নতুন চিঠি

২০১৯

সম্পাদক

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

বার্তা সম্পাদক

দিনেশ ঝা

প্রকাশক

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা সহযোগিতায়

অরুণ মজুমদার, সুকৃতি ঘোষাল, শিবানন্দ পাল,
কাজি আব্দুল করিম, কিশোর মাকর, মুরারী মণ্ডল,
পার্থ চৌধুরী, ফজলুল বারি মিদ্দা, জহুর আলম

ব্যবস্থাপনায়

আবদুস সবুর

প্রচ্ছদ : **শ্যামলবরণ সাহা**
অক্ষরবিন্যাস-পৃষ্ঠাসজ্জা : **শ্যামসুন্দর বেরা**
অলঙ্করণ : **সমর মুখোপাধ্যায়, কুশল বণিক**
মুদ্রক : **নতুন চিঠি প্রেস**, বর্ধমান
মুদ্রণ সহযোগিতায় : **সাধনা প্রেস**, ১১ জে বি মিত্র রোড ও **সত্যযুগ কর্মী শিল্প সমবায় প্রেস**, কলকাতা

মূল্য : ৫০ টাকা

NC/F1

সম্পাদকীয়

বৃহৎ ও অতি-বৃহৎ গণমাধ্যমের আধিপত্য এবং সোস্যাল মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তৃতির এই যুগে ছোটো পত্রিকার টিকে থাকাই বড়ো সমস্যা। মনোরঞ্জনের মাধ্যমে পাঠকদের আকৃষ্ট করার প্রতিযোগিতায়ও ছোটো পত্রিকার দাঁড়াবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা নেই। একমাত্র গুণগত বৈশিষ্ট্যে রুচিশীল পাঠকদের আকৃষ্ট করতে পারাই তার সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যেই ‘নতুন চিঠি’ আত্মনিবেদিত। বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও নতুন চিঠি গর্বিত যে আগ্রহী পাঠকদের কাছে এই পত্রিকার, বিশেষত তার শারদ সংখ্যার, একটা বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা আছে। সেই গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার জন্যই নতুন চিঠি সদা-সচেষ্ট।

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা, বিজ্ঞানচর্চার নানা দিক উন্মোচন এবং যথোচিত মানের কবিতা, শিল্পকলা ও সাহিত্যের যথাসাধ্য উপস্থাপনের মাধ্যমেই নতুন চিঠি, বিশেষত তার শারদ সংখ্যা, আগ্রহী পাঠকদের সম্মুখীন হয়েছে। এই বৎসরটি বিদ্যাসাগর প্রমুখ ভারত-গৌরব বেশ কয়েকজন মহামনীষীর বিশেষ স্মরণের বৎসর। তাঁদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের প্রয়াসও নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে।

বর্তমান দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন চিঠি তার নিজ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরতে চায় এই বিশেষ শারদ সংখ্যার বিভিন্ন রচনায়। ভারতের বর্তমান শাসক দেশকে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের এক ভয়ঙ্কর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এক-নেতৃত্বাধীন রাজ্যের শাসন পরিণত হয়েছে নৈরাজ্যে। ভারতের সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো বিপর্যয়ের মুখে। বাম-শক্তির দুর্বলতার সুযোগে তা ক্রমশ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির যথোচিত পর্যালোচনাই নতুন চিঠি-র এই শারদ সংখ্যার মৌলিক লক্ষ্য।

নতুন চিঠি-র ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুভানুধ্যায়ী নিরুপম সেন প্রয়াত হয়েছেন, প্রয়াত হয়েছেন আর এক শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক সুধীর রায়। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁদের স্মরণ করি।

পাঠকদের আকৃষ্ট করতে পারলেই নতুন চিঠি-র এই প্রয়াস সার্থক হবে।

লেখক, পাঠক, গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা ও মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীদের শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

১. **সীতারাম ইয়েচুরি** : ভারতে ফ্যাসিবাদের উত্থানকে রুখতে হবে
৫ **বিমান বসু** : বিদ্যাসাগর—আরম্ভ করলে শেষ করতেন
৭ **ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ** : ভারতীয় দর্শনে মার্কসবাদের পথিকৃৎ দেবীপ্রসাদের স্মরণে (পুনর্মুদ্রণ)
১৫ **মদন ঘোষ** : ভারতে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা
১৯ **সাক্ষাৎকার পুনর্মুদ্রণ, নিরুপম সেন** : 'পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বিকাশের ভবিষ্যত সার্বিকভাবেই উজ্জ্বল'
২১ **অরিন্দম কোঙার** : গতর-খাটা মানুষের জন্য দেবীপ্রসাদের 'মার্ক্সবাদ'
২৫ **অমল হালদার** : কৃষি সংকট ও কয়েকটি প্রসঙ্গ
২৭ **অচিন্ত্য মল্লিক** : শতবর্ষে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি
২৯ **সুস্নাত দাশ** : স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : শতবর্ষে ফিরে দেখা
৪১ **আভাস রায়চৌধুরী** : সেক্যুলারিজ়ম কেন চাই

কবিতা : ৪৫-৫২

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থ রাহা, জিয়াদ আলী, অরবিন্দ সরকার ৪৫; কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস প্রধান, সতীরঞ্জন আদক, অনাথ মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, অভিজিৎ দাশগুপ্ত ৪৬; পরেশ ঘোষ, গৌতম হাজরা, অভিজিৎ ঘোষ, সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ৪৭; সংঘমিত্রা চক্রবর্তী, জমর সাহানী, নীলয় মিত্র, কৃষ্ণা মালিক ৪৮; তাপস রায়, পরেশনাথ কর্মকার, অরূপ আচার্য, স্বপ্না রায়, কালিদাস ভদ্র ৪৯; অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, পুষ্পজিৎ রায়, তাপস মিত্র, নরেশ মণ্ডল, কুশল দে ৫০; বিশ্বনাথ কয়াল, মিনতি গোস্বামী, মলয় রায়, রসুল করিম, স্বরাজ ঘোষ ৫১; বিকাশ বিশ্বাস, সুকান্ত দে, চয়ন ভৌমিক ৫২

প্রবন্ধ

৫৩ **হরিহর ভট্টাচার্য** : ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন, সংসদীয় রাজনীতি ও রাজ্যভিত্তিক আন্দোলনের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন
৫৭ **বিভাস সাহা** : অতীত ঔপনিবেশিকতা এবং বর্তমান অনুন্নয়ন
৬৫ **রথীন রায়** : আমরা এখন কোথায়? সচেতন মানুষই শেষ কথা বলবে
৬৯ **সুকান্ত কোঙার** : ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শতবর্ষ ও সি.আই.টি.ইউ-র পঞ্চাশ বছর
৭৩ **অপূর্ব চ্যাটার্জি** : মিথ্যার নির্মাণকে ভেঙে বিকল্পনীতি নির্মাণের সংগ্রাম

দ্বিশতবর্ষে স্মরণ

৭৭ **শেখ সাইদুল হক** : প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর : দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী এবং জেলা বর্ধমান
৮১ **শ্যামাপ্রসাদ বসু** : প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ
৮৫ **হরিলাল নাথ** : বিদ্যাসাগরের চোখে 'ভ্রান্ত দর্শন'
৮৯ **শ্যামসুন্দর বেরা** : ঈশ্বরের শেষ ঠিকানা কর্মাটাঁড়ের নন্দনকানন
৯৩ **সঞ্জীব চক্রবর্তী** : দ্বিশত প্রয়াণবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
৯৭ **রামপ্রণয় গাঙ্গুলী** : জন্মের দ্বিশতবর্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত
৯৯ **নিশীথকুমার দত্ত** : বিস্মৃতপ্রায় অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ বিনয় কুমার সরকার

গল্প

১০৩ **তরুণ মজুমদার** : শ্রীকালীগতি ভট্চায ও বনভ্রমণ
১০৭ **স্বপ্নকমল সরকার** : তারাদের কথা
১০৯ **কাকলি ঘোষ** : বন্ধন
১১১ **গীষ্পতি চক্রবর্তী** : বিসর্জন

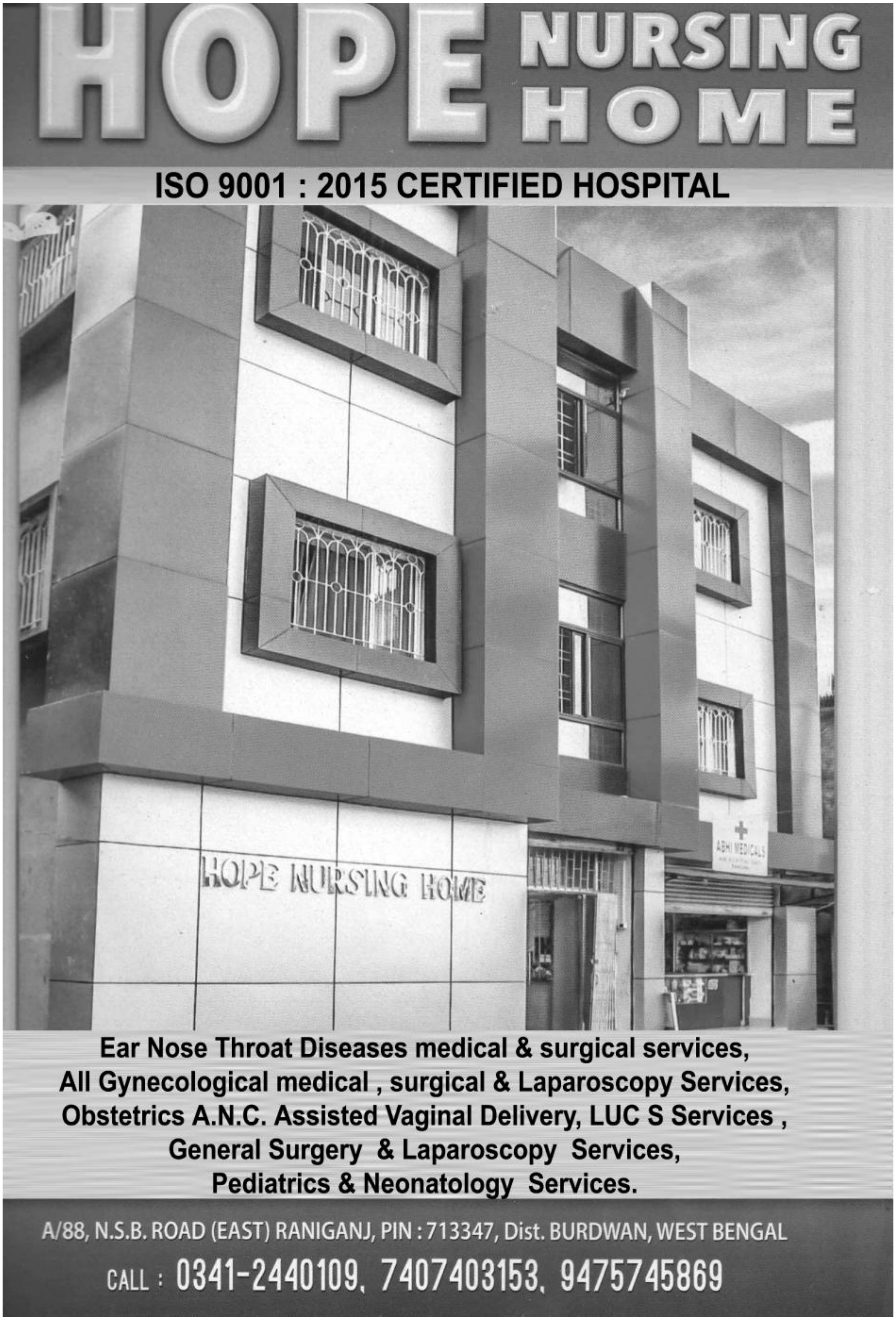
HOPE NURSING HOME
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED HOSPITAL
HOPE NURSING HOME
ABHI MEDICALS
Ear Nose Throat Diseases medical & surgical services,
All Gynecological medical , surgical & Laparoscopy Services,
Obstetrics A.N.C. Assisted Vaginal Delivery, LUC S Services ,
General Surgery & Laparoscopy Services,
Pediatrics & Neonatology Services.
A/88, N.S.B. ROAD (EAST) RANIGANJ, PIN : 713347, Dist. BURDWAN, WEST BENGAL
CALL : 0341-2440109, 7407403153, 9475745869

Sl. No. 94

সূচিপত্র

বিজ্ঞান

১১৫ **সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়** : শতাব্দীর বিশ্রুত এক সূর্যগ্রহণ

১২৩ **ড. অরবিন্দ দাশ** : দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলিভ ও তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের সার্ধশতবর্ষ

১২৭ **চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** : মহাবিশ্বের বিস্ময় কৃষ্ণগহ্বর

কবিতা : ১৩১-১৩৮

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশ পুরকায়স্থ, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহেব আলি খান ১৩১; মনামী ঘোষ, গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়, সূর্য মণ্ডল ১৩২; পান্নালাল মল্লিক, কানাইলাল বিশ্বাস, রীনা মিত্র, ঝর্না মুখোপাধ্যায় ১৩৩; সুনির্মল কুণ্ডু, রীতা বসু (ধর), গৌতম সাহা ১৩৪; শ্যামলবরণ সাহা, মিলনেন্দু জানা, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, সুধাংশুরঞ্জন সাহা ১৩৫; শেখ জয়নাল আবেদীন, মাধুরী অধিকারী, সুকমল ঘোষ, পবিত্র কুমার ভক্তা ১৩৬; মানিকলাল অধিকারী, বিশ্বনাথ নায়েক ১৩৭; বিকাশ পণ্ডিত, রীনা কুণ্ডু, গৌরী সেনগুপ্ত, তন্ময় ভট্টাচার্য, লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা, শীলা দাশ ১৩৮

ভ্রমণ

১৩৯ **চন্দ্রাবলী সেন** : রূপসী শীতল মরুতে

১৪৩ **মধুছন্দা মিত্র ঘোষ** : অকপট এই অরণ্যযাপন, রামসাই বনবস্তি...

প্রবন্ধ

১৪৭ **কল্যাণী ভট্টাচার্য** : সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে নজরুল মৌখিক সাহিত্য : তত্ত্বের আধারে

১৫১ **ভব রায়** : ক্ষেত্রদৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ

১৫৫ **শিবশঙ্কর কুণ্ডু** : শিল্পকলায় মূর্ত-বিমূর্ত রূপ

১৫৯ **রঙ্গনকান্তি জানা** : রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গ

১৬৫ **বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস** : ছড়া-কবিতায় শিশু-কিশোরদের বারোমাস্যা

১৬৭ **মৃদুল সেন** : মোদিজির দ্বিতীয় ইনিংস

১৭১ **পঙ্কজ রায় সরকার** : একুশ শতকের রানার : রিচ দ্য টার্গেট

ইতিহাস

১৭৫ **জহরলাল সাঁই** : সরোজিনী নাইডু : একশো চল্লিশতম বর্ষে ফিরে দেখা : সেদিনের বর্ধমানে এক বর্ণময় ভারতীয় নারী

১৭৯ **দেবেশ ঠাকুর** : জালিয়ানওয়ালাবাগ : কবি-কথা

১৮৩ **বীরেন ঘোষ** : ঝোড়ো যুগের দিনলিপি

১৮৭ **প্রবাল সেনগুপ্ত** : বিদ্যানগর স্কুলের জন্মকথা

১৮৯ **সর্বজিৎ যশ** : স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবিদ্যা চর্চা

গল্প

১৯১ **রূপক মিত্র** : জলে ডোবা মানুষেরা

১৯৫ **স্বপন ঘোষ চৌধুরী** : পাড়ি

১৯৯ **তপোময় ঘোষ** : এক সফল পুরুষের বৃত্তান্ত

২০৩ **স্বপন পাঁজা** : ধানু হাজরার জোলের জমি

২১৭ **গৌতম চট্টোপাধ্যায়** : অবিশ্বাস্য

কবিতা : ২০৫-২০৯

যযাতি দেবল, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ মাজিলা ২০৫; নলিনীরঞ্জন সরকার, কনিষ্ক আচার্য, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, পরেশ কর্মকার ২০৬; অজয়রঞ্জন বিশ্বাস, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, তপন পাল ২০৭; গৌতম সাহা, অনন্য ভট্টাচার্য ২০৮; প্রভাত ঘোষ, অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৯

ভ্রমণ

২১১ **বিলাস চ্যাটার্জী** : রুপিন পাস অভিযান

২১৫ **কৌশিক লাহিড়ী** : বার্লিনের ডাইরি

With best compliments of

GIL

ভারতে ফ্যাসিবাদের উত্থানকে রুখতে হবে

সীতারাম ইয়েচুরি*

ভারতের রাজনীতিতে যে দক্ষিণপন্থী অভিমুখটি তৈরি হয়েছে, তার অগ্রগতি যে ক্রমশ আরও সুসংহত রূপ গ্রহণ করছে, ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের রায় সেই চিত্রটিকেই তুলে ধরে। এর তাৎপর্যটা বোঝা দরকার।

ভারতের শাসকশ্রেণিগুলি আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগে রাষ্ট্রশক্তিকে কঠোরভাবে ব্যবহার করে নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে যে পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে, তার লক্ষ্য ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিব করে তোলা। দক্ষিণপন্থার এই সুসংহত প্রয়োগ বরাবরই ভারতের শাসকশ্রেণিগুলির লক্ষ্য। নয়া-উদারনৈতিক ব্যবস্থাকে মজবুত করে তোলার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থাকে সুসংহত করার সাথে সাথে ভারত রাষ্ট্র সেই সমস্ত শক্তির স্বার্থরক্ষায় তৎপর যারা তাদের দক্ষিণপন্থী কর্মসূচির ভিত্তিতে আমাদের সমাজ ও তার বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটাতে চায়।

বিজেপি আরএসএস-এর রাজনৈতিক বাহু ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং আরএসএস-এর ঘোষিত কর্মসূচি হলো ভারতের আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে তাদের ভাষ্য অনুযায়ী চরম অসহিষ্ণু ধর্মভিত্তিক এক ফ্যাসিবাদী 'হিন্দুরাষ্ট্র' হিসাবে গড়ে তোলা।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থার দৃঢ়ীকরণের অর্থ হলো সংবিধান দ্বারা নির্ণীত ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিকেই অবলুণ্ঠিত করে আরএসএস-এর ফ্যাসিবাদী প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সিপিআই(এম)-এর কর্মসূচিগত দৃষ্টিভঙ্গি

সাময়োপযোগী করে গৃহীত সিপিআই(এম)-এর কর্মসূচি তার ৫.৭, ৫.৮, ৫.৯ এবং ৭.১৪ ধারায় আরএসএস-এর এই ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের পর্যালোচনা করেছে। এই কর্মসূচি থেকে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটিই স্পষ্ট করে দেয় ফ্যাসিবাদের এই বিপদ এবং সর্বস্তরে তার সুদৃঢ় মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিপিআই(এম)-এর অবস্থানকে—

সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী চরিত্রসম্পন্ন আরএসএস কর্তৃক পরিচালিত জোটের শক্তিবৃদ্ধি ও কেন্দ্রে তাদের ক্ষমতা দখলের ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিই আজ গুরুতর বিপদের সম্মুখীন। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রশাসন, শিক্ষাব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যমের সাম্প্রদায়িকীকরণের পরিকল্পিত প্রয়াস চলছে। সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার শক্তিবৃদ্ধি সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকেও জোরদার করবে এবং জাতীয় ঐক্যকে বিপন্ন করবে। বিজেপি ও তার সাম্প্রদায়িক মঞ্চের প্রতি বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির কোনো কোনো অংশের সমর্থন দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে। (অনুচ্ছেদ ৫.৭)

সুতরাং আমাদের পার্টি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ধারাবাহিক রূপায়ণের জন্য আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই নীতি থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিকেও উন্মোচিত করে দিতে হবে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু নির্বিশেষে প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের এবং সেই সঙ্গে যারা কোনো ধর্মমতে বিশ্বাসী নয় তাদেরও যে-কোনো ধর্মমতে বিশ্বাস ও ধর্মাচরণ করার বা আদৌ না করার অধিকারকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির কর্তব্য জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনে ধর্মের যে-কোনো রকমের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে উর্ধে তুলে ধরা। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উপর ভর করে যে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বিস্তারলাভ করছে, তার বিরুদ্ধে অবশ্যই সর্বস্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৫.৮)

আরএসএস ও তার সংগঠনগুলি নিয়মিতভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্ররোচনা দিয়ে যাচ্ছে। তারা খ্রিস্টান সম্প্রদায়কেও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে। এর ফলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতার মনোভাব ও নিরাপত্তাহীনতা, যার থেকে জন্ম হয় মৌলবাদী প্রবণতার এবং এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার স্তম্ভগুলিই দুর্বল হয়ে পড়ে। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্ন করে এবং সকল অবদমিত জনগণের সাধারণ আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে শক্তিশালী করার সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সংখ্যালঘুদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো। (অনুচ্ছেদ ৫.৯)

ভারতীয় জনতা পার্টি বিভেদকামী ও সাম্প্রদায়িক মঞ্চের একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল, যার প্রতিক্রিয়াশীলতার মর্মবস্তু হলো অন্যান্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী জাত্যভিমান। বিজেপি কোনো সাধারণ বুর্জোয়া দল নয়, কেননা ফ্যাসিস্ত ধাঁচের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাকে পরিচালনা করে ও তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় আর এস এস রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেছে। হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ পুনরুত্থানবাদকে মদত দেয় এবং হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে। এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার সংখ্যালঘুর মৌলবাদকে উসকে দেয়। আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির উপর তার গুরুতর প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে তা গুরুতর বিপদ। এ ছাড়াও বৃহৎ বাণিজ্য ও ভূস্বামীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ বিজেপি-কে সর্বাত্মক সমর্থন দিচ্ছে। (অনুচ্ছেদ ৭.১৪)

আর এস এস-এর কর্মসূচির অগ্রগতি

২০১৯-এর নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থার শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধির নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আসাম ছাড়া দেশের অন্যান্য অংশেও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বজ্রনির্ঘোষে জানিয়েছেন যে বর্তমান বিজেপি সরকার দেশ থেকে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নকে সুনিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের লক্ষ্যে নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Act)-এর প্রস্তাবিত সংশোধন ভারতীয় সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুসলমান হিসাবে চিহ্নিত সকল আগতদের 'অনুপ্রবেশকারী' হিসাবে গণ্য করা হবে, যদিও সমস্ত অ-মুসলমান, বিশেষত হিন্দু-দের গণ্য করা হবে 'বাস্তুহারা' হিসাবে। পূর্বোক্তদের বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারী হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং পরোক্তদের মানবিক কারণে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার প্রথম চার মাসের মধ্যেই বর্তমান সরকারের প্রশ্রয়ে বেসরকারি ঘাতক বাহিনী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে থাকে। বিনা শাস্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। আরএসএস-বিজেপি এবং তাদের সরকারের সঙ্গে যারা সহমত নয় বা তার বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও কারাবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি-র সংশোধনের মাধ্যমে আইনসিদ্ধ করা হচ্ছে এমন একটি নিরাপত্তাদায়ী রাষ্ট্র (security state)-কে, যা কার্যত সমস্ত নাগরিকদের উপর নজরদারিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

ভারতীয় সরকার সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-ক ধারাকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, যে ধারা-দুটির ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীর এক বিশেষ অবস্থান থেকে ইনস্ট্রুমেন্ট অব একসেশন-এ স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে যোগদান করেছিল।

অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে জোর করে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যমকে আরও জোরদার করে তোলা হচ্ছে।

নতুন শিক্ষানীতি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্নির্মাণ করতে চাইছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যার কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় যুক্তিবাদকে বিধ্বস্ত করা। ভারতীয় শিক্ষার বর্তমান বিষয়বস্তু ও পাঠক্রমে যুক্তিবাদের স্থান নিচ্ছে যুক্তিহীনতা। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে আর এস এস-এর প্রকল্প অনুযায়ী একটি ফ্যাসিবাদী 'হিন্দু রাষ্ট্র'-তে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে সুগম করার জন্য বিজেপি-র পক্ষে এটা অবশ্যকরণীয়।

দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সংঘবদ্ধতা ও ফ্যাসিবাদ

১৯৩৫ সালে সপ্তম কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এ তাঁর তীক্ষ্ণধী অভিভাষণে জর্জি ডিমিট্রিভ ইওরোপীয় ফ্যাসিবাদের প্রকৃতি ও তার উদ্ভব সম্পর্কে যে প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছিলেন তা আজও একইরকম প্রাসঙ্গিক। ফ্যাসিবাদকে তিনি '*চরম প্রতিক্রিয়াশীল, উৎকট স্বদেশপ্রেমী এবং লগ্নিপুঁজির চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদী অংশের উন্মুক্ত সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র*' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখল এক বুর্জোয়া সরকার থেকে আর-এক বুর্জোয়া সরকারে পদার্পণের সাধারণ কোনো প্রক্রিয়া নয়, তা হলো

শাসক-শ্রেণির এক চরিত্রের শাসনের বিকল্প হিসাবে অন্য চরিত্রের শাসনের প্রবর্তন, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের বদলে উন্মুক্ত সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্রের প্রবর্তন।

ইওরোপে যে গভীর অর্থনৈতিক সংকট শাসকশ্রেণির আধিপত্যকে সংকটগ্রস্ত করে তুলেছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় এই পরিবর্তন। হিটলারি ফ্যাসিবাদের পত্তনের পূর্বে, ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী 'মহামন্দা'-জনিত পুঁজিবাদী সংকটের অংশ হিসাবে জার্মান একচেটিয়া পুঁজির ক্ষেত্রে এমন সংকটই ঘটেছিল। সিপিআই(এম)-এর ২২তম কংগ্রেস সেই সময়ে বিশ্বব্যাপী রাজনীতির যে দক্ষিণপন্থী দিকপরিবর্তন লক্ষ করেছিল, তার আবির্ভাব ঘটেছিল দীর্ঘকালব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশ্বিক সংকটের ফলস্বরূপ।

কাজেই ভারতে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের পরে দক্ষিণপন্থী শক্তির সংহতি উপরোক্ত অর্থে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা নয়, ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তরঙ্গাভিঘাত। **আসল প্রশ্ন হলো বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসসাধন করে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই অভিঘাতকে সার্থকতা অর্জন করতে দেওয়া হবে কি না।**

এখন প্রয়োজন ফ্যাসিবাদের অভিমুখে এই তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে প্রতিহত করা। তা করতে হলে তার উদ্ভবকালে ফ্যাসিবাদ যে প্রচার-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল সে-সম্পর্কে ডিমিট্রভ-এর পর্যালোচনার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যেতে পারে।

> প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক অবস্থান অনুযায়ী ফ্যাসিবাদের বিকাশ ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের চরিত্র এক এক দেশে এক এক রূপ পরিগ্রহ করে থাকে।... যখন তার অবস্থান বিশেষভাবে সঙ্কটগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন নিজ শ্রেণিচরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে, সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থূল ভাওতাবাজির সঙ্গে উন্মুক্ত সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্রের সম্মিলনে নিজ ভিত্তি সম্প্রসারণের প্রয়াস থেকে ফ্যাসিবাদকে বিরত করা যায় না।
>
> কমরেডস, ফ্যাসিবাদের ক্ষমতাসীন হবার প্রক্রিয়াটিকে এমন সরলভাবে ব্যাখ্যা করলে চলবে না, যেন লগ্নি-পুঁজির কোনো একটি কমিটি কোনো এক বিশেষ দিনে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।... ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগেই বুর্জোয়া সরকারগুলিকে সাধারণত কতকগুলি প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে আসতে হয় এবং এমন কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় যা ফ্যাসিবাদের ক্ষমতাসীন হবার প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। **যদি এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণির ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্বেই তাকে প্রতিহত করা না যায় তাহলে তা ফ্যাসিবাদের জয়যাত্রার পথকেই সুগম করবে।** (১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে প্রদত্ত প্রতিবেদন, স্থূলাক্ষর ব্যবহার লেখকের)

কাজেই ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবার পর তার বিরুদ্ধে লড়াই করলে চলবে না। তাহলে লড়াইয়ের আগেই আরএসএস-এর লেলিয়ে দেওয়া নিজস্ব বাহিনী আরও অনেকের সঙ্গে এই লেখক ও তার পাঠকদেরও গিলে খেয়ে ফেলবে।

শিহরণ জাগানো সাযুজ্য

উত্থানশীল ফ্যাসিবাদ ও আরএসএস-এর প্রচারপদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে। আরএসএস-বিজেপি এখন ফ্যাসিবাদী পদ্ধতিতে জনপ্রিয় প্রতীকগুলিকে আত্মসাৎ করছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বঞ্চনার এক মিথ্যা চেতনা তৈরি করছে এবং অগ্রগতির পদ্ধতি হিসাবে চূড়ান্ত যুদ্ধং-দেহি দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে। ডিমিট্রভ বলেছিলেন, ''*ফ্যাসিবাদ চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করে, কিন্তু জনসাধারণের কাছে নিজেদেরকে অন্যায়ের শিকার এক জাতির ছদ্মরূপে উপস্থাপন করে এবং অপমানিত 'জাতীয়' সংবেদনের কাছে আবেদন জানায়।*'' এ-ব্যাপারে আরএসএস-কে চাম্পিয়ন হিসাবে তুলে ধরার জন্য এমন একটি মিথ্যা চেতনা তৈরি করা হচ্ছে যে হিন্দুরা বরাবর বঞ্চিত হয়ে এসেছে ও এখনও হচ্ছে, এবং একই সঙ্গে হিটলারের অনুসরণে হিন্দুদের এই বঞ্চনার জন্য মুসলমানদেরই দায়ী করে হিটলারের ইহুদি-বিদ্বেষের অনুসরণে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য হিন্দুত্ববাদীরা হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবেলস-প্রদর্শিত পথে অনবরত মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

চরম সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে কাজ করার প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতে মুনাফাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবার সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা এবং সেই সঙ্গে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক রণনীতিগত প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিজেপি সরকার তার প্রথম পাঁচ বছরে ভারতকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধস্তন সহযোগী হিসাবে পাকাপাকিভাবে যুক্ত করেছে।

এ-ছাড়াও, জর্জি ডিমিট্রভের ভাষায় বলা যায়, ''*বুর্জোয়া শ্রেণির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের স্বার্থেই ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া দলগুলি ছেড়ে চলে আসা হতাশাগ্রস্ত জনগণের সামনে উপস্থিত হয়। কিন্তু বুর্জোয়া সরকারগুলির প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণ শানিয়ে ও পুরাতন বুর্জোয়া দলগুলির প্রতি অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শনের ছলনায় সেই জনগণকেই ভুল বুঝিয়ে স্বপক্ষে টেনে আনে।*''

লক্ষণীয়, ৭০ বছরের অধিক কাল ধরে যে স্বাধীন ভারত এগিয়ে চলেছে তাকে আরএসএস-বিজেপি কী উদগ্র ভাষায় আক্রমণ করে থাকে। তারা এমন চিত্রটাই তুলে ধরতে চায় যেন তাদের সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার আগে দেশে কোনো উন্নয়নই হয়নি। যেন একমাত্র তাদের শাসনকালেই ভারত এখন একটি বৈশ্বিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে, একমাত্র তাদের শাসনকালেই ভারত বৈশ্বিক স্তরে অর্থনৈতিকভাবে প্রতাপশালী একটি রাষ্ট্রে উত্তীর্ণ হতে চলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মাধ্যমে তারা মোদির এমন একটি ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চাইছে যেন ভারতের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের স্বার্থে তিনি অপরিহার্য।

ডিমিট্রভ লিখেছেন—

> ফ্যাসিবাদ জনগণকে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ও অর্থগৃধ্নুদের করুণার পাত্র করে তোলে, কিন্তু জনগণের বিপুল হতাশার পরিপ্রেক্ষিতে 'সৎ ও দুর্নীতিতে লিপ্ত করা যায় না এমন একটি সরকার'-এর দাবি নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হয়... ফ্যাসিবাদ প্রতিটি দেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার বাক্‌বিভূতি বিস্তার করে। এবং বিপুল সংখ্যক পেটিবুর্জোয়া, এমনকি নিদারুণ অভাব, বেকারি এবং অস্তিত্বের সংকটে আক্রান্ত হতাশাগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণির একটি অংশও ফ্যাসিবাদের সামাজিক ও উগ্র দেশপ্রেমিকতার গলাবাজির শিকার হয়ে পড়ে।

(Dimitrov, Georgi, Selected Works, Voloume 2, Sofia Press–1972, p. 12)

বিগত পাঁচ বছরে, পূর্ববর্তী বিজেপি সরকারের শাসনকালে দেশ এবং জনগণকে কার্যত চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অর্থগৃধ্নুদের করুণার পাত্র হয়ে থাকতে হয়েছে। রাফাল কেলেঙ্কারি, দলের পছন্দসই লোকদের জমি প্রদান (যার সবচেয়ে বড় প্রাপক ছিলেন রামদেব, যার 'পতঞ্জলি' অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস থেকে

১৯১৮ সালে ৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিশাল এক কোম্পানিতে পরিণত হয় এবং তাকে ভারতের ২০ জন সর্বোচ্চ ধনীর একজনে উন্নীত করে), রাজনৈতিক দুর্নীতিকে আইনসিদ্ধ করে 'ইলেক্টোরাল বন্ড' চালু করা, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে কার্যত পঙ্গু করে পছন্দসই তাবেদারদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণদান, ইত্যাদি। আরএসএস-বিজেপি কর্তৃক অর্থশক্তির এই বিপুল প্রদর্শনী কার্যত গণতন্ত্রকে দারুনভাবে বিকৃত করেছে। বিগত পাঁচ বছরে যে পদানত পুঁজিবাদের পত্তন করা হয়েছে, তা পদাশ্রিতদের অকল্পনীয় সম্পদের অধিকারী করে তুলেছে।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, মুকেশ আম্বানির শিল্প-সাম্রাজ্য ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে দ্বিগুণের থেকেও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। এর অর্থ হলো মোদি প্রধানমন্ত্রী হবার আগে ৫৮ বছরের জীবনে মুকেশ আম্বানি যত সম্পদ সৃষ্টি করেছিলেন বা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন, বিজেপির পাঁচ বছরের শাসনকালে তার থেকেও বেশি সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন।

নরেন্দ্র মোদি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন গুজরাটের গৌতম আদানি 'আদানি এন্টারপ্রাইজেস'-এর সম্পদের ৫,০০০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। ২০১৪ থেকে ২০১৮, এই চার বছরে আদানির সম্পদের নিট মূল্য ২.৬ বিলিয়ন থেকে চারগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৯ বিলিয়নে উঠে আসে।

এই সমস্ত নির্বাচনে বিজেপি এই নজিরবিহীন দুর্নীতি এবং ঘনিষ্ঠ পুঁজিবাদী সাহচর্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। তাথাপি তার প্রচার-অভিযানের কেন্দ্রে রয়েছে দুর্নীতি সম্পর্কে 'জিরো টলারেন্স'-এর মতো বজ্রনির্ঘোষ। এর মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদী পন্থা-পদ্ধতির যে উদাহরণ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে শিহরণ-জাগানো সাযুজ্য।

ফ্যাসিবাদী উত্থানকে পরাজিত ও প্রতিহত করো

ফ্যাসিবাদী প্রবণতার গতিবৃদ্ধিকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে এবং ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিমুখী প্রয়াসকে অবশ্যই স্তব্ধ ও পরাস্ত করতে হবে। এবং এটা করতে হবে সেই সমস্ত শক্তির দৃঢ়তর সংগ্রামী ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে যারা আমাদের নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে অটুট রাখতে চায়।

নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হতমান করার যে-কোনো অপপ্রয়াসকে প্রতিহত করতে হবে। নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষকে করায়ত্ত করা বা তার স্বাধীনতাহানির ঘটাবার যে-কোনো প্রয়াসের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। সম্প্রতি আইন-প্রণয়ন ও আইন-সম্পর্কে সংসদীয় কমিটির পর্যালোচনার সমস্তরকম সংসদীয় রীতিনীতিকে নস্যাৎ করে সংসদকে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার প্রদর্শনের একটি মঞ্চে পর্যবসিত করা হয়েছে।

বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, ন্যায়বিচারকে বিকৃত করা একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। নির্বাচন কমিশন, সিবিআই, আরবিআই, সিভিসি, রাইট টু ইনফরমেশন কমিশন-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে হয় করায়ত্ত করা হচ্ছে, নয় তো হতমান করা হচ্ছে। এইসব সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষকে গুড়িয়ে ফেলার লক্ষ্য হলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে আরএসএস-এর প্রকল্প অনুযায়ী ফ্যাসিবাদী 'হিন্দু রাষ্ট্রে' পরিণত করার পথকে মসৃণ করা।

বর্তমানে ভারতে গড়ে উঠেছে এক কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক জোট যা সর্বগ্রাসী জাতীয়তাবাদের সুতীব্র প্রচারের মাধ্যমে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর। 'হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদ' ও 'ভারতীয় দেশপ্রেম'-এর মধ্যে লড়াইকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলতে হবে। যারা আরএসএস/বিজেপি-র বিরুদ্ধাচরণ করে ভারতীয় দেশপ্রেমকে উর্ধে তুলে ধরতে চায়, 'জাতি-বিরোধী' তকমা দিয়ে তাদের উপর রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের অধীনে মামলা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংবিধান-প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এখন আশু কর্তব্য।

বৃহৎ মুনাফালোভী দেশি ও বিদেশি নয়া-উদারবাদী কর্পোরেটদের মধ্যে যে পারস্পরিক সংযোগ গড়ে উঠেছে, এবং সাম্প্রদায়িকতার মেরুকরণের তীব্রতা যে-ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে মানুষের জীবনযাত্রার সমস্ত দিকের উপর অসহনীয় আক্রমণ অবশ্যই আরও তীব্র হয়ে উঠবে। জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক বোঝাকে ক্রমশ আরও বাড়িয়ে তোলা অবশ্যই আর সহ্য করা চলবে না এবং ধনীকে আরও ধনী ও গরিবকে আরও গরিব করে তোলার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে নামতে হবে। এর জন্য ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন, যার ভিত্তিতে বৃহত্তর শক্তির অধিকারী জনগণের লড়াই গড়ে তুলতে হবে।

---

*সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক

নতুন চিঠি-র জন্য রইল শুভেচ্ছা

জনৈক শুভার্থী

বিদ্যাসাগর—আরম্ভ করলে শেষ করতেন

বিমান বসু

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কারের কাজ ও হিনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিওর স্বল্পায়ু জীবনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাজের ভিতরে ওপর দাঁড়িয়ে। উল্লেখ্য, রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবরণ এবং ডিরোজিওর কূপমণ্ডুকতা-বিরোধী আন্দোলন তৎকালের সমাজে অভাবনীয় কীর্তি। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮২০ সালের ২৬ সেপেমটম্বর বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর পিতা ঠাকুরদার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী।

১৮২৯ সালে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বীরসিংহ গ্রাম থেকে বিদ্যাসাগর কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে বালক ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহের শিবচরণ মল্লিকের বাড়িতে পাঠশালায় লেখাপড়া করতেন। সংস্কৃত কলেজে ১২ বছর লেখাপড়া করে ব্যাকরণ, অলংকার, কাব্য, বেদান্ত, স্মৃতি এবং ন্যায়-সহ বিভিন্ন বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে ১৮৩৯ সালে হিন্দু ল'কমিটির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে তিনি 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ওই বছরের ২৯ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিতের চাকরিতে যোগদান করেন। এই সময় থেকেই বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের সূচনা।

বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকুরিরত অবস্থায় হিন্দি ও ইংরাজি শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং লেখাপড়া জানা ইংরাজ কর্মচারীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। ইংরাজ কর্মচারীরা বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখে তারিফ করতেন।

১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের কোর্স কারিকুলাম পরিবর্তন করার প্রস্তাব পেশ করলে তৎকালীন সম্পাদক রসময় দত্ত মহাশয় তা নাকচ করে দেন। বিদ্যাসাগর যৎপরোনাস্তি অপদস্থ বোধ করে সংস্কৃত কলেজের চাকুরি ছেড়ে পুনরায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকুরিতে যোগদান করেন। যদিও চাকুরি ছাড়ার পর বিদ্যাসাগরকে বেশ কয়েক মাস বেকার জীবন যাপন করতে হয়েছিল। তবে একথা ঠিক সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি সংস্কারের প্রস্তাব কলেজ কর্তৃপক্ষ মেনে নিলে বিদ্যাসাগর পুনরায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনার কাজে প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্বিতীয়বার সংস্কৃত কলেজে ফিরে আসার পর বিদ্যাসাগর সহ-অধ্যক্ষ পদে আসীন হয়ে শিক্ষার স্বার্থে ও সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষের পদে আসীন হয়ে কলেজের নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষকদের নিয়মানুবর্তিতা মান্য করে পাঠদানের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে যত্নবান হতে আবেদন করেন। একাজে বিদ্যাসাগরকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কারণ তিনি ওই কলেজেই পড়াশোনা করেছেন এবং অনেকেই তাঁর শিক্ষক ছিলেন। এমনও হয়েছে কলেজে ক্লাসের সময়ে তাঁর শিক্ষকরা যখন ঢুকতেন তখন তিনি ঘড়ি দেখিয়ে বলতেন, এখনকার সময়টা নিজের ঘড়িতে দেখে নিন। এই ঘটনা থেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের নিয়মানুবর্তিতার বৈশিষ্ট্য আমরা সবাই শিখতে পারি।

বিদ্যাসাগর সমাজে অন্ধ বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতা-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি আবার বিশ্বাস করতেন নারীদের মধ্যে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস দূর করতে নারী শিক্ষা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি মনে করতেন মা'র মন সংস্কারমুক্ত না হলে তাঁর সন্তান-সন্ততিরা কখনো সংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই, কর্মজীবনের শুরুতেই লর্ড বেথুনের সহায়তায় উত্তর কোলকাতার হেদুয়াতে ক্যালকাটা জুভেনাইল গার্লস স্কুল স্থাপন করেছিলেন যার সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজে। বেথুন মারা যাবার পর তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ওই স্কুলটির নামকরণ হয় বেথুন স্কুল। এই সময় ওই স্কুলটি একটি ভালো মেয়েদের স্কুল ছিল যা ১৭০ বছর পরেও মেয়েদের একটি ভালো স্কুল হিসাবে বিবেচিত হয়।

বিদ্যাসাগরের সময়ে বাংলায় ভালো পাঠ্য বই ছিল না। এমনকি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যে বই ছিল তাও ছাত্র-ছাত্রীদের তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে অসুবিধা হতো। তাই বিদ্যাসাগর বাংলা শব্দ ব্যবহার করে সংস্কৃত শিক্ষার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবন করে সমস্যার সমাধান করেছেন। আবার বিদ্যাসাগরের জনশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যেও বাংলা ভাষায় 'বোধোদয়' ও 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরীসহ বিভিন্ন বই লিখতে হয়েছে। এই কাজ করতে তিনি তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিয়ে সংস্কৃত প্রেস নামে একটি ছাপাখানা তৈরি করেছিলেন। জনশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হলে আমাদের জানতেই হবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু ধরেই তিনি জন্মভিটা বীরসিংহে একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া শুরুর আকে ছাত্রদের একটি ভারী টিফিনের ব্যবস্থা থাকতো যার ব্যয় নির্বাহ করতেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। আর এই নৈশ বিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর মাতা ভগবতী দেবী। একবার ১৮৫৮-৫৯ সালে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর তোমার পাঠানো টাকায় টিফিনের ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হচ্ছে।' বিদ্যাসাগর যা অর্থ পাঠাতেন তার দ্বিগুণ অর্থ পাঠানো শুরু করলেন। আবার লক্ষ করা যায় ১৮৫৭ সালের ১৪ এপ্রিল তদানীন্তন ডি পি আই গর্ডন ইয়ংকে তিনি লিখছেন, ''এদেশের দীনমজুরদের পারিশ্রমিক এত কম যে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে না, সুতরাং তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে সরকার যদি তাদের সন্তানদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দেবার ব্যবস্থা করে তাহলেই তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারবে—নতুবা নয়।'' এর থেকেই বিদ্যাসাগরের জনশিক্ষা ও যুগোত্তীর্ণ বৈপ্লবিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জনশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হলে আমাদের জানতেই হবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু ধরেই তিনি জন্মভিটা বীরসিংহে একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া শুরুর আকে ছাত্রদের একটি ভারী টিফিনের ব্যবস্থা থাকতো যার ব্যয় নির্বাহ করতেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। আর এই নৈশ বিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর মাতা ভগবতী দেবী।

বিদ্যাসাগরের জীবনের আর একটি বড় কীর্তি বালবিবাহের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে বিধবা বিবাহ চালু করার কঠিন অভিযান। তিনি ১৮৫০ সালে বালবিবাহের দোষ নামক একটি ছোট্ট গ্রন্থ রচনা করেন এবং তা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। কোন্ যুগে বিদ্যাসাগর বালবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন যা দেড়শো-পৌনে দুশো বছরের পরও আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। সেটা থাক, কিন্তু বিধবা বিবাহ চালু করার জন্য বিদ্যাসাগর শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্র খণ্ডন করে তা যে শাস্ত্রসম্মত তাকে অস্বাভাবিক পরিশ্রমী কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবার বিদ্যাসাগরের শত্রুর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়তে শুরু করল। বেশ কয়েকবার তাঁর জীবন সংশয় হয়েছে। এমনকি তাঁর গ্রামের বাড়ি বীরসিংহে বিদ্যাসাগর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। আর কলকাতা থেকে বিধবা বিবাহের বিরোধীরা কয়েকজন লেঠেলকে পাঠিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে খুন করার জন্য। উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালিবাড়ির সামনে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করা হয়েছিল। আক্রমণ করা হয়েছিল বিধবা বিবাহ দেওয়া অনুষ্ঠান বিদ্যাসাগর পরিচালনা করার সময়তেও। এই দৃঢ়চেতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজে মনে করতেন তাঁর জীবনের সবথেকে সৎ কাজ বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগর নিয়ে তৎকালে এবং পরে অনেকেই তাঁকে কালোত্তীর্ণ মহান পুরুষ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর সমসাময়িক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায়, ''মানব চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র, উৎকট ব্যক্তিসম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজ মধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি।'' পরবর্তী সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, ''বিধাতা সাত কোটী বাঙ্গালী গড়িতে গড়িতে এক একটি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'' সত্যিই তো মানুষ বিদ্যাসাগর অক্লান্তভাবে সামাজিক কু-আচারকে দু'হাতে সরিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে প্রতিপক্ষকে রুখে শিক্ষার অধিকার পুরুষ ও নারী উভয়ের সামনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক ধরনের যুদ্ধে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ৭১ বছরের জীবন ও কর্ম দিয়ে আমাদের যা শিখিয়েছেন তার প্রকাশ আবার কবিগুরুর ভাষায় উল্লেখ করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, ''আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না; আড়ম্বর কবি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভুরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না...।''

বঙ্গপ্রদেশে স্কুল স্থাপন করতে নিঃশর্ত জমিতে স্কুল বাড়ি তৈরি করে দিলেই বিদ্যাসাগর তার অনুমোদনের ব্যবস্থা করতেন। তিনি নিজেও বহু স্কুল স্থাপন করেছেন। এই সব কাজে বিদ্যাসাগর কোনদিন ব্যক্তিগত লাভের কথা চিন্তা করতেন না। একবার বর্ধমানের মহারাজা বিদ্যাসাগরকে ব্যক্তিগতভাবে জমি ও অর্থ সাহায্য করার কথা বলেছিলেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিদ্যাসাগর কোনদিন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ধরনের সাহায্য গ্রহণ করেননি।

এক কথায় বলা চলে, বিদ্যাসাগর যা বিশ্বাস করতেন তা কাজে রূপায়ণ করতে নিজের জীবন তুচ্ছ করে চলায় অটল ছিলেন। কথায় ও কাজে বিপরীত অবস্থানে বিদ্যাসাগরকে কোনোভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কথায় ও কাজে এক থাকায় বিশ্বাস করতেন বিদ্যাসাগর।

ভারতীয় দর্শনে মার্কসবাদের পথিকৃৎ দেবীপ্রসাদের স্মরণে

ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ

সম্প্রতি প্রয়াত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন উচ্চমাপের শিক্ষাবিদ এবং ভারতীয় মার্কসবাদীদের কাছে বস্তুবাদী দর্শনচর্চার পথিকৃৎ। বিজ্ঞান ও ইতিহাসে এই দর্শনের প্রয়োগ সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু আর এক অগ্রগণ্য গবেষক প্রয়াত ডি. ডি. কোশাম্বীর সঙ্গেই কেবল দেবীপ্রসাদের তুলনা হতে পারে। মুখ্যত গণিতবিদ হলেও কোশাম্বী পরবর্তী প্রজন্মের ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে অনুপ্রেরণা স্বরূপ। দেবীপ্রসাদ প্রধানত দর্শনবিদ—এমন এক গবেষক যিনি তাঁর উচ্চমানের গবেষণার দৌলতে ভারতীয় দর্শনে মার্কসবাদের অদ্বিতীয় ভাষ্যকার হয়ে উঠেছিলেন।

দেবীপ্রসাদের কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থের রিভিউ করার সুযোগ হয়েছে আমার। কিন্তু যার সুবাদে দেবীপ্রসাদ দেশে ও বিদেশে খ্যাতনামা হয়ে উঠেছেন সেই 'লোকায়ত' রচনাটির পর্যালোচনা করার দুঃসাহস আমার হয়নি। তাঁর অন্য কয়েকটি বিখ্যাত রচনার, যেমন— 'What is Living and What is Dead in Indian Philosophy', 'History of Science and Technology in Ancient India' এবং সর্বোপরি 'Global Philosophy for Every Man', গভীরে যাবার সুযোগ ইতোপূর্বে আমার হয়নি। এই কারণে বর্তমান নিবন্ধে আমি তাঁর এই সমস্ত রচনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

লোকায়ত (Lokayata)

বইটির সম্পূর্ণ শিরোনামটি হল—Lokayata: A Study in Ancient Indian Materialism। ১৯৫৯ সালে বইটি প্রকাশিত হয় এবং স্বদেশে-বিদেশে বিদ্বৎমহলে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোসেফ নীডহাম লেখককে জানিয়েছেন, ''আমার বইয়ের তাকে আপনার বইটি একটি নিখাদ সম্পদ হিসেবে বিরাজ করবে। এটা অভূতপূর্ব যে প্রাচীন ভারতীয় ও চৈনিক সমাজ নিয়ে গবেষণার ফলাফলে বিপুল সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও আপনার উপস্থাপনার মূল্যায়ন করা আমার সাধ্যাতীত, আমি এইটুকুই বলতে পারি যে, আপনার আলোচনা আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে।" প্যারিসের দুটি বিজ্ঞান পত্রিকাতেও লেখক সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করা হয়। একটিতে লেখা হয় : ''বইটি যথার্থই মূল্যবান, ভারতচর্চাবিদদের এবং সমাজতাত্ত্বিকদের এটি পড়া উচিত।" অন্যটিতে লেখা হয় : ''এটা সকলেই মানেন যে আকর গ্রন্থ নষ্ট হয়ে গেছে তাই ভারতে বস্তুবাদের পুনর্গঠন দরকার। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শুধু তাঁর পুনর্নির্মাণ করেননি, মার্কসীয় পদ্ধতিতে সামাজিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে তার এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ প্রচেষ্টা সবটাই প্রায় নতুন।"

স্বদেশী মূল্যায়নের দিকে নজর ঘোরালে দেখি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় লেখা হয়েছে—''এই সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য বইটি বিশ্বমননকে নিশ্চয়ই নাড়া দেবে। একজন পুরাতত্ত্ববিদের দক্ষতায় লেখক ইতস্তত ছড়ানো ইতিহাসের ভগ্ন টুকরোগুলো সযত্নে কুড়িয়ে অতীতের এক সুরম্য সৌধ পুনর্নির্মাণ করেছেন।" 'লোকায়ত' সত্যিই এক পথ-দেখানো গবেষণাপত্র। বিদেশি শাসকের পৃষ্ঠপোষিত পণ্ডিত এবং হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীরা যে মিথ্যা কাহিনি নির্মাণ করেছে তা হল—'পাশ্চাত্য সততই বস্তুবাদী, প্রাচ্য ভাববাদী।' 'লোকায়ত' সেই মিথ্যা ধারণা সমূলে উৎপাটন করেছে। অনেক তথ্য নষ্ট হয়ে গেছে। যা আছে তার মধ্য থেকে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করে চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতের এক বস্তুবাদী ঐতিহ্য ছিল। সেই বস্তুবাদ, যাকে দেবীপ্রসাদ

‘প্রেটো-মেটিরিয়ালিজ্‌ম’ বলেছেন, বেদের থেকেও প্রাচীন, যদিও সচরাচর বেদকেই ভারতের সাহিত্য ও দর্শনের সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়।

প্রাক্‌-বৈদিক যুগের সিন্ধুসভ্যতার সংস্কৃতির মধ্যে দেবীপ্রসাদ লোকায়ত বা সাধারণ মানুষের দর্শনভাবনার সন্ধান করেছেন। এই সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি পরবর্তী যুগের ভারতীয় সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—“বৈদিক এবং লোকায়ত উভয় দর্শনের অন্তঃস্তরে অবস্থিত যে আদি-বস্তুবাদ (Proto-materialism) তা আবিষ্কারের তাৎপর্য কী? আমার উত্তর খুব সরল। মার্কসবাদে আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার অবস্থানের মূল্যের সঙ্গে তুলনীয় এর মূল্য। মার্কসবাদীরা আদিম-সাম্যবাদী সমাজের গুরুত্বের ওপর জোর দেয় এই জন্য নয় যে তারা সেই ব্যবস্থায় ফিরতে চায়। আদি-সাম্যবাদের উল্লেখের আসল উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর রাষ্ট্রব্যবস্থা মানব-অস্তিত্বের বাইরের কিছু নয়—এটা প্রমাণ করা। সভ্যতার একটা পর্যায়ে যেমন তাদের উদ্ভব হয়েছে ঠিক তেমনভাবেই একটা পর্বে তাদের অবলুপ্তি ঘটবে।” প্রোটো-মেটিরিয়্যালিজ্‌মকে মহিমান্বিত করতে তা নিয়ে আলোচনা করেননি দেবীপ্রসাদ। সভ্যতার সেই অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কাম্য, এ ধারণার সপক্ষে তিনি যুক্তি সাজাননি। তাঁর মতে এর আসল গুরুত্ব হল যে এ থেকে বোঝা যায়, অধ্যাত্মবাদ মানুষের সহজাত নয়। অধ্যাত্মবাদের যেমন এক সময়ে উদ্ভব হয়েছে, এক সময় তার বিলোপ হতে বাধ্য। অধ্যাত্মবাদী ভাবনা যেমন একটা পর্বে অঙ্কুরিত হয়েছে মানবমনে, সমাজে কায়িক ও মানসিক কর্মের বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে একটা সময় তার অবলুপ্তি হতে বাধ্য। ভারতীয় দর্শনের বিকাশের গতিপথ সম্যকরূপে অনুধাবন করার জন্য এই দৃষ্টিকোণ খুবই কার্যকর, কারণ ভারতীয় দর্শনে অধ্যাত্মবাদের গুরুত্বের কথা শুনতেই আমরা অভ্যস্ত।

লোকায়ত এবং বেদ (Lokayata and the Vedas)

একজন প্রকৃত মার্কসবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে দেবীপ্রসাদ আদি-বস্তুবাদ বা Proto-materialism-এর আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমি কী ছিল তার সন্ধান করেছেন লোকায়ত ও তৎপরবর্তী বৈদিক সমাজে। বিপুল তথ্যভাণ্ডার ঘেঁটে ও তার ব্যাখ্যা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সেই সমাজে শ্রম ও চিন্তা পৃথকীভূত হয়নি। তাছাড়া, সে-সময়ে সমাজ ছিল মুখ্যত গোষ্ঠীবদ্ধ—শ্রম, চিন্তা এবং শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায়, গোষ্ঠীসদস্যরা যূথবদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু লোকায়ত ও বৈদিক সমাজের একটা বিশেষ পার্থক্যরেখা ছিল। লোকায়ত সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক ও মাতৃতান্ত্রিক। বৈদিক সমাজ ছিল পশুচারণভিত্তিক ও পিতৃতান্ত্রিক। গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত যুক্তিগুলি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : “লোকায়ত মানে মানুষের দর্শন, ঐহিক-দর্শন বা প্রবৃত্তিগত বস্তুবাদ অর্থেও ‘লোকায়ত’ ব্যবহার হয়। লোকায়তের মূল রচনাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, ফিরে পাবার সম্ভাবনা নেই। তাই বিরুদ্ধবাদীদের উল্লেখ সূত্রেই লোকায়ত পুনর্গঠন করতে পারা যাবে।... লোকায়ত বলতে সেই সমস্ত গূঢ়, লোকমান্য আচার-আচরণকে বোঝায় যা, একত্রে, তন্ত্রজ্ঞান বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। তন্ত্রবিদ্যার ওপর পরবর্তীকালে অতীন্দ্রিয় ও পারলৌকিক ভাবনা চাপিয়ে দেওয়া হয়। আদি রূপে, সাংখ্যদর্শনের মতোই, তন্ত্রবিদ্যা কিন্তু ছিল অনৈশ্বরিক ও বস্তুকেন্দ্রিক।

“তন্ত্রশাস্ত্র আধুনিক মনকে ততটা টানে না, সম্ভবত এর কারণ হল তন্ত্রশাস্ত্র যৌনতা নিয়ে মাত্রাতিরিক্তভাবে বায়ুগ্রস্ত। যারা পরবর্তীকালে বৈদিক ঐতিহ্যের প্রবক্তা হয়েছিলেন তাঁরা তন্ত্রের প্রতি এই কারণেই বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁরাই কিন্তু প্রাচীন বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গিরও সমালোচনা করেছেন। এর থেকে এই অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে স্বীকৃত নয় এমন কোনো তাৎপর্য ছিল এগুলির। লোকায়তের সমস্যা তাই এগুলির আসল তাৎপর্য কী ছিল তা নির্ণয়ের সমস্যা।”

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেবীপ্রসাদ সেই চমকপ্রদ কাহিনি শুনিয়েছেন যা থেকে আমরা জানতে পারি কেমন করে লোকায়তকে চাপা দিয়ে হল আদি বেদের উত্থান, কেমন করে তাকে সরিয়ে এলো বেদের পরবর্তী খণ্ডগুলি এবং সবশেষে এলো উপনিষদ। এই পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপেই বিরোধিতা কী তীব্র ছিল, দেবীপ্রসাদ তা বিশদে বর্ণনা করেছেন। দর্শনের জগতে এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভিত নিহিত সমসাময়িক সামাজিক পরিবর্তনে। সেই পরিবর্তনের প্রধান সূচকগুলি হল—জনগোষ্ঠীগুলির আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙে যাওয়া, দ্বিজশূদ্রাদি বর্ণসম্পর্কের নতুন বিন্যাস, এই বিন্যাসের জটিলতর রূপ যেখানে অন্য বর্ণের মানুষের ওপর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায় এবং সর্বোপরি এই ব্রাহ্মণশাসিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের তীব্রতা। বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শনের উত্থান থেকে এই প্রতিবাদের স্বরূপ বোঝা যায় বলে দেবীপ্রসাদ জানিয়েছেন।

যারা বেদের কর্তৃত্ব মানত না সেই নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের তাই অস্তিক্যবাদীদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামতে হয়েছিল। এই দুই দর্শনের সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ হয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে ভারতের শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। বর্তমানের বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের বৌদ্ধিক দ্বন্দ্ব তাই সংখ্যালঘু দ্বিজ ও সংখ্যাগুরু শূদ্রাদি বর্ণের সামাজিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই দেখতে হবে।

এর অর্থ হল, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বস্তুবাদের দ্বন্দ্বে সে যুগে বহু রং-ফারাক ছিল। শুধু তাই নয়, আধুনিক বস্তুবাদ ও ভাববাদের দ্বন্দ্বেও তা লক্ষিত হয়। আমরা আধুনিক কালের মার্কসীয় বস্তুবাদের প্রতিনিধিরা লোকায়ত, বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক ও সাংখ্য দর্শনের মধ্যে প্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বস্তুবাদ নিয়ে তাই আপ্লুত নই। আধুনিক মার্কসীয় বস্তুবাদের বিচারে তাদের মধ্যে অনেক ঘাটতি বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও লোকায়তের আদি বস্তুবাদ ও বেদ এবং বেদ-পরবর্তী যুগের বস্তুবাদী ভাবনার দ্বন্দ্বের গুরুত্ব আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। আমরা তাদের মূল্য স্বীকার করি এবং আমরা সে যুগের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে আধুনিক বস্তুবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। সংক্ষেপে এই হল ভারতীয় মার্কসীয় বস্তুবাদের প্রথম মুখ্য গ্রন্থের বক্তব্যসার।

‘ভারতীয় দর্শনে কী জীবিত, কীই বা মৃত’ (What is Living and What is Dead in Indian Philosophy)

দেবীপ্রসাদের দ্বিতীয় প্রধান গ্রন্থের শিরোনাম হল ‘হোয়াট ইজ লিভিং অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডেড ইন ইন্ডিয়ান ফিলোজফি’। ‘লোকায়ত’ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে লেখা নিচের কথাগুলি থেকে বোঝা যায় এটি ‘লোকায়ত’ বইটির অনুবৃত্তি বা সিক্যুয়েল—

“১৯৭৩ সালে এসে ১৯৫৯ সালের প্রথম গ্রন্থে যা লেখা হয়েছিল তার অনেকটাই পরিমার্জনীয় মনে হচ্ছে। এটা আমি প্রথম উপলব্ধি করি ১৯৬৭ সালে, যখন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রস্তাব

আসে। কিন্তু তখন তা আমি করিনি। কারণ আমার মনে হয়েছিল, যে-সমস্ত নতুন তথ্য আমি ঢোকাতে চাই এবং যেভাবে নতুন করে আমি যুক্তিবিন্যাস করতে চাই, তাতে বইটি এতটাই বদলে যাবে যে, এ-সমস্ত তথ্য নিয়ে পৃথক একটি বই লেখা অনেক ভালো হবে। দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে আমি পাঠকদের কাছে তাই 'ফারদার স্টাডিজ় ইন ইন্ডিয়ান মেটিরিয়ালিজ়ম' নামে একটি নতুন গ্রন্থ রচনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম।"

যাই হোক, নতুন বইটি লিখতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ বুঝলেন তাঁর কী ভুল হয়েছে। তিনি বলেছেন, ''রচনার সময়কালে যতটা ভাবা হয়েছিল তার থেকে অনেক দীর্ঘ হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথমত, এটি লিখতে গিয়ে ভারতীয় দর্শনের বহু ব্যাখ্যা বাতিল করার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, যতই আমি ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের ধারাটিকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম ততই আমি বুঝতে পারছিলাম যে, ভাববাদ, যা জগৎকে অস্বীকার করে, তার আলোচনা ছাড়া এটা করা সম্ভবই নয়। উপনিষদের সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম অষ্টম শতক থেকে নৈয়ায়িক গদাধরের সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত দু-হাজার বছরের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, দুটি বিপরীতধর্মী মতের লড়াই চলেছে সমগ্র কালপর্বে। সে সংঘাত কখনো প্রকট, কখনো প্রচ্ছন্ন। তাছাড়া এই মূল দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিছু অনুসারী দ্বন্দ্ব। ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমুখীনতাকে অবলম্বন করে বস্তুবাদী দর্শন বৃদ্ধি পাচ্ছিল; ভাববাদী দর্শন তার অস্তিত্বের জন্য অতীন্দ্রিয়বাদ, দুর্জ্ঞেয়তাবাদ এবং শাস্ত্র-সর্বস্বতাকে আশ্রয় করছিল। এই দ্বন্দ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মতাদর্শের যে দ্বন্দ্ব বর্তমানে লক্ষ করা যাচ্ছে তা সঠিকভাবে বোঝা যায়।" ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে লেখকের এই নতুন উপলব্ধিই লেখককে বইটির নাম 'ফারদার স্টাডিজ় ইন ইন্ডিয়ান মেটিরিয়ালিজ়ম' থেকে পাল্টে 'হোয়াট ইজ় লিভিং অ্যান্ড হোয়াট ইজ় ডেড' রাখতে প্রণোদিত করে।

লোকায়ত-র অনুবর্তী হলেও, এই বইটিতে সযত্নে বস্তুবাদ ও ভাববাদের সিংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। 'অ্যালায়েড প্রবলেমস' শীর্ষক চতুর্থ ভাগে এবং পদ্ধতি বিষয়ক প্রথম ভাগে লেখক ভারতীয় দর্শনে দ্বান্দ্বিকতার অস্তিত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে দেবীপ্রসাদ প্রাচীন ভারতে দার্শনিকদের তার্কিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই পদ্ধতিকে তিনি 'প্রাচীন গ্রীসের প্রশ্নোত্তরে তর্কমীমাংসার সমগোত্রীয়' বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, ''উপনিষদ-যুগ বিষয়ে আমরা যেটুকু জানি, তা থেকে বলা যায়, সে সময়ে এক শ্রেণির দার্শনিকদের মধ্যে 'বাকো বাক্য'-র (অর্থাৎ যুক্তিবিজ্ঞান) সমধিক মূল্য বিষয়ে প্রবল সংশয় প্রকাশের একটা প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। এই দার্শনিকরা নিজেদের 'গুপ্তজ্ঞান', যে জ্ঞান অর্জনে সহজে দীক্ষিত হওয়া যেত না, সংরক্ষণে খুবই তৎপর ছিলেন। কিন্তু এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উপস্থিতির সুবাদে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে তার্কিক পদ্ধতির বিকাশ ব্যাহত হয়নি। প্রথম খ্রিস্টীয় শতকের আগেই সংগৃহীত 'চরক সংহিতায়, যেটি প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম, মতামতের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চিন্তা সমৃদ্ধির গুরুত্ব উল্লিখিত হয়েছে।... তর্কশৈলীতে প্রমাণ, যুক্তি ও ভ্রান্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে ওষধি বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে তর্কশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে।"

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে এভাবেই দ্বান্দ্বিকতার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু গ্রীক 'ডায়ালগো'র মতো ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে 'থিসিস', 'অ্যান্টিথিসিস' ও 'সিন্থেসিসের' ত্রি-পদ কাঠামো নেই; আছে 'পূর্বপক্ষ' ও 'সিদ্ধান্তপক্ষ'। এই দুই তর্ক পদ্ধতির পার্থক্য সুগভীর। গ্রীক পদ্ধতিতে 'থিসিস' ও 'অ্যান্টিথিসিস'-এর দ্বন্দ্ব থেকে 'সিন্থেসিস' আত্মপ্রকাশ করে। সেটি আবার নিজেই 'থিসিস' হয়ে ওঠে ও 'অ্যান্টিথিসিস'-এর জন্ম দেয়। এভাবেই অনন্তকাল ধরে বিবর্তনের ধারাটি অব্যাহত থাকে। ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে তার্কিক পদ্ধতি অনেকটা সরল। এখানে 'সিদ্ধান্তপক্ষ' 'পূর্বপক্ষ'কে যুক্তিবিদ্ধ করে এবং তার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তর্কমীমাংসা হয়। এই তর্ক-মীমাংসার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে ভাববাদের তর্কপদ্ধতি, যেটি বৈদিক যুগে সুসংহত হয়ে বেদান্তের যুগে বস্তুবাদী ভাবনাকে কোণঠাসা করে। ভারতীয় দর্শনে কোনো মতের পরাজয়ে যেহেতু কোনো অ্যান্টিথিসিস তৈরি হয় না, তাই দর্শনের অগ্রগমন থমকে যায়। এভাবেই ভারতের সমাজ ও দর্শনচিন্তায় অসাড়তা ও নিশ্চলতার পর্ব শুরু হয়। ভাববাদের কাছে বস্তুবাদের এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সমাজে দ্বিজ-শূদ্র লড়াই-এর অবসান—যে মতটি দেবীপ্রসাদ তাঁর পরবর্তী কিছু লেখায় ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রাচীন ভারতে দ্বান্দ্বিকতা
(Dialectics in Ancient India)

এখানে এখন আমরা 'What Is Living and What Is Dead in Indian Philosophy' গ্রন্থের 'পরিবর্তন এবং স্থায়িত্ব ও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া' শীর্ষক নবম পরিচ্ছেদের আলোচনা করব। এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অধ্যায়টির শুরুতে দেবীপ্রসাদ লিখেছেন : ''এ পর্যন্ত আমরা বৌদ্ধদের কথা, যেটিতে তারা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই তার্কিক অবস্থানের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। তার মানে এই নয় যে, ভারতীয় দর্শনে তারাই এর একমাত্র প্রতিনিধি। তার মানে এটাও নয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে আগাগোড়া এই দৃষ্টিভঙ্গি সমান উৎসাহে আদৃত হয়েছে। বৌদ্ধ-বলয়ের বাইরেও জগতের নিয়ত পরিবর্তনশীলতা নিয়ে, জন্ম ও বিনাশ নিয়ে, স্পষ্ট অভিমত রয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের অনিত্যতা-তত্ত্বের সঙ্গে তুলনায় এ-সমস্ত মত তত গভীরভাবে দাগ কাটে না। আবার বৌদ্ধ দর্শনেও অনিত্যতা-তত্ত্বের ইতিহাস বেশ জটিল। এই তত্ত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতাও কখনো কখনো পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যারা এই মতকে খারিজ করতে চায় তারাও বোঝাতে চায় যে তারা যেন এই দর্শনের নতুন কোনো ব্যাখ্যা দিচ্ছে। বৌদ্ধ দর্শনে এই চিন্তার গুরুত্ব এতটাই গভীর যে, এটাকে তাত্ত্বিকভাবে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব।"

তাই এটা বলা অসঙ্গত হবে না যে, লোকায়ত যেমন বস্তুবাদী ভাবনার

ভারতীয় দর্শনে কোনো মতের পরাজয়ে যেহেতু কোনো অ্যান্টিথিসিস তৈরি হয় না, তাই দর্শনের অগ্রগমন থমকে যায়। এভাবেই ভারতের সমাজ ও দর্শনচিন্তায় অসাড়তা ও নিশ্চলতার পর্ব শুরু হয়। ভাববাদের কাছে বস্তুবাদের এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সমাজে দ্বিজ-শূদ্র লড়াই-এর অবসান—যে মতটি দেবীপ্রসাদ তাঁর পরবর্তী কিছু লেখায় ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রতিনিধিত্ব করে, বৌদ্ধ দর্শন প্রতিনিধিত্ব করে দ্বান্দ্বিকতার। লোকায়তের বস্তুবাদ ও বৌদ্ধদর্শনের দ্বান্দ্বিকতা থেকে আধুনিক দর্শনে যাকে বলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সেই পরিণত ভাবনা জন্ম দিতে পারত, যদি অবশ্য সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা সে ভাবনার অনুকূল হতো।

বাস্তবে তা হয়নি, কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সুপরিণত ছিল না। শুধু তাই নয়, সমাজবিকাশের এই পথটি রুদ্ধ করে দিয়েছিল শূদ্রের ওপর ব্রাহ্মণদের দাপট যাকে শ্রেণিসংগ্রামের ভারতীয় রূপ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের ফলে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিকতা বলে যা কিছু ছিল, তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ফলে ভারতীয় দর্শনের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়, তা চলনশক্তিহীন হয়ে পড়ে। ইউরোপে তা হয়নি, কারণ সেখানে গ্রীক দর্শনের দ্বান্দ্বিকতা ও বস্তুবাদ বিবর্জিত হয়নি।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও সমাজ (Science and Society in Ancient India)

চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় বই, যেটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হল 'Science and Society in Anciet India', ('প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও সমাজ')। শিরোনাম দেখে মনে হবে যে, প্রাচীন ভারতের সবরকম বিজ্ঞান ও যে সামাজিক প্রেক্ষিতে তাদের উদ্ভব হল, সব নিয়ে গ্রন্থটিতে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন লেখক। বাস্তবে কিন্তু বইটিতে শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর কারণ, ''একমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানই ছিল সম্পূর্ণ ধর্মপ্রভাবমুক্ত এবং আধুনিক অর্থে 'বিজ্ঞান' অভিধাটির দাবিদার।''

'চরক সংহিতা' ও 'শুশ্রুত সংহিতা' নামক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দুই প্রধান গ্রন্থ থেকে অঢেল উদ্ধৃতি সহযোগে দেবীপ্রসাদ দেখিয়েছেন দৈবী জ্ঞানের পরিবর্তে ডাক্তাররা সে যুগে বিষয়মুখী জ্ঞানের ওপর কতটা নির্ভর করতেন। এই মতের সপক্ষে চরক সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায় : ''দেহ বলতে বোঝায় পঞ্চভূতের সংমিশ্রণ যা হল চৈতন্যের—সেই চৈতন্য যা দেহোপাদানের ভারসাম্য রক্ষা করে—অধঃস্তর। তাই দেহোপাদানের সামঞ্জস্য নষ্ট হলে ব্যাধি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। দেহোপাদানের অসংগতির আবার কারণ হল যে কোষগুলি দিয়ে সেগুলি গঠিত তাদের অতিপুষ্টি বা শীর্ণতা, সম্পূর্ণ বা আংশিক। এই অতিপুষ্টি অথবা শীর্ণতা যুগপৎ ঘটে, কারণ যে ঘটনা একটি কোষের বৃদ্ধি ঘটায় সেই একই ঘটনা বিপরীতধর্মী কোষের শীর্ণতার কারণ হয়ে ওঠে... ওষুধ তাই সেই বস্তু যা, যখন সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়, একই সাথে অতিপুষ্ট ও শীর্ণ—উভয় ধরনের কোষের ওপর ক্রিয়া করে, যেটি অত্যধিক বেড়েছে তাকে কমায়, ও যা শীর্ণ তাকে পুষ্ট করে।''

'চরক সংহিতা' থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : ''নিদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাচীন চিকিৎসকরা এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন যেটা প্রাকৃতিক বস্তু প্রয়োগ করে দেহোপাদানের যৌগের হ্রাস-বৃদ্ধির সামঞ্জস্য ফেরানো থেকে ঢের বেশি জটিল। এই লক্ষ্যে সফল হতে গেলে বহুদিনের ধৈর্যশীল গবেষণা প্রয়োজন, যাতে ক্রমশ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। এক্ষেত্রে বস্তুকে শুধু ক্ষিতি, অপ, তেজ হিসেবে না দেখে তার ধর্ম ও রূপান্তর ক্ষমতা বোঝা প্রয়োজন। এখানে যেটা আমাদের আকর্ষণ করে তা হল প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার তাত্ত্বিকরা শুধু সমস্যাটা সনাক্ত করেননি, এটা সমাধানের জন্য কতকগুলো বৌদ্ধিক হাতিয়ার নির্মাণেও তাঁরা অগ্রণী হয়েছেন।''

দেবীপ্রসাদের মতে, মানবদেহ সমেত সমস্ত জড় প্রকৃতির প্রমাণগ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ থেকে টানা এই বস্তুবাদী দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানে বিবর্তিত হতে পারত, যদি একে বিকশিত হতে দেওয়া হত। কিন্তু তা হতে দেওয়া হয়নি। জড় প্রকৃতির ওপর মানবনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই লড়াইকে শোষণের প্রয়োজনে মানুষে মানুষে লড়াইয়ে পর্যবসিত করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতে দুটি সমাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতার উত্থানের কথা বলেছেন। একটি হল ক্ষত্রিয়ের 'রাজশক্তি' ও ব্রাহ্মণের 'পূতশক্তি' যা কৃষক-বণিকের অর্থাৎ বৈশ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্রিত হয়ে 'দ্বিজ' নামক শাসকশ্রেণির রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এর বিপরীতে ছিল মেহনতি মানুষের গণশক্তি যা শূদ্র বলে পরিচিত ছিল। 'রাজশক্তি' যারা সমাজের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চায় তারা 'পূতশক্তি'র মদত পায়। 'পূতশক্তি' এমন কথা বলল যে, প্রকৃতি, যার মাঝে মানুষের অবস্থান, যেমনটা দেখছি তেমনটা আসলে নয়। চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আবার উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—''রাজা এবং অভিজাত সম্প্রদায় বুঝেছিল যে সমাজে তাদের সুবিধাজনক অবস্থানের সাফাই দিয়ে তত্ত্ব বানাতে পারে এমন লোক তাদের প্রয়োজন। ক্ষমতাসীনের রাজনৈতিক চাহিদা মেটানোর জন্য এই চিন্তাবিদদের বাস্তব অবস্থার এক ভ্রান্ত বর্ণনা দিয়েই শুরু করতে হয়। কারণ নির্ভেজাল সত্য সর্বসমক্ষে আসুক এটা ক্ষমতাসীনেরা একেবারেই চায় না। বাস্তবকে সুবিধা মতো বেঁকিয়ে, দুমড়িয়ে শাসকের ক্ষমতার ঐশী অনুমোদন যারা দাবি করে, সেই চিন্তাবিদরা তাই চিরকাল ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পছন্দের তালিকায় থাকে।''

এর থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক শক্তির যার প্রয়োজন ছিল লোকায়ত ও প্রাচীন বৈদিক যুগের বস্তুবাদী চিন্তাস্রোতকে রুদ্ধ করা। এভাবেই আদি বস্তুবাদী চিন্তা পাল্টে গেল, ক্রমশ উদ্ভব হল ভাববাদের। এভাবেই চিকিৎসাবিদ্যা পূর্বের উচ্চাসন থেকে অধঃপতিত হল। আদি-বৈদিক যুগের অশ্বিন নামক দেবদ্বয়, যাঁরা তাঁদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানবতার জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন, ব্রাহ্মণাদি পরবর্তী বৈদিককালে নিম্নবর্গের দেবতা হিসেবে চিহ্নিত হলেন। মনু ইত্যাদি নিয়ম-রচয়িতাদের সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চাকারীরা সমাজের ভ্রুকুটির পাত্র হয়ে উঠলেন এবং ব্রাহ্মণদের জন্য চিকিৎসাবিদ্যা-চর্চা নিষিদ্ধ হল।

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিদ্যার এই অবনমন থেকে যা বোঝা যায় তা হল, যে মানুষরা কায়িক পরিশ্রম করে মানুষের কল্যাণের জন্য প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে সচেষ্ট ছিল তাদেরকে ঠেলে নামানো হল সেই তাদের নিচে যাদের কোনো কাজ করতে হত না, কিন্তু সমাজের সম্পদের অনেকখানির মালিকানা যাদের ছিল। এর ফলে শুধু বিজ্ঞানের নয়, সমস্ত শাখার জ্ঞানচর্চার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। কারণ, 'রাজশক্তি' ও 'পূতশক্তি'-র যুগলবন্দি সব সমাজেই বিজ্ঞানবিরোধী মতাদর্শের অভ্রান্ত চিহ্ন। এই অবস্থায় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্রোত হারিয়ে যায় ও অবক্ষয় শুরু হয়।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস—সূচনাপর্ব (History of Science and Technology in Ancient India: Beginnings)

চট্টোপাধ্যায়ের পরের যে বইটির দিকে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটি হল 'হিস্ট্রি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া—বিগিনিংস' (প্রাচীন ভারতে

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস—সূচনাপর্ব)। চট্টোপাধ্যায়কে বইটি লিখতে অনুরোধ করে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ়', যেটি সি.এস.আই.আর.-এর অংশবিশেষ। বই-এর মুখবন্ধে চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : ''এদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল যে এখানে প্রাদেশিকতাবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদী শক্তি একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে যে তারাই যেন জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রকৃত জিম্মাদার। তাঁদের কল্পনাপ্রসূত এক ভয়ঙ্কর দাবি এটি, তাই এক্ষেত্রে ভ্রান্তিমোচন আবশ্যক। কিন্তু শুধু বক্তৃতাবাজি করে ভ্রান্তিমোচন সম্ভব নয়। দেশীয় প্রযুক্তিবিদ, যন্ত্রকুশলী এবং বিজ্ঞানীদের সাথে দেশের মানুষের পরিচয় ঘটাতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে এই কুশলীরা বিজ্ঞানমনস্কতাকে কীভাবে অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই লড়াই। মানুষকে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে, সমস্ত প্রতিভা সত্ত্বেও প্রাচীন যুগে এইসব বিজ্ঞানীরা কী কারণে আধুনিক বিজ্ঞানের (ইউরোপে গ্যালিলিওর সময় থেকে যা বিকশিত হতে শুরু করেছিল) পথে এগিয়ে যেতে পারেন নি। এটা করতে চেষ্টা করলেই আমাদের একটা অপ্রত্যাশিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। আমরা দেখব, যে-সমস্ত কারণে সে-কালে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতে পারেনি, সেই একই কারণে এযুগে বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক উগ্রতার সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যভাবে বললে মোদ্দা কথাটা হল, আমরা সেই একই দৈত্যকে দেখতে পাব যার কাছ থেকে এ-যুগেও, কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে বিভেদকামী শক্তি তার শক্তি ধার নিয়ে চলেছে।''

চট্টোপাধ্যায় আরো লিখেছেন : ''প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে এ কারণেই নিছক সারস্বত-সাধনা ভাবা ঠিক নয়। এটা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।'' এই হলেন মার্কসীয় দার্শনিক দেবীপ্রসাদ, যিনি একই সাথে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক উচ্চমার্গের চিন্তাবিদ। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ইতিহাস তাঁর কাছে উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নয়। এর লক্ষ্য দ্বিবিধ : একদিকের লক্ষ্য হল বিজ্ঞানমনস্কতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার, অন্যদিকের লক্ষ্য হল সমসাময়িক সমস্যার প্রতি সম্মুখমুখী দৃষ্টিপাত। কুসংস্কার, তমসাবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রভৃতি প্রতি-বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রাত্যহিক লড়াইয়ে এই বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের প্রধান রচনাগুলি নিঃসন্দেহে অসামান্য হাতিয়ার। নিজের তাত্ত্বিক আত্মপরিচয় না খুইয়ে দেবীপ্রসাদ এভাবেই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার তীব্র লড়াইয়ে এক সক্রিয় সেনানী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান। বিশিষ্ট ব্রিটিশ পণ্ডিত জোসেফ নীডহাম লিখেছেন : ''চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় প্রথমাবধি একটি বিষয় সবকিছুর ওপর প্রাধান্য পেয়েছে। সেটি হল—বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং নিদানশাস্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে তৎকালীন সমাজ-ইতিহাসের গভীর সংযোগ ছিল। উদাহরণ হিসেবে 'সায়েন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অব চায়না' গ্রন্থের সমস্ত খণ্ডের ওপর বিরাজমান সেই মহা-প্রশ্নটির উল্লেখ করা যায়। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ষোলশো, সতেরোশো বছর আগে চীন দেশে এত চমকপ্রদ আবিষ্কার থাকা সত্ত্বেও, সেখানে নয়, ইউরোপে কেন আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটল? এই প্রশ্নের উত্তর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে বিচার করেই দেওয়া সম্ভব। চীনে ছিল আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র, ইউরোপে সামরিক-অভিজাত সামন্ততন্ত্র যাকে ওপর থেকে দেখলে শক্তপোক্ত মনে হলেও আসলে তা ছিল দুর্বল। তাই বুর্জোয়াদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই ব্যবস্থা বাতিল করার প্রয়োজন হল, সেই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। এটা যখন আমরা জানি তখনই আমরা বুঝতে পারি পুঁজিবাদ, সমাজসংস্কার প্রক্রিয়া ও আধুনিক বিজ্ঞান ইউরোপে কেন বিকশিত হয়েছিল। ভারতে কী ঘটেছিল আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমি মনে করি, যুদ্ধ ও ঔপনিবেশিক বিস্তার ছাড়াও সেখানে আরও স্পষ্ট কিছু আর্থ-সামাজিক কারণ ছিল যার জন্য অতীতের সুমহিম কীর্তি সত্ত্বেও আধুনিক বিজ্ঞান ভারতে বিকশিত হতে পারেনি।

আলোচ্য বইয়ে এই রোমাঞ্চকর কাহিনির শুরু। চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীরা দুটি নগরায়ণের উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি সিন্ধু সভ্যতার অন্তর্গত হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো কেন্দ্রিক, যার উন্মেষ প্রায় দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে—চিনের সাং-ইন সভ্যতার সময়পর্বে বা তার কিছুটা আগে। সেই সভ্যতার ক্ষয় ও পতনের কারণ সবটা বোঝা যায়নি। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এরপরেই শুরু হয় আর্যদের ভারতে আগমন এবং বৈদিক যুগ। তার পরে আসে দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণ, মোটামুটি ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

এখান থেকে যে সম্পর্কটা স্পষ্ট হয়, অন্তত আমার কাছে, তা হল গণিতমনস্কতা, যেটা 'সুলভ সূত্র'-এ বিধৃত আছে, পোড়া ইট ব্যবহারকারী সিন্ধুসভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল। এটা রোম ও চৈনিক সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন কারণ সেখানে সহস্র খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে পোড়া ইট ব্যবহার হয়নি। যাই হোক, এই শিল্পটি বৃহদাকার উৎপাদনের প্রারম্ভিক উদাহরণ এবং যেহেতু সব ইটেরই আকৃতি সমান হতে হবে, নির্মিত সৌধেও তার জ্যামিতিক ছাপ বিদ্যমান। গোটা বই জুড়ে ধাতু বা মৃৎশিল্প প্রসঙ্গে, ইটের আবিষ্কারের পর তৎকেন্দ্রিক তত্ত্বের উদ্ভবের কথা বারে বারে এসেছে।

বেদান্ত : স্থবিরতার এক শক্তি (Vedanta, a Force of Stagnation)

এটা খুবই স্পষ্ট যে 'সায়েন্স অব মেডিসিন ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া' গ্রন্থে চট্টোপাধ্যায় যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, 'হিস্ট্রি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া' খণ্ডে তিনি সেই আলোচনাই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এখানে প্রেক্ষাপটটি সুবৃহৎ এবং বইটি পড়লে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সূচনা কীভাবে হয়েছিল তা আমরা দেখতে পাই। এখান থেকেই আবার আমরা দেখতে পাই কেমন করে 'পূতশক্তি' ও 'রাজশক্তি' পরস্পরের হাত ধরলে প্রগতির গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পি. সি. রায়ের মতের উল্লেখ করেছেন। দেবীপ্রসাদের ভাষায় : ''ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্য কেউ কেউ যেমন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতাকে উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি অনেকে জড়বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছেন। পি.সি. রায় দর্শন বিশারদ ছিলেন না। তবুও প্রাচীন দর্শনে এই দুই শিবিরের পার্থক্যটা তাঁর চোখ এড়ায়নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতীয় প্রেক্ষিতে, কণাদ যার প্রতিষ্ঠাতা বলে লোকে বিশ্বাস করে, সেই কণা তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা ছিল। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত, যা বিশ্বকে 'মায়া' বলে অস্বীকার করে, কেন এই কণাবাদের শত্রু, রায় সেটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পি.সি. রায়ের বিচারে তাই প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অবলুপ্তির জন্য শঙ্করাচার্যও দায়ী। ভারতীয় প্রেক্ষিতে এ মত পোষণ করা সামান্য ব্যাপার নয়, কারণ অনেকেই শঙ্করাচার্যকে অবতার অর্থাৎ ঈশ্বরের মানবরূপ বলে মনে করেন। পি. সি. রায় কিন্তু সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, ''বেদান্ত দর্শন, বিশেষত, শঙ্করাচার্য সেটা যেমন করে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন, বস্তুজগতের অলীকতার দাবি করে। পদার্থবিজ্ঞানের অবক্ষয়ের জন্য এই দর্শনও অনেকাংশে দায়ী। কণাদ ও তাঁর ভাবনার প্রতি শঙ্করাচার্য খড়্গহস্ত হয়েছেন। ...বর্ণভেদ প্রথায় যারা

বাঁধা এবং বেদ-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনে যাদের মগজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত তাদের মধ্যে থেকে কোনো রবার্ট বয়েলের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব ছিল না।" (পি.সি. রায়, *হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি*, খণ্ড-১, পৃ. ১৯৫-৯৭) (রবার্ট বয়েল ইঙ্গ-আইরিশ পদার্থবিজ্ঞানী, যিনি ভ্যাকুম পাম্প আবিষ্কার করেন এবং এটিকে গ্যাসের ধর্ম, (বয়েল ল ১৬৬২ বলে যা পরিচিত) প্রমাণের জন্য ব্যবহার করে নি। তিনি শুধু রাসায়নিক পদার্থের সংজ্ঞা দেননি, রসায়ন শাস্ত্রকে অ্যালকেমি থেকে আলাদা করেছেন।)

পি.সি. রায়ের ওপর চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের মন্তব্য এভাবে সংযোজন করেছেন : "এখানে আমরা পাই এক বিজ্ঞানকর্মীকে যিনি ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞান ও দর্শনের মিথষ্ক্রিয়া বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করেছেন।" তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এটা আমাদের জে.ডি. বার্নালের নিচের উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয় : "ভাববাদী পক্ষ সব সময় স্থিরতা, অভিজাত শ্রেণি আর প্রচলিত ধর্মের পক্ষে।... বস্তুবাদী মত, শিক্ষিত সমাজের সমর্থন পায়নি বা মান্য দর্শনের অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। বিজ্ঞানের রাজ্যে ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব চলছে আবহমানকাল ধরে।... মাঝেমধ্যে জড়বিজ্ঞানের জিত হলেও লড়াই যে একটানা চলেছে এটাই প্রমাণ করে লড়াইটা বিজ্ঞান বা দর্শনের নয়। সেটা আসলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। প্রতিটি ধাপেই ভাববাদী দর্শনকে টেনে এনে এটাই ভান করা হয়েছে যে বর্তমান ক্ষোভ আসলে বিভ্রম, সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কোনো গলদ নেই। উল্টোদিকে প্রতিটি ধাপেই বস্তুবাদী দর্শন বাস্তবের কষ্টিপাথরে অস্তিত্বকে যাচাই করে পরিবর্তনের কথা বলেছে।" প্রাচীন ভারতের মতো আজকের দিনেও ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব, ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব, আসলে শ্রেণি-দ্বন্দ্বেরই অন্য রূপ।

সর্বজনের জন্য বিশ্ব দর্শন
(Global Philosophy for Everyman)

চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় দর্শনকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে যেভাবে বিচার করেছেন তার পরিচয় দেবার পর যেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল, দর্শনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় মাত্র নয়, আন্তর্জাতিক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত শেষ প্রধান গ্রন্থটি হল 'গ্লোবাল ফিলজ়ফি ফর এভরিম্যান—আ মিনি লাইব্রেরি ইন এইট ভল্যুমস'। (বিশ্বের দর্শন—সকলের জন্য : আট খণ্ডের ক্ষুদ্র জ্ঞানভাণ্ডার)। আট খণ্ডের তিনটি চট্টোপাধ্যায়ের নিজের লেখা, বাকিগুলি অন্য সহযোগীদের রচনা। সম্পাদক দাবি করেছেন যে, "বিশ্ব-দর্শনের সাধারণ পাঠকদের প্রকৃত বৌদ্ধিক চাহিদা মাথায় রেখে একটি ক্ষুদ্র জ্ঞানভাণ্ডার রচনায় প্রয়াসী হওয়া গেছে। বিশেষ জ্ঞান ও সন্ধানী দৃষ্টির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে এই রচনায়। ফলে পাঠক বুঝতে পারবে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে, উন্নত করতে পারবে নিজের আচরণ। সমগ্র বিশ্বে যে দার্শনিক ক্রিয়াকাণ্ড চলছে তার সামগ্রিক পরিদর্শন করা হয়েছে এই রচনায় এবং মানুষের ভবিষ্যৎ কীভাবে দর্শনের ভবিষ্যতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে সে সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা দিয়ে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে।"

প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধের তারিখ ১মে, ১৯৯০; শেষ অর্থাৎ অষ্টম খণ্ডের তারিখ ৯ জুলাই, ১৯৯১। এতগুলি খণ্ডের গোটা বইটি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনাতে সময় লেগেছে মাত্র এক বছর দু-মাস। শেষ খণ্ডের মুখবন্ধের তারিখ (৯.৭.৯১) খেয়াল করা দরকার। এর দেড় মাসের মধ্যই সংঘটিত হয় বুর্জোয়া প্রেস কথিত 'সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্যু বা অভ্যুত্থান'। ঘটনাটি হল, সিপিএসইউ-তে গরবাচেভ-বিরোধীদের ক্ষমতাদখল ও গরবাচেভের গ্রেপ্তার। রচনার মুখবন্ধে লেখক সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টার পথে এই 'মহা সংকট'-এর কথা উল্লেখ করেছেন : "শোষণ-ভিত্তিক সমাজকে পাল্টে ব্যক্তিমালিকানা-মুক্ত উৎপাদন-ব্যবস্থার একটা বড়ো পরীক্ষা চলছিল। এর ফলে সমাজে খুব বড়ো প্রত্যাশা মুকুলিত হয়েছিল, পরিবর্তিত চেতনা ও নতুন মূল্যবোধ নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার আশা জেগেছিল নতুন মানুষের মনে। কিন্তু শেষ কয়েক বছর শোষণ-ভিত্তিক সমাজের ব্যাধিগুলি, যেমন গা-ঢাকা-দেওয়া দুষ্কৃতীর সংখ্যাবৃদ্ধি, আবার প্রকট হচ্ছিল। এর ফলে মার্কসবাদে সমাজপ্রগতির যেসব দামি কথা আছে তা প্রহসনে পরিণত হচ্ছিল। মানুষের সাহায্যে সমাজকাঠামোর খোল-নলচে পাল্টানোর এই প্রথম পরীক্ষার ব্যর্থতা মেনে নিলেও এর ফলে মার্কসবাদের দেউলিয়াপনার প্রমাণ হয় না। বাস্তবে যে ব্যর্থতা সামনে এসেছে তার কারণ দ্বিবিধ : মার্কসবাদের মৌলিক কিছু ধারণা নিয়ে বিভ্রান্তি ও যে অবস্থায় সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা হয়েছে সেই অবস্থায় সাফল্যের শর্তগুলির অসম্পূর্ণতা। এই ধারণা অমূলক নয়, কারণ মার্কসবাদের কাঠামো দিয়ে অন্য বহুবিধ সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা সফলভাবে করা গেছে। আজকের দিনে মার্কসবাদী তত্ত্ব নিয়ে পুনরালোচনা পুনর্বীক্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক।"

মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই দুর্মর আশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি একটা প্রশ্ন তোলা হয়েছে : "মানুষের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে মার্কসবাদের কোনো প্রয়োগসাধ্য দার্শনিক বিকল্প আদৌ আছে কি? আমাদের বর্তমান প্রয়াসে, পঞ্চম খণ্ডে মার্কসবাদের উদ্ভব সংক্রান্ত ধারণা উল্লেখ করে, আমরা আন্তরিকতার সাথে সেই বিকল্প সন্ধানের নিমিত্তে পরবর্তী দুটি খণ্ডে স্থান রেখেছিলাম। কিন্তু সন্ধান সফলকাম হয়নি। কোনো কোনো দার্শনিকের চিন্তার অসামান্য দীপ্তি সত্ত্বেও, আমরা কারুর চিন্তায় এমন কোনো উল্লেখ পাইনি যা মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে পারে। তাঁদের কাছ থেকে আমরা শুধু সমাজ এক বন্ধ্যা, পতিত জমি এই নেতিবাচক ভাবনাই পেয়েছি। মার্কসবাদ নিয়ে ঠাট্টা করা সোজা, কিন্তু তার কোনো ইতিবাচক বিকল্প পাওয়া তত সোজা নয়।"

লেখক কিন্তু মার্কসবাদীদের সতর্কবাণী শোনাতেও ভুল করেননি : "ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি যা মার্কসবাদে পাওয়া যায়, তা একই সাথে সেই আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি সূচিত করে যে আন্দোলনের ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রগতি নিয়ে আশা-রঙিন ছিল সেসব দিন। কিন্ত আজ বিজ্ঞান কোন পথে চলেছে? সাম্প্রতিক অতীতে পরমাণু অস্ত্রের অপব্যবহারে হিরোসিমায় ৬০,০০০ আর নাগাসাকিতে ৩৯,০০০ মানুষ স্রেফ নিকেশ হয়ে গেছে। কিন্তু তবু আণবিক, জৈবিক ও অন্যান্য ধরনের মারণাস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত হবার প্রতিযোগিতায় কোনো ছেদ নেই। এই পরিস্থিতিতে একেবারে নিরেট মূর্খ ছাড়া কে-ই বা বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে ভাবতে পারে? এই প্রশ্নের গুরুত্ব অপরিসীম—আজকের দিনে এই প্রশ্নকে পাশ কাটানো অসম্ভব। এই প্রশ্নের মুখোমুখি না হলে আমাদের বর্তমান গ্রন্থ-ভাবনার পরিকল্পনা বিশ্বাসযোগ্যই হবে না।"

"স্বস্তির কথা, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের এমেরিটাস অধ্যাপক জন সামারভিল, যিনি আমার জীবনে দেখা সর্বোত্তম মার্কসীয় চিন্তকদের অন্যতম। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'দ্য পিস রেভলুশন : এথিক্স অ্যান্ড সোস্যাল প্রগ্রেস' ('শান্তি বিপ্লব : নৈতিকতা ও সামাজিক প্রগতি') সমাজ প্রগতির ওপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিপ্লবের প্রভাব নিয়ে নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ বিশ্লেষণ। আমার বইয়ের পরিশিষ্টাংশে ওই বইটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে

তাই বর্তমান গ্রন্থাবলীর উপসংহার পরিকল্পিত হয়েছে।”

চিন, ভারত, প্রাচীন গ্রীস, মধ্য ও আধুনিক ইউরোপ হয়ে বর্তমান বিশ্বে দর্শনের ক্রমবিকাশের আলোচনান্তে লেখক এবং তাঁর সহযোগীরা যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তা হল, সর্বত্র মানুষ জীবন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছে, যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে দর্শনের। সমগ্র বিশ্বে এই দার্শনিক-ভাবনা মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অভিমুখে বিকশিত হয়েছে। ইউরোপে তথা বৃহত্তর বিশ্বে এই দর্শনের রূপকার মার্কস, এঙ্গেলস এবং পরবর্তীকালে লেনিন। প্রধান গ্রন্থ 'লোকায়ত'-এ চট্টোপাধ্যায় ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে এই দর্শন-ভাবনার সুপ্রয়োগ করেছেন। এই লক্ষ্যে তিনি কাজ করে গেছেন। এখানে যে গ্রন্থগুলির পর্যালোচনা করা হল, সেগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। অন্য পাঁচজন সহযোগীকে নিয়ে চট্টোপাধ্যায়ই 'বৈশ্বিক দর্শন' বিকাশের এক প্রণালীবদ্ধ (অথচ যা কম সারস্বত, বেশি লোকবোধ্য) বৃত্তান্ত রচনা করেছেন।

আজকের দিনে দেবীপ্রসাদের প্রাসঙ্গিকতা

যে প্রধান রচনাগুলি এখানে পর্যালোচিত হল সেগুলি ছাড়াও চট্টোপাধ্যায় অনেক লেখালিখি করেছেন। সেগুলি আলোচ্য গ্রন্থসমূহের ভাবনার লোকপ্রিয় পরিবেশন বলে ধরা যেতে পারে। সেগুলি আলাদা করে আলোচনার প্রয়োজন নেই কারণ সে-সমস্ত লেখার নির্যাস এই নিবন্ধেই পরিবেশিত হয়েছে।

চট্টোপাধ্যায়ের লেখার শিরোনাম উল্লেখ বা তাঁর লেখার পর্যালোচনার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, ভারতীয় সমাজের বর্তমান সমস্যাগুলি নিয়ে যে সামাজিক-রাজনৈতিক আলোচনা-বিশ্লেষণ চলছে সেক্ষেত্রে তাঁর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন করা। তাঁর অবদানের সবচেয়ে বড়ো দিক হল—কু-সংস্কার, কুহেলিকাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর এক বড়ো হাতিয়ার হল তাঁর লেখা। এসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক-রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্মলগ্ন থেকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা ধারণ করে বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তবু স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ লগ্নে কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ইত্যাদি মাথা চাড়া দিতে থাকে। বৈদেশিক শাসনের শেষে দু-বছরই শুধু নয়, স্বাধীনতা লাভের পরেও এই শক্তি সমানভাবে সক্রিয় থেকেছে। ফলে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে মুখ দেখা যাচ্ছে সেই দানবের যার আস্ফালনে জাতীয় সংহতি বিপন্ন ও স্বাধীনতা সংকটাপন্ন হয়েছে। গণতন্ত্রের বিকাশ স্তব্ধপ্রায়, প্রগতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তি ক্রমশ ক্ষীণবল হচ্ছে।

হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী এইসব অশুভ শক্তি আমাদের দেশকে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। দেশকে তারা তথাকথিত সেই 'বৈদিক স্বর্ণযুগে' নিয়ে যেতে চায় যে যুগে পূত শক্তি প্রভুশক্তির হাত শক্ত করেছিল বলে দেখিয়েছেন চট্টোপাধ্যায়। এই দুই শক্তির গাঁটছড়া বাঁধার বিরুদ্ধেই চট্টোপাধ্যায় শাণিত করেছেন তাঁর লেখনী। তাঁর সব লেখা তাই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজবাদের জন্য লড়াইয়ে অমোঘ হাতিয়ার হিসেবেই গণ্য হবে।

'মার্কসিস্ট' ভল্যুম-২, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৩

অনুবাদ : ড. সুকৃতি ঘোষাল, অধ্যক্ষ, মহরাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

সমুদ্রগড় সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

সমুদ্রগড়, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫৪) ২৬৬২৫৬, ৯৩৩৩২১২৬৭০

আমাদের পরিষেবা

● ন্যায্য দরে ভেজালহীন সারের ব্যবস্থা। ● ব্যাঙ্কে সকল রকম আমানতের ব্যবস্থা। ● কম সুদে চাষিদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। ● অভাবি চাষিদের পাট ক্রয়। ● মিনি ডিপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা। ● হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা। ● হাসকিং মিলে ধান ভাঙানোর ব্যবস্থা। ● কৃষি ও কৃষকের স্বার্থবাহী প্রকল্প রূপায়ণে এই সমবায় সর্বদা সজাগ।

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় *সভাপতি* — **সাহাদুল খান** *সম্পাদক* — **হামরাজ সেখ** *ম্যানেজার*

Sl. No. 50

With best compliments of

M/s TIWARI CONSTRUCTION

Fabricators, Erectors, Mechanical Engineers, Civil Contractors

Specialist in :
Stainless Steel & Pipeline Job, Dealing with Earth Moving Machine,
JCB & Hydraulic Crane Etc.

ESBY Industrial Estate
Sanjib Sarani, Durgapur-713201, Dist. Paschim Bardhaman, E-mail : vinodtiwarig@gmail.com
Phone : 0343-2554757 (R), G.T. : 9002390791
V.T. : 9333950979, R.T. : 9333907643 / 9932697055

WORKS SITE
(1) Graphite India Ltd., (2) Ganga Rasayanie (P) Ltd. (3) Jai Balaji Group, (4) Ultratech

Sl. No. 77

ভারতে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা

মদন ঘোষ

২০১৯-২০ আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করতে গিয়ে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশের স্তরে উন্নীত করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বর্তমানে দেশ ২.৮ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির স্তরে আছে। বাজেট পেশের পর অধিকাংশ অর্থনীতিবিদরা বলেছিলেন যে, এই স্তরে পৌঁছাতে গেলে বছরে দেশে গড় আর্থিক বিকাশের হারকে কমপক্ষে ৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। বাড়াতে হবে কর্মসংস্থানের হারকে।

অর্থনীতির বেহাল দশা

ইতোমধ্যে যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কর্পোরেট অর্থনীতির অনিবার্য পরিণতিতে আমেরিকা সহ বিশ্বের সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশ এখনও ২০০৮ সালের মন্দার কবল থেকে বের হতে পারেনি। উদার অর্থনীতির পথ ছেড়ে আমেরিকা এখন সংরক্ষণের নীতিকে ধরে বাঁচতে চাইছে। আমেরিকা-চিন বাণিজ্য যুদ্ধের পরিণতিতে চিনের অর্থনৈতিক বিকাশের হারও আগের বৃদ্ধির হারকে ধরে রাখতে পারছে না। মার্কিন নির্দেশে চলতে গিয়ে ভারতে শুরু হয়েছে ব্যাপক মন্দা।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং (তিনিও উদারীকরণপন্থী) দেশের চলতি মন্দাকে 'ম্যান মেড' বলে আখ্যায়িত করেছেন। রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর ড. সিং-এর মতে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ১,৭৬,০০০ কোটি টাকা সরকারি তহবিলে নিয়ে ব্যাংককে ঘুরে দাঁড়ানোর নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে সরকার। এই সরকারের আমলে যে তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। নোট বাতিল, অপরিকল্পিতভাবে ও তাড়াহুড়ো করে জি.এস.টি চাপিয়ে দেওয়ায় ছোট বড় ব্যবসায়ীদের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কর সন্ত্রাস চলছে। গত তিন মাসে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ভোগ্যপণ্যের চাহিদা গত ১৮ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম। গাড়ি শিল্পে কাজ হারিয়েছে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে বহু কাজ চলে গেছে। ২০২০ সালের মধ্যে বাড়বে বেকারি। গ্রামীণ অর্থনীতির বেহাল দশা। কৃষক পর্যাপ্ত দাম পাচ্ছে না। গ্রামীণ অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। দেশের জনগণের ৫০ শতাংশের বেশি মানুষকে চূড়ান্ত দুর্দশার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে বৃদ্ধির হার ০.৬ শতাংশে নেমে গেছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে আমরা এখন একটা দীর্ঘস্থায়ী সংকটের মধ্যে রয়েছি। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 'প্রতিহিংসার রাজনীতি' ছেড়ে সুস্থ বক্তব্য রয়েছে এমন চিন্তাশীল মানুষদের সাথে পরামর্শ করুন। এরপর মারুতি কারখানা দু'দিনের জন্য উৎপাদন বন্ধ করেছিল।

সবরকমের চেষ্টা করেও দেশে কোম্পানি বা কর্পোরেটে বিনিয়োগ আসছে না। প্রকৃত অর্থে ২০১৮ সালে কর আইন নির্ধারণের আগে টাস্কফোর্সের হিসাব অনুযায়ী বিগত বছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে ১০.৩৩ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে কমে হয়েছে ৪.২৫ ট্রিলিয়ন ডলার। ক্রমবর্ধমান বেকারি ও কম মজুরির ফলে মানুষের

ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে মজুরি না বাড়ার ফলে গ্রামে চাহিদা কমছে।

প্রসঙ্গত এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি রাষ্ট্রের জি.ডিপি. বৃদ্ধির হার উল্লেখ করা হল : বাংলাদেশ ৮.১৩ শতাংশ, নেপাল ৭.৯ শতাংশ, ভুটান ৭.৪ শতাংশ, চিন ৬.৯ শতাংশ, মায়ানমার ৬.৮ শতাংশ, পাকিস্তান ৫.৪ শতাংশ ও ভারত ৫.১ শতাংশ। দেশে নোট বাতিলের যুক্তি হাজির করতে গিয়ে মোদীজি 'জাল নোট বন্ধ হওয়া'-র কথা বলেছিলেন। কিন্তু গত দু'বছরে ৫০০ টাকার জাল নোট ১২১ শতাংশ বেড়েছে। বেড়েছে ২০০০ টাকার জাল নোটও। দেশে ৬৩ কোটি কর্মহীন মানুষ। গত ২ বছরে ছাঁটাই হয়েছেন ২ কোটি কর্মরত মানুষ। রেলে ৩ লক্ষ কর্মী ছাঁটাই-এর ইঙ্গিত আসছে। বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস এমন ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০০তম। আত্মহত্যাকারী কৃষকের সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের রাজ্যে ২১৮তে পৌঁছেছে।

কৃষির অবস্থা

আমাদের থেকে পরে স্বাধীন হয়েও চিন কেমন করে এগিয়ে গেল? চিন আয়তনে বড় হলেও ওই দেশে চাষযোগ্য জমি আমাদের দেশের থেকে কম। সরকারে কৃষি দপ্তর প্রকাশিত পুস্তিকা অনুসারে আমাদের দেশে নিট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৬০ মিলিয়ন হেক্টর (১ হেক্টর = ২৪৭.১ একর)। সর্বমোট আবাদি জমির পরিমাণ ২০০.৯ মিলিটন হেক্টর। কৃষি নিবিরতা মাত্র ১৪০ শতাংশ। ২০১২-১৩ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশে সেচপ্রাপ্ত জমি ৬৫ মিলিয়ন হেক্টর বা ৩৫ শতাংশ। বাস্তব হচ্ছে এটাই যে, বর্তমানে সেচের প্রধান উৎস ভূগর্ভস্থ জল। বিশ্বব্যাংক ঋণ হিসেবে দিয়েছিল এই টাকা। ওই জল থেকে সেচ হয় ৩৯ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে। ক্যানেলের জলে সেচ হয় ২২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে।

বদলেছে বর্ষার গতিপ্রকৃতি

উষ্ণায়নের ফলে প্রতি বছর বদলাচ্ছে বর্ষার গতিপ্রকৃতি। মৌসম ভবনের তথ্য অনুসারে জুন মাসেও দেশে বৃষ্টিপাতের হার ৩৩ শতাংশ ছিল। ১-১৯ জুলাই দেশে বর্ষা হলেও গত ৩০ আগস্ট পর্যন্ত স্বাভাবিকর তুলনায় ১৭ শতাংশ ঘাটতি থেকে গেছে। ইতিমধ্যে কেরল, তামিলনাড়ু, মুম্বাই ও বিহারে বন্যা হয়েছে। মরু-অধ্যুষিত রাজস্থান সুবর্ষা পেয়েছে। আমাদের রাজ্যের উত্তরবঙ্গের ২-৩টি জেলায় বন্যা হলেও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান সহ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও আবাদের কাজ হয়নি বললেই চলে। আগাম বর্ষায় আবাদ করা জমির ধান যেমন বৃষ্টির অভাবে শুকিয়েছে, তেমন ভদ্র মাসে আবাদ করা জমিতে ফলন স্বাভাবিকের অনেক নিচে নেমে আসবে। কৃষির সাথে যুক্ত সকলেই জানেন যে বীজের বয়স ২১ দিন হয়ে গেলে পাশকাঠি কম হয়। পাট চাষের অধিকাংশ জেলায় পাট ধোয়া-কাচার কাজ মার খাচ্ছে। এমনিতেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের অনেক নিচে। ভালো করে ধোয়ার অভাবে উচ্চ গুণমানের পাট এলাকাতেও রং খারাপ হওয়ার কারণে দামে মার খাবেন কৃষক।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আমাদের দেশের বড় অংশের জমিতে ভূগর্ভস্থ জলে সেচ হয়ে থাকে। অবৈজ্ঞানিক প্রথায় জলোত্তলনের ফলে সবকটি রাজ্যেই জলস্তর এতটাই নেমে গেছে যে মাটির নিচের জল তোলাই সম্ভব হয়নি। ক্যানেলের জল এসেছে যৎসামান্য। কেন্দ্রীয় জল কমিশন, যারা বৃহৎ জলাধারগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের তথ্য অনুসারে ১৮ জুলাই (জল ছাড়ার প্রচলিত দিন) পর্যন্ত সবকটি জলাধারের মাত্র ২৪ শতাংশ পূর্ণ হয়েছিল।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ

ডাউন টু আর্থ (Down to Earth) ১-১৫ আগস্ট সংখ্যায় রিচার্ড মহাপাত্র লিখেছেন, "২০১৬ সালে ভারতের কৃষকের গড় বয়স ছিল ৫০.১ বছর। ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিদিন ২০০০ কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ কৃষি থেকে গড় আয় অন্য পেশার ১/৫ অংশ মাত্র। কমবয়সীরা কার্যত কৃষির প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। এর সাথে উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত ছাত্ররা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছে, তারা অন্য পেশায় যোগ দিচ্ছে। রিচার্ড-এর মতে এটা হল 'ভারতীয় কৃষি থেকে একটা বড় আকারের মগজ চালান (brain drain) হচ্ছে।'

১৯১৭ সালে 'প্রথম' নামের একটা এন.জি.ও তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে লিখেছে যে, তারা ত্রিশ হাজার গ্রামীণ যুবকের উপর সমীক্ষা চালিয়েছে। এদের মধ্যে ১২ শতাংশ কৃষিতে, ১৮ শতাংশ সেনাবাহিনীতে ও ১২ শতাংশ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

এই সমস্যাটা শুধুমাত্র ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বের। আমেরিকায় কৃষকের গড় বয়স ৫৮ বছর, জাপানে ৬৭ বছর। ইউরোপে প্রতি ৩ জনে ১ জনের বয়স ৬৫ বছর। সম্প্রতি জাপান সরকার ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়স্কদের কৃষিক্ষেত্রে আকর্ষণের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে। ২০৫০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১৯০ কোটিতে পৌঁছাবে। এদের ২/৩ অংশের বেশি হবেন মধ্য আয়ের মানুষ। ফলে কৃষিপণ্যের চাহিদা দ্বিগুণ হবে।

গ্রামীণ ভারতের চিত্র

ডাউন টু আর্থ (Down to Earth)-এর একই সংখ্যায় রিচার্ড মহাপাত্র লিখেছেন, "এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কৃষি, যা কিনা দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ-এর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, তা এখন নিদারুণ সংকটের মধ্যে আছে।" কৃষির সাথে পরিকাঠামো, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সার্ভিস সেক্টরের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, ২০২৪ সালে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাইলে এই প্রধানমন্ত্রীকে অনেক বেশি সরকারি ব্যয় বাড়াতে হবে— 'বিনিয়োগের হাই ডোজ স্টেরয়েড' দিতে হবে"।

অর্থনীতিবিদ, নীতি আয়োগের সদস্য ও সরকারের 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' রমেশ চন্দ্র তাঁর গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন যে, 'আর্থিক ও কর্মসংস্থানের বিচারে গ্রামীণ ভারত তার কৃষিনির্ভর নয়'। তাঁর ব্যাখ্যা হল ১৯৯৩-৯৪ ও ২০০৪-০৫ সালে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১.৮৭ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে অ-কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৭.৯৩ শতাংশে পৌঁছেছে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে রিচার্ড মহাপাত্র লিখেছেন অ-কৃষি ক্ষেত্রগুলো কাজ সৃষ্টি করতে না পারায় আর কর্মপ্রার্থীদের কাজে নিয়োগ করতে পারছে না। সংস্কার-পূর্ব সময়ে গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ২.১৬ শতাংশ। আর্থিক সংস্কারের পর উন্নয়নের হার বাড়লেও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে। সুতরাং যদি ভারত ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে পৌঁছায়ও, তবু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে না। এটা হবে কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধি।

প্রাণী সম্পদ সম্পর্কে

কৃষকের আয়ের ৩০ শতাংশ আসে প্রাণী পালনের মধ্য দিয়ে। স্বভাবতই কৃষকের জীবনে এটা একটা বড় আয়ের উৎস। ২০১৪ সালে প্রথম মোদী সরকার প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় সরকার 'রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন (আর.জি.এম) ঘোষণা করে প্রকল্পের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। মাঝে কিছুদিন অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব সামলান পীযূষ গোয়েল। তিনি বাজেট পেশ করতে গিয়ে বলেন, 'গরু

আমাদের মাতা।' তিনি ৭৫০ কোটি টাকা আর.জি.এম. প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করেন। সম্প্রতি গবাদি প্রাণী সংক্রান্ত শুমারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যাশা মতো গো-সম্পদ বাড়েনি। কিছু ক্ষেত্রে কমেছে। ২০০৭ সালে দেশে গরুর সংখ্যা ছিল (কোটিতে) ১৬.৬০২, ২০১২ সালে ১৫.১১৭ ও ২০১৯ সালে ১৩.৯৮২। বিদেশি ও সংকর জাতীয় গরু ছিল যথাক্রমে ৩.৩০৬, ৩.৯৭৩ ও ৫.১৪৭। মহিষের সংখ্যা যথাক্রমে ১০.৫৩৪, ১০.৮৯৭ ও ১১.০১৭। ছাগল : ১৪.০৫৪, ১৩.৫১৪ ও ১৪.৭৭৭টি। ভেড়া : ৭.১৪৬, ৬.৫০৭ ও ৬.৫০৭। শূকর যথাক্রমে ১.১১৩, ১.০২৯ ও ০.৮২৬টি।

কেন্দ্রীয় পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, ''সারা দেশে গরু জন্মানোর কারখানা খুলে দেব। আগামী দিনে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যত গরু জন্মাবে সবই গাই গরু হবে।'' তিনি হরিয়ানার মহিলাদের যে ভ্রূণ পরীক্ষা হয় গরুর ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা করবেন নাকি? এই সব সংবাদ দেখে ও পড়ে পুরানো দিনের গ্রামীণ কথা মনে পড়ে গেল। ওনার 'উতুর-পুব (উত্তর-পূর্ব) জ্ঞান নেই'।

২০১৪ সালে যখন কেন্দ্রীয় সরকার 'রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন' ঘোষণা করে তখন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি সরকার ছিল। পরে যুক্ত হয়েছে উত্তরপ্রদেশ। কেন্দ্রীয় সরকার 'রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন' ঘোষণার সাথেসাথে গড়ে ওঠে আর.এস.এস পরিচালিত বজরঙ্গ দল পরিচালিত 'গোরক্ষা সমিতি'। বিজেপি পরিচালিত কয়েকটি রাজ্যে গোহত্যা ও গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন পাশ হয়। ফ্রিজে গো-মাংস না থাকা সত্ত্বেও এই আইনের প্রথম শিকার সেখ আকলাখ। মুসলিম সমাজের অনেকেই জীবিকার স্বার্থে গরু-ছাগলের পাইকারি ব্যবসা করেন। তাঁদের অনেককেই পিটিয়ে বা গাছে ঝুলিয়ে মেরেছে 'গোরক্ষা সমিতি'-র লোকেরা। রাজস্থানে এবছর সুবর্ষা হলেও অন্য বছর জমির মাঝে ছোট সেচ পুকুর তৈরি করে কম জলে চাষ করার রেওয়াজ চালু আছে। রবি চাষ শিশির-নির্ভর। সন্ধ্যার মুখে জমিতে চাষ দিয়ে মাটিতে শিশির পড়লে সকালে সেটাকে আবার বাঁশ ও মই দিয়ে চাপা দিয়ে জমির আর্দ্রতা বাঁচিয়ে রবি চাষ হয়। কয়েক বছর আগে একটা ক্যানেল হওয়ায় চাষের সুযোগ বেড়েছে। কিন্তু একটা বড় অংশের মানুষের প্রধান জীবিকা প্রাণী পালন। কয়েক মাস আগে একটা পাক্ষিকে প্রকাশিত হয়েছিল যে, একজন বর্ধিষ্ণু কৃষকের বাৎসরিক আয়ের ৭৫ শতাংশ আসতো প্রাণী পালন থেকে। 'গোরক্ষা সমিতি'-র লোকদের ভয়ে তিনি প্রাণী পালন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য তিনি নির্মাণ-কর্মীর কাজ করছেন। এদের হাতে নিরাপদ মানুষ? বাড়বে দুধের যোগান?

লড়তে হবে এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে

কাজটা সহজ নয়। এরজন্য চাই, মতাদর্শে পুষ্ট নেতৃত্বকে কর্মীদের পুষ্ট করতে হবে। মানুষের আপনজন হয়ে ওঠার কৌশলকে সাথে থেকে শেখাতে হবে। গণফ্রন্টগুলোকে গণচরিত্র দিতে হবে। কাল যে মানুষটি ভুল করেছেন তাঁর কাছেও পৌঁছে তাঁকে জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে সাহায্য করতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে 'ট্রোজান হর্স'-দের বিরুদ্ধে। এটাই হবে এখনকার কাজ।

লেখক : সর্বভারতীয় কৃষক নেতা ও সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সাতগেছিয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম : বরোয়ামহেশ, জেলা : পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১৪৬, যোগাযোগ : (০৩৪২) ২৭০০৩৫৭

আমাদের সাফল্য

১. সরকারি আদেশ অনুযায়ী পঞ্চায়েত পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার।
২. তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে জন্ম, মৃত্যু, ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রদান।
৩. প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ও গীতাঞ্জলি প্রকল্পে গৃহ নির্মাণের অনুদান।
৪. আই.এস.জি.পি. প্রকল্পে পাকা ড্রেন, কংক্রিট রাস্তা, প্রতীক্ষালয় নির্মাণ।
৫. মিশন নির্মল বাংলা-র লক্ষ্যে পঞ্চায়েতভুক্ত প্রত্যেক পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত করা।
৬. জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তি বা পরিবারকে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৭. সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ
৮. পঞ্চায়েতভুক্ত সকল নাগরিককে পঞ্চায়েতমুখী করা।

বাবলু মাণ্ডি
উপপ্রধান

সকোল মনি টুডু
প্রধান

Sl. No. 13

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

বোহার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

মেমারি-২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত

গ্রাম ও পোঃ বোহার, জেলা : পূর্ব বর্ধমান

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- প্রধানমন্ত্রী আবাসন ও বাংলা আবাস যোজনায় গৃহ অনুদান।
- ISGP প্রকল্পে ঢালাই রাস্তা, পাকা ড্রেন নির্মাণ ইত্যাদি।
- স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।
- মিশন নির্মল বাংলা উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে এলাকায় বনসৃজন ও ঘরে ঘরে শৌচাগার নির্মাণে সহায়তা করা।
- আদর্শ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে সকল নাগরিককে পঞ্চায়েতমুখী করা।
- পঞ্চায়েতভুক্ত প্রতিটি কন্যাকে কন্যাশ্রী প্রকল্পভুক্ত করা ও রূপশ্রী প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ।

পঞ্চায়েতের অধীন সরকারি পরিষেবা পেতে যথা সময়ে ভূমি ও গৃহকর প্রদান করুন।

চলো আমরা পথে নামি.... করতে শিশু ইস্কুলগামী
এসো হাতে হাত রাখি... করতে তোমায় পঞ্চায়েতমুখী

রেভানা ইয়াসমিন
উপপ্রধান

সনজিৎ মুরমু
প্রধান

Sl. No. 46

‘পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বিকাশের ভবিষ্যত সার্বিকভাবেই উজ্জ্বল’ : নিরুপম সেন

প্রয়াত প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের এই সাক্ষাৎকারটি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস গ্রুপের ‘বিজনেস পাবলিকেশন্’ ডিভিশনে প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে নেওয়া এই সাক্ষাৎকারটির বাংলা অনুবাদ করে পুনর্মুদ্রিত হলো।

বাংলায় তর্জমা করেছেন —**অনন্য ভট্টাচার্য**

☐ গত দুবছর যাবৎ লগ্নি করার ক্ষেত্রে ‘ব্র্যান্ড বেঙ্গল’ হিসেবে যে বিশেষ ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল, দুটি অবাঞ্ছিত বা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় তা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনি কি এখনও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র হিসেবে বাংলায় লগ্নি করার ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের আশ্বাস দিতে চান?

জীবনে সব সময়েই ওঠা-পড়া থাকে। চলার পথে এটা অবধারিত। এটা কখনোই আশা করা উচিত নয় যে, কুসুমাস্তীর্ণ পথ ধরে দ্রুততার সঙ্গে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবো। অপ্রত্যাশিত, অভাবিত এবং দুর্ভাগ্যজনক নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, এবং এই ঘটনাগুলিই আবার দ্বিগুণভাবে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করে তোলার শক্তি যোগাবে। দীর্ঘ পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তিগুলিই সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটা ঘটনা যে, শিল্প-প্রকল্পগুলি সঠিক পথেই হাঁটছে এবং ভালো সংখ্যক প্রকল্প প্রস্তুতির পথে আছে, যেগুলির মাধ্যমে এই বার্তা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গই শিল্পস্থাপন ও লগ্নির উপযুক্ত গন্তব্যস্থল। শিল্পের ক্ষেত্রে একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেত্র হবে এই রাজ্য। আপনার প্রশ্নের সূত্রে এভাবেই নিরাময় ও শুশ্রূষার স্পর্শ দিতে চাই এই কথাগুলির মাধ্যমে।

☐ সমর্থ ও বড়ো শিল্পদ্যোগীদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বার্তা দিতে চান? রাজ্যের সম্পর্কে নেতিবাচক ধরাণাগুলি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আপনি কী ভূমিকা নিয়েছেন? আপনার শিল্পনীতি কতখানি আকর্ষণীয় এবং লাভজনক?

দেখুন, কারো মধ্যে যদি নেতিবাচক ধারণা বদ্ধমূল থাকে তবে তাকে এটা বোঝানো খুবই কঠিন যে শিল্পের চাকা আবার ইতিবাচক ও উন্নতির পথেই এগোবে। একজন শিল্পপতি লগ্নি করবেন কি করবেন না এটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আমি কখনোই তাঁর উপর এবিষয়ে চাপসৃষ্টি করবো না। যাবতীয় বাধা ও দুর্বলতা অতিক্রম করে আমরা কী করেছি ও করছি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, তা সকলের জানা। লগ্নির ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিরা সমস্ত দিক বিবেচনা করে সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিক।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পস্থাপনে লগ্নি করার সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্য রাজ্যের তুলনায় কতখানি বেশি তা অবশ্যই ভালোভাবে জেনে তারা সিদ্ধান্ত নিক এরাজ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে তারা লগ্নি করবে অথবা করবে না। অন্যদিক থেকে আমরা আমাদের কাজ ও সিদ্ধান্তগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে যদি তাতে কিছু ভুল হয় তা অবশ্যই শুধরে নেবো। আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতাই দীর্ঘ দৌড়ের ক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক হবে এটাই আমরা বলতে চাই। শিল্পের লাভজনক প্রকল্পে লগ্নির ক্ষেত্রে আমরা যুগোপযোগী ও আধুনিকমনস্ক বলেই মনে করি। বর্তমান যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমরা শিল্পনীতি গ্রহণ করেছি। আপনি এটা নিশ্চয়ই মানবেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রের নির্ধারিত নীতিগুলিকেই সর্বদা মেনে চলতে হয়। আমাদের যে শিল্পনীতি তাতে কেন্দ্রীয় নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ রয়েছে। আমরা আমাদের চাহিদা, শিল্পদ্যোগীদের প্রত্যাশা এবং GOI-এর নির্দেশিত নীতির মধ্যে ভারসাম্য রেখে আমাদের রাজ্য এবং রাজ্যের মানুষের আর্থিক লাভ ও উন্নতির ক্ষেত্রটিকে আরও প্রসারিত করে দিতে চাই।

সম্প্রতি আমরা এ বিষয়ে সমীক্ষার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের উদ্যোগে একটি সমীক্ষক দল (Scrutiny Committee)

গঠন করেছি। এঁরা আগামী দিনের প্রস্তাবিত লাভজনক শিল্পপ্রকল্পগুলি নিয়ে সমীক্ষা করবেন। এই কমিটির প্রধান হিসেবে থাকবেন শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের বিশেষ সচিব। এছাড়াও শিল্পনিগম-এর ডিরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন সংস্থার (WBIDC) ডিরেক্টর এবং অর্থবিভাগের যুগ্ম সম্পাদককে নিয়ে গঠিত এই কমিটি—শিল্প বিষয়ক প্রস্তাবগুলি সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট দেবেন।

□ আপনাদের শিল্প পরিকল্পনায় সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প কোন্‌টি? বিগত বছরের মধ্যে লগ্নিকৃত বিভিন্ন শিল্প-প্রকল্পের সংখ্যা কত ছিল?

বড় প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ম্যাট্রিক্স গ্রুপের ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট; জিন্দালদের ইন্টিগ্রেটেড আয়রন, স্টিল প্ল্যান্ট; বেদান্ত গ্রুপের ভূষণ স্টিল, শ্যাম স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম প্রকল্প; অ্যাসটনফিল্ডের বায়ো-মাস প্রকল্প; ভাস্কর সিলিকনের সোলার ফটো ইত্যাদি। এখনি সমস্ত শিল্প-প্রকল্পগুলির সম্পূর্ণ চেহারাটা দেওয়া যাচ্ছে না, তবে ২০০৯-এ এটা স্পষ্ট যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রকল্প এই সময়েই গঠিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। চূড়ান্ত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৭১০০ কোটি টাকা লগ্নি হচ্ছে, যা অবশ্যই সাফল্যের সূচক বলা যেতে পারে। এই সাফল্যের চিত্রটি মাঝারি ও বড়ো মাপের শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং শুধু আমাদের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের দেশের সফল ও সমর্থ শিল্পপতিদের কাছেও।

□ রাজ্য সরকারের এখন বিপুল প্রত্যাশা ও উৎসাহ নয়াচরে প্রস্তাবিত পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প নিয়ে। সারা বিশ্বের পেট্রোকেম প্রকল্পের নিরিখে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকির কাজ বলা যেতে পারে। এই প্রকল্পটির বর্তমান চেহারা ও পরিস্থিতি কীরকম?

এই প্রকল্প তৈরির কাজ বা সক্রিয়তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত পরিবেশে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত রিপোর্টটি। এই রিপোর্টটি GOI-তে জমা পড়েছে এবং এক্ষেত্রে তাদের চূড়ান্ত সম্মতি পেলেই সময় নষ্ট না করে আমরা দ্রুত প্রকল্পের কাজ কার্যকর করবো। তবে ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে লগ্নি ও বাণিজ্যিক বিষয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

□ শিল্পজগতের একটি অংশ মনে করে যে, পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য হওয়া উচিত আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে সারা বিশ্বের শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করা। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

আমরা ইতিমধ্যেই এই দিকনির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ শুরু করেছি। ২০০৮-এর এপ্রিলে আমি জার্মানির বাভেরিয়া এবং লোয়ার স্যাকসনিতে বাণিজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছি। এরই আদলে সম্প্রতি ২০০৯-এ 'বেঙ্গল-বাভেরিয়া শীর্ষ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ২০০৯-এর এপ্রিলে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করেছি। তাছাড়া এবিষয়ে দুই সদস্যের রাজ্য-প্রতিনিধিকে ২০১০-এর জানুয়ারিতে দোহা, কাতারে পাঠিয়েছি NROAB (Non Resident Overseas Association at Bengal) প্রথম সম্মেলনে। এই সম্মেলনে সদস্য প্রতিনিধিদের যে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তা প্রবলভাবেই আশাব্যঞ্জক এবং প্রেরণাদায়ক। NROAB ইতিমধ্যেই তাদের রিপোর্ট ও প্রস্তাবগুলি জমা দিয়েছে। তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং ইতিবাচক মনোভাব সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশ করবে বলেই মনে করি। খুব শীঘ্রই ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আর একটি দল আমেরিকা যাচ্ছে PCPIR-এর Upsteream ও Downstream প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে। আমরা হ্যানোভার, জার্মানি প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাতেও অংশগ্রহণ করছি প্রতিবছর।

□ শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি অনেক সময়েই রাজ্যে শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ বিষয়টিকে আপনি কতখানি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন?

আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতভাবেই বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করছি। বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এ বিষয়ে যেমন আলোচনা চলছে, তেমনই ক্ষতিপূরণ, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয় নিয়েও চর্চা ও কাজ চলছে। এই তিনটি বিষয়ই জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঘটনা যে, এক্ষেত্রে আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, আমরা সামনের দিকে বিস্তৃত পথ ধরে এগিয়ে যাবো।

CSR (Corporate Social Responsibility বা শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি প্রতিটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। R & R প্যাকেজ (Rehabilitation & Resettlement) এবং জমির মূল্যের বিষয়টিও লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনাধীন।

□ WBIDC (West Bengal Industrial Development Corporation) যেটি রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্পের মূল কেন্দ্র, বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ করে 'Industrial Park' তৈরি করছে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের বিকাশকে সহজতর করার জন্য। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? এই ধরনের 'Industrial Park' গুলি কি শিল্পের বিকাশে সহায়ক হবে?

উত্তর : WBIDC-র এই কাজ প্রকৃতপক্ষে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার বিশেষ পদক্ষেপ। এই সেক্টরগুলি বিশেষ করে Industrial Park গুলি প্রগতির বাহক হয়ে উঠবে। এর মাধ্যমে পুঁজি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। সামগ্রিকভাবে রাজ্যের অর্থনীতির উন্নতি ঘটবে। এই অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিকাশই প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির বিদ্রোহ প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে উঠবে।

তাছাড়া এটি অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি এবং উন্নতমানের পরিকাঠামো তৈরির সহায়ক হবে। মাঝারি ও বড়ো মাপের উৎপাদনশীল শিল্পক্ষেত্রগুলি ছোট ও ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্পগুলিকে সহায়তা দেবে, যেখানে কর্মসংস্থানের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

□ আগামী আর্থিক বছরে শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে রাজ্যের সম্ভাবনা কেমন বলে আপনার ধারণা? অনুগ্রহ করে রাজ্যের শিল্প সংস্থাগুলির বিকাশ ও অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি কী তা বলুন।

আমি এ বিষয়ে যথেষ্টই আশাবাদী। সাম্প্রতিক নিরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন অপ্রধান ও গৌণ শিল্প-কেন্দ্রগুলিরও বিকাশ ঘটেছে। আমি এক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রতিষ্ঠিত, উন্নত ও দ্রুত উৎপাদনশীল শিল্প-সংস্থাগুলির কাছে বিশেষ সক্রিয়তা ও দায়বদ্ধতা প্রত্যাশা করি। কারণ, এই সময়কালে শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির বিষয়টি রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যযুক্ত ও সর্বব্যাপী উন্নতির আদর্শ কাঠামো নির্মাণের জন্য দুটি বিকাশশীল শিল্পক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে IEM (Industrial Enterpreneurs Memoramdums) তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছে লগ্নিকারীদের, যাঁরা প্রভূত উৎসাহ নিয়ে রাজ্যের শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ বিকাশকে আরোও উজ্জ্বলতর করে তুলবে তাদের স্থাপিত শিল্পের মধ্য দিয়ে। আমাদের সামনে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, সমস্ত শিল্প-প্রকল্পগুলির ভিত্তিভূমি দ্রুত প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

অনুবাদক : হুগলি মহসিন কলেজের বাংলার অধ্যাপক

গতর-খাটা মানুষের জন্য দেবীপ্রসাদের ‘মার্ক্সবাদ’

অরিন্দম কোঙার

মহাপণ্ডিত

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮-৯৩) মস্ত দার্শনিক ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকস্তরে অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন। স্নাতকোত্তরস্তরেও তাই। তারপর ‘প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও সমাজ’ বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট (ডি. লিট) হন। কলেজে অধ্যাপনা করেন।

এটা ঠিক যে, দেবীপ্রসাদ দর্শনশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন এক মহাপণ্ডিত। কত বিষয় চর্চা করেছেন—সাহিত্য ও শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি। কত ভারি ভারি বই লিখেছেন বাংলা ও ইংরেজিতে—ভারতীয় দর্শন, লোকায়ত দর্শন, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, What is living and what is dead in Indian Philosophy, History of Science and Technology in Ancient India (2 vols), Lenin the Philosopher ইত্যাদি। আবার কত সরলভাবে এবং সহজ ভাষায় লিখেছেন ‘মার্ক্সবাদ’। বইটা প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আদ্যন্ত একজন মার্কসবাদী ছিলেন। মার্কসবাদ সমাজবিজ্ঞানের একটা তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সাহায্যে মানুষ ও তার সমাজকে জানা যায়, বোঝা যায়, শুধু তাই নয়, এই তত্ত্বকে ঠিকঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সমাজের বড় ধরনের পরিবর্তনের রাস্তা পাওয়া যায়। বড় ধরনের পরিবর্তন বলতে শোষণ আছে, বঞ্চনা আছে এমন একটা সমাজ থেকে শোষণ নেই, বঞ্চনা নেই এমন একটা সমাজে পরিবর্তন। পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। গতর খাটিয়ে, মাথা খাটিয়ে যে সম্পদ তৈরি হয়, গুটি কতক মানুষ তার ফল ভোগ না করে বেশিরভাগ মানুষের ফল ভোগের সুযোগ পাওয়া অর্থাৎ সম্পদের সুষম বন্টন। এর জন্য জবরদস্ত লড়াই করতে হয়। তাকেই বলে বিপ্লব।

মুক্তির পথ

বিপ্লব হচ্ছে মানুষের—সম্পদ সৃষ্টিকারী কিন্তু সম্পদ থেকে বঞ্চিত মানুষের মুক্তির পথ। এই বিপ্লবে সামনে থাকবে কলে-কারখানায়, খেতে-খামারে গতর খাটানো মানুষের দল। এই মানুষগুলোর মুক্তির মন্ত্র অর্থাৎ তত্ত্ব হাজির করেছেন মার্কস-এঙ্গেলস। রাশিয়ায় এই তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের রাস্তা তৈরি করতে নেতৃত্ব দেন লেনিন। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি [রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি (বলশেভিক)]। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়। রাশিয়া এগোয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। নতুন দেশ, নতুন মানুষ। সেই রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ যান ১৯৩০ সালে। দেবীপ্রসাদ তাঁর

‘মার্ক্সবাদ’ শুরু করেন রবীন্দ্রনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি’ থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত করে। সেখানে আছে, ‘‘শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে, এখানে তাই হল; দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।’’ এই বুদ্ধি স্ববশ, হাত হাতিয়ার স্ববশ শক্তির উৎস মার্কসবাদ।

জ্ঞান ও জান

জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন মার্কসবাদ। জানের জন্য প্রয়োজন মার্কসবাদ। তাই ‘জ্ঞানের খাতিরে’ আর ‘জানের দায়ে’ মার্কসবাদ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘‘আসলে এই কথাটা মার্কসবাদের একটা মূল কথাই : জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, মাথা খাটানোর সঙ্গে গতর খাটানোর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা চাই। এ সম্পর্ক ভেঙে গেলে

জ্ঞান হবে বৃথা-জ্ঞান। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা যেরকম বলতেন, কাকদন্ত পরীক্ষা করবার মতো বৃথা, সেইরকমই। আবার উলটো দিকে, মানুষ যদি চোখ-বাঁধা বলদের মতো শুধু গতর খাটায়—যদি তার কর্মের সঙ্গে চেতনার বা স্পষ্ট ধারণার জ্ঞানের যোগাযোগ না থাকে,—তা হলে তার পরিশ্রমটুকু হবে অনর্থক, অন্ধ, অর্থহীন। তার থেকে সুফল ফলবে না। তাই, এক পিঠে জ্ঞান আর এক পিঠে কর্ম। কর্ম বাদ দিলে জ্ঞান হবে পঙ্গু, বন্ধ্যা। জ্ঞানকে বাদ দিলে কর্ম হবে অন্ধ, অর্থহীন। সবকিছুর বেলাতেই এই কথা। সমাজতত্ত্বর বেলাতেও, রাজনীতির বেলাতেও।"

সবাই দার্শনিক

আমরা সবাই দার্শনিক। চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "হয়তো, শ্যামাদাসবাবুর মতোই দেশের আকাশে-বাতাসে ছড়ানো কোনো মতবাদই আপনার মনকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু একটা-না-একটা দার্শনিক মতবাদ আপনার মনে আছেই। তাই দার্শনিক না হয়ে আপনার পক্ষে উপায়ই নেই। আপনি ভগবান মানেন? জন্মান্তর মানেন? পরলোক মানেন? কর্মফল মানেন? হয় আপনাকে বলতে হবে 'মানি' আর না হয় বলতে হবে 'মানি নে'। এছাড়া তো আর কোনোরকম জবাব আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দুরকমের মধ্যে যে জবাবটাই আপনি দিন না কেন সেটাই দার্শনিক মতবাদ হবে। এক রকমের দর্শন, না হয় তো অন্য রকমের দর্শন। কিন্তু দর্শনই।" আসলে দর্শনের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। দর্শনের জন্যই আমরা কেউ আপাত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাই, আবার দর্শনের জন্যই আমরা আপাত স্থিতাবস্থা ভাঙতে চাই।

অর্থনীতি-রাজনীতি

অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নির্ধারণ করে অর্থনীতির আলোচনা করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু অর্থনীতি কী? তাঁর উত্তর, "মোদ্দা কথায়, অর্থনীতি হল উৎপাদনের কায়দাকানুন। চাল-ডাল-গামছা-শাড়ি থেকে শুরু করে হাওয়া-গাড়ি আর হাউই-জাহাজ পর্যন্ত সবই মানুষ তৈরি করে। অর্থাৎ উৎপাদন করে। কিন্তু উৎপাদনের কারখানাকানুনটা সব সময়ই তো একরকম নয়। যেমন ধরুন, কাপড় উৎপাদন করা। তাঁত বুনেও করা যায় আবার কলকারখানা চালিয়েও করা যায়। কায়দায় আকাশ পাতাল তফাৎ নয় কি? তফাতটা শুধুই হাতিয়ারের দিক থেকে তফাৎ নয় কিন্তু; শুধুই তাঁতের সঙ্গে কলকারখানার তফাৎটুকই নয়। উৎপাদনের ব্যাপার নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেও আকাশ-পাতাল তফাত। যেমন ধরুন, এক রকমের সম্পর্ক হল জমিদার দলের সঙ্গে রায়ত-কারিগর দলের সম্পর্ক। আবার একরকম সম্পর্ক হল মিলমালিকের সঙ্গে দিনমজুরের সম্পর্ক। এইসব ব্যাপার নিয়ে অর্থনীতির আলাচনা।"

উৎপাদন, উৎপাদন-সম্পর্ক, উদ্বৃত্ত মূল্য, মুনাফা, ভিত্তি, উপরি কাঠামো আলোচনার ধরণটা এবার দেখা যাক : "মুনাফাটা ঠিক কোথা থেকে আসে? এই নিয়ে বড়ো বড়ো পণ্ডিতরা অনেক রকম কঠিন কঠিন তর্ক-বিতর্ক তোলেন। মার্কসবাদ বলে, মুনাফাটা আসে শ্রমিকদের মেহনত থেকে। একজন শ্রমিক হয়তো দিনে দশ ঘন্টা মেহনত করছে আর হয়তো মজুরি পাচ্ছে পাঁচ টাকা। এখন, দশ ঘন্টা ধরে সে যা তৈরি করছে তার আসল দাম হবে হয়তো আট টাকা। তার মধ্যে পাঁচ টাকা সে নিজে পায়, তিন টাকা পায় মালিক। এই যে বাড়তি তিনটে টাকা এর থেকেই মালিকের মুনাফা।" এখানে উদ্বৃত্ত মূল্য আছে, মুনাফা আছে। আর ভিত্তি আর উপরি কাঠামো? দেবীপ্রসাদের ভাষায়, "আসলে, এতসব দিকের মধ্যে অর্থনীতির উপরই জোরটা সবচেয়ে বেশি। কেননা, মার্কসবাদী বিচার অনুসারে এই অর্থনীতি—ধন উৎপাদনের এই কায়দাকানুন—শুধুই যে রাজনীতির গড়নটাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই নয়, মানবসভ্যতার যা কিছু কীর্তি তার সবই শেষ পর্যন্ত এর উপর নির্ভর করে। ইমারতের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়, অর্থনীতিই হল শেষ পর্যন্ত সব কিছুর চরম ভিত্তি। শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, আইন বলুন, ধর্ম বলুন, দর্শন বলুন—সব কিছুর পেছনেই অর্থনীতির প্রভাব। কেননা, ধন উৎপাদনের কায়দাকানুনের দরুন এক এক যুগে মানব সমাজের এক একরকম গড়ন, আর শিল্পীই হোক বা সাহিত্যিকই হোক সকলেই শেষ পর্যন্ত সামাজিক জীব। তাই তাদের কীর্তির উপর—শিল্পে, সাহিত্যে, দার্শনিক চিন্তায়, সব কিছুরই উপরেই—সমাজের এই গড়নটার প্রভাব এসে পড়বেই। তাই সমাজের গড়নটা নিয়ে মার্কসবাদের বিশেষ আলোচনা।" মার্কসবাদ শ্রমজীবী মানুষের জীবনের কথা, ভয়াবহ পণ্ডিতি বাপার নয়।

সমাজ পরিবর্তন

ফয়েরবাখ্ সম্বন্ধে মার্কসবাদের থিসিস সাদামাটা ভাষায় উল্লেখ করে দেবীপ্রসাদ লিখেছেন, "পৃথিবীকে বদল করা। চলতি কথায় এরই নাম হল মেহনত। মানুষ ছাড়া আর কোনো জানোয়ার মেহনত করতে পারে না। এঙ্গেলস্ বলেছেন, হাতিয়ার সৃষ্টি থেকেই মেহনত শুরু। কেননা, মেহনত মানে তো শুধুই গতর খাটানো নয়, গতর খাটিয়ে পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের দরকারমতো জিনিস আদায় করা। পাগলামি করতে করতে পাগল যদি গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যায় তা হলেও তাকে মেহনতকারী বলব না। কেননা, এই গলদ্‌ঘর্ম হওয়াটা তার পক্ষে পাগলামিই, পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রাম নয়। ঘানির বলদ দিন রাত ঘানি ঘোরাচ্ছে; তবু সে মেহনতকারী নয়, মেহনতকারী হল কলু। কেননা, কলুই জানে সে কী চায়, পৃথিবীর কাছ থেকে তা কেমন করে আদায় করা যায়।" শ্রম ও উৎপাদনের কী প্রাঞ্জল উপস্থাপন। মানুষ কেন শ্রেষ্ঠ জীব? মানুষের দেহের গঠন, মস্তিষ্কের (দেবীপ্রসাদের ভাষায় 'মগজ') বিকাশ, মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের সম্পর্ক উঠে এসেছে তাঁর আলোচনায়।

এইবার তিনি গেছেন জ্ঞান চর্চায়। সাবলীল উপস্থাপনা—"জ্ঞান কাকে বলে, এই প্রশ্ন নিয়ে সাবেকি দার্শনিকেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। এতসব কূট তর্ক হয়েছে যে তার মধ্যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। এবং এতসব কূট তর্কের পর অনেক দিক্‌পাল দার্শনিক হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, জ্ঞান বলে কোনো কিছুই সম্ভব নয়। এর নাম দেওয়া হয় অজ্ঞানবাদ আর সন্দেহবাদ। স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় এই অজ্ঞানবাদ এক অসম্ভব মতবাদ। কেননা, মানুষের জ্ঞান রয়েছে, দিনের পর দিন এই জ্ঞান বেড়েও চলেছে। তাছাড়া, জ্ঞান যে সম্ভব নয়, এটাও তো এক ধরনের জ্ঞানের কথাই হবে।" বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না—"আপাতত কথা হল, মেহনতকারীর তরফের দর্শন বলেই মার্ক্সীয় দর্শনের কাছে জ্ঞানের মধ্যে মেহনতের অবদানটা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ল। মার্কসবাদ দেখাল, জ্ঞান বা বিষয়-বিষয়ী সম্পর্ক একান্ত ভাবেই প্রয়োগ-নির্ভর সম্বন্ধ, আমাদের দেশের দার্শনিকদের ভাষায় ব্যবহারিক সম্বন্ধ।" কোথা থেকে কোথায় চলে এলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং কত স্বচ্ছন্দে।

মানুষ ও জন্তু

মানুষ জীব, জন্তু জীব। কিন্তু মানুষ জন্তু নয়, বরং মানুষ সবচেয়ে উন্নত জীব। কোনো মানুষ হীন কাজ করলে তাকে জন্তু বলে তিরস্কার করা হয়। দেবীপ্রসাদ লিখেছেন, "মার্ক্সবাদ বলছে,

মুক্তির পথ হল পৃথিবীর মুখোমুখি হবার পথ। প্রকৃতির নিয়মকানুনকে, প্রকৃতির শৃঙ্খলাকে, স্পষ্ট করে স্পষ্টতর ভাবে চেনবার পথ। যত ভালো করে চিনতে পারা, যত স্পষ্টভাবে চিনতে পারা ততই সুনির্দিষ্টভাবে সেগুলিকে বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যের দিকে নিয়োগ করতে পারা। এই নিয়োগের নামই হল পৃথিবীকে জয় করা, প্রকৃতির দাসত্ব মুক্তি। জানোয়ারের দল প্রকৃতির দাস; কেননা তারা প্রকৃতির মুখ চেয়ে বাঁচে, যেন প্রকৃতির দয়ায় ওপর নির্ভর করে। কপালে যদি খাবার জোটে তা হলেই পেট ভরবে, নইলে নয়। কপালে যদি মাথা গোঁজবার জায়গা জোটে তা হলেই মাথা গুঁজতে পারে, নইলে নয়। মানুষ কিন্তু প্রকৃতির দাসত্ব থেকে অনেকখানিই মুক্ত হয়েছে; কেননা তার হাত স্ববশ, হাতিয়ার স্ববশ। এই হাত-হাতিয়ারের সাহায্যেই সে শিখেছে প্রকৃতির কাছ থেকে নিজের চাহিদা মতো জিনিস আদায় করে নিতে।" তাই চট্টোপাধ্যায়ের 'মার্ক্সবাদ'-এ আছে, ''মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম, তারই ফলে মানুষ শিখেছে উৎপাদন করতে, নিজের দরকারমতো জিনিস প্রকৃতির কাছ থেকে আদায় করে নিতে। কিন্তু সেইসঙ্গেই মানুষ সৃষ্টি করেছে একটা ব্যাপার, যাকে বলা হয় উৎপাদনের সম্পর্ক। উৎপাদনকে অবলম্বন করেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। যেমন বলি, জমিদার-রায়তের সম্পর্ক, মিলমালিক-দিনমজুরের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ব্যাপারেও আইনকানুন আছে, শৃঙ্খলা আছে। এবং মানুষের দরুণ হলেও এইসব নিয়মকানুন এই শৃঙ্খলা, শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিরই নিয়মকানুনেরই একটা দিক, প্রকৃতির শৃঙ্খলারই একটা দিক।"

সমাজের বিকাশ

মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো ছোট ছোট বাক্যে তুলে ধরে চট্টোপাধ্যায় প্রবেশ করেন সমাজ বিকাশের ধারায়। এইবার তাঁর বর্ণনা—''একজনের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস আর একজনের পক্ষে আত্মসাৎ করে নেবার কথা। হাতিয়ারের উন্নতির কল্যাণে মানুষ যে বাড়তি জিনিস তৈরি করতে শিখল সেই বাড়তিটাই আত্মসাৎ করা। আগেকার অবস্থায় এ ব্যাপার সম্ভব ছিল না; কেননা উদ্বৃত্ত বলে তখন কিছুই নেই। তাই হাতিয়ারের উন্নতির দরুনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বদলে গেল। সমানে সমান সম্পর্ক নয় আর, তা বদলে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। এরই নাম হল শ্রেণিবিভাগ। একদল মানুষ শুধু মেহনত করে মরে, কিন্তু তাদের মেহনত দিয়ে তৈরি সবটুকু জিনিস তাদের নিজেদের ভোগে আসে না। এদেরই নাম শোষিতের দল। যতটুকু না হলে নেহাত প্রাণ বাঁচে না ততটুকু তাদের কপালে। বাকিটুকু—ওই বাড়তিটুকু বা উদ্বৃত্তটুকু ওঠে অন্য আর একদল মানুষের ভাঁড়ারে। তারাই শোষক; তারা নিজেরা বড়ো একটা গতর খাটায় না, অপরের গতর খাটানো দিয়ে তৈরি জিনিস লুঠ করে বড়লোক হয়।" সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে গেল।

'মার্ক্সবাদ'-এ লেখা হলো—''শ্রেণীবিভাগ। একদিকে শোষিতের দল আর একদিকে শোষকের দল। একদল শুধু গতর খাটিয়ে মরে আর একদল গতর খাটায় না, অপরের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস লুঠ করে বড়লোক হয়। যারা গতর খাটিয়ে মরে সমাজের সদর মহলে তাদের ঠাঁই রইল না। তাদের ইজ্জত গেল। তারা ক্রমশই হয়ে পড়ল ইতর মানুষের দল। শুধুই যে আজকাল তাদের তাচ্ছিল্য করে কুলি-মজুর আর চাষাভুষো বলা হয় তাই নয়; যখন থেকে শ্রেণিবিভাগ দেখা দিয়েছে—সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে—তখন থেকেই এই কথা।" এরপর আসে ব্যাখ্যা—''যেমন ধরুন, অতি প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে মেহনতকারীদের নাম দেওয়া হয়েছে শূদ্র আর শোনা গিয়েছে, শূদ্রের ছোঁয়া খেলে পাপ, শূদ্রের ছায়া মাড়ালে পাপ। মেহনতকারী মানুষ নাকি এমনই নিচু ধরনের মানুষ। কিংবা, প্রাচীন গ্রীক আর রোম সভ্যতার ক্রীতদাসদের দশাটা ভেবে দেখুন। তাদের মেহনতের উপরই পুরো সমাজের নির্ভর, তবুও তাদের ইজ্জতটা নেহাত গোরু-ভেড়া বা হাল-লাঙলের চেয়ে একটুও বেশি নয়। সমাজের সদর মহলটা যারা আলো করে রয়েছে,—জমিদার পুরোহিত আর রাজা বাদশা থেকে শুরু করে অতি আধুনিক কালের কোটিপতি মহাজন মালিক পর্যন্ত—তারা নিজেরা বড়ো একটা গতর খাটায় না। শ্রেণীবিভাগ শুরু হবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই কথাই। গতর খাটাবার দায়টা একান্তভাবেই অপরের উপর। কিন্তু অপরে গতর খাটিয়ে পৃথিবীর কাছ থেকে যে সম্পদ সংগ্রহ করে সেই সম্পদের বেশিরভাগই ওঠে এদের ভাঁড়ারে।"

ভাববাদ

এদিক-ওদিক করতে করতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় চলে এলেন ভাববাদী দর্শনে। প্রশ্ন তুলে দিলেন। —''ধরুন, আপনি মেনে নিলেন দুনিয়াটা আগাগোড়াই মন-গড়া জিনিস, স্বপ্নে দেখা জিনিসের মতো। আজ আপনার পেটে অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই। কিন্তু ভাববাদীর কথায় আপনি যদি মৌজ পান তাহলে মনে হবে : দূর ছাই, পেটই বা কোথায় আর পরনই বা কোথায়? অন্ন বলে জিনিসটাও মন গড়া, বস্ত্র বলে জিনিসটাও মনগড়া। আজ আপনার রক্ত জল করা ফসলের অনেকখানি উঠছে জমিদার মহাজনের ঘরে; পাটকলে আপনার রক্ত জল করা তৈরি জিনিস থেকে মুনাফা লুটে সাহেবসুবোর দল কীরকম মহানন্দে হাওয়াগাড়ি হাঁকাচ্ছে! কিন্তু ভাববাদীর কথায় আপনার মন যদি মৌজ হয়, তাহলে? তখন জমিদারই বা কোথায়, মহাজনই বা কোথায়, কোথায় বা হাওড়াগাড়ি, কোথায় বা পাটকলের সাহেব? সবই তো তখন আপনার মন-গড়া জিনিস। স্বপ্নের মতো। তামাশা নিয়ে তামাশা করা চলে, কিন্তু সংগ্রাম করা তো চলে না। কার সঙ্গে লড়বেন? কেনই বা লড়বেন? কী নিয়ে লড়বেন?" তাবড় তাবড় ভাববাদী দার্শনিকেদের উল্লেখে করে তিনি লিখেছেন, ''একটুখানি খেয়াল রাখলেই দেখতে পাওয়া যাবে, দার্শনিক মহলের ভাববাদী কথাবার্তাগুলো কীরকম ভাবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বাইরে আসে, প্রচারিত হয় জনগণের মধ্যে। প্রচারের মাধ্যম কত রকমের। গান, গল্প, কথকতা, কতই না! রামপ্রসাদের গান, সাধারণ ভবঘুরে বৈরাগীর বাউল—কান পেতে শুনুন আর হিসেব করে দেখুন এর মূলে কোন দার্শনিক মতবাদ, ভাববাদ কি না? গঙ্গার তীরে ভাগবত পাঠ, গীতা পাঠ, গাঁয়ে গাঁয়ে কথকতার আয়োজন। শ্রোতা কারা? আর, কোন দার্শনিক মতবাদের প্রচার এইসব সভায়? সন্ন্যাসীদের শান্ত নির্জন মঠ আশ্রম থেকে শুরু করে শ্মশানের বেকার গাঁজাখোরদের কথায় কান দিন, আর ভালো করে ভেবে দেখুন ভাববাদের আলোচনা শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আবদ্ধ না, দেশের জনসাধারণের মধ্যে নানান ভাবে, নানান ঢঙে, প্রচারিত।" এখানে লোক-সংস্কৃতি আছে। লোক-সংস্কৃতির রূপ গ্রহণীয়, কিন্তু ভাব বর্জনীয়। কারা ভাববাদী দার্শনিক? ''মনে রাখতে হবে, যাঁদের আমরা পণ্ডিত দার্শনিক বলি তাঁরা সমাজের ওই সদর মহলের অন্নাশ্রিত জীবই। তাই তাঁদের ধ্যানধারণায় সমাজের সদর মহলেরই স্পষ্ট স্বাক্ষর। এদিক থেকে মোহনতজীবনের সঙ্গেও তাঁদের মুখ দেখাদেখি নেই, নিছক চিন্তা করবার দায়টুকুই তাঁদের কাছে একমাত্র দায়। তাই, নানান রকম যুক্তিতর্ক দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে সমাজের সদর মহলের ওই চেতনাটুকুই চরম জ্ঞানের কথা বলে তাঁরা প্রচার করেছেন।

শ্রেণিবিভাগ দেখা দেবার সময় থেকেই আজ পর্যন্ত মোটের উপর এই কথাই। তাই সাবেকি দর্শনের উপর ভাববাদের প্রভাব প্রায় তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন।" ভাববাদ এল, ভাববাদী দর্শনের প্রভাব এল, তারপর? তারপর এল ভাববাদ খণ্ডন।

ভাববাদ খণ্ডন

লোকগাথায় যেমন ভাববাদ প্রচারিত হয়, তেমনি বস্তুবাদও প্রচারিত হয়, তবে মাত্রায় কম। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অন্য-একটা বইয়ে তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "চার্বাক বা লোকায়তিকদের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ লোকগাথা আছে : 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে মাধাবাচার্য বেশ কয়েকটি উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলির মূল কথাও মোটের উপর একই। কিছু ধূর্ত মানুষ লোক ঠকিয়ে উপার্জন করবার উদ্দেশ্যে রকমারি ধর্মকর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিধান দিয়ে থাকেন এবং এসব যে নেহাতই লোক-ঠকানো ব্যাপার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকেই তা সহজে বোঝা যায়। লোকগাথাগুলি চিত্তাকর্ষক এবং আধুনিক বস্তুবাদীদের রচনাতেও অনায়াসেই এগুলির স্থান হতে পারে।" (ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে) ভাববাদ প্রচারে প্রাবল্য বেশি কারণ সেই প্রচার সমাজপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

তীক্ষ্ণ যুক্তি। সাবলীল প্রকাশ। "দুনিয়াকে বদল করা। মেহনত। কর্মজীবন। এইদিক থেকে ভেবে দেখুন, দেখবেন ভাববাদের কথাগুলো কীরকম খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে। যে কিষান মাটি কোপাচ্ছে তাকে প্রশ্ন করুন : মাটিটা বাস্তব না মন-গড়া জিনিস? কোদালটা বাস্তব, না, মন-গড়া জিনিস? সে নিশ্চয়ই বলবে দারুণ বাস্তব। কেননা, সে যে হাড়ে হাড়ে বোঝে কতখানি বাস্তব, গতরে ঘাম ছুটিয়ে দেয় এমন বাস্তব, মাথার ঘাম পায়ে গড়ায় এমন বাস্তব। সুতোকলে কাজ করছে যে শ্রমিক তাকে প্রশ্ন করুন : চোখের সামনের মাকুগুলো মন-গড়া জিনিস কি না? সে নিশ্চয়ই হেসে উঠবে, ভাববে আপনি বুঝি নেশা করেছেন, তা নইলে এমন উদ্ভট প্রশ্ন আপনার মাথায় আসবে কেন?" পৃথিবী জয়ে ভাববাদ খন্ডন করতে হবে। তাই দেবীপ্রসাদের উপস্থাপনা, "পৃথিবীকে জয় করা বলতে এইসব নিয়মকানুনকেও চেনা আর চেনবার ভিত্তিতে মানবকল্যাণের পক্ষে নিয়োগ করা। ভাববাদ খন্ডনের প্রসঙ্গে এই কথাও স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি ভাববাদ হাওয়া থেকে জন্মায়নি, আর তার একটা সামাজিক কারণ রয়েছে। সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দিয়েছিল বলেই গতর খাটানোর সঙ্গে মাথা খাটানোর সম্পর্ক ঘুচেছিল; পৃথিবীর সঙ্গে যে হাত দিয়ে সংগ্রাম সেই হাতের কথাটা পড়ে ছিল চোখের আড়ালে, আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর কথাটাও। তাই ভাববাদ; গতর খাটাবার সবটুকু তাগিদ বাদ দিয়ে শুধু মাথা খাটাতে খাটাতে মনে হল পৃথিবীটা বুঝি মন গড়া ব্যাপার। শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই ভাববাদের জন্ম আর এই ভাববাদ মেহনতকারী জনতার মনকে পঙ্গু করে রেখে সাহায্য করেছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে।" কেবল দার্শনিকরাই নন, বিজ্ঞানীদের মধ্যেও ভাববাদ বস্তুবাদ নিয়ে মতামত সহজ সরলভাবে তুলে এনেছেন তিনি।

বস্তুবাদ

বস্তুবাদ, তবে কেবল বস্তুবাদ নয়—দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। ডায়লেকটিক্যাল বস্তুবাদ। মার্কসবাদী দর্শন। চট্টোপাধ্যায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মূল দিক চুম্বক আকারে লেখেন—

১) প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতিটি বিষয়েরই একদিকে জন্ম আর একদিকে মৃত্যু।

২) এই পরিবর্তন কুমোরের চাকার মতো একই আবর্তে ঘোরা নয়, এর মূলে অগ্রগতি, উন্নতি।

৩) পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিরুদ্ধের মধ্যে সংঘাত।

৪) পরিবর্তন মানে শুধুই পরিমাণ-বৃদ্ধি নয়, পরিমাণের পরিবর্তন থেকেই জন্ম হয় নতুন গুণের।

৫) পরিবর্তনের নিয়ম হল 'অভাবের অভাব'।

৬) প্রকৃতির কোনো কিছুকে স্বতন্ত্রভাবে বা আলাদাভাবে চেনবার চেষ্টাটা ভুল; প্রকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ অজস্র জিনিসের স্তূপ মাত্র নয়। প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে অন্য জিনিসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, প্রতিটি জিনিসের পক্ষে অন্য জিনিসের উপর একান্ত নির্ভরতা।

এই 'অভাবের অভাব' কী? দেবীপ্রসাদের ভাষ্যে, "একটি মূলসূত্র হল 'অভাবের অভাব', ইংরেজি তর্জমায় বলা হয় negation of negation। আমাদের এই পুরনো দৃষ্টান্তটির কথাই মনে রাখা যাক। খেতের উপর একমুঠো ধান ছড়ালাম। কিছুদিন পরে দেখা গেল ধান আর নেই, তার বদলে ধানের চারা। তার মানে, ধানগুলোর 'অভাব' হয়ে গিয়েছে, ধান ধ্বংস হয়ে তাদের জায়গায় এসেছে চারাগাছ। আবার কিছুদিন পরে ওই চারাগাছ আর থাকবে না। তার মানে, আবার চারাগাছগুলিরও অভাব। প্রথম একটা অভাব আর তারপর সেই অভাবটারও আবার অভাব। তাই ছোটো করে বলা হয় 'অভাবের অভাব'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলটা কী হল? চারাগাছগুলিরও তো ধ্বংস হল, অভাব ঘটল, ফলে পাওয়া গেল ধান।" তবে অনেক ধান, বেশি ধান। পরিবর্তন চাই। কেন? জীবনের জন্য। "মার্ক্সবাদী তাই বলেছেন, পরিবর্তনের কথা ভুললে চলবে না, দ্বন্দ্বের কথা ভুললে চলবে না, ভুললে চলবে না এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নতুনের দিকে, উন্নতির দিকে, এগুবার কথা। মার্ক্সবাদী তাই বলেছেন, পরিবর্তনটা অলীক বা মিথ্যা হওয়া দূরের কথা পরিবর্তনটাই হল প্রকৃতির নিয়ম। আর পরিবর্তনের নিয়ম হল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এগুনো। প্রতিটি বস্তুর অন্তরের মধ্যে রয়েছে বিরোধ, দ্বন্দ্ব। বিপরীতের সংগ্রাম উত্তীর্ণ হয়েই অগ্রগতি।" তবে পরিবর্তনের নিয়মকানুন জানতে হয়। "দুনিয়ার পরিবর্তনকে চিনতে হলে, পরিবর্তনের নিয়মকানুনকে স্পষ্টভাবে জানতে হলে, দুনিয়ার কোনো কিছুকেই একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করা চলবে না। তার মানে, আপনি যদি কোনো জিনিস বা কোনো ঘটনাকে স্বতন্ত্রভাবে—আলাদা করে দেখবার চেষ্টা করেন তা হলে পরিবর্তনের রহস্যটুকু আপনার পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব হবে না। আমাদের ওই ঘরোয়া দৃষ্টান্তের কথাই আবার ধরা যাক। বীজ পুঁতলাম, গাছ হল। কিন্তু শুধু বীজটুকু থেকেই কি গাছ হল? বাকি সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক বাদ দিয়ে আপনি যদি বীজটার কথা আলাদা ভাবে বুঝতে চান তা হলে গাছ জন্মাবার রহস্যটা আপনার কাছে রহস্য হয়েই থাকবে। কাচের শিশিতে বীজটাকে আলাদা করে রেখে দিন, সে বীজ বদলে গাছ হবে না। তাই বীজ বদলে গাছ হবার কথাটা বুঝতে গেলে শুধুমাত্র বীজটুকুর কথা আলাদা ভাবে ভাবা চলে না। সেই সঙ্গে জমির সম্পর্ক, জলের সম্পর্ক, সারের সম্পর্ক—অনেক কিছুর সম্পর্ক মিলিয়ে ভাবতে হয়।"

জীবনের দিকে জয়ের জন্য মার্কসবাদ। গতর খাটা মানুষের জন্য মার্কসবাদ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মার্ক্সবাদ'। মহাপণ্ডিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আটপৌরে মার্কসবাদ। মার্কসবাদে কতটা দখল থাকলে এমনভাবে মার্কসবাদকে উপস্থাপিত করা যায়, তার দৃষ্টান্ত দেবীপ্রসাদের 'মার্ক্সবাদ'। একদিকে গভীর জ্ঞান, আর একদিকে সরল উপস্থাপনা।

লেখক : মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য

কৃষি সংকট ও কয়েকটি প্রসঙ্গ

অমল হালদার

সারা দেশে কৃষিতে সংকট আজ সর্বগ্রাসী। অন্নদাতা পিতারা যে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছে দেশের কতজনই বা এই সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করে! নয়া উদারীকরণ শুরুর আগে দেশের সরকার কৃষিতে ভর্তুকি দিত। সার বীজ সহ কৃষি উপকরণের এতটা মূল্য ছিল না। দেশে যে পণ্য উৎপাদিত হতো বিদেশ থেকে তা আমদানি নিষিদ্ধ ছিল। সস্তায় ব্যাংক-ঋণ, সেচ ব্যবস্থার প্রসার, উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট দাম ইত্যাদি নানা সুযোগের জন্য ৮০-র দশকে কৃষিতে দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। একসময়ে দেশে যে খাদ্যসমস্যা ছিল তা নিরসন হতে থাকে। নব্বই দশকে উদারীকরণ নীতি চালু হবার পর থেকেই ধীরে ধীরে কৃষিতে সংকট শুরু হয়। দেশের সার কারখানাগুলি বন্ধ হতে থাকে, বিদেশ থেকে আমদানি শুরু হয়। বিভিন্ন কোম্পানির বীজ চড়া দামে আমদানি শুরু হয়, দেশের বীজ খামারগুলি বন্ধ হতে থাকে। ব্যাংক-ঋণ কমতে থাকে, কৃষিতে ভর্তুকি কার্যত তুলে দেওয়া হয়। দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্য মজুত থাকতেও বিদেশ থেকে আমদানি বাড়াতে থাকে। গ্যাট চুক্তি, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সাথে চুক্তির মাধ্যমে আমাদের দেশের কৃষিকে কার্যত ঘিরে ফেলে। তখন থেকেই সারা দেশে শুরু হয় সংকট। সেই সময় রাজ্যে যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন ছিল, সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও কৃষির উন্নতি বজায় রাখার জন্য বেশ কিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মনে রাখতে হবে সারা রাজ্যে ভূমিসংস্কার, বর্গাদারদের রেকর্ডের মাধ্যমে স্থায়িত্বের ব্যবস্থা, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন নতুন সুযোগ গ্রামীণ ব্যবস্থায় এক বিশাল পরিবর্তন সূচিত করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই ধান, আলু, সবজি, মাছ সবক্ষেত্রেই দেশের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে ছিল আমাদের রাজ্য।

ব্রিটিশ আমলে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সারা বাংলায় নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার। খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদের জুলুমে কৃষকরা শেষ সম্বলটুকু জমিদারদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হতো। বাংলার গ্রামে গ্রাম শুরু হয়েছিল হাহাকার। যতটুকু ফসল উৎপাদিত হতো তার সিংহভাগ চলে যেত জমিদারবাবুর বিরাট অট্টালিকায়। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের সাক্ষী এই বাংলার মানুষ। দেশের স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক, চলচ্চিত্রকাররা সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনার ছবি তুলে ধরেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পরও ছিল এই বাংলার খাদ্য সংকট। ৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন, ৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন, সাতের দশকে খাদ্যের দাবিতে মজুত উদ্ধার আজও তার সাক্ষ্য বহন করে। '৭৭ সালের বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই রাজ্যে '৭৭ সালের পর থেকে কোনো খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করতে হয়নি। বিধ্বংসী বন্যা বা তীব্র খরার মাঝেও বামফ্রন্ট সরকার মানুষের হাতে অন্ন তুলে দিয়েছে। কাউকে

ভিক্ষাপাত্র নিয়ে অতীতের মতো 'ফ্যান দাও গো মা, ফ্যান দাও' এই আওয়াজ শুনতে হয়নি। অভাবের জ্বালায় কোনো কৃষককে আত্মহত্যা করতে হয়নি। যত দিন গেছে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে, গ্রামে গঞ্জে তৈরি হয়েছে ব্যবসা কেন্দ্র, কৃষকের সন্তান যাতে স্কুলে পড়াশুনা করে তার ব্যবস্থা হয়েছে, গ্রামে কাঁচা বাড়ি পাকা বাড়িতে পরিণত হয়েছে, ফসলের দাম নিয়ে আজকের মতো কোনো চিন্তা কৃষকের ছিল না। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর গ্রামাঞ্চলে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে আগামী দিনে এই রাজ্যেও বাড়বে কৃষিতে মারাত্মক সংকট। ইতিমধ্যেই নজর এড়ায়নি ধান, আলু পাট সহ কোনো ফসলের লাভজনক দর নেই। এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর ২১৭ জন কৃষক খেতমজুর দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছেন। এই সরকার থাকলে পরিস্থিতি যে আরও ভয়ানক হতে বাধ্য তা এই রাজ্যের কৃষক-ক্ষেতমজুররা তাঁদের জীবনের যন্ত্রণা থেকে অনেকটাই উপলব্ধি করছেন। রাজ্যে বেকারির হার গুরুতর আকার ধারণ করেছে। সিঙ্গুরে তৈরি কারখানা ডিনামাইট আর বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার পর বড় বড় শিল্প সম্মেলন, সপারিষদ বিদেশ ভ্রমণ করে শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ এই রাজ্যের বেকার যুবক মানতে রাজি নয়। কাজের প্রত্যাশায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ যুবক, পশ্চিমবাংলায় এমন গ্রাম আছে যেখানে কোনো অল্প বয়সের পুরুষ মানুষ নেই। এদের বেশিরভাগ কাজ করে নির্মাণশিল্পে সেখানেও শুরু হয়েছে সংকট, আবাসন শিল্পের সংকট

আমরা জেনেছি। হয়তো দেখা যাবে কয়েক লক্ষ ছেলেকে আবার রাজ্যে ফিরে আসতে হবে। আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তাতে দেখা যায় সংখ্যালঘু-প্রধান গ্রামগুলি থেকেই বেশি সংখ্যার মানুষ ভিন রাজ্যে বা রাষ্ট্রে গেছেন। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের কথা বলে সংখ্যালঘুদের পেটের ভাত কেড়েছে বর্তমান এই সরকার। সংখ্যালঘুদের জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষি, চামড়ার ব্যবসা, পাইকারি ব্যবসা, খড়ের ব্যবসা এবং অপেক্ষাকৃত তরুণদের গাড়ির ব্যবসা একসময়ে রমরমিয়ে চলত, এখন সব ক্ষেত্রেই ব্যবসার ঝাঁপ বন্ধ হতে চলেছে। এক বুক হতাশা মানুষকে গ্রাস করছে। দুটো পয়সা রোজগারের জন্য নিজের প্রতি বা সরকারের প্রতি আস্থা নয়, ভাগ্যের হাতে জীবনকে বাজি রেখে শহরে গঞ্জে চলেছে রমরমিয়ে লটারি ব্যবসা। লটারিতে পয়সা ঢেলে সর্বস্বান্ত হচ্ছে কিছু মানুষ, কিন্তু কোনো শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নয়। হতাশা কীভাবে একটা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, একটু দৃষ্টি দিলে বোঝা অসম্ভব নয়।

দেশের মানুষ বিগত নির্বাচনে বিজেপির মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। বিগত নির্বাচনে কৃষিক্ষেত্র সহ জনজীবনের গুরুতর সংকটের ক্ষেত্রগুলি নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে যাতে প্রাধান্য না পায় তার জন্য দেশের মিডিয়াকুল অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবোধের প্রচারের মাধ্যমে সমাজের সকল অংশের মানুষের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতিকে সামনে আনা হলো। ভাত, কাপড়, কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি চাপা পড়ে গেল। জনজীবনের সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন সংগ্রামে ময়দানে থাকা বামপন্থীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন সময়ে বামপন্থীদের বড়বড় সমাবেশ বা মিছিল প্রচার মাধ্যম সামনে আনেনি, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মেরুকরণই ছিল তাদের প্রচারের কৌশল। শুধুমাত্র সংবাদপত্র বা টেলিভিশন চ্যানেল নয়, বিপুল অর্থ ব্যয় করে সোশ্যাল মিডিয়াকে বিপজ্জনকভাবে ব্যবহার করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে নতুন প্রজন্মের যুবক আসল সত্যটা বুঝতেই পারলো না। নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসীন হলেন উন্নয়নের কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়েই। এখনও সময় আছে ভাবাবেগ ছেড়ে বাস্তবের মাটি স্পর্শ করার প্রয়াস নেওয়ার। দেশের শিল্প, কৃষি সহ সমস্ত ক্ষেত্র তছনছ হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনের সময় যারা নীরব ছিলেন এখন বলা হচ্ছে ৪৫ বৎসরে এই ধরনের ভয়াবহ বেকারি কখনও বাড়েনি। দেশের নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার বলতে বাধ্য হচ্ছেন ৭০ বছরে দেশে এই ধরনের অর্থনৈতিক সংকট বাড়েনি। নোট বাতিল ও জি.এস.টি যে একটা বড় কারণ দেশের নামজাদা অর্থনীতিবিদরাও বলছেন। কী হবে দেশের ভবিষ্যৎ? কিছু মানুষ আছেন সংকটের এই তীব্রতা বুঝতে পেরেও এক ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে এই সরকারকে সমর্থন করে থাকেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শুধুমাত্র পুলিশ, আইন, বিচারব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ইত্যাদি দমনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শাসন করে না, এর বাইরেও একটা আস্তরন তৈরি করা হয় যা দিয়ে জনগণের একটা বড়ো অংশকে দেশি-বিদেশি বুর্জোয়া স্বার্থের পক্ষে টেনে আনা সম্ভব হয়। দমন ও সহমত দুই হাতিয়ারকে ব্যবহার করেই বুর্জোয়ারা তাদের শোষণ-শাসনকে আরও বিস্তার ঘটাতে চেষ্টা করে। সমাজে কিছু মানুষ আছেন যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কিছুটা হুজুগে আচরণে বুর্জোয়াস্বার্থের পক্ষে নিরন্তর প্রচারে ব্রতী হন। তার প্রচারে আম্বানী-আদানিরা লাভবান হতে পারে, কিন্তু গ্রাম-শহরের গফুর সেখ, পদা বাগদী, হোপনা মুর্মুদের কিছু উন্নতি হবে কি? অপরের কথা ছেড়ে দিলেও স্বয়ং তিনি কি বাঁচতে পারবেন! অনেক পণ্ডিতব্যক্তি বলেন নিরক্ষর মানুষদের থেকে অর্ধশিক্ষিত মানুষ খুবই ভয়ংকর। নিজেদের সর্বজ্ঞ বলে মনে করে সমস্ত ইস্যুতে ধর্মীয় পরিসরের প্রশ্নটি প্রাধান্য দেন। কয়েকদিন আগে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক তাঁর কলামে চমৎকারভাবে এই বিপজ্জনক শক্তির অনুপ্রবেশের একটি প্রবণতা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য : ‘‘অধিপত্যকামী রাষ্ট্রকে চেনা সহজ কিন্তু আধুনিক ধনতন্ত্রের আধিপত্যকামী পুঁজিকে চেনা তুলনায় অনেক কঠিন। সে কাজ করে আমাদের চিন্তায় ও চেতনায় ব্যক্তি স্বাধীনতার মোহ আবরণ পরিয়ে। ৯০-এর দশক থেকে সজ্ঞান ভারতবাসী দেখছে ‘উদার অর্থনীতি’ কীভাবে মানুষের জীবনের সব দিক গ্রাস করে তার সামাজিক সম্পর্ক ও সমবায়গুলিকে ধ্বংস করে বলবৎ করে চলে আদিগন্ত বাজারের শাসন।’’ ‘‘...সামাজিক সংহতি দুর্বল, সমাজের মানুষ যত বিচ্ছিন্ন পুঁজির দিগ্বিজয় তত সহজ।’’ ‘‘...যে বিচ্ছিন্নতা পুঁজির সহায় সেই বিচ্ছিন্নতাই সংখ্যাগুরুবাদী অতি-জাতীয়তার সমিধ। সামাজিক সংহতি দুর্বল, সমাজের মানুষেরা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত, তার ফলে সুগম হয়েছে ধর্মীয় পরিচয়ে ও জাতীয় নিরাপত্তার যৌথ প্রকরণ ব্যবহার করে সংখ্যাগুরুর মহাজোট নির্মাণের পথ। এ পথ নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের....’’

উদার অর্থনীতি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি শুধু ধ্বংস করেনি, টেনে এনেছে সমাজ জীবনে ব্যাপক অবক্ষয়, দুর্নীতি। এক ভয়ংকর স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ গ্রাস করেছে আমাদের নৈতিকতা, মূল্যবোধকে। সমগ্র জীবন যেন ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম শহরের জীবনে অতীতের মতো নাগরিক বা গ্রামীণ সমাজের ঐক্য দেখা যায় না। এমনকি পারিবারিক সম্পর্কগুলিও ক্রমশ জটিল হয়েছে। যে পারিবারিক ঐক্য অতীতে প্রত্যক্ষ করতাম আজ ক্রমশ তা দূরে চলে যাচ্ছে। এই কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন হলো এই কারণে যে সংকট এত গভীর হচ্ছে অথচ মানুষের চিন্তা-চেতনার বিশেষ পরিবর্তন ঘটছে না। এটা নিশ্চিত আমাদের দেশের কর্পোরেট দ্বারা পরিচালিত প্রচার-মাধ্যমের একটা ভূমিকা তো আছেই। দেশে জিডিপি হ্রাস হচ্ছে, রপ্তানি কমছে, টাকার দাম দ্রুত পড়ছে নির্বিচারে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে জলের দরে বিক্রি করা হচ্ছে। মোটর গাড়ি শিল্প থেকে বিস্কুট শিল্প সবক্ষেত্রেই সংকট, লক্ষ লক্ষ কর্মী ছাঁটাইয়ের মুখে। কার্যত অর্থনীতি তলানিতে কিন্তু প্রচার-মাধ্যমের ভাষা হলো দেশ এখন সমৃদ্ধির পথে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত ভাণ্ডারে যখন হাত পড়ে তখন অর্থনীতিবিদদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এই দেশের ভবিষ্যৎ কী, নরেন্দ্র মোদী সন্ত্রাসবাদ আইন পরিবর্তন করছেন, তথ্য জানার আইনের বারোটা বাজাচ্ছেন, আমরা অনেকেই নীরব। কাশ্মীরে ৩৭০ নং ধারা তুলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে কাশ্মীরে যা ঘটছে জনগণকে তা বুঝতে দিতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার। আসলে জম্মু কাশ্মীরের ঘটনা শুধু তাদের সমস্যা নয়, এদেশের গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর বিশাল আঘাত, এটা বোঝার চেষ্টা করছি না। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির সংকটকে আড়াল করতে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে নিক্ষেপ করার জন্য যে কৌশলগুলি গ্রহণ করছেন আমরাও কেউ কেউ সহমত পোষণ করছি। মনে রাখতে হবে, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় আসীন তাদের কোনো ইতিহাস নেই, যাদের ইতিহাস নেই তাদের ভবিষ্যৎও নেই। সত্য একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই, মিথ্যার মৃত্যু ঘটবেই। আমাদের প্রত্যেকের কাজ হলো দেশের অগণিত শ্রমজীবী ও কৃষকের স্বার্থে বর্তমান সরকারের মুখোশটা যত দ্রুত খুলে ফেলতে পারি। তার জন্য চাই প্রচুর মানুষের সমর্থন, সেই সমর্থনের জন্য খণ্ড খণ্ড আংশিক দাবির আন্দোলনেও প্রতি মুহূর্তে গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে, নিজে জানতে হবে, অপরকে জানাতেই হবে।

লেখক : সারা ভারত কৃষকসভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক

শতবর্ষে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি

অচিন্ত্য মল্লিক

আগামী ১৭ অক্টোবর ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি শতবর্ষে পদার্পণ করবে। ১৯২০ সালে এই দিনেই সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দের মাটিতে গড়ে উঠেছিল আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি। নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব পৃথিবীর দেশে দেশে খেটে খাওয়া মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে একটা জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতের অসংখ্য বিপ্লবী তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন। এইরকম দেশান্তরী বিপ্লবীদের কয়েকজন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১০ জনকে নিয়ে গঠিত এই কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক হন মহম্মদ শফিক। এম.এন রায়, অবনী মুখার্জী ও শফিকই ছিলেন এর মূল সংগঠক। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, লাহোর, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে কর্মরত তরুণ কমিউনিস্টদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এই পার্টি।

শতবর্ষের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের মূল্যায়ন, তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সেসব নিয়ে লেখার মতো যোগ্যতা, সাহস এবং ক্ষমতা কোনটাই আমার নেই। শুধুমাত্র পার্টির বিকাশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়-বাঁকে পার্টির ভূমিকা উল্লেখ করাই এই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য।

১৯২০ সালে পার্টি গড়ে ওঠার পরে একেবারেই ক্ষুদ্রশক্তি যে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিল—কারণ কমিউনিস্টরাই যে তাদের প্রকৃত শত্রু তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিল।

এই একশোটা বছর পার্টির সামনে ফুল বিছানো রাস্তা ছিল না। রক্তস্নাত পথেই চলতে হয়েছে পার্টিকে। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম, কঠোর আত্মত্যাগ, অসংখ্য শহিদের মৃত্যুবরণ, কারাবাস, নিপীড়নের পথ বেয়েই চলতে হয়েছে পার্টিকে। বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থানকালে আপাত অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যেও শহিদের রক্তঝরা পথেই চলতে হয়েছে পার্টিকে। অনেক চড়াই-উৎরাই, জোয়ারভাটার মধ্যেই পার্টির পথচলার একশো বছরের ইতিহাস। আজকের দিনে যখন চরম দক্ষিণপন্থার ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখোমুখি পার্টি, তখন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের ''আমাদের পথ ফুল বিছানো নয়, কাঁটা বিছানো''—এই শিক্ষা বারে বারে স্মরণ করতে হবে।

১৯২০ সালে পার্টি গড়ে ওঠার পরে একেবারেই ক্ষুদ্রশক্তি যে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিল—কারণ কমিউনিস্টরাই যে তাদের প্রকৃত শত্রু তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের তরুণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটার পর একটা ষড়যন্ত্র মামলা তারা রুজু করে—পেশোয়ার (১৯২২), কানপুর (১৯২৪), মীরাট (১৯২৯)। ১৯২০ সালে পার্টি তৈরি হবার পরপরই পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো আর দু-দশকের বেশি সময় নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই পার্টিকে কাজ করতে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের তীব্র দমন-পীড়নের মুখোমুখি হয়েই।

তীব্র আক্রমণ এবং দমনপীড়নের মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টির জঙ্গি ও ধারাবাহিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে দেশের বিভিন্ন ধারার বিপ্লবীদের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ব্যাপারে আকর্ষণ করেছিল। পাঞ্জাবের গদর পার্টির বিপ্লবীরা, ভগৎ সিং-এর সহযোদ্ধারা, বাংলার বিপ্লবীরা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জঙ্গি লড়াকু শ্রমিকেরা এবং কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশসহ দেশের বিভিন্ন অংশের প্রগতিবাদী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কংগ্রেস সদস্যরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

স্বাধীনতার পরেও পার্টিকে স্বাধীন ভারতবর্ষে তীব্র দমন-পীড়ন এবং নিপীড়নের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-এর মধ্যে কংগ্রেস শাসকদের তীব্র আক্রমণ চলে। তেভাগা এবং তেলেঙ্গানা

লড়াইয়ে নজিরবিহীন দমন-পীড়ন চালানো হয়। ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়, এই নিষেধজ্ঞা চলে ১৯৫১ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গে এবং তার পরে ত্রিপুরায় আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়। কেরালা ও দেশের অন্যান্য প্রান্তেও পার্টিকর্মীদের ওপর হিংস্র আক্রমণ সংগঠিত হয়। পাঞ্জাব, ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অসংখ্য পার্টিকর্মীকে শহিদের মৃত্যু বরণ করতে হয়। ৬০-এর দশকেও চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়েও তীব্র দমন-পীড়নের মুখে পড়ে পার্টি।

পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইংরাজ শাসক এবং কংগ্রেস সরকারের তীব্র আক্রমণ মোকাবিলা করেই যেমন পার্টিকে চলতে হয়েছে, অন্যদিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে পার্টি গড়ে তুলতে অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য পার্টিকে পথ চলতে হয়েছে। সংশোধনবাদ সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম মতাদর্শগত ভাবে পার্টিকে পুষ্ট করেছে।

স্বাধীন সরকারের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে পার্টির অভ্যন্তরে তীব্র মতপার্থক্য তৈরি হয়। আলোচনার মাধ্যমে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক মীমাংসার সমস্ত পথ যখন সংশোধনবাদীরা বন্ধ করে দেয়, তখন ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের ৩২জন সদস্য বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করেন। তারপরেও ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় এবং তা ব্যর্থ হয়। এই ৩২ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালীতে একটি সর্বভারতীয় কনভেনশনের ডাক দেন। এই কনভেনশন থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান জানায় পার্টির সপ্তম কংগ্রেস। ১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় সপ্তম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম পার্টি কংগ্রেস নতুন পার্টি কর্মসূচি ও আশু কর্তব্য সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সপ্তম পার্টি কংগ্রেস থেকে পি সুন্দরাইয়া পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভারত সরকারের মদতে নির্বাচন কমিশন ১৯৬৫ সালে কেরালার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সংশোধনবাদীদের সি পি আই হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে পার্টির নির্বাচনী প্রতীক তাদের দিয়ে দেয়। মার্কসবাদীরা বাধ্য হয়ে সিপিআই(এম) নাম নিয়ে নতুন নির্বাচনী প্রতীকে লড়াই করেন। এই নির্বাচনে সিপিআই(এম) উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করে।

সিপিআই(এম) গঠনের সময়কাল থেকেই বিশ্বের দুটি বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তীব্র মতাদর্শগত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। সিপিআই(এম) জন্মলগ্ন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টির সংশোধনবাদী লাইন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সংকীর্ণতাবাদী লাইনের তীব্র বিরোধিতা করে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সংকীর্ণতাবাদী লাইনের প্রভাব সিপিআই(এম)-এর ভিতরে এবং বাইরে দেখা দেয়। আমাদের দেশে নকশালপন্থী নাম নিয়ে সংকীর্ণতাবাদের পথে পার্টিতে অবস্থান গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে চীনের পার্টি এবং সরকার সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা অভিযান শুরু করে। ফলে পার্টির মতাদর্শগত ক্ষেত্রে অবস্থান নির্ণয়ের প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৬৮ সালে এপ্রিল মাসে মতাদর্শগত প্রশ্নে পার্টির বর্ধমান প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির অভ্যন্তরে বাম সংকীর্ণতাবাদীরা পাল্টা দলিল হাজির করে এবং বর্ধমান প্লেনামের প্রতিনিধিরা তা খারিজ করে দেয়। প্লেনাম ঘোষণা করে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত প্রশ্নে পার্টি স্বাধীন অবস্থান নেবে, একইসঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে পার্টি সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে। পরবর্তীকালেও রাজনীতির বিভিন্ন বাঁক-মোড়ের মুখে পার্টিতে নানা ধরনের ঝোঁক দেখা দিয়েছে এবং সেসব ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এর বিপ্লবী নীতির আলোকে পার্টি সঠিক অবস্থান গ্রহণ করেছে।

একদিকে শাসকশ্রেণির ভয়ঙ্কর আক্রমণ ও দমন-পীড়নের মোকাবিলা করে যেমন এগোতে হয়েছে, ঠিক তেমনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য আন্তঃপার্টি সংগ্রাম পার্টিকে চালাতে হয়েছে।

বর্তমান সময়ে সমস্ত দিক দিয়েই পার্টি ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে। এই আক্রমণ মোকাবিলায় পার্টি সংগঠনকে গড়ে তোলা, প্রস্তুত করা এবং সর্বোপরি মানুষকে গণআন্দোলন, শ্রেণি আন্দোলনের ময়দানে টেনে আনার জরুরি কর্তব্য আমাদের সামনে হাজির হয়েছে, ঠিক একইভাবে মতাদর্শগতভাবে পার্টিকে গড়ে তোলা আজকের দিনের জরুরি কাজ।

মনে রাখা দরকার মতাদর্শ, রাজনীতি, সংগঠন, আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই আজকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। নিশ্চিতভাবেই, এই লক্ষ্যে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

লেখক : সিপিআই (এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক

With best compliments from

SANKAR MAHADEV NURSERY

Accredited by National Horticulture Board (NHB), Ministry of Agriculture, Govt. of India

Purbasthali Rail Station (South Railgate), Purbasthali, Purba Bardhaman
E-mail : sankarmahadevnursery@gmail.com

Prop. Sankar Dutta

Sl. No. 51

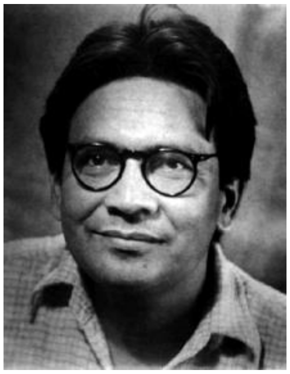

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : শতবর্ষে ফিরে দেখা

সুস্নাত দাশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে কলকাতা থেকে কে বা কারা (সম্ভবত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার লোকজন) লন্ডনে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদের কাছে একটি চিঠিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে লেখেন : ''জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে এবং ইংরেজ সরকারকে সবাই খুবই অপছন্দ করে। করভার অত্যন্ত বেশি এবং রাজস্বের বেশির ভাগই চলে যায় প্রশাসনের মাথাভারী খরচ বহন করতে। অন্যদেশের মতই, শাসকশ্রেণির বড়লোকিয়ানার পাশে প্রকট হয়ে উঠেছে এখানেও শ্রমজীবীদের চরম দুর্গতি। অথচ যে সম্পদ অপচয় করা হচ্ছে, তা তাদের শ্রমেই সৃষ্ট। শ্রমিক আন্তর্জাতিকের শাখা এখানে খুললে, জনগণের ব্যাপক অংশ তাতে যোগ দেবে।''

এক পক্ষকাল পরে প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের একটি সভা হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন কার্ল মার্কস। কলকাতায় একটি শাখা খোলার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং মার্কস মন্তব্য করেন : ''ভারতের শ্রমিক শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঠিক খাপ খায়, এমনই একটি সংগঠন হচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিক। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষদের তা ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হবে এবং শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জন করতে সাহায্য করবে।'' তবে ১৮৮৩-তে মার্কস যখন চোখ বুজলেন, তখন ভারতবর্ষে মার্কসবাদী একজনও ছিলেন না বলেই মনে হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হল। ভারতের জাতীয় বিপ্লবীদের কেউ কেউ ইউরোপে গিয়ে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করলেন ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে। ১৯০৭-এ স্টুটগার্ট আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী মহাসম্মেলনে প্রথম বক্তৃতা করলেন একজন ভারতীয়—বিপ্লবী মহিলা নেত্রী ভিকোজী রুস্তম কামা। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, শ্রমিক নেতা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের বাধা ভেঙে ফরাসি, জার্মান ও রুশ বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের সহায়তায় মাদাম কামা কংগ্রেসের সামনে বলবার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন : ''ভারতে ব্রিটিশ শাসন চলতে থাকলে তা ভারতের বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং ভারতীয়দের প্রকৃত স্বার্থের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে। এই নিপীড়িত বিশাল দেশে বসবাস করে মানবতার পাঁচভাগের এক ভাগ এবং তাদের বন্ধনমুক্ত করা সারা বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরই অবশ্য কর্তব্য। আদর্শ সমাজব্যবস্থা দাবি করে যে কোনও স্বৈরাচারীই অপর কোনও দেশকে পদানত করে রাখতে পারে না।''

১৯০৮-এ ইংরেজ সরকার বাল গঙ্গাধর তিলককে কয়েকটি 'রাজদ্রোহাত্মক' সম্পাদকীয় লেখার অভিযোগে ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল বোম্বাই শহরে। তার প্রতিবাদে পরদিন ২৩ জুলাই বোম্বাইয়ের সমস্ত কলকারখানাতে লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট করলেন—ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণির প্রথম রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট। তাদের একটিই দাবি—ব্রিটিশ রাজ ধ্বংস হোক, তিলক মহারাজের মুক্তি চাই। বোম্বাই, পুণা, শোলাপুর ও অন্যত্রও প্রায় এক সপ্তাহ অটুট রইল শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ ধর্মঘট ও ব্রিটিশ ফৌজ ও পুলিশের সঙ্গে ব্যারিকেড-সংগ্রাম। মারাঠি ও গুজরাটি শ্রমিক, কর্মচারী ও তরুণ মিলে অর্ধশতাধিক শহিদ হন গুলিবিদ্ধ হয়ে। বোম্বাইয়ের বাহাদুর শ্রমিকশ্রেণির পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছিলেন শহরের মেহনতি গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির দোকানদার কর্মচারীরা এবং গ্রাম থেকে আসা গরিব চাষির ছেলেমেয়ে, যারা শহরে ঝি বা চাকরের কাজ করতেন। এইভাবে ১৯০৮-এর জুলাই মাসে প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে, কিছুটা অস্পষ্টভাবে অবশ্যই, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব শহর ও গ্রামের মেহনতি গরিবদের প্রথম ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রাম। ক্ষোভের কথা যে ভারতের কোনও জাতীয়

নেতা বা সংগঠকই তখন এই ধর্মঘট সম্বন্ধে কোন রকম সমর্থনসূচক মন্তব্য করেননি। কিন্তু নির্বাসনে সুইজারল্যান্ডে বসে, যেটুকু সামান্য খবর সাম্রাজ্যবাদের লৌহ যবনিকা ভেদ করে তার হাতে এসেছিল, তারই ভিত্তিতে লেনিন লিখলেন : ''ভারতের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির এই চেতনা ইতিমধ্যেই হয়েছে, যাতে তাঁরা শ্রেণি-সচেতন রাজনৈতিক গণসংগ্রাম সংগঠিত করতে পেরেছেন। আর তার মানে হচ্ছে যে ঈঙ্গ রুশ পদ্ধতির দ্বারা আর ভারতকে পদানত রাখা যাবে না।''

ভারতের জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যারা ইংরেজ শাসকদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়িয়ে ফ্রান্স বা জার্মানিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জার্মানিতে ভারতের স্বাধীনতা সংঘ গড়ে জার্মানি সরকারের সঙ্গে এক আনুষ্ঠানিক চুক্তি করেন, জার্মানির সহায়তায় ভারতকে স্বাধীন করার জন্য। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সরোজিনী নাইডুর ভাই বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দর ছোট ভাই ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত। সমাজতন্ত্রী ভাবধারায় তাঁরা ইতিমধ্যেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে জার্মান সরকারের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের সই করা চুক্তিপত্রের ১০ নং ধারায় : ''আমাদের বিপ্লব সফল হইলে ভারতে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তন করা আমাদের অভিপ্রেত হইবে। তখন অস্ট্রো জার্মান শক্তি তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না।'' কিন্তু জার্মান সরকারেরও যে আসল চেহারা সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত তারা যে সমর্থন করবে না, একথা ভারতীয় বিপ্লবীদের বোঝাতে থাকেন জার্মানির বামপন্থী বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা, বিশেষত, কার্ল লিবেনেক্ট। ফলে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জার্মানি ত্যাগ করে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে চলে যান এবং সেখানে সুইডিশ বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্রে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন।

এই সব খবর জানতে পেরে ইংরেজ শাসকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। স্টকহোমে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ১৯১৭-র ২৪ মে লন্ডনস্থ ইংরেজ সরকারকে সাংকেতিক গোপন তারে জানান : ''নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বার্লিন থেকে এখানে এসেছেন। এক সাক্ষাৎকারে চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন যে শান্তির সপক্ষে প্রচার করতে তিনি আসেননি। তিনি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ভারত গড়বার কাজেই এসেছেন। গতকাল আমি আরও খবর পেয়েছি যে শীঘ্রই জাতীয়তাবাদীদের একটা সম্মেলন হবে যাতে ফিন ও রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে এই ভারতীয় বিপ্লবী দলটিও অংশ নেবে। ...এদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লেনিন ও অন্যান্য ইংরেজ-বিরোধী, চরমপন্থী, রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করা।''

১৯১৭-র নভেম্বর মাসে মাদ্রাজ থেকে একটি ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় : 'দ্য লেসনস্ ফ্রম রাশিয়া'। তাতে লেখা হয় : ''রুশ বিপ্লব ভারতে আমাদের অভিভূত ও অনুপ্রাণিত করেছে। ...রুশ দেশের অত্যাচারিত কৃষকরা যে অসাধারণ মনোবল দেখিয়েছে, তা ভারতের একই রকম বা আরও বেশি অত্যাচারিত কৃষকদেরও প্রেরণা দেবে।'' ১৯১৭-র নভেম্বরে রুশদেশে ঐতিহাসিক বিপ্লব সংঘটিত হলে ইংরেজ ধনবাদীদের মুখপত্র 'স্টেটস্ম্যান' এক সম্পাদকীয়তে লেখে ঃ ''রাশিয়ার কারখানায় মজুর আর গ্রামাঞ্চলের চাষি খাদ্য দাবি করছে। সৈন্যদল ও নাবিকদের বৃহত্তম অংশ যুদ্ধ করে হাঁফিয়ে উঠেছে। এক সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চাষিদের শতাব্দী সঞ্চিত জমির দাবি। বলশেভিকরা এই দাবিগুলি পূরণ করার ভিত্তিতেই তাদের শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়।'' এর সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক জগতকে হুঁশিয়ারিও জানাতে ভোলেনি ইংরেজ ধনকুবেরদের এই মুখপত্রটি। লিখেছে ঃ ''প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইতিহাসে যত রকম বিপ্লবী প্রচেষ্টা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সর্বাত্মক ও বিপজ্জনক হচ্ছে রাশিয়ার নতুন বিপ্লবী সরকারের কার্যকলাপ।'' বহু জাতির বন্দিশালা জারতন্ত্রী রুশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস দেখে, উৎসাহিত হয়ে কলকাতার একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় লিখল— ''জারতন্ত্রের পতন ভারতে বিদেশী সম্রাজ্যবাদের পতনের দিনকেও ঘনিয়ে আনছে।''

কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক জনসভাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল বললেন— ''সারা পৃথিবীতে এক নূতন জনশক্তি জেগে উঠেছে, তারা চায় জনগণের নায্য অধিকারকে পুনরুদ্ধার করতে। তারা চায় শোষণমুক্ত সমাজে, তথাকথিত উচ্চশ্রেণির উৎপীড়ন থেকে অব্যহতি পেয়ে সুখে, স্বাধীনভাবে বাঁচতে। তারই নাম বলশেভিজম্।'' জাতীয় বিপ্লববাদী নেতা মৌলানা বরকতুল্লাহ্ মস্কো গিয়েছিলেন। সর্বহারা বিপ্লব তাঁকে চমৎকৃত করে। তাসখন্দ থেকে প্রকাশিত এক উর্দু পুস্তিকাতে তিনি লেখেন—''রাশিয়ার দিকচক্রবালে মানব স্বাধীনতার ভোর দেখা দিয়েছে, তার দীপ্যমান সূর্যের নাম লেনিন...।''

এই ১৯১৯-এর মার্চ মাসেই সোভিয়েত রাশিয়াতে জন্ম নিয়েছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক। প্রতিষ্ঠার মহাসম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট ভাষাতেই বলা হয়েছিল : ''ভারতে, বিপ্লবী আন্দোলনে একদিনের জন্যও ভাঁটা আসেনি। সেখানেই সংঘটিত হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম শ্রমিক ধর্মঘট। বোম্বাইয়ে সংগ্রামী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সাঁজোয়া গাড়ি বের করতে বাধ্য হয়েছে ব্রিটিশ শাসকরা...।'' ভারতেও, ইংরেজ শাসকদের গোয়েন্দা চূড়ামণি সেসিলকে ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব ম্যাকফারসনকে এক গোপন রিপোর্টে জানান—''অনেকে বলছেন যে উত্তরপ্রদেশের কিষাণ সভা ও বাংলা দেশের রায়ত সভা একেবারে বলশেভিকপন্থী।.... ১৯১৯-এ অমৃতসরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এরা যে খসড়া প্রস্তাব দিয়েছিল, তাতে বলা হয় যে (ক) কৃষকদের উপর কর ধার্য করার জন্য উৎপন্ন ফসলকেই তার আয়ের ভিত্তি বলে গণ্য করতে হবে; ... জমি বিতরণের প্রশ্নে বলশেভিকদের কর্মপদ্ধতি ভারতীয়দের কাছে খুবই আদর পাবে এবং ভারতীয় আন্দোলনকারীদের মধ্যে যারা বলশেভিক, তারা এই কাজটিই করেছে। ভারতবর্ষে বিপ্লব নিশ্চয় লেনিনের কাম্য, তবে আমার মনে হয় যে লেনিন চাইছেন যে ভারতে বিক্ষোভ তার নিজস্ব ভঙ্গিতেই এগিয়ে চলুক।''

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়-বিপ্লবী বাঘা যতীনের দক্ষিণ হস্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে গিয়ে সেখানকার সমাজতন্ত্রী দলের সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাশিয়ার বলশেভিক সংগঠক বোরোদিনের সংস্পর্শে এসে তিনি দীক্ষিত হন কমিউনিস্ট মতবাদে। লেনিনের আমন্ত্রণে তিনি ১৯২০-তে মস্কো যান কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে। ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তিসংগ্রামের রণকৌশল নিয়ে লেনিনের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের (ততদিনে তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় নামেই সমধিক পরিচিত) মতপার্থক্য হয়।

লেনিনের উত্থাপিত মূল প্রস্তাবটির নাম ছিল ''প্রিলিমিনারি ড্রাফ্ট থিসিস অন দ্য ন্যাশনাল অ্যান্ড কলোনিয়াল কোয়েশ্চেন।'' ওই দলিলের ১১-অনুচ্ছেদে লেনিন লিখেছিলেন— ''যে-সব অনগ্রসর দেশে এখন সামন্ততান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা চালু আছে, সে-সব দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে—

ক) সেই সব দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করা সকল কমিউনিস্ট পার্টির অবশ্য কর্তব্য;

খ) উপনিবেশ ও পশ্চাৎপদ দেশগুলির বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন মৈত্রী স্থাপন করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া চলবে না। এই সব দেশে, একেবারে প্রাথমিক অবস্থাতেও শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সযত্নে রক্ষা করতে হবে।"

মানবেন্দ্রনাথ রায় একমত হতে পারলেন না এই খসড়া প্রস্তাবের সঙ্গে। সংযোজনী প্রস্তাব (সাপ্লিমেন্টারি থিসিস) এনে তিনি কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) বললেন— "ভারতে একটি পরাক্রান্ত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার মত সমস্ত উপাদানই রয়েছে। কিন্তু ব্যাপক জনসাধারণ ও ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের কোনও মিলই দেখতে পায় না।" লেনিন, রায়ের মতকে সংকীর্ণতাবাদ দুষ্ট ও ভ্রান্ত বলে সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতকে সরাসরি বর্জন করেননি। ১১ অনুচ্ছেদের খসড়াতে লেনিন লিখেছিলেন ঃ 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন'। রায়ের সমালোচনার পর, লেনিন সেটি পরিবর্তন করে চূড়ান্ত থিসিসে লিখলেন : 'বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলন'। অর্থাৎ পদানত দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকেও মূল্য দিলেন লেনিন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ও বহু বছর পর এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন : " সেটা সম্ভবত আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। একজন মহৎ নেতা আমাকে তাঁর সমকক্ষ ধরে নিয়ে ব্যবহার করলেন এবং এই আচরণের দ্বারা তাঁর নিজের মহত্বের প্রমাণ দিলেন। লেনিন অনায়াসেই বলতে পারতেন যে একজন ছোকরার সঙ্গে তর্ক করে তাঁর মূল্যবান সময় তিনি নষ্ট করতে পারবেন না। আর তাহলে ঐ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমার বক্তব্য পেশ করার কোনও সুযোগই আমি পেতাম না।"

একই সময়ে এটা লক্ষ করবার মতো যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের অধিকাংশই তাঁদের সন্ত্রাসবাদী অতীতের অবশেষ হিসেবেই 'বামপন্থী' সংকীর্ণতাবাদী ভাবধারায় ভুগেছেন। এম.এন. রায় এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর ব্যাতিক্রম ছিলেন ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখ অন্যান্য আরও কয়েকজন, যাঁদের সঙ্গে ভারতে জনতার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, যাঁরা কংগ্রেস ও সেইসঙ্গে গান্ধীজির ভূমিকা এবং যথাযথ অবস্থানটিকে চিনে নিতে পেরেছিলেন। ১৯২০ সালে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্নটির আলোচনাকালে এম. এন. রায়ের 'বামপন্থী' সংকীর্ণতাবাদ আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে লেনিন ঐ প্রশ্নের ওপর তাঁর থিসিস উত্থাপন করেন এবং আলোচনান্তে কয়েকটি সংশোধনীসহ তা গৃহীত হয়। রায় একটি পরিপূরক থিসিস উত্থাপন করেছিলেন, যার মধ্যে বহু মৌল বিষয়ে গুরুতর ভ্রান্ত ধারণা বিধৃত ছিল। লেনিন যে ওইসব ভ্রান্ত ধারণাকে শুধুমাত্র যুক্তির তীব্রতা দিয়েই ছিন্নভিন্ন করেছিলেন তাই নয়, তিনি বহু সংশোধনী এনে রায়-এর ঐ পরিপূরক থিসিসকে অধিকাংশ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করেছিলেন।

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবরে তাসখন্দে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার পরে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হলো। এই প্রতিষ্ঠালগ্নে উপস্থিত ছিলেন এম.এন. রায়, ইভেলিন রায়, অবনী মুখার্জী, রোজা ইটিংগফ, মহম্মদ আলী, মহম্মদ শফিক এবং এম পি বি টি আচার্য প্রমুখ সাতজন। মহম্মদ শফিককে সম্পাদক নির্বাচিত করা হলো। অবিভক্ত সিপিআই-এর দিনগুলোতেও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী যে সমস্ত কারণে ঐ তারিখটিকে আমাদের প্রতিষ্ঠাদিবস বলে মেনে নেননি তার উল্লেখ রয়েছে আমাদের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে। মাত্র সাতজনের সমন্বয়ে গঠিত একটা দল, যার মধ্যে দুজন আবার এমনকি ভারতীয় পর্যন্ত নন, যার সঙ্গে এই দেশের শ্রমিক-কৃষক অথবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কোনো সংশ্রব ছিল না তা একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও এই ঘটনা আমাদের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের একটি অংশ। দলটি যথেষ্ট পরিমাণ প্রচারমূলক কাজকর্ম সম্পন্ন করেছিল, 'ভ্যানগার্ড' নামে ১৯২২ সালের মে মাসে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিল (প্রধানত কমিন্টার্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কর্তব্যরত এম এন রায়ের অবদান)। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলোতেও এই দলটি সাহায্য করেছে, চেষ্টা করেছে তাদের পরস্পরের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধান করতে। ইতিমধ্যে ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলো আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে ডাঙ্গে তাঁর 'গান্ধী বনাম লেনিন' ছেপে বার করলেন। এটাকে কেন্দ্র করেই একটি কমিউনিস্ট গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করল এবং পরবর্তীকালে ১৯২২ সালের আগস্ট থেকে 'সোস্যালিস্ট' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন ডাঙ্গে। এই সময়েরই কাছাকাছি কলকাতায় মুজাফ্ফর আহমেদকে কেন্দ্র করে আর একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। সিঙ্গারভেলু চেট্টিয়ার আরও একটি গোষ্ঠী তৈরি করলেন মাদ্রাজে। ১৯২২ সালে লাহোরে গোলাম হোসেনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল এই রকমেরই আর একটি গোষ্ঠী, যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন 'ইনকিলাব'। এসবের প্রেক্ষাপটে ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস-পরিচালিত দেশজোড়া ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এই প্রধান আন্দোলনটির অংশ হিসেবেই শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনও দানা বেঁধে উঠেছিল। নানকানার নির্মম হত্যাকাণ্ড যা শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকজনতার ব্যাপক অংশকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে টেনে নিয়ে আসে, উত্তর প্রদেশের রায়ত কৃষকদের একা-আন্দোলন, মোপলা বিদ্রোহ বলে পরিচিত মালাবারের কৃষকদের অভ্যুত্থান, দেশব্যাপী ধর্মঘটের ঢেউ যার মধ্যে ছিল বেশ কতকগুলো অর্থনৈতিক কারণসম্ভূত ধর্মঘট এবং একটি রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট—এই সমস্তই একটি সংগ্রামী, ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের আবির্ভাব এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা-পালনের ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করে দেয়। ১৯২০ সালে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ইতিমধ্যেই দাপটের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল।

লেনিনের সমালোচনা গ্রহণ করে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অপর একজন গোড়ার যুগে ভারতীয় কমিউনিস্ট বিপ্লবী অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে রচনা করলেন একটি ইস্তাহার, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামে এবং সে ইস্তাহার হাজারে হাজারে বিলি করা হল ১৯২১-এ আমেদাবাদে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে। তাতে লেখা ছিল যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও একটি সার্বভৌম যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র গঠনই কমিউনিস্টদের প্রথম লক্ষ্য। সেই রাষ্ট্রে নির্বাচিত-সরকার গঠনের ভিত্তি হবে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকার। সামন্ততন্ত্র ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা এবং বৈদেশিক পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা। শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণি সংগঠন গড়ার অধিকার স্বীকৃত হবে। নারীসমাজের উপর সকল বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হবে। এই ইস্তাহারটি পুনরায় বিতরণ করা হয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে, ১৯২২-এর ডিসেম্বরে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এতেই সন্ত্রস্ত হয়ে অঙ্কুরেই ভারতে কমিউনিস্ট

আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইল। একটি গোপন রিপোর্টে লেখা হয় ঃ ‘‘আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাই না, কিন্তু গত দুবছরের চেয়েও আগামী বছরগুলিতে ভারতে বিশেষত বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। পুরানো বাঙ্গালী বিপ্লববাদীদের গুপ্ত আন্দোলনের কায়দার সঙ্গে কমিউনিস্ট প্রচারকদের পদ্ধতি মিশ্রিত হয়ে এই আন্দোলন দেখা দেবে। ...জনসাধারণের সমর্থন থেকে যদি এই আন্দোলনকে আমরা বিচ্ছিন্ন করতে চাই তবে সুকৌশলে প্রচার ও প্রমাণ করতে হবে যে এই নতুন আন্দোলনের পিছনে বিদেশী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের টাকা আছে।’’ ১৯২৩-এ ভারত সরকার এস এ ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহমদ, সউকৎ উসমানি ও নলিনী গুপ্তকে গ্রেপ্তার করে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করলো। বিচারক ছিলেন এইচ এল হোস্, যিনি চৌরিচৌরার ১৭২ জন বিক্ষোভকারীর ফাঁসির হুকুম দেন। ফলে কমিউনিস্ট বন্দিরা অসহ্য নির্যাতন ভোগ করেন। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন ঃ ‘‘গলায় লোহার হাঁসুলি ও পায়ে লোহার মল পরিয়ে আমাদের চার জনকে বিভিন্ন জেলে বদলি করে দেওয়া হল।’’ কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল কমিউনিস্ট নেতা চার জনেরই। কিন্তু ধ্বংস হল না ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন। পরের বছর ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে ওই কানপুরেই অনুষ্ঠিত হল প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলন।

।। ২ ।।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯২৭-২৮ সাল এক যুগসন্ধিক্ষণ। বছরটা যখন শুরু হল, তখন আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। শাসন সংস্কার ব্যবস্থার ভিতরে ঢুকে তাকে বানচাল করে দেব—স্বরাজ্য দলের এই রণকৌশল প্রায় ব্যর্থ হয়েছে এক বাংলাদেশে ছাড়া। গান্ধীবাদী অসহযোগ আন্দোলনের গতিবেগ প্রায় নিঃশেষ। বিপ্লববাদীদের সেরা কর্মীরা হয় কারারুদ্ধ, নয় ফেরারি। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের তখনও শৈশব। তাছাড়া কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় ও নানাবিধ দমন-পীড়নে শ্রেণি-সংগ্রামের আগুন তখন ছাই চাপা পড়েছে। দেশ জুড়ে কালো ছায়া পড়েছে সাম্প্রদায়িক বীভৎসতার। সারা দেশে একটা অবসাদ, হতাশার আবহাওয়া—শুধু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাই পরিতৃপ্ত!

কিন্তু সেই ১৯২৭ শেষ হবার আগেই দেশের চেহারা ও মেজাজ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। সাম্রাজ্যবাদের পরিতৃপ্তির হাসি মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল কুঞ্চিত ললাটে গভীর দুশ্চিন্তা-রেখা। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অবসাদ ঝেড়ে ফেলে, শিরদাঁড়া সোজা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে এগোতে থাকল সামনের দিকেই। বিপ্লববাদীদের সেরা যুবকর্মীরা সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন বুকে নিয়ে, ক্রমেই বেশি বেশি করে আকৃষ্ট হতে লাগল সমাজতন্ত্রের দিকে। বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সেরা যুবকর্মীরা সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন বুকে নিয়ে, ক্রমেই বেশি বেশি করে আকৃষ্ট হতে লাগল সমাজতন্ত্রের দিকে। বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যোগসূত্রও স্থাপিত হল এই বছরে। সর্বোপরি, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন, তার শৈশব অতিক্রম করে সংগ্রামী কৈশোরে পদার্পণ করল, রক্তপতাকা লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে।

১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে, ইউরোপে, বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ শহরে পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। তার উদ্যোগ গ্রহণ করল কমিউস্টরা, বামপন্থী সমাজতন্ত্রীরা এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা সমবেত ভাবে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট নেতা উইলি মুনজেনবার্গ, ইংরেজ বামপন্থী শ্রমিকনেতা জেমস্ ম্যাক্সটন, চীনা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী নেত্রী সুং চিং-লিং (মাদার সান ইয়াৎ-সেন) প্রভৃতি। আর ছিলেন অগ্নিযুগের প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লবী নেতা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘চট্টো’ নামেই যিনি সমধিক খ্যাত। তরুণ জওহরলাল নেহরু তখন ইউরাপে—চট্টোর আমন্ত্রণে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপেই যোগ দিলেন ব্রুসেলসের মহাসম্মেলনে। জওহরলাল লিখছেন ঃ ‘‘১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ব্রুসেলস্ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ...কমিউনিস্টরা সেখানে বেশ জোরালো ভাবেই হাজির ছিল। নিপীড়িত জাতিদের নিজেদের মধ্যে ও তাদের সঙ্গে বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের মিলিত সংগ্রামের কথা তখন সরবে আলোচিত হচ্ছিল। সবাই তখন মনে করেছিল যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সবাই মিলেই করতে হবে। ইন্দোচীন, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশ থেকে জাতীয়তাবাদী সংগঠনের প্রতিনিধিরা সেই মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন; ছিলেন উত্তর আফ্রিকার, আরব ও কৃষ্ণ আফ্রিকার নিগ্রো নেতারা। উপস্থিত ছিলেন বহু বামপন্থী শ্রমিক নেতা, উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন মানুষ যাঁরা একযুগ ধরে ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের বরণীয় নেতা। কমিউনিস্টরা তো অবশ্যই ছিল এবং সম্মেলন পরিচালনায় তারা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল।

ইতিমধ্যে ১৯২৭-এর গোড়াতে আর একটি ঘটনা ঘটে, যা ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রগতির পথে ঠেলে দিতে সাহায্য করে—তা হল, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ভারতীয় শ্রমিকনেতা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র সাপুরজী শাকলাৎওয়ালার ভারত আগমন। মাত্র কয়েকমাস শাকালাৎওয়ালা ভারতে ছিলেন। তারই মধ্যে তিনি তোলপাড় করে দিলেন সমগ্র ভারত। বক্তৃতা করলেন ছোট বড় অজস্র জনসভায়, দেখা করলেন জাতীয় নেতৃবর্গ থেকে শুরু করে অগণিত সাধারণ কমীদের সঙ্গে। সর্বত্র তাঁর মুখে ছিল একটিই রণধ্বনি ঃ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, দীর্ঘজীবী হোক সাম্যবাদী আন্দোলন। বছরের একেবারে গোড়াতে বোম্বাই পৌঁছলেন শাকলাৎওয়ালা। ১৯২৭-এর ১৮ জানুয়ারি তাঁকে বোম্বাই নগরীতে বিপুল জনসংবর্ধনা জানান হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন শত শত শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, কংগ্রেসসেবী, এবং মৌলানা শওকৎ আলি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও বি জি হর্নিম্যানের মতো প্রসিদ্ধ জননায়ক। সভায় সভানেত্রীত্ব করলেন সরোজিনী নাইডু। এক আবেগ-মথিত ভাষণে শাকালাৎওয়ালাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বললেন ঃ ‘স্বাধীনতা ও মৃত্যুর মধ্যে স্বাধীনতাকেই একমাত্র বিকল্প বলে বেছে নিয়েছে ভারতের যে পুনরুজ্জীবিত মর্মাত্মা, শাকলাৎওয়ালা

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯২৭-২৮ সাল এক যুগসন্ধিক্ষণ। বছরটা যখন শুরু হল, তখন আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। শাসন সংস্কার ব্যবস্থার ভিতরে ঢুকে তাকে বানচাল করে দেব—স্বরাজ্য দলের এই রণকৌশল প্রায় ব্যর্থ হয়েছে এক বাংলাদেশে ছাড়া।

তারই প্রতিমুর্তি।" উত্তরে শাকলাৎওয়ালা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের মুখোস ছিঁড়ে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। বক্তৃতার শেষে, উদাত্ত কণ্ঠে তিনি আহ্বান জানালেন : "ধ্বস কর সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে, যা দুনিয়াকে বিভক্ত করেছে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে।"

ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে শাকলাৎওয়ালা কলকাতায় আসেন। তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানান কংগ্রেস ও শ্রমিকনেতারা সকলেই। কলকাতা পৌরসভায় তখন স্বরাজ্যদল সংখ্যাগরিষ্ঠ। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন পৌরসভার মেয়র। পৌরসভায় ইংরেজ সদস্যদের তীব্র বাধা সত্ত্বেও, কলকাতা পৌরসভা স্থির করে যে ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে তারা শাকলাৎওয়ালাকে কলকাতার টাউন হলে সংবর্ধনা জানাবে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের রাজ্যশাখা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও স্থির করে যে তারা ১৯ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শাকলাৎওয়ালাকে গণসংবর্ধনা জানাবে। দুটি সভাতেই বিপুল জনসমাগম হয়—১৯ ফেব্রুয়ারি প্রধানত শ্রমিক সমাবেশ এবং ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানত রাজনৈতিক কর্মীদের ও ছাত্র-যুব সমাজের সমাবেশ। ১৯ ফেব্রুয়ারির সমাবেশে শাকলাৎওয়ালাকে সংবর্ধনা জানালেন নরমপন্থী প্রবীণ শ্রমিক-নেতা মৃণালকান্তি বসু এবং অনুরোধ জানালেন তিনি যেন শ্রমিকদের বুঝিয়ে বলেন সাম্যবাদের প্রকৃত অর্থ কী! দীর্ঘ বক্তৃতায় চমৎকারভাবে সাম্যবাদের ব্যখ্যা করে, পরিশেষে শাকলাৎওয়ালা বলেন : "সাম্যবাদই সভ্যতার ভবিষ্যৎ। বর্তমানের খুনী ও দুর্বৃত্ত সমাজকে চূর্ণবিচূর্ণ করেই সাম্যবাদ বিজয়ী হবে। তাই আপনাদের কাজ নিজেদের সংগঠিত করা। সাম্যবাদের আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে এগিয়ে চলুন, সাম্যবাদের ভিত্তিতেই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।" পরের দিন পৌরসংবর্ধনা সভাতেও দীর্ঘ, চমকপ্রদ ভাষণ দেন শাকলাৎওয়ালা। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সাম্যবাদ-ভীতি ছিল। স্পষ্টভাবে সে কথা স্বীকার করে, শাকলাৎওয়ালার ভাষণের শেষে তিনি বললেন ঃ "শ্রীযুক্ত শাকলাৎওয়ালার বক্তৃতা শোনার পর, আগে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে যে সন্দেহ ও বিরোধিতা আমার মনে ছিল, এখন আর তা নেই—একথা আমি সজোরে বলতে পারি।"

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি ও তৎকালীন তরুণ শ্রমিক সংগঠক রাধারমণ মিত্র, ওই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে শাকলাৎওয়ালার দুটি সভাতেই তিনি ছিলেন এবং তাঁর জীবনে এরকম অসাধারণ বাগ্মিতা তিনি শোনেননি বললেই চলে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল দিল্লিতে, মার্চ মাসে। সেখানেও সংবর্ধনার উত্তরে শাকলাৎওয়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন : "শ্রমিকরা যদি সমাজের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করতে পারে, তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তামাশায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দৃঢ় লক্ষ্য হওয়া উচিত ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে শ্রমিকের কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

এই সময় অবধি ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্টরা একটা ছোট শক্তি ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উদ্যোগে, এবং সম্ভবত শাকলাৎওয়ালার প্রভাবে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই মহাসম্মেলনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়—চীন থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আশা প্রকাশ করে। তাছাড়া এই অধিবেশনে অন্য ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এই প্রথম সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হয় এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কারখানায় শ্রমজীবী প্রতিনিধিরা সম্মেলনকক্ষে সর্বপ্রথম ধ্বনি তোলেন (যে ধ্বনি আজ অতি পরিচিত), 'লাল ঝাণ্ডা কী জয়'।

১৯২৭ -এর ১২ ফেব্রুয়ারি খড়্গাপুরে ২৫ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করলো। ইংরেজ সরকার ধর্মঘট ভাঙার জন্য ফৌজ পাঠাল, কিন্তু শ্রমিকরা অদম্য মনোবল নিয়ে রুখে দাঁড়াল। খড়্গাপুরে রেলশ্রমিকরা ধর্মঘটে সংগ্রামী ঐক্যকে অটুট রাখল। ৩১ অক্টোবর খড়্গাপুরে সারা ভারত রেলশ্রমিক ফেডারেশনের বিশেষ সম্মেলন আহূত হল। সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করল ঃ "নিখিল ভারত রেল শ্রমিক ফেডারেশনের এই সম্মেলন সরকারকে ছাঁটাই করার নীতিকে ধিক্কার জানাচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে সাধারণ ধর্মঘটই এখন একমাত্র পথ।" সম্মেলন আরও সিদ্ধান্ত করল যে এই ধর্মঘটকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। পরদিন বেঙ্গল নাগপুর রেলশ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ভি ভি গিরি এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করলেন যে রেলশ্রমিকদের সামনে একমাত্র যে পথ খোলা আছে, তা হল সাধারণ ধর্মঘট। খড়্গাপুরের এই ধর্মঘট চলে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে এবং তার সমর্থনে, বিশেষত বাংলাদেশের রেলশ্রমিকদের মধ্যে, এক গণ-অভ্যুত্থান পরিলক্ষিত হয়।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ঘোষণা করল যে ভারতে শাসন-সংস্কারের জন্য, স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে তারা শীঘ্রই ভারতে এক কমিশন পঠাচ্ছে। জড় অবসাদগ্রস্ত জাতীয় আন্দোলন যেন এক কশাঘাতে চমকে জেগে উঠল এবং প্রায় একবাক্যে সাইমন কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিল। এই পটভূমিতেই, ১৯২৭-এর ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। সেখানে বিষয়-নির্বাচক কমিটির সভায়, বোম্বাইয়ের কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা কে এন যোগলেকর (পরে ইনিও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন) একটি ছোট্ট প্রস্তাব রাখেন পূর্ণ স্বাধীনতার—যে প্রস্তাবটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিটি বাৎসরিক অধিবেশনে কমিউনিস্টরা উত্থাপন করে আসছিলেন, কিন্তু কোনোবারই ১৪/১৫টির বেশি ভোট পায়নি। ১৯২৭-এ মাদ্রাজ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম যোগলেকরের প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন জওহরলাল নেহরু এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে যখন তিনিও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন তখন বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি গৃহীতও হয়ে গেল।

বেঙ্গল নাগপুর রেল ধর্মঘটই প্রথম ধর্মঘট যাতে কমিউনিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এর পরের বছরগুলিতে কমিউনিস্টরা বহু ধর্মঘটে অংশ নেয়। ধর্মঘটের চরিত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন এনে দেয় কমিউনিস্টরাই। ভারতের শ্রমিকশ্রেণির ব্যাপক ও জঙ্গি গণসংগ্রামের জন্যই ১৯২৮ সাল ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমগ্র বছরটি ধরেই বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর ভারত ও বাংলাদেশে শ্রমিকশ্রেণির উত্তাল গণসংগ্রাম চলেছিল, আর তার নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্টরা ও তাদের শ্রেণিসচেতন অনুগামী বন্ধুরাই। ১৯২৮-এর মধ্যভাগের একটি দিনের একটি সংবাদ-পত্রের কয়েকটি মাত্র শিরোনামা এর প্রমাণ হিসেবে তুলে দিচ্ছি—

"খড়্গাপুরের শ্রমিকরা সংগ্রামে দৃঢ় হয়েছে"

"কেশোরাম সূতাকলের ৪৫০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেছে"

"কানপুরের এলগিন মিলে ধর্মঘট—শ্রমিকরা স্ট্রাইক কমিটি নির্বাচিত করেছে।"

"জামসেদপুরে হরতালের আহ্বান।"

"লিলুয়ার ধর্মঘট পরিস্থিতি অব্যাহত!"

১৯২৮-এর মে মাসে ধর্মঘটী লিলুয়া শ্রমিকদের সমর্থনে যুক্ত বিবৃতি দিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র

বসু ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি মৃণালকান্তি বসু। সারা বাংলার শ্রমিক-শ্রেণির কাছ থেকে ধর্মঘট তহবিলে সাহায্য এল ৫০ হাজার টাকা। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল অণ্ডাল, আসানসোল ও অন্যান্য কেন্দ্রে। লিলুয়ার ধর্মঘটি নেতাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অন্যান্য শ্রমিকনেতারাও।

এইখানে বলে রাখা ভালো যে গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামী দুজনেই ছিলেন বিপ্লবী অনুশীলন দলের পুরানো কর্মী, যাঁরা ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে ঝুঁকছিলেন। ১৯২৭-এ তাঁরা দুজনেই যোগ দিয়েছিলেন শ্রমিক ও কৃষক দলে। অপরদিকে রাধারমণ মিত্র ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঝানু কংগ্রেসি। অসহযোগ আন্দোলনে উত্তরপ্রদেশে এটোয়া জেলায় সত্যাগ্রহ সংগ্রামের তাঁরা ছিলেন অবিসংবাদী নেতা। পরে গান্ধীবাদী নেতৃত্ব সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কলকাতায় ফিরে তাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদে যুক্ত হন। লিলুয়ার রেল-শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম তাঁদের গভীরভাবে টেনেছিল এবং তাঁরাও ক্রমশ জড়িয়ে পড়লেন সেই লড়াইয়ে।

ইতিমধ্যে দুজন ইংরেজ কমিউনিস্ট ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের বন্ধু হিসেবে এদেশে এসেছিলেন—ফিলিপ স্প্র্যাট ও বেন ব্রাড্লী। ব্রাড্লীর কর্মক্ষেত্র ছিল বোম্বাই ও পশ্চিম ভারত, আর স্প্যাট বেছে নিয়েছিলেন বাংলাদেশ। ফলে স্প্যাট ছিলেন লিলুয়ার সংগ্রামের একজন অংশীদার। রাধারমণ মিত্র বলেছেন : ''কিরণ মিত্রর অনুরোধে, রেলপথে ধর্মঘটকে ছড়িয়ে দেবার জন্য আমরা প্রথম গেলাম অণ্ডালে। আমাদের দলে ছিল স্প্যাট, ধরণী, গড়বড়ে, চিরঞ্জীলাল শ্রফ্ ও আমি। এক সপ্তাহ দাঁতে দাঁত দিয়ে আমরা অণ্ডালে পড়ে রইলাম, তারপর সেখানকার রেলমজুররা নামল ধর্মঘটের রাস্তায়। লিলুয়ার ধর্মঘট যতদিন চালু ছিল, অণ্ডালের শ্রমিকরাও আর ততদিনে কাজে ফিরে যায়নি। একই ধরনের অভিজ্ঞতা হল আসানসোলে। সেখানেও অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর শ্রমিকদের ধর্মঘটে নামাতে সক্ষম হলাম এবং দু'মাস তারা ধর্মঘটে দৃঢ় হইল।''

১৯২৮-এ যতগুলি বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলশ্রমিকের এই ধর্মঘট ছিল তার মধ্যে খুবই ব্যাপক, কঠোর ও রক্তাক্ত। ১৬,৩১৫ জন রেলশ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট করেছিলেন—লিলুয়ার কারখানার ১১,২৯৬ জন, অণ্ডালের ৫৯৫ জন, আসানসোলে ১৫৩০ জন, হাওড়াতে ২০০৩ জন ও বাকি ছোটখাট কেন্দ্রগুলি থেকে। বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যান্য কর্মীরাও এই সময়ে শ্রমিকদের এই সংগ্রাম দেখে, এদিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করেছিলেন। গোপেন চক্রবর্তী তাঁর পূর্বোদ্ধৃত সাক্ষাৎকারে আর এক জায়গায় বলেছেন যে লিলুয়া ধর্মঘটের সময় একদিন তিনি ও শিবনাথ ব্যানার্জী গ্রেপ্তার হলে, শ্রমিকদের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশের একটি সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষের সময় ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করে একদল বিপ্লবী যুবক, যাঁদের নেতৃত্ব দেন সর্দার ভগৎ সিংয়ের সাথী বটুকেশ্বর দত্ত। ডাঃ রণেন সেন ছিলেন ত্রিশের দশকের গোড়া থেকে কমিউনিস্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি বললেন—''আমরা তখন বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সবে সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছি। ঠিক সেই সময় লিলুয়া ধর্মঘট আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। সামনে মেশিনগান হতে ফৌজ, পিছনে মেশিনগান হতে ফৌজ, মাঝখানে কয়েক হাজার ধর্মঘটী রেলশ্রমিক মাথা উঁচু করে ঝাণ্ডা হাতে ধ্বনি দিতে দিতে কলকাতা কাঁপিয়ে চলেছে—সর্বহারার নেতৃত্ব কাকে বলে এই প্রথম দেখলাম।'' এক বছরে মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়লাম চটকলে সাধারণ ধর্মঘটের জোয়ারে।

বাংলার বিপ্লবীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা সতীশ পাকড়াশীও বলছেন : ''আমরা কি শুধু বই পড়ে কমিউনিজমের দিকে এসেছিলাম? মোটেই না। যে সব সংগ্রাম আমাদের উদ্দীপিত করেছিল, লিলুয়ার রেলশ্রমিকদের সংগ্রাম তারই অন্যতম।...'' ১৯২৮-এর জুন-জুলাই-এ বাংলাদেশে ধর্মঘটের স্রোত বইতে শুরু করল। মণি সিং ছুটলেন মেটিয়াব্রুজে। রাধারমণ মিত্র বলছেন ঃ ''১৯২৮-এ বাংলার শ্রমিক-শ্রেণির মধ্যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা দিল। চেঙ্গাইলেই আমি প্রথম সংগঠিত করলাম বেঙ্গল চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন। দেখতে না দেখতেই ধর্মঘটের পথে পা বাড়াল চেঙ্গাইলের শ্রমিকরা। সাহেব মালিকরা ধর্মঘট ভাঙার জন্য সব কিছুরই আশ্রয় নিল—ছল-চাতুরি, চোখরাঙানি, দমনপীড়ন। এত বড় ধর্মঘট আমরা সামলাতে পারছিলাম না। তাই আমি ডাক পাঠালাম প্রথমে বঙ্কিমের ও পরে স্প্র্যাটের কাছে। দুজনেই সে ডাকে সাড়া দিয়ে চেঙ্গাইলে চলে এল।'' এই প্রসঙ্গে স্প্র্যাটও লিখছেন ঃ ''আমার কাজ ছিল ধর্মঘটীদের সভামঞ্চে উঠে তাদের মনোবল ঠিক রাখতে সাহায্য করা। সেই যুগে একজন সাদা চামড়া সাহেব এই কাজে কত বড় সহায়ক, তা বলাই বাহুল্য। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমি তখন চেঙ্গাইলে গেছি, মাঝে মাঝে স্থানীয় ছোট্ট একটি চায়ের দোকানে রাতও কাটিয়েছি.... অবশ্য চটকলে ব্যাপক ধর্মঘট দানা বেঁধে ওঠার আগেই লিলুয়া রেল ধর্মঘটের সমর্থনে রেল-শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনে আমি গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ি। চেঙ্গাইলে ধর্মঘটের প্রধান নেতা ছিল, যতদুর মনে পড়ে, রাধারমণ মিত্র। সে-ই আমাকে ও অন্যান্যদের ডেকে পাঠিয়েছিল? আমি, গোপেন ও বঙ্কিমও চেঙ্গাইলে গিয়েছি এবং হয়তো এক-আধবার মুজফ্ফর আহমদও।'' সারা ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলিতেই তখন শ্রমিক আন্দোলনের ঝড় উঠেছে। কমিউনিস্টরা তখন সংখ্যায় কম। আইনীভাবে তারা কাজ করছিল শ্রমিক ও কৃষক দলের এবং গিড়্নী কামগড় ইউনিয়নের মাধ্যমে। তারা আলওয়ের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা গড়ল এবং ১৯২৮-এর ১৫ এপ্রিল মহানগরীর সূতাকল শ্রমিকদের এক বিশাল জমায়েত সংগঠিত করল। ২০,০০০ শ্রমিকের সেই জনসভায় বক্তৃতা করলেন আলওয়ে, ঝাবওয়ালা, নিম্বকর প্রভৃতি। আর তাঁরা সবাই আহ্বান জানালেন সূতাকলগুলিতে সাধারণ ধর্মঘটের। ১৭ এপ্রিল বোম্বাইয়ের শতকরা ৮০টি সূতাকলই ধর্মঘটের আহ্বানে সাড়া দিল এবং ২৬ এপ্রিলের মধ্যে শ্রমিকদের সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘটে প্রায় সমস্ত সূতাকলই অচল হয়ে গেল। এমনকি নরমপন্থী শ্রমিক নেতারাও ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হলেন। ২ মে তারিখে সমস্ত ধর্মঘটীদের এক বিশাল সম্মিলিত জনসভায়, সব কটি ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সম্মিলিত ধর্মঘট কমিটি গঠন করল ও এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটকে বিজয়ী করার প্রতিজ্ঞা নিল। তারপর প্রায় ৬ মাস ধরে, ২ লক্ষেরও বেশি বোম্বাইয়ের সূতাকল মজদুর, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নেতৃত্বের পরিচালনায় বীরত্বপূ সাধারণ ধর্মঘট চালিয়ে গেল—ধর্মঘটী শ্রমিকদের ও বিভিন্ন মঞ্চের রাজনৈতিক কর্মীদের সম্মিলিত করে গঠিত যুক্ত ধর্মঘটী কমিটিই ছিল সেই নতুন নেতৃত্ব। সেই দীর্ঘ ও রক্তাক্ত সাধারণ ধর্মঘট পরিচালনার গতিপথে নরমপন্থী ও সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ক্রমেই শ্রমিক সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সামনে এগিয়ে এল কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট- দরদী শ্রমিক নেতৃত্ব। তাদের সংগ্রামী হাতিয়ার হল তাদের গণসংগঠন গিড়্নী কামগড় ইউনিয়ন।

১৯২৮ সালের ৫ অক্টোবর বোম্বাইয়ে এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ হল। ১২ অক্টোবর, গিড়্নী কামগড় ইউনিয়ন, শ্রমিকদের মধ্যে একটি ইস্তাহার বিলি করল। তাতে বলা ছিল ঃ ''সূতাকল

শ্রমিকদের ধর্মঘট মুলতুবি রয়েছে, তার অবসান হয়নি। আমরা যদি চুপচাপ বসে থাকি এবং তৈরি না হই, তাহলে সরকার ও মালিকরা আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। সুতরাং, ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত সূতাকল শ্রমিককে প্রস্তুত থাকতে হবে। গিড়্নী কামগড় ইউনিয়নে এক লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করতে হবে।'' সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট সারা ভারতে শ্রমিক ধর্মঘটের তরঙ্গ বইয়ে দিল। জি আই পি রেলশ্রমিক এবং বোম্বের বন্দরশ্রমিকদের মধ্যে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পরিচালনাধীন ইউনিয়ন গড়ে উঠল। ১৯২৮-এর জুন, সূতাকল ধর্মঘটের সমর্থনে বোম্বাই-এর বন্দরশ্রমিকদের এক সমাবেশ আহূত হয়। বন্দরশ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন এস এস মীরাজকর এবং তিনি বন্দরশ্রমিকদের আহ্বান জানালেন ধর্মঘটী সূতাকল শ্রমিকদের সক্রিয় সমর্থন জানাতে। তাঁর সমর্থনে একই ধরনের বক্তৃতা করলেন শ্রমিক নেতা ঝাবওয়ালা, বেন ব্র্যাড্‌লী প্রমুখ।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভারতেও শ্রমিকরা অশান্ত হয়ে উঠল। দক্ষিণ ভারত রেলপথের কর্তৃপক্ষ ১৯২৮-এর ২৮ জুন লক-আউট ঘোষণা করলেন, যাতে নাগপট্টম, গোডামুর, গোল্ডেন রক ও ত্রিচিনপলির ৮০০ শ্রমিক আক্রান্ত হল। দক্ষিণ ভারত রেল শ্রমিক-ইউনিয়ন তখন সংস্কারবাদীদের হাতে ছিল। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করল যাতে দক্ষিণ ভারতের রেল শ্রমিকরা সংগ্রামের পথে না যায়। তাদের একজন নেতা রেলশ্রমিকদের হুঁশিয়ার করে দিলেন যাতে তারা কমিউনিস্টদের খপ্পরে না পড়ে। তা সত্ত্বেও জঙ্গি শ্রমিকরা সংগ্রামের পথেই পা বাড়াল এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে একটা ধর্মঘট কমিটি গঠন করে ঘোষণা করল যে তারা ১৯২৮-এর ২০ জুলাই থেকে সাধারণ ধর্মঘট করবে। দক্ষিণ ভারতের রেলশ্রমিকদের এই সংগ্রামী ঘোষণা সারা ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। ২০ জুলাই দক্ষিণ ভারতের রেলশ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু হল এবং প্রচণ্ড দমননীতি সত্ত্বেও, সাধারণ ধর্মঘট সফল হল। মায়াভরম, টিউটিকারিন ও ভিল্লুপুরমে পুলিশ গুলি চালিয়ে ১২জন রেলশ্রমিককে হত্যা করল, শত শত শ্রমিক আহত হলেন। গ্রেপ্তার হলেন বহু শত শ্রমিক এবং ধর্মঘট কমিটির প্রায় সমস্ত নেতা। দশ দিন বীরত্বপূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট চালানোর পর, এই প্রচণ্ড দমনপীড়নের সামনে পিছু হটে, ৩০ জুলাই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল।

১৯২৮-এর জুন মাসের সংবাদপত্রের বিবরণী থেকে দেখা যায় যে শোলাপুর, কানপুর ও জামশেদপুরে একই ধরনের জবরদস্ত শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল এবং সরকার সবকটি ক্ষেত্রেই ধর্মঘটের জন্য দায়ী করেছিল কমিউনিস্টদের। ভারতে ইংরেজ ধনকুবেরদের মুখপত্র স্টেটসম্যান আতঙ্কিত হয়ে লিখেছিল : ''ভারতের শিল্পাঞ্চলে যে মস্কোর প্রতিনিধিরা কাজ করছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ধর্মঘটের সমস্ত নেতারাই, সে তাঁরা ভারতীয়ই হন, আর অন্য কেউই হন, সবাই প্রকাশ্য কমিউনিস্ট। সম্প্রতি তাঁরাই ইনজিনিয়ারিং, চটকল ও সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগঠিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছেন।... মস্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।''

ইতিমধ্যে দেশজুড়ে শুরু হয়ে গেছে নতুন গণজাগরণ। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে চলছে ভারতের সর্বত্র ব্যাপক প্রতিবাদ, কালো পতাকার মিছিল, হরতাল। ১৯২৮-এর ৩ ফেব্রুয়ারি, সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে পৌঁছায়, আর তার বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের রাজপথ কাঁপিয়ে বের হয় ২০ হাজার শ্রমিকের জঙ্গি মিছিল, যাদের সংগঠিত করেছিল কমিউনিস্টরা ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা, যাদের মুখে রণধ্বনি ছিল 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'।'' প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সোহন সিং যোশ, তখন যুবকর্মী। তিনি বলছেন : ''১৯২৮-এর গোড়াতেই পাঞ্জাবে আমরা গড়ে তুলেছি শ্রমিক ও কৃষক দল। ভগৎ সিং বহু ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। 'কীর্তি' পত্রিকাটি আমরা একত্রে বার করি। ভগৎ সিং আমাকে তখন বলতেন যে ইংরেজদের তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন করার পর সমাজতান্ত্রিক রাজ গড়াই হবে তাঁদের কাম্য।

।। ৩ ।।

১৯২৮-এ ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই শ্রমিক ও কৃষক দল গড়ে ওঠে। বোম্বাই ও বাংলাদেশে তার অস্তিত্ব তো আরও পুরানো। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কমিউনিস্টরা স্থির করলেন যে ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে, কলকাতায় যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হবে, তখনই তাঁরাও সারা ভারত শ্রমিক ও কৃষক দলের প্রথম জাতীয় সম্মেলন করবেন।

১৯২৮-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, বঙ্গ-বিহার সীমান্তের কয়লাখনি অঞ্চলে ঝরিয়াতে, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হল। কমিউনিস্ট-পরিচালিত গিড়্নী কামগড় ইউনিয়ন ও জি আই পি রেলশ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা তখন যথাক্রমে ৮০ ও ৪০ হাজার। জওহরলাল নেহরু সম্মেলনে দৃপ্ত ভাষণ দিলেন। সম্মেলনের পর তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জওহরলাল সহ সমস্ত প্রতিনিধিরা তখন বজ্রধ্বনি তোলেন : দুনিয়া কি মজদুর এক হো! এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত হয় যে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘর্ষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

শ্রমিক ও কৃষক দলের সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়, ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর। পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা সর্দার সোহন সিং যোশ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। উপস্থিত সংগঠনের মধ্যে ছিলেন বোম্বাই থেকে মীরাজকর, ঘাটে, যোগলেকর ও নিম্বকর, উত্তর প্রদেশ থেকে পি সি যোশী, বাংলাদেশ থেকে মুজফ্‌ফর আহমদ, আব্দার রেজ্জাক খাঁ, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ। দর্শকদের মধ্যে গোপনে উপস্থিত ছিলেন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ভগৎ সিং। ওই বছরই, কলকাতায়, ২৭ ডিসেম্বর, রামমোহন হলে সারা ভারত সমাজতন্ত্রী যুবকদের প্রথম মহাসম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, বিখ্যাত বিপ্লবী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ভাষণে বলেন : ''যে সব যুবকরা মার্কসবাদী, তাদের কর্তব্য ভারতীয় পরিস্থিতির সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করা, জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করা ও তাদের শ্রেণি-সচেতন করা।

অবশ্য ১৯২৮-এর ডিসেম্বর মাসের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন চলাকালে। এমনিতেই এই অধিবেশনে প্রবল উত্তেজনা ছিল। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতারা স্বাধীনতা-সংগ্রামের লক্ষ্যকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর মধ্যে সীমিত রাখতে চাইছিলেন। আর দেশের তারুণ্য ও বামপন্থী শক্তিরা জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সংশোধনী এনেছিলেন যে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হবে পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রবল বিতর্কের পর সামান্য ভোটের ব্যবধানে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পরাজিত হয়। তবে পরের দিন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ৪০ হাজার শ্রমিকের এক দৃপ্ত মিছিল কংগ্রেস অধিবেশনের সামনে আসে, মণ্ডপে প্রবেশ করে ও জাতীয় নেতৃত্বের কাছে নিজেদের দাবি পেশ করে। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন রাধারমণ মিত্র, বঙ্কিম মুখার্জী, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ। জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন ৫০ হাজার শ্রমিকের সুশৃঙ্খল মিছিলের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তারা দু ঘন্টার জন্য মণ্ডপ দখল করে, জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিপ্রস্তাব গ্রহণ করে।"

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এবার সত্যই আতঙ্কিত হল। বড়লাট আরউইন স্বয়ং বললেন : ''কিছুদিন ধরে ভারতের কমিউনিজমের অস্বস্তিকর প্রভাব বৃদ্ধি, আমাদের সরকারের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।" বহুদূর থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখলেন ''সাম্রাজ্যবাদ নির্ভুলভাবেই তার সবচেয়ে মারাত্মক ও দৃঢ়চেতা শত্রুকে চিনতে পেরেছে—যে শত্রু ভারতের সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী।" ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ও বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস এক নূতন যুগের সূচনায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

।। ৪ ।।

১৯২৮-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস। এম এন রায় এই কংগ্রেসে ছিলেন না। কারণ কমিন্টার্নের সঙ্গে তাঁর মতভেদ তখন প্রকট। ভারতবর্ষ থেকে নবজাত ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট পার্টির তরফে তিনজন প্রতিনিধি সেই সম্মেলনে গিয়ে হাজির হন— সিকান্দার শূর (সউকৎ উসমানি), নারায়ণ (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এবং জি এ লুহানি। তাঁরা ছাড়াও ভারতের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ক্লিমেন্স পাম দত্ত (রজনী পাম দত্তর ভাই)। এঁদের মতামত ও ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সংক্ষেপে আলোচনা করব, কারণ সে যুগের ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নীতি ও কার্যকলাপ বোঝার জন্য তা একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক। ক্লিমেন্স পাম দত্ত, তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ 'ইন্ডিয়ান পার্টি ইন দি ওয়ার্ল্ড রিভুল্যুসন'-এ গভীর-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়নে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি লেখেন : ''ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে তাদের শাসন সংস্কার করে ভারতীয় বুর্জোয়াদের উপরমহলের হাতে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে তাদের দলে টেনেছে।" এই লাইনেই ষষ্ঠ কংগ্রেসে চূড়ান্তভাবে গৃহীত থিসিসটিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই বলা হয় : ''ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যেন জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোনও যুক্ত মোর্চা গঠন না করে এবং স্পষ্টভাবেই যেন পার্টি নিজেকে তফাতে রাখে সমস্ত পেটিবুর্জোয়া দলসমূহ ও গোষ্ঠীবর্গ থেকেও।'

সি পি দত্ত অবশ্য অতদূর যেতে রাজি ছিলেন না। তাঁর এক প্রবন্ধে তিনি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির সারা ভারতে আইনসঙ্গত ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টি গড়ে তোলার রণকৌশলের প্রশংসাই করেছিলেন। ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি সউকৎ উসমানি কমিন্টার্নের থিসিসের বাঁয়ে সরে গিয়ে বললেন যে ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস্ পার্টি নামে যে জগাখিচুড়ি, বামপন্থী যুক্তফ্রন্টের নামে ভারতের কমিউনিস্টরা গড়ে তুলছে, তা অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া উচিত।

কমিন্টার্নের এই কংগ্রেসে কিছুটা ভিন্ন সুরে ও অপেক্ষাকৃত সঠিক মূল্যায়ন করে বক্তৃতা করেন ভারতের আর একজন প্রতিনিধি, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেন : ''উপনিবেশসমূহে বুদ্ধিজীবীদের শহরের পেটিবুর্জোয়াদের একটা বিপ্লবী ভূমিকা রয়েছে। সেইসব সংগ্রামী পেটিবুর্জায়াদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চার সাংগঠনিক চেহারা কী হবে? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উচিত পেটিবুর্জোয়াদের এই বিপ্লবী উৎসাহকে কাজে লাগানো। আমার স্পষ্ট মতামত এই যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চা গড়তে হলে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজান্টস্ পার্টিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং সর্বহারার নেতৃত্বে শহুরে বুদ্ধিজীবীসহ সমস্ত সংগ্রামী পেটিবুর্জোয়াদের এক ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়তে হবে।'

কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী ইতিহাসবিদরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে ভারতের কমিউনিস্টরা সব সময় তাঁদের রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করেছেন কমিন্টার্নের হুকুমে, চলেছেন একান্তভাবেই 'মস্কোর' আঁচল ধরে। ইতিহাসের তথ্য কিন্তু তা বলে না। তুলে ধরে এক জটিলতার বাস্তব চিত্র। ১৯২৮-এর ডিসেম্বর, কলকাতার ভারতের তরুণ, স্বল্প অভিজ্ঞ কমিউনিস্ট নেতৃত্বের পরিচালনায় ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টির প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে গৃহীত মূল থিসিসে লেখা হল : ''এখন বেশ কিছুকাল ধরে কংগ্রেস থাকবে একটি ঢিলেঢালা সংগঠন, যার আদর্শও থাকবে বেশ অস্পষ্ট। বুর্জোয়া নেতৃত্বেই তা পরিচালিত, কিন্তু তার সমর্থকবৃন্দের বৃহৎ অংশই পেটিবুর্জোয়া। এই সমর্থকরা এসেছেন সমাজের নানা স্তর থেকে। তাঁদের রয়েছে নানারকম রাজনৈতিক প্রবণতা। তাঁদের একাংশের মধ্যে রয়েছে বিপ্লবী সম্ভাবনা। এই যখন বাস্তব অবস্থা এবং সারা দেশ জুড়ে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজান্টস্ পার্টি যখন এখনও যথেষ্ট দুর্বল ও অসংগঠিত, তখন সঠিক রণকৌশল হবে কংগ্রেসের ভিতরে ঢুকে বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরি করা, বিপ্লবী প্রচার করা, কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের মুখোশ খুলে দেওয়া এবং তাদের বিপ্লবী অংশদের ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টির দিকে আকর্ষণ করা।"

মানবেন্দ্রনাথ রায়ও একই সময়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখলেন : ''ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী পরিবেশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন—যে দলের চালিকাশক্তি হচ্ছে ভারতের কমিউনিস্টরাই। ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টিটি নিশ্চয় কমিউনিস্ট পার্টি নয়। কিন্তু কমিউনিস্টরাই রয়েছেন তার নেতৃত্বের আসনে। জাতীয়তাবাদী জনগণের প্রগতিশীল রূপান্তরে সেতুবন্ধের কাজ করার জন্যই এ দলের জন্ম। তাই কমিউনিস্টরা একে সর্বদা সাহায্য করেছে। গত দু বছরের প্রায় সমস্ত বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছে এই দলই। কমিউনিস্টদের লক্ষ্য হচ্ছে এই দলের মঞ্চে জাতীয়তাবাদী শিবিরের সমস্ত বিপ্লবীদের জমায়েত করা, দলটিকে একটি জাতীয় বিপ্লবী গণপার্টিতে পরিণত করা—যা এই মুহূর্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।"

১৯২৯-এর গোড়াতে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামে, ভারতের শ্রমিকশ্রেণির উদ্দেশ্য এক ইস্তাহার প্রদান করা হয়। তাতে লেখা ছিল : ''শ্রমিকশ্রেণি এখন যে যুগে প্রবেশ করেছে, তা দুঃখকষ্টের" প্রচণ্ড বিপদের ও বিপুল সম্ভাবনার যুগ। শ্রেণি হিসাবে শ্রমিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলেই একমাত্র তারা বহু বছরের দাসত্ব ও দুর্গতিকে এড়াতে পারবে। শ্রমিকশ্রেণিকেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিপদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সভ্যতার এই দ্রুত অধঃপতনকে রুখতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণির সংহত শক্তিই। বুর্জোয়ারা সমস্ত গণ্ডগোল ও অশান্তির জন্য দায়ী করে কমিউনিজমকে। আমরা এর জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। কারণ এর ফলে শ্রমজীবীরা আরও ভালো করে বুঝতে পারে যে কমিউনিজমই তাদের মুক্তির প্রকৃষ্ট আদর্শ।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু কমিউনিস্টদের কার্যকলাপে গভীর উদ্বেগ বোধ করতে লাগল। ১৯২৯-এর গোড়া থেকেই ভারতের বড়লাট আরউইন, এদের বড় বড় ইংরেজ গোয়েন্দা ও বিলেতের সরকারের মধ্যে গোপনে চিঠি ও তারবার্তা চালাচালি হচ্ছিল—ভারতীয় কমিউনিস্টদের কীভাবে দমন করা যায়। ভারত সচিবকে এক গোপন তারবার্তায় বড়লাট আরউইন লিখলেন :

''ভারতের পরিস্থিতি যথেষ্ট বাঁ-দিকে মোড় নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে বড়রকমের গোলমালের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।'' এর ঠিক একমাস পরে, ফেব্রুয়ারি মাসে, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব হেগ্ সমস্ত প্রাদেশিক সরকারদের এক জরুরি বার্তা পাঠালেন যে 'ভারতীয় বিপ্লবীরা ও কমিউনিস্টরা হাত মেলাচ্ছে : খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এইসব চরমপন্থীদের শক্তি বেশি বাড়তে দেওয়া মোটেই উচিত নয়।' বোম্বাই-এর গভর্নর ও ভারতে ইংরেজ গোয়েন্দাপ্রধান ইসঙ্গার দুজনেই সুপারিশ করলেন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হোক। এই মামলার উদ্দেশ্য হবে 'পার্টি সংগঠনকে ভেঙে চুরমার করা, নেতাদের গ্রেপ্তার করা, কমিউনিস্টদের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতিকে জনসমক্ষে পেশ করা, যাতে দেশের বহু লোকই সরকারের কাজকে সমর্থন করে।' ভারত সরকারের বড় কর্তারা এর উপর মন্তব্য করলেন যে ভারতীয় জুরিদের সামনে যদি এই ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হয়, তবে কমিউনিস্টরা সম্ভবত খালাস পেয়ে যাবে, কারণ ভারতের রাজনীতিবিদরা কমিউনিস্টদের প্রতি বেশ খানিকটা সহানুভূতিশীল এবং জুরির সদস্যরা জনমতের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। বহু শলাপরামর্শের পর বড়লাট আরউইন ও ইংরেজ গোয়েন্দা-চূড়ামণিরা স্থির করলেন যে সারা ভারতে কমিউনিস্ট নেতাদের অতর্কিতে গ্রেপ্তার করে, উত্তরপ্রদেশের কোনও একটি শহরে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হোক, কারণ উত্তরপ্রদেশে এদের বিচারের জন্য জুরি রাখার প্রয়োজন হবে না। সেই জন্যই তাঁরা শেষ অবধি বেছে নিলেন উত্তর প্রদেশের ছোট্ট শহর মীরাটকে।

১৯২৯-এর ২০ মার্চ, সারা ভারতে একই সঙ্গে তল্লাশি ও ধরপাকড় চালিয়ে, ইংরেজ সরকার বোম্বাই, কলকাতা, কানপুর ও লাহোর থেকে ৩১ জন কমিউনিস্ট ও শ্রমিকনেতাকে গ্রেপ্তার করলেন। তাঁদের মধ্যে রইলেন ৩ জন ইংরেজ—ফিলিপ স্প্র্যাট, বেঞ্জামিন ব্র্যাডলি ও লেস্টার হ্যাচিনসন। বোম্বাই থেকে ধৃত হলেন ১২ জন; এস ভি ঘাটে, এস এস মীরাজকর, কে এম যোগালেকর, আর এস নিম্বকর, এস এ ডাঙ্গে, গঙ্গাধর অধিকারী, এম জি দেশাই, এম এইচ ঝাবওয়ালা, এ এ আলওয়ে, ভি থেংডি, এল কদম ও জি আর কাম্‌লে; বাংলা থেকে এলেন ৮ জন—মুজফ্‌ফর আহমদ, সামসুল হুদা, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, রাধারমণ মিত্র, কিশোরীলাল ঘোষ ও শিবনাথ ব্যানার্জী; উত্তরপ্রদেশ থেকে পি সি যোশী, অযোধ্যা প্রসাদ, গৌরীশঙ্কর ও বিশ্বনাথ মুখার্জী; পাঞ্জাব থেকে মোহন সিং যোশ, আবদুল মজিদ ও সউকৎ উসমানি। শুরু হয়ে গেল ভারতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল ও দীর্ঘস্থায়ী মামলা 'মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা'—যার মাধ্যমে এই প্রথম কমিউনিস্ট মতাদর্শের কথা সারা ভারতের শিক্ষিত অংশের মানুষ ও শ্রমিক-কৃষক সংগঠকদের কাছে পৌঁছে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে মীরাট বন্দিদের বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ চার্জশিট পেশ করা হয়।

বিশ্ব-অর্থনৈতিক মহামন্দা ও সুতীব্র শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধনিক-বণিক গোষ্ঠীর আক্রমণের হাতিয়ার ভারতে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় ৩২ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে যার অধিকাংশই ছিলেন কমিউনিস্ট। এর কয়েকদিনের মধ্যেই দিল্লির আইনসভায় সশব্দে বোমা-ফাটিয়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বধির ইংরাজের কানে সশস্ত্র বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। লাহোরের কারাকক্ষে তাঁরা এই উপলব্ধিতে এসেছিলেন যে লেনিনের পার্টিই হবে তাঁদের অনুপ্রেরণা, সোভিয়েতের পথই হওয়া উচিত তাঁদের পথ। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৯-৩৩ সাল) প্রভাব সমকালীন সশস্ত্র বিপ্লববাদী-আন্দোলনের উপর যথেষ্টই পড়েছিল। বিশেষ করে মজফ্‌ফর আহমেদ প্রমুখ আঠারোজন মীরাট মামলার কমিউনিস্ট বন্দি আদালতের কাঠগড়া থেকে যে রাজনৈতিক বিবৃতি পেশ করেছিলেন তা ভারতের মার্কসবাদ ও কমিনিস্টদের সম্পর্কে সমগ্র বিপ্লববাদী মহলে প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি করে। মুজফ্‌ফর আহমদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পরিচালনার দ্বারা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও ভাবধারা প্রশমিত না হয়ে প্রসারিত হয়েছে।

বাংলার বিভিন্ন জেলে ১৯৩২-৩৩ সাল থেকেই ব্যাপকভাবে বিপ্লবী বন্দিরা মার্কসবাদের চর্চা শুরু করেছিলেন। আলিপুর, প্রেসিডেন্সি, মেদিনীপুর, বহরমপুর, ঢাকা, হিজলী এবং দেউলি ও বক্সার বন্দিশিবিরে কয়েক হাজার বন্দি সে সময় ছিলেন। ''এদের মধ্যে কমিউনিজমের আদর্শ প্রচারে প্রধান পথিকৃৎরা হলেন আব্দুল হালিম, সরোজ মুখার্জী, কালী সেন, রেবতী বর্মণ, আব্দুর রেজ্জাক খান, ভবানী সেন, বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ। আন্দামানে দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেন। এঁদের অনেকেই কংগ্রেস-পরিচালিত আইন-অমান্য আদোলনেও অংশ নিয়েছিলেন। আন্দামান সেলুলার জেলকে অনেক কমিউনিস্ট বিপ্লবীই 'মার্কসবাদী বিশ্ববিদ্যালয়' রূপে অভিহিত করেছেন। এখানে 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন' গঠন প্রসঙ্গে বিপ্লবী নলিনী দাস লিখেছেন : ''সেলুলার জেলে বন্দি সকল কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কমরেড সম্মিলিতভাবে পড়াশুনার মাধ্যমে নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে সুশিক্ষিত করে তোলেন।'' সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৫ সালের ১ মে আন্দামানে প্রথমে যে পঁয়ত্রিশ জন বন্দিকে নিয়ে কনসোলিডেশন গঠিত হয়েছিল তাঁরা এসেছিলেন অনুশীলন, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, শ্রীসংঘ, রিভোল্টিং গ্রুপ, চট্টগ্রাম গ্রুপ এবং হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন (HSRA) থেকে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৪ সালকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়কালরূপে চিহ্নিত করা চলে। ওই বছরের ৬ জুন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জাতীয় কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন—হোম মেম্বার হেইগ-এর উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের লড়াইয়ের প্রথম পক্ষকে সমর্থন। ড. ত্রিপাঠীর অনুমান সঠিক। শুধুমাত্র হেইগ নয়, কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের বিরুদ্ধে মেঘের আড়াল থেকে লড়বার জন্য গান্ধীজি বোম্বাই অধিবেশনে (অক্টোবর ১৯৩৪) কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সকল প্রকার দলীয় পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাছাড়া আইন অমান্য আন্দোলন ও গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার গ্লানিও কিঞ্চিৎ ছিল। প্রায় রাজনৈতিক সন্ন্যাস। অপরদিকে জওহরলাল নেহরুর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে জন্ম নিল মার্কসবাদী জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, রাম মনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, মিনু মাসানী, মধু লিমায়ে, নাম্বুদ্রিপাদ প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল (CSP)। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তখন নানাভাবে ও নানা পথে বিভক্ত। এছাড়া হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসী যাঁরা 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব মানতে রাজি ছিলেন না।

এই বহুমুখী বিরোধিতা ও দ্বন্দ্বের জটিল অভিঘাতে ১৯৩৪ সালে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীবাদের উপরে যে তীব্র আঘাত এসেছিল তা ইতিপূর্বে কখনোই আসেনি। গান্ধীজির জাদুকরী ব্যক্তিত্ব, আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠার তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের সাধুসুলভ ভক্তি শ্রদ্ধা—সবই যেন ওই সময়ে টলে ওঠে। ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টিও মনে করতে শুরু করে গান্ধীবাদের স্থলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করার এটাই মোক্ষম সময়। ইতিমধ্যেই ১৯৩৩ সালে এই উদ্দেশ্যে একটি সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও এই সময়কালে শুরু হয়। মীরাট মামলার জন্য এ সময় কমিউনিস্টদের নীতি-আদর্শ-কার্যকলাপ সম্পর্কে রাজনীতি-সচেতন জনমানসে কিছুটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় অনুকূল পরিস্থিতি ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে অতীতে আসেনি। জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রমশই কমিউনিজমের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সময় শ্রমিক সভাগুলির চরম বিপ্লবাত্মক বক্তব্যগুলি এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না এবং তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে। সমসাময়িক গোয়েন্দা রিপোর্টে তার প্রমাণ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের আর বাড়তে দেওয়া উচিত মনে করেনি এবং ১৯৩৪-এর ২০ জুলাই 'ইনপ্রেকর' (International Press Correspondence)-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির থিসিস (Draft Platform of Action) প্রকাশের তিন দিনের মধ্যেই ২৩ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যখন গড়ে ওঠার মুখে, তখন তার নিষিদ্ধকরণ নিঃসন্দেহে পার্টির সংগঠকদের চূড়ান্ত অসুবিধার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সারা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা তখন মাত্র ১৫০ জনের মতো। কিন্তু তার থেকেও বড় বিষয় হলো যে ২৫০০ মতো সশস্ত্র বিপ্লববাদী এই সময় দেশের বিভিন্ন বন্দিশিবিরে, কারাগারে, এমনকি আন্দামান সেলুলার জেলে পর্যন্ত নিজেদের 'সন্ত্রাসবাদী' চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে মার্কসবাদ ও কমিউনিজম্-এর মতাদর্শের প্রতি ক্রমশই আকৃষ্ট হতে শুরু করেছেন। ১৯৩০-৩৪ সালে বাংলার রাজনৈতিক বন্দিদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই মাত্র কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছিল ততই সশস্ত্র বিপ্লববাদী কর্মীরা 'সন্ত্রাসবাদ'-এর পথ পরিত্যাগ করে ক্রমেই কমিউনিজমের পথ বেছে নিতে শুরু করেছিলেন। সারা দেশে বিভিন্ন জেলখানা ও বন্দিশিবিরে সব মিলিয়ে অন্তত দশ হাজার রাজনৈতিক বন্দি সে সময় ছিলেন। এঁদের মধ্যে বাঙলা প্রদেশে মার্কসবাদের আদর্শ প্রচারের প্রধান পথিকৃৎরা হলেন আব্দুল হালিম, সরোজ মুখার্জী, রেবতী বর্মণ, আব্দুর রেজ্জাক খান, কালী সেন, ভবানী সেন প্রমুখ। অবশ্য মার্কসবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তখনও সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। যদিও সে অভাব পূরণের জন্য সদ্য ইউরোপ-প্রত্যাগত প্রবাসী বিপ্লবী ও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ড. ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ)-র চেষ্টার অবধি ছিল না। ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে সতেরো বছর পর দেশে ফিরে লেনিনের নির্দেশপ্রাপ্ত ভুপেন্দ্রনাথ দেশের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে মার্কসবাদ প্রচারে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তরুণ সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের তিনি ধৈর্য সহকারে বুঝিয়েছিলেন 'সন্ত্রাসবাদ'-এর সীমাবদ্ধতা ও নিষ্ফলতা কোথায়। তাঁদের দীক্ষিত করেছেন মার্কসবাদে, উৎসাহিত করেছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রভাব (১৯২৯-৩৩) সমকালীন সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের উপর তীব্রভাবে পড়েছিল। বিশেষত মুজফ্ফর আহমদ সহ আঠারোজন কমিউনিস্ট বন্দি আদালতের কাঠগড়া থেকে যে তত্ত্ব সমৃদ্ধ জবানবন্দি পেশ করেছিলেন তা ভারতে মার্কসবাদ ও কমিউনিজম সম্পর্কে বিপ্লবী মহলে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি করে।

।। ৫ ।।

বস্তুতপক্ষে, শ্রেণি-রাজনীতির সঙ্গে জাতীয় বিপ্লববাদী আন্দোলন এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন জাতীয় রাজনীতির একটা সংযোগ সাধনের প্রয়াস তিরিশের দশকের এই কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির মাধ্যমেই কিছুটা হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। এই গোষ্ঠীগুলির কিছু সদস্য ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছুদিন সশস্ত্র-বিপ্লববাদী রাজনীতির (যুগান্তর বা অনুশীলন সমিতি ইত্যাদি) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন এবং এঁদের অনেকেই দেশব্যাপী গণ-আইন-অমান্য আন্দোলনে শুধু অংশগ্রহণ করেননি, কোথাও কোথাও আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই আন্দোলনকে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ দিতে তৎপর হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের ৭ জুলাই থেকে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা অঞ্চলে যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়, তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ'-এর সদস্যরা। চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য দেনের নেতৃত্বে ভগৎ সিং-এর হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেরণায় চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ সংগঠিত হয় ১৯৩০ সালে, ১৯৩৪ পর্যন্ত যা অব্যাহত ছিল। এর দেড়মাস পরেই ১৯৩৪-এর ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। বাংলা তথা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন অবশ্য এর দ্বারা তখন মারাত্মক কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। কারণ নানা ধরনের প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির (ব্রিটিশদের ভাষায় 'টেরো-কমিউনিস্ট') মাধ্যমেই কমিউনিস্ট নেতৃত্ব নিজেদের কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছিলেন। এই কর্মসূচির মুখ্য বিষয়গুলি ছিল—

১) শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে নিজেদের প্রভাবিত ইউনিয়ন গড়া।
২) কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগসূত্র ঘটানো।
৩) ছাত্র-যুব, বিশেষ করে তরুণ বিপ্লবীদের কমিউনিজমের আদর্শে দীক্ষিত করা।
৪) মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গান্ধীবাদ-বিরোধী মানসিকতা গড়ে তোলা।
৫) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা উচ্ছেদ করে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন।

এই কারণে শুধুমাত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা নিশ্চিত হতে পারেনি, অপরাপর ছোট বড় কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির কর্মতৎপরতাও ব্রিটিশ সরকারের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হতে থাকে। ১৯৩৫ সালের ১ মার্চ (৭ মার্চ গেজেটে প্রকাশিত) বেঙ্গল গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের এক ঘোষণা (১৯০৮-এর ইন্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের ১৬ নং ধারা অনুযায়ী) দ্বারা ১৩টি কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট- প্রভাবিত সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়। এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে। দলে দলে কমিউনিস্টরা প্রথমে জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল এবং পরে মূল জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য পদ গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৩৫-৩৬ এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে নানা সীমাবদ্ধতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেও এই সময়কাল থেকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন প্রকৃত অর্থে সর্বভারতীয় — সর্বাত্মক জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে থাকে কমিউনিস্ট পার্টির 'যুক্তফ্রন্ট' নীতি গ্রহণের দ্বারা।

জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের অবশ্য সর্বাধিক বীতরাগ ছিল

মার্কসবাদী ‘শ্রেণিতত্ত্বের’ প্রতি। কমিউনিস্টরা যে কারণে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে চিরকাল উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছিল। শ্রেণিদ্বন্দ্বের মতবাদ জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী ও সে-কারণে জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক—এরূপ ধারণা কংগ্রেসের উপরিভাগের নেতৃত্বকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তাঁরা এই সত্য বিস্মৃত হয়েছিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আরো বড় প্রতিবন্ধক। অথচ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাঁরা তারই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। শ্রেণিদ্বন্দ্বের কারণ ছিল ১৯৩১-৩৪ সাল পর্বে ভারতব্যাপী কমিউনিস্ট ও রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরাট বিরাট শ্রমিক আন্দোলনগুলি।

তথাপি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সূচনাপর্ব থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের বিস্তৃত মঞ্চকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রয়াসে নিজেদের কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করতে সক্রিয় হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলতে তারা ব্যর্থ হয়। কমিউনিস্টদের সঙ্গে কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের সংযোগ ও বিচ্ছিন্নতার চিত্রটি ছিল পর্যায়ক্রমে এই রকম : ১৯২০-২৯ (সংযোগ); ১৯৩০-৩৪ (বিচ্ছিন্নতা); ১৯৩৫-৪১ (সংযোগ); ১৯৪২-৪৫ (বিচ্ছিন্নতা), ১৯৪৬-৪৭ (বৈরিতা)। লক্ষণীয় যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শেষ দুটি বছর কমিউনিস্ট-কংগ্রেস সম্পর্ক শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, বৈরিতামূলকও হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু মনে করতে শুরু করে! তৎসত্ত্বেও এটা উপেক্ষণীয় নয় যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ ধারায় কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা মোট ২৭ বছরের মধ্যে অন্তত ১৭ বছর সম্মিলিত ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল। এর মধ্যে নিঃসন্দেহে ১৯৩৫-৪১ সাল পর্যন্ত যুক্ত বা ইউনাইটেড ফ্রন্টের নীতি অনুসারে পরিচালিত সময়কাল ছিল সর্বাধিক উজ্জ্বল। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৩৫ সালটি ছিল এক দিক্‌নির্ণায়ক সময়। বিগত প্রায় সাত বছরের বামপন্থী বিচ্যুতি ও সংকীর্ণতার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে (২৫ জুলাই—২০ আগস্ট, ১৯৩৫) গৃহীত জর্জি ডিমিট্রভের ‘ইউনাইটেড ফ্রন্ট’ নীতির বাস্তব রূপায়ণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মতো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও ঘটাতে শুরু করে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৩৫-৩৬ এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে নানা সীমাবদ্ধতা ও অর্ন্তদ্বন্দ্বের মধ্যেও এই সময়কাল থেকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন প্রকৃত অর্থে সর্বভারতীয় ও সর্বাত্মক জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে থাকে এবং ক্রমশ এই ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের লক্ষ্যেও পরিচালিত হতে শুরু করে। বিশেষত কংগ্রেসের আন্দোলন ও সংগঠনে কমিউনিস্টদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ জাতীয় আন্দোলনে এক ‘প্রভাবশালী’ বা বামপন্থী ধারার জন্ম দেয়—যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। ডিমিট্রভের ‘যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব’ এবং তার সূত্র ধরে ‘দত্ত ব্রাডলে (R. P. Dutta & Ben Bradley) থিসিস’ শুধুমাত্র ভারতীয় কমিউনিস্টদের নয়, জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে বামপন্থী শক্তি এবং সোশ্যালিস্ট গ্রুপকেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী একটি ব্যাপক সংগ্রামী মঞ্চ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। ভারতের মাটিতে এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

‘যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব’-র বাস্তব প্রয়োগের দ্বারা সদ্য-কারামুক্ত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বাংলার এই সময়ে বে-আইনি যুগে যেমন জেলায় জেলায়, যাবতীয় ঔপনিবেশিক দমননীতির সম্মুখে গ্রামে-নগরে-শিল্পাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সংগঠন গড়ে তুলতে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি পাশাপাশি জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী রূপেও তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ধারাটিকে শক্তিশালী করে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারায় পরিচালিত করার ক্ষেত্রে বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই পর্যায়ের ভূমিকা ছিল নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক-শ্রমিকদের শ্রেণি সংগ্রামকে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার অন্যতম কৃতিত্ব কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের পাশাপাশি কমিউনিস্টদেরও যে ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এছাড়া বামপন্থী বা মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের গণ-আন্দোলনে তথা সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও এসময়ে কমিউনিস্টদের ভূমিকা অনবদ্য। বিপরীতে দেখা যায় ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তীব্রভাবে সমালোচনা করলেও, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে তাঁরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিয়েই অংশগ্রহণ করেছিল। দক্ষিণপন্থী নেতারা বামপন্থী-কংগ্রেসিদের বুঝিয়েছিল ব্রিটিশ শাসন-সংস্কার ধ্বংস করার জন্যই তাঁরা প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আপসহীনতার যারা পক্ষপাতী ছিল কংগ্রেস-অনুগামী সেই বিশাল জনতা এবং বামপন্থীরা দেখল প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ-বিড়লাদের ক্ষমতালিপ্সু কৌশলই জয়যুক্ত হল। বাংলা ও পাঞ্জাব ছাড়া ক্রমশ প্রায় সবগুলি প্রদেশেই কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা গঠিত হল। সংসদ-সর্বস্বতার কাছে এমনকি জওহরলাল নেহরুও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। যদিও CSP-CPI-র সঙ্গে তিনি তখনও ‘ফেডারেশন’-বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সুভাষচন্দ্রের মতন এই বিরোধিতা আপসহীন ছিল না। যা হোক, ১৯৩৭-৩৯ সালে বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন এই প্রেক্ষাপটেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠছিল। অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন, ‘‘নেহরুর সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি না পেলে শেষপর্যন্ত কংগ্রেস জনগণের কতটা সমর্থন আদায় করতে পারত তা বলা যায় না। ১৯৩৭-র নির্বাচন কংগ্রেসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নেহরুর Charisma ও বামপন্থীদের জনসংযোগ কংগ্রেসের বিপুল জয়ের পিছনে ছিল।’’ বাংলা থেকে তখন যে ৬১ জন এ.আই.সি.সি সদস্য ছিলেন, তার মধ্যে ৫ জন ছিলেন কমিউনিস্ট। এঁরা হলেন বঙ্কিম মুখার্জী, কালিপদ মুখার্জী, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এবং মুজফ্‌ফর আহমেদ। সুভাষ ও জহরলালের নেতৃত্বের প্রতি United National Front-এর নীতিতে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট নেতৃত্বের যথেষ্ট আস্থা ছিল।

।। ৬ ।।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে কালপর্বটি (১৯৩৫-৪৭) নিয়ে অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা সংক্ষেপে যে আলোচনা করলাম—সেই সময়কালটি ছিল বস্তুতপক্ষে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির গড়ে ওঠার সূচনাকাল। ফলে তার মধ্যে নানাস্তরে ও পর্যায়ে অপরিণত বৈশিষ্ট্যাবলী এসময়ে দেখা গেছে। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের (অর্থাৎ দেশজ নয়) একটি ভাবাদর্শ নিয়ে পথ চলা দলের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারতীয় কমিউনিস্টরা তাদের ভুল-ত্রুটিগুলিকে

স্বীকার ও আত্মসমালোচনা করতো এবং দ্রুত নিজেদের সংশোধিত করতে সচেষ্ট হতো। ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এজাতীয় প্রয়াস সচরাচর দেখা যায়নি। সমালোচকরা তাই কমিউনিস্টদের সংশোধিত হওয়ার এই সদিচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে যখন তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলিকেই বড় করে দেখাতে থাকেন, তখন তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হওয়া যায় কি?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন বা কাজ করেছেন বেশ কয়েকজন মার্কসবাদী বিদ্বজ্জন। কিন্তু তাঁরা সম্ভবত একধরনের বিষাদজিনত নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত। এঁদের কেউ কেউ আলোচ্য সময়কালে প্রত্যক্ষভাবে নিজেরাও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সক্রিয় ছিলেন। তাই তাঁরা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পরিণতি ও কমিউনস্ট আন্দোলনের মধ্যেকার সম্পর্ক ও তার তাৎপর্য বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসেন, তখন প্রায়শই 'অলমোস্ট-রেভ্যুলিউশন', 'অসমাপ্ত-বিপ্লব', 'অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি শব্দবন্ধগুলি তাঁদের চিন্তাভাবনাকে স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত করে। এর সুযোগ নেন ভিন্ন ধারার ঐতিহাসিকবৃন্দ। ভারতের স্বাধীনতা লাভ যে ছিল নানা অর্থে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, সে বিষয়ে আজ অনেকেই একমত। কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে যে ভূমিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য ছিল—নানা বাস্তব কারণে তা পালন করতে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব অনেকাংশে অসফল হয়েছিল। এই অসফলতার কার্য-কারণ অনুসন্ধান অবশ্যই করা প্রয়োজন। কিন্তু তা করতে গিয়ে একশ্রেণির তাত্ত্বিক ও বিদ্বানরা যখন 'যত নষ্টের গোড়া' রূপে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন—তা যেমন অনৈতিহাসিক; তেমনি মার্কসবাদী গবেষক ও ইতিহাসকাররা যখন নিছকই অতীত-ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে অনাবশ্যক কী হয়নি তার হিসাব মেলাতে ব্যস্ত থাকেন—তখন তার মধ্যেও ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় জনগণ তথা কমিউনিস্টরা স্বাধীনতার যে ফল ভোগ করার প্রত্যাশা করেছিলেন তা সফল হয়নি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণি-ঐক্যকেই শুধু ব্যাহত করেনি, তা এই খণ্ডিত উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদকে 'নয়া-ঔপনিবেশিক' কায়দায় নতুনভাবে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতেও সাহায্য করেছিল। ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিরূপে যাঁরা কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেন—তাঁরা দুর্ভাগ্যবশত 'সামাজিক গণতন্ত্রী'র আচ্ছাদনে মুলত 'মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া (Compradore Bourgeois) রূপেই বিদেশী পুঁজি ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে একধরনের সুবিধাবাদী আপস-রফা করেই কাজ করতে থাকে— স্ব-শ্রেণি স্বার্থরক্ষাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি তাদের দেশভক্তি ও জাতীয়তাবোধের সেটুকুই প্রকাশ ঘটাতে ও প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিল—যেটুকু নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য না করলেই নয়। অবশ্য এই প্রশ্নে তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছিল না—তা বলা চলে না। স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরে এই দ্বন্দ্ব নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে (এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় অনুঘটক নিঃসন্দেহে ছিলেন নেহরু)—কখনো গান্ধী, কখনো প্যাটেলের হস্তক্ষেপে আবার তা মিটেও গেছে। মাঝখান থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি—যারা মনে করেছিল কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থার এই বিরোধকে ব্যবহার করে এবং মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে 'জাতীয় স্বাধীনতা (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব)' ও 'সমাজতন্ত্র' একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে ঠিক পৌঁছে যাবে; ভারতে প্রতিষ্ঠা পাবে শোষণমুক্ত, অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন ও সমানাধিকার-ভিত্তিক এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা—সে প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার বেদনায় তাঁরা যে আহত হবেন তা বলাই বাহুল্য।

কমিউনিস্টরা নীতিগত ভাবে তীব্র সংকটে পড়ে বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগে। ১৯৪২-৪৫-এর জনযুদ্ধের তিন বছর যখন সারা ভারতে বিপ্লবী পরিস্থিতি ছিল সর্বাপেক্ষা অনুকূল—তখন কমিউনিস্টদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা জাতীয় আন্দোলন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। আমাদের আলোচ্য সময়কালে (১৯৩৪-৪৭) মাত্র এই সংক্ষিপ্ত অথচ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বছরেই জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরাতে হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে। ১৯৪৬-৪৭ সালেও কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত ও কার্যত একঘরে হয়েও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম থেকে CPI এরকম বিচ্ছিন্ন (alienated) কখনোই হয়নি যা ১৯৪২-৪৫ সালে তাকে হতে হয়েছিল। অথচ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও স্বকীয়তাবোধের প্রয়োগ ঘটিয়ে CPI-এর সামনে সুযোগ ছিল ১৯৪৩ সালের সূচনাকালেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির দায়বদ্ধতা পালন করেও (এই সময় স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনী জার্মানীর আক্রমণ প্রতিহত করে প্রত্যাঘাত শুরু করে দেয়) স্বদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার। চীনে মাও- সে-তুঙের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বাহিনী একই সঙ্গে চিয়াং-কাই-সেককে এবং জাপানী আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্টরা সে সময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ও উপযুক্ত পন্থা অনুসন্ধানে কেন সেদিন চীনের দিকে নজর ফেরাননি—এ প্রশ্নের সমাধান মেলেনি। জানা যায় ১৯৫০ সালে ভারতীয় কমিউনিস্টদের এক প্রতিনিধিদলকে স্তালিন ভর্ৎসনা করেছিলেন 'জনযুদ্ধ' নীতির সময়কালকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে দীর্ঘয়িত করার জন্য। এমনকি স্বদেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে না হটিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তা নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্টদের অতিরিক্ত তৎপরতাকে স্তালিন শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে সমালোচনাও করেন।

১৯৪৬-৪৭ সালের শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ ও উত্তাল গণআন্দোলন কমিউনিস্টদের পুনরায় বিপ্লব সংঘটনের স্বপ্ন দেখায়। সুচেতা মহাজন এ-বিষয়ে যতই প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করুন না কেন—দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিস্থিতি সে-সময়ে যথেষ্ট অনুকূল ছিল। কিন্তু বাস্তব সত্য হল তা সংগঠিত করার শক্তি, সামর্থ্য এবং মানসিকতা আমাদের দেশে প্রধানত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের ছিল না। গ্রামশ্চি বুদ্ধিজীবীদের যে বিপ্লবী ভূমিকার কথা লিখে গেছেন, ভারতে অন্তত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা অধিকাংশই সেই বিরল গুণসম্পন্ন ছিলেন না। পেটি-বুর্জোয়া নানাবিধ পিছুটান তাঁদের বিপ্লব-অভিলাষ পূরণের অন্তরায় ছিল। কংগ্রেস-লীগের পশ্চাদনুবর্তিতাই ছিল যেন তাদের একমাত্র ভবিতব্য—একক নেতৃত্ব প্রদানের সাহস ও সক্ষমতা কমিউনিস্টরা দেখতে পারেনি। সুতরাং অহেতুক 'বিপ্লব-বিলাসী' হয়ে—অজাত সন্তানের বেদনায় বৃথা বিলাপের কোনো অর্থ নেই! তবে এবিষয়ে সন্দেহ থাকার কারণ নেই যে ভারতীয় কমিউনিস্টরা যে ধরনের 'সুখী ও স্বাধীন ভারতের' স্বপ্ন দেশবাসীকে দেখিয়েছিল, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের 'খণ্ডিত স্বাধীনতা' তাদের সে আকাঙ্ক্ষাকে অধরাই রাখে।

লেখক : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক

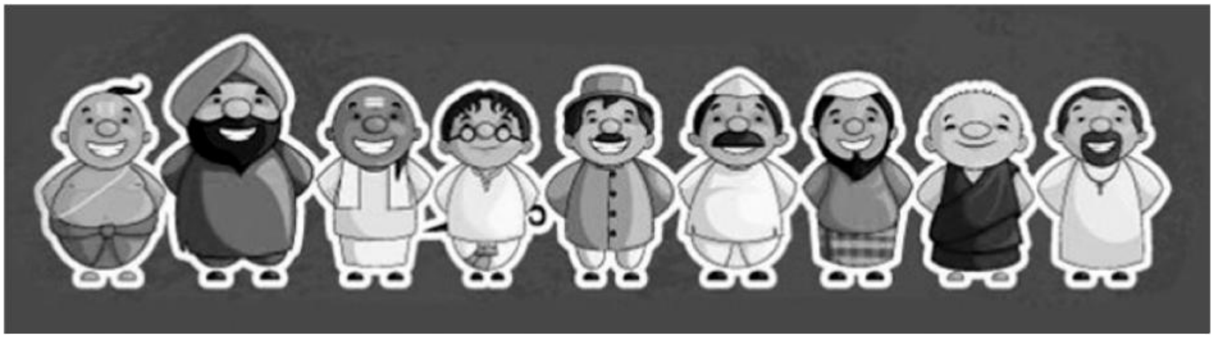

সেক্যুলারিজ়ম কেন চাই

আভাস রায়চৌধুরী

কিসের সেক্যুলারিজ়ম? কী দরকার? কানে তালা ধরিয়ে দেওয়া শব্দ যেমন মস্তিষ্কে আঘাত করে তেমনই হঠাৎ উদ্ধত প্রশ্ন দুটো সম্বিত ফেরালো আমার। বর্ধমান থেকে আসানসোলের দিকে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন। মানকর পেরোতেই দু-দিকে জমির ধারে ধারে সবে কাশফুল ফুটতে শুরু করেছে। আমার দৃষ্টি চলে গেছে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠের যতদূর যাওয়া যায়। প্রথম শরতে নীল আকাশে সবে সাদা মেঘের ভেলা ভাসা শুরু হয়েছে। কোন সুদূরে গিয়েছিল মন এখন মনে নেই, প্রশ্নদুটোর কর্কষ আওয়াজে আবার ফিরে এসেছিল ট্রেনের কামরায়। তাকিয়ে দেখি পোশাক পরা এক অফিসযাত্রী। সামাজিক পরিস্থিতির হালফিল পরিবর্তন অজানা নয়, তবু ভয়ঙ্কর কষ্টকর অনুভূতি হল। আমরা এ প্রজন্ম ছেচল্লিশ দেখিনি, দেশভাগ দেখিনি, তবে বিরানব্বই দেখেছি, দু-হাজার দুই দেখেছি। এই বাংলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দেয়নি। সরকারের ভূমিকা অবশ্যই ছিল, বামপন্থী দলগুলির বলিষ্ঠ ভূমিকা তো ছিলই, কিন্তু সব থেকে সহায়ক ছিল বাংলার জনসমাজ, সাম্প্রদায়িকদের জায়গা দেয়নি। বাংলার অসাম্প্রদায়িক জনসমাজ নির্মাণে শ্রমজীবীদের শ্রেণিসংগ্রামের বলিষ্ঠ ভূমিকা তো ছিলই। সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত গঠনে উনিশ শতকের জাগরণ নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। সেই বাংলার বর্তমান তরুণতর প্রজন্ম যাদের বেড়ে ওঠার শৈশব কৈশোর তো কখনোই সাম্প্রদায়িক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত নয়, তবে কেন আজ তাদের একটা বড়ো অংশ সাম্প্রদায়িক ভাবনা দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন? বাংলার, ভারতের সমাজ-সংস্কৃতিতে এ বড়ো দুঃসময়। এটা বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ, এটা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ। আমাদের সভ্যতার প্রগতিমুখীনতার দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

ট্রেন থামলো রানিগঞ্জে। রানিগঞ্জ, ব্রিটিশ মালিকের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে পিছিয়ে যায়নি কাগজকলের ভুখা শ্রমিকরা, শহিদ হয়েছিলেন সুকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্রিটিশ মালিকের ধর্মঘট ভাঙতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ষড়যন্ত্রও সেদিন ব্যর্থ করেছিল লড়াকু শ্রমিকশ্রেণি। এ কি সেই রানিগঞ্জ? আজ যেখানে ধর্মের নামে দাঙ্গা হয়, দাঙ্গা বাধায় শাসকেরা। আবার ছুটে চলেছে ট্রেন, আমার ভাবনায় ছুটছে। এই পথেই কি বিদ্যাসাগর সভ্য বাঙালি সমাজ ছেড়ে গেছিলেন কর্মাটাঁড়ে। কী জানি হবে হয়তো। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন প্রেরণা পেয়েছিল উনিশ শতকের জাগরণ থেকেই, কালক্রমে বিকশিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐতিহ্য, বহুত্ববাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতা। আবার এটা ভুলে গেলে চলবে না উনিশ শতকের জাগরণ এসেছিল পরাধীনতার পত্রপুটে। এই সীমাবদ্ধতার ফলই হল ব্রিটিশের ডিভাইড অ্যান্ড রুলের শিকার হওয়া আমাদের সমাজ রাজনীতি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সদর রাস্তা যদি হয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আকাঙ্ক্ষা, তবে কানাগলিতে বাসা বেঁধেছিল ধর্মীয় পরিচয় কিংবা সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ধারণা। কিছু পরে ট্রেন পৌঁছল আসানসোলে। এবার আমার নামার পালা। পায়ে চলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই নজর গেল আমার প্রিয় রেলপাড়ের দিকে। রাত থাকতে ঘর থেকে বেরোনো আর রাত হলে ঘরে ফেরা কয়েক হাজার শ্রমজীবী মানুষের বাস। এখানে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত আজানের ডাক ও সকাল সন্ধ্যা মন্দিরে ঘন্টার ধ্বনি শোনা যায় দশকের পর দশক ধরে। জাতধর্মের পার্থক্য থাকলেও এখানকার সাধারণ মানুষ তা নিয়ে দাঙ্গা চান না কখনও। কিন্তু অন্ধকারের জীবেরাও এখানে তৎপর। এই তো সেদিন রাম আর আল্লার নামে অন্ধকারের জীবদের ষড়যন্ত্রে যখন দাঙ্গার আগুন জ্বলল, রেলপাড়ে খুন হল ষোল বছরের কিশোর, তখনও হয়তো এখানে কোনো উদ্ধত আস্ফালন শোনা গিয়েছিল—কিসের সেক্যুলারিজ়ম! কিন্তু এখানেই দাঙ্গায় পুত্রহারা নূরানি মসজিদের ইমাম হোঁশ না হারিয়ে দাঙ্গা রুখেছিলেন।

সময় এখন বড়ো জটিল। বলা ভালো রাক্ষসী সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা। আমাদের সমাজসভ্যতার যা কিছু ভালো দিক তার সবটাই গিলে খেতে চায় এ অসময়। চারি দিকে বিভ্রান্তি। যুক্তির বিনাশের অন্ধকার রাত্রে গভীর খাদের পাড় ধরে চলেছি আমরা। চলা থামলেই ধসে পড়া, তাই ধীরে চলা, বুঝে চলা— কিন্তু চলা, থামা নয়। বিরানব্বইয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনে কিংবা ২০০২-এ গুজরাট গণহত্যার দিনে সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে আক্রমণ করেছে, কখনও ধর্মনিরপেক্ষতার বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে কিংবা ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে নিজেদের মুখ লুকিয়ে চলতে চেয়েছে কিন্তু আজকের মতো সেক্যুলারিজ়মকেই বাতিল করতে সাহস দেখায়নি।

নরেন্দ্র মোদির নতুন ভারতে আর এস এস-এর কার্যকলাপ জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজকে ভয়ঙ্করভাবে সাম্প্রদায়িক করে তুলছে। পৃথিবীতে, ভারতে সেক্যুলারিজ়ম কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতা

কোন্ পথে এসেছে, কী বার্তা বহন করছে, এক বড়ো অংশের মধ্যে এই ধারণার অনুপস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে সংঘ পরিবার ও তাদের শত্রুবেশী বন্ধুরাও।

সেক্যুলারিজ়ম শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আমরা করেছি ধর্মনিরপেক্ষতা। এটা হয়তো সহজবোধ্য, তাই ব্যবহার করা ভালো। কিন্তু ঠিকঠাক বাংলা করলে দাঁড়ায় 'ইহজাগতিক' অর্থাৎ বস্তুজগতেই যার অস্তিত্ব। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির স্থান নেই। মানুষের জীবন নিয়তিনির্দিষ্ট নয়, ব্যক্তি মানুষ তার সহজাত বুদ্ধিশীলতার সাহায্যেই নিজের আচরণ ও জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে সক্ষম। এদিক থেকে দেখলে সেক্যুলারিজ়ম পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী এবং মানবতাবাদের সমার্থক। এ নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে চেতনায় বস্তুবাদী না হলে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায় না।

তবে শুরু থেকে বিকাশের বর্তমান সময় পর্যন্ত সেক্যুলারিজ়ম ধারণার অনুশীলনের সঙ্গে নাস্তিকতাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি, তা করা যায় না। উচিত নয়। প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এঙ্গেলস্ শ্রমিকশ্রেণিকে সতর্ক করেছিলেন। সেক্যুলারিজ়মের ধারণার সৃষ্টি রেনেসাঁস-এর ইউরোপে, সেদিক থেকে ভাবলে এটা ইউরোপীয়। আমাদের দেশের মৌলবাদীরা বিশেষত সংখ্যাগুরু মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার নেতা সংঘ পরিবার সেটাই প্রচার করে। তখন তারা ভুলে যায় ওদের গুরু গোলওয়ালকরের তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী তত্ত্ব আসলে জার্মান দার্শনিক নিৎসের ভারতীয় সংস্করণ। যাক সে কথা, প্রসঙ্গে ফিরি। সেক্যুলারিজ়ম ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর সন্তান হলেও যে প্রত্যয় সে বহন করে তা বিশ্বজনীন।

ইউরোপের রেনেসাঁস আন্দোলন ছিল সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টান ধর্ম ও যাজকতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে উত্থান। চার্চ মানুষের দৈব কর্তৃত্ব আর সম্রাট মানুষের পার্থিব কর্তৃত্ব। মানুষের জীবনের পুরো নিয়ন্ত্রণ কে নেবে—দ্বাদশ শতক থেকে চলা এই দ্বন্দ্ব থেকেই আধুনিক ইউরোপে, আধুনিক পৃথিবীতে সেক্যুলারিজ়মের জন্ম। অবশ্য এই শব্দের উৎপত্তি আরও কয়েক দশক পরে। চৌদ্দ শতকের ইতালির পদুয়ার মার্সিলিও চার্চের সঙ্গে সম্রাটের দ্বন্দ্বে পার্থিক কর্তৃপক্ষের আধিপত্যের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। মানুষের পরকালের নিয়ন্ত্রণ চার্চ করুক কিন্তু ইহকালের নিয়ন্ত্রক হবে সম্রাট। মনে রাখতে হবে তখনও পৃথিবীতে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাতশো বছর আগের পৃথিবীতে সমাজনীতি, রাজনীতিতে মানুষ আবিষ্কার করেছিল রাষ্ট্র রাজনীতি ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হোক। সেক্যুলারিজ়ম শব্দ ব্যবহার না করেই ফরাসি বিপ্লবই প্রথম রাষ্ট্রপরিচালনা, শিক্ষা, সামাজিক নীতি নির্ধারণে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণকে সরিয়ে দিয়েছিল। মূলত মানবতাবাদী এই উত্থান ও আন্দোলনের ফলে ইউরোপের সমাজের বিকাশের ধারায় সেক্যুলারিজ়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। উনিশ শতকে জর্জ ইলিয়োকে প্রথম 'সেক্যুলারিজ়ম' শব্দটির ব্যবহার করে বলেন, সেক্যুলারিজ়ম পার্থিব জীবনের বিধি। এই বিধিতে বিশুদ্ধভাবে মানুষের স্বার্থের ভিত্তিতে সামাজিক নীতি নির্ধারিত হবে। ধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে কিন্তু সামাজিক নীতিনির্ধারণে তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এর ফলে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ সহজ হতে শুরু করে। ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রকে আলাদা করাই ছিল সেক্যুলারিজ়মের প্রধান তাৎপর্য। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকারতত্ত্বের গোড়ায় ঘা মারে। উদীয়মান বুর্জোয়াদের বিকাশ ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পথ সুগম করে। পাশাপাশি ধর্মসংস্কারের পথও প্রসারিত হয়। কয়েক শতক ধরে রাষ্ট্র ও খ্রিস্টান চার্চের যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল তার বিরাম ঘটে। সেই বিরামের অভিঘাতে সেক্যুলার রাষ্ট্র গতিশীল বিকাশের পথে এগোয়।

সেক্যুলারিজ়মের অনুশীলনের ক্ষেত্র সমগ্র রাজনৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি। এখানে ব্যক্তিমানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করাও হয় না আবার গ্রহণও করা হয় না। ব্যক্তিমানুষ ধর্মে বিশ্বাসী হলে তার নিজ ধর্মমত অনুসারী ধর্মীয় আচরণ পালন করে এবং তার সেই অধিকার সুরক্ষিত থাকে সেক্যুলারিজ়মে। আবার নাস্তিক ব্যক্তির নাস্তিকতার জীবনচর্যাও সুরক্ষিত থাকে। ধর্মবিশ্বাসী কিংবা নাস্তিক—উভয়ের বোধ, বিশ্বাস ও আচরণ একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরের, সেখানে কেউ কারো পরিসরে প্রবেশ করতে পারে না, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয়। এ দিকে থেকে দেখলে সেক্যুলারিজ়মই সমাজের সব মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করতে পারে। ধর্মবিশ্বাসী কিংবা নাস্তিকতার সম্পর্ক দার্শনিক জগতে দ্বন্দ্বের—ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব। কিন্তু রাজনৈতিক সমাজে সেক্যুলারিজ়মে এই দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া হয়, এড়িয়ে যেতে হয়। মানুষের সমাজের বিকাশের ধারায় একটা পর্যায়ে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। মানুষের মর্মবস্তু প্রকৃত বাস্তবতায় বিকশিত হয়নি বলেই, মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নয় বলেই ধর্মের মাধ্যমে বিশ্বকে দেখে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চায় ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে। সমাজের মানুষের মুক্তির প্রত্যাশার সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ভাববাদী দর্শন মানুষকে মুক্তির পথ হিসেবে ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মপালন করতে শিখিয়েছে এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন শিখিয়েছে সমাজের শোষণশাহী এবং ব্যক্তিজীবনের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে একই সমস্যার দুটি সমাধানের সঙ্গে স্পষ্টভাবে চলে আসে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শাসক ও শাসিত, শোষক ও শোষিত—পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি। বর্তমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চাওয়া শাসক শ্রেণির স্বার্থ পূরণ করে ভাববাদী দর্শনের ধারাটি আর বস্তুবাদী দর্শনের ধারাটি শাসিত শ্রেণির স্বার্থ পূরণ করতে চায়। সেক্যুলারিজমের উদ্ভব ও বিকাশের সূচনালগ্নে বুর্জোয়া শ্রেণি ছিল প্রগতিশীল ও আগামী শাসকশ্রেণি। বুর্জোয়া বিকাশ যত রুদ্ধ হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণি যখন প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র লাভ করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই রেনেসাঁস-এর যুক্তিবাদকে খণ্ডন করে 'যুক্তির বিনাশ' জায়গা নিতে শুরু করেছিল। রুদ্ধ হয়েছে সেক্যুলারিজ়মের পথ। আমাদের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস, স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র গঠন থেকে আজকের সময় পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ থেকে আজকের সংকট ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ ও চরিত্রের পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যখন বুর্জোয়ারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, গান্ধীজির উপস্থিতিতে জাতীয় আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হচ্ছে, রুশ বিপ্লবের প্রভাবে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রেণি হিসেবে এবং মতাদর্শ হিসেবে শ্রমজীবী মানুষ উজ্জ্বল হচ্ছে, তখন ইতোমধ্যই আন্তর্জাতিক স্তরে বুর্জোয়ারা তাদের প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে ফেলছে। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে। আধুনিকতার যুক্তিবাদ যুক্তিহীন স্রোতহীনতায় আটকে গেছে। এই যুক্তিহীনতার পথ ধরেই এ-দেশে বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছিল। তাই এদেশেও রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় আচরণ কিংবা নিয়ন্ত্রণের পুরো বিচ্ছেদ ঘটেনি।

ঔপনিবেশিক ভারতে শাসক ব্রিটিশ ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে জনসংখ্যাকে দেখতো। ওদের স্বার্থের দিক থেকে এটাই স্বাভাবিক ছিল। ব্রিটিশ ভারতে জনগণনায় প্রথম দেশীয় জনগণকে হিন্দু মুসলমান হিসেবে দেখা শুরু হয়। ক্রমশ সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর এই

ধারণা প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ভিত্তি ও অংশ হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদীরা এই ধারণাকে সামগ্রিকভাবে চ্যালেঞ্জ করেনি। এটা ছিল অগ্রগামী বুর্জোয়া সমাজ ও পশ্চাৎমুখী সামন্তসমাজের সহাবস্থানের ফল। তবে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীরা সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মধ্যে ঐক্য ও সহাবস্থানের ওপরেই জোর দিয়েছিল। অবশ্যই এই ঐক্যপ্রচেষ্টায় আন্তরিকতা ছিল। গান্ধীজির সমগ্র জীবন ও কর্মধারা, যা ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রধান ধারা, সেদিকে দৃষ্টি দিলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা জাতীয় সংগ্রামে প্রতিক্রিয়াশীল ধারার সৃষ্টি ও বিকাশকে ঠেকাতে পারেনি।

ঔপনিবেশিক শাসন, ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈত চরিত্র ও যুক্তিহীন অবস্থান এবং ধর্মপরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ—এসবের কারণে স্বাধীন ভারতে জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক ধারাটি রয়ে গেছে, বিকশিত হয়েছে। ভারতে সেক্যুলারিজ়ম ধারণার পরিপূর্ণ রূপায়ণ ঘটেনি শাসকশ্রেণির দুর্বলতার কারণেই।

জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা কংগ্রেস ধর্মীয় পরিবারভিত্তিক মানুষের ঐক্য ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী ছিল। বিকাশমান শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে স্বাধীনতার পরে শোষণমুক্ত সমাজের প্রত্যাশা ছিল, সেখানে মানুষের ঐক্যের ভিত্তি ছিল শ্রেণি পরিবার, ধর্মপরিবার নয়। অপরদিকে ঔপনিবেশিক নির্মাণের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো সংগঠনগুলি ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার করে সেক্যুলারিজ়মের ধারণাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে সেই শুরুর দিন থেকেই। তাই ১৯৩১-এ করাচিতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে স্বাধীন ভারত ধর্ম বিষয়ে 'নিরপেক্ষতা'র প্রস্তাব গ্রহণ করলেও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগ ঠেকানো যায়নি।

করাচি কংগ্রেসের এই 'নিরপেক্ষতা'র ধারণার ভিত্তিতে স্বাধীন ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়েছিল। যদিও সংবিধানের ১৯৭৪-এর ৪২তম সংশোধনের আগে পর্যন্ত এই শব্দ ছিল না, কিন্তু মর্মার্থ স্পষ্টভাবেই ছিল। তাই ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রে ব্যক্তির অধিকার ও গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে। এখানে ব্যক্তির অধিকার ও গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিধির মধ্যেই বিচার করতে হবে। অন্যদিকে, ধর্মের নামে গঠিত পাকিস্তানে প্রথম দিন থেকেই সমধর্মের মানুষদের অধিকার ও গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোনো সরকারই সে দেশের মানুষের কাছে তাদের অধিকারের স্বাদ পৌঁছে দেয়নি। শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাপনের থেকে বিচার করলে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা বহু ছিল, আজও আছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্র, ব্যক্তির অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ—এসব মৌলিক প্রশ্নে ভারত তার প্রগতিশীল অবস্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এখানে অবশ্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবী ও দেশের ভিতরে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসন, ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈত চরিত্র ও যুক্তিহীন অবস্থান এবং ধর্মপরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ—এসবের কারণে স্বাধীন ভারতে জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক ধারাটি রয়ে গেছে, বিকশিত হয়েছে। ভারতে সেক্যুলারিজ়ম ধারণার পরিপূর্ণ রূপায়ণ ঘটেনি শাসকশ্রেণির দুর্বলতার কারণেই। আবার এটাও ঠিক বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহু জাতি, বহু সংস্কৃতির সমাজে রাজনৈতিক অনুশীলনে সেক্যুলারিজ়মের প্রয়োগ পৃথক হওয়াটা পুরোপুরি বাতিল করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হল ঝোঁক কোন দিকে থাকবে। করাচি কংগ্রেসের নিরপেক্ষতার ধারণাতেই ভারত রাষ্ট্রের কাছে সব ধর্মই সমান। গান্ধীজির 'সর্বধর্ম সমন্বয়' ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি ও প্রাণ। তবে সব ধর্মের পাশাপাশি সহাবস্থান শেষ পর্যন্ত অটুট থাকা খুবই কঠিন, বিশেষত যখন আর্থসামাজিক সংকট প্রকট হতে থাকে তখন শাসক মানুষকে বিভাজিত করতে ধর্মপরিচয়কে ব্যবহার করে। আজকের ভারতে এ-বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। তাই সহাবস্থান সব ধর্মের মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করে না। পাশাপাশি এটা মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে ধর্মীয় কর্তৃত্বের বাইরেও নিয়ে যায় না। ফলে সেক্যুলারিজ়মের মূল কথাটা রাজনীতি, রাষ্ট্র আর ধর্ম পরস্পর থেকে আলাদা থাকবে তা অকার্যকর হয়ে যায়, তাই ঘটেছে ভারতের রাজনৈতিক সমাজে। সীমাবদ্ধতা নিয়েও ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সময়ের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করেছে। আজ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ও সংবিধানের মৌলিক ভিত্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। সদ্য স্বাধীন ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সহায়ক ছিল। তাই তা সংরক্ষিত হয়েছে। সারা জীবন হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান কিন্তু আদ্যোপান্ত অসাম্প্রদায়িক গান্ধীজি স্বাধীনতার শৈশবেই নিহত হলেন। গান্ধীজির হত্যাকাণ্ডের পর কয়েক দশক তথাকথিত হিন্দুবাদীরা জনসমাজে ঘৃণিত ছিল। প্রবহমান সাত দশকে পৃথিবী ও ভারতের সমাজ অর্থনীতির বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষত আজকের নয়া-উদারবাদের এই তিন দশকে। গান্ধীজির হত্যাকারীর উত্তরপ্রজন্ম আজ ভারত রাষ্ট্রের ক্ষমতায়। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতো সর্বধর্মসমন্বয়ের ধর্মনিরপেক্ষতাও আজ তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীদের অস্ত্রের ডগায়।

এই বিকৃতির ধারাবাহিকতা আমাদের জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের ভিতরে ক্রিয়াশীল ছিলই; আজকের অর্থনৈতিক, সমাজিক সংকট, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন বাড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিপদে মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। গবেষক তপন রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন, কেমন করে আর এস এস ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মিশ্র জাতীয়তাবাদের তত্ত্বকে বাতিল করে দিয়েছে। ১৯৪৯-এ গোলওয়ালকর ভারতীয় সংবিধানকে অভারতীয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আরও স্পষ্টভাবে একে অহিন্দু আখ্যা দেয়। 'স্বরাজ'কে বলা হয় আমাদের রাজ—আমাদের বলতে শুধু হিন্দু বোঝানো হয়। ১৯২০ ও ৩০-এর দশকের গণআন্দোলনে আর এস এস-এর কোনো ভূমিকা ছিল না। গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনকে তারা সমর্থন করেনি কারণ এর ফলে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনকেও তারা সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করে। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আর এস এস অনুপস্থিত ছিল কিন্তু ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গায় তারা সক্রিয় ছিল। আর এস এস-এর দৃষ্টিতে ভারতীয় জাতি হিন্দু জাতির সমার্থক। মোদি জমানায় প্রবল সক্রিয় সংঘ পরিবার। প্রতিক্রিয়া হিসেবে সংখ্যালঘুর মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাও দ্রুত গতিতে বাড়ছে। সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িক ভাবনার বৃদ্ধি পুনরায় সংঘ পরিবারের পরিসর বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের তথাকথিত তত্ত্বের আড়ালে রাজনৈতিক হিন্দু গড়ে

তুলতে মদত যোগাচ্ছে। আজকের এই প্রেক্ষাপটে মোদির কাজের সমালোচনা, বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ কণ্ঠস্বর ও অস্তিত্বকে যেভাবে দেশদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত করা কিংবা মোদির হাত ধরে হিন্দুত্ববাদী উগ্র জাতীয়তাবাদ নির্মাণ, তার সূচনা করেছিলেন গোলওয়ালকর ১৯৪৯-এ। এতদিন পরিস্থিতির কারণে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। আজ অনুকূল পরিস্থিতিতে সর্বগ্রাসী স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী রূপ ধারণ করে বেপরোয়া হয়েছে। আজ নয়া-উদারবাদে পুঁজিবাদ সংকটের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে গেছে। পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির নিগড়ে আমরা এখন জড়িয়ে যাচ্ছি। ফলে ভারতীয় শাসকশ্রেণির সংকটমুক্তির পথ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুঁজিবাদের আঁতুড়ঘরের বৈশিষ্ট্য মতোই আজকের সংকটকে শ্রমজীবী মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ওরা সচেষ্ট। কিন্তু আজ পুঁজিকে সন্তুষ্ট করে অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরোনোর কোনো রাস্তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নয়া-উদারবাদ কানাগলিতে আটকে গেছে। এই অবস্থায় পুঁজিবাদ ভারতে হিন্দুত্ব আর জাতীয়তাবাদকে সামনে রেখে ফ্যাসিবাদে আশ্রয় নিতে চাইছে। তাই মোদির নতুন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল। রাজনৈতিক সমাজে মোদি সরকার সেক্যুলারিজ়মকে ভাঙতে চাইছে সংবিধানে ছুরি চালিয়ে। সংঘ পরিবারের বিষাক্ত মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো শাখাপ্রশাখা এবং কর্পোরেট পরিচালিত মিডিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়িয়ে, ইতিহাস ও যুক্তির বিনাশ ঘটিয়ে জনসমাজকে অন্ধকারময় মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, যেখানে ব্যক্তির পরিচয় 'মানুষ' কিংবা 'রাষ্ট্রের নাগরিক' নয়, হিন্দু অথবা অন্য কোনো ধর্মের, যেখানে কেউ কখনো জানতে পারবে না সেক্যুলারিজ়ম বলে একটা শব্দ আছে এবং যার সাথে জড়িয়ে আছে মানবসভ্যতার সাতশো বছরের ইতিহাস।

ইতিহাসবিহীন যুক্তির বিষাণের দিনে তাই সহজেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মপালনের পরিবর্তে আচারসর্বস্ব উগ্র আন্দোলন ও উন্মাদনা তৈরি করা হচ্ছে, যাতে ব্যক্তিমানুষের সমস্ত অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক অনুশাসন, ব্যক্তিমানুষের বিশেষত তরুণ প্রজন্মের চিন্তাভাবনায় সেক্যুলারিজ়মের কণামাত্র স্থান করতে না পারে। এখন সংঘ পরিবার খানিকটা তো সফল বটেই। এই সাফল্যের পথ বেয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে দেশবাসীর মনে জায়গা পায়নি সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের নির্মাণ, এখন পুনরায় সেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আমরা কি একটু খেয়াল করে দেখেছি রামনবমীর মিছিল, শ্রাবণ মাসে শিবঠাকুরের মাথায় জল ঢালার অনুষ্ঠান, গণেশ পুজোতে ভাগোয়া ঝাণ্ডার সাথে জাতীয় পতাকাকে ব্যবহার করা হয়েছে। চেনা পরিবেশে যে যুবদের এ কাজ করতে দেখছি তাদেরই পুলুয়ামা-বালাকোট পর্বে মোমবাতির সঙ্গে জাতীয় পতাকার ব্যবহার করতে দেখা গেছিল। তবুও তাতে গোপন অ্যাজেন্ডা যাই থাকুক প্রকাশ্যে ছিল জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আবার এই যুবকদেরই দেখেছি সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে এক সঙ্গে ভাগোয়া ঝাণ্ডা আর জাতীয় পতাকা নিয়ে মোদির নামে ভোট চাইতে। এভাবেই ধর্মীয় আচরণ, সাম্প্রদায়িক অনুশাসন, দেশরক্ষা, আকঙ্ক্ষা সব মিলে মিশে এদেশে এখন উগ্রজাতীয়তাবাদের বুনিয়াদ তৈরি করেছে, যা মোদিকে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর কুর্শিতে বসিয়েছে আর ভারতের জাতীয়তার ধারণা আর সেক্যুলারিজ়মকে দুর্বল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ইউরোপের মতো ভারতে একজাতি-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনি। জাতি ধর্ম ভাষা সংস্কৃতির বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্য নিয়েই ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে। কৈশোরে ইতিহাসে পড়েছি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য হল ভারতের জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের প্রাণভ্রমরা। সংঘ পরিবার বৈচিত্র্যের চরিত্রকে বাতিল করে ব্রিটিশের দেখানো ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে সামনে এনে হিন্দু পরিচয়কেই ভারতীয় জাতি বলে নির্মাণ করতে চাইছে যা আসলে অস্বাভাবিক এবং আরোপিত বৈশিষ্ট্য। ভারতের বহুত্ববাদী সমাজ ও জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক পরিণতি ধর্মনিরপেক্ষতা। এবং তা গণতান্ত্রিকও বটে। বহুত্ববাদকে অস্বীকার, ধর্মপরিচয়কে জাতিপরিচয়ে উপস্থিত করা, ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধ্বংস করা আসলে শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রকে সরিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি প্রস্তুত করবে।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি শাসকশ্রেণির সীমাবদ্ধতার কারণে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ও অনুশীলন প্রকৃত অর্থে সেক্যুলার প্রত্যয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যা আছে ঐতিহাসিকভাবে তা অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ আজ লুণ্ঠনের পথে, তাকে রক্ষা করতেই হবে। এই রক্ষার সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমজীবীরা যাতে সেই ভূমিকা নিতে না পারে তার জন্য তাদের চেতনায় সাম্প্রদায়িক বিভ্রম, বিদ্বেষ ও বিভাজনের চাষ চলছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ভাষ্যকে যদি পরিবর্তন করতে হয়ে তবে ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শগত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সব থেকে জরুরি শ্রমজীবীদের জীবন-জীবিকার শ্রেণিভাষ্যকেই সামনে নিয়ে আসা। শাসকশ্রেণির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া রুখতে কর্মসূচি গ্রহণ যথেষ্ট নয়, শ্রমজীবীদের জীবনজীবিকার দাবিগুলিতে সংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে। কলে কারখানায়, খেত-খামারে, হাটে-বাজারে, গ্রাম-নগর-বন্দরে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এই সংগ্রামগুলি একই সঙ্গে শ্রমজীবীদের শ্রেণিসংগ্রামকে শক্তিশালী করবে আবার সেক্যুলারিজ়মের সংগ্রামকেও বাঁচিয়ে রাখবে। এখনই সমাজের সব মানুষ ধর্মবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, তা হতে পারে না। এ-বিষয়ে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে। ধর্মীয় পরিচয়ের তুলনায় ভারতীয় নাগরিক হিসেবে সেক্যুলার পরিচিতি অগ্রাধিকার পাবে, রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে। একদিনে তা হবে না। এখন পরিস্থিতি খুবই জটিল। রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে একজোট করতে হবে এবং সে কাজে বামপন্থীদেরই বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভারতের ইতিহাস এবং বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটাতে হবে। এখনই একাজ খুব কঠিন কিন্তু তা বিকল্পহীন। এবং অসম্ভবও নয়। মানুষের কাছে বুঝিয়ে বলতেই হবে সেক্যুলারিজ়ম না থাকলে গণতন্ত্রও থাকবে না। ধর্মের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা আসলে মানুষের সভ্যতাকে সাতশো বছর পিছিয়ে নিয়ে যাবে, যেখানে অন্ধ বিশ্বাস আর প্রশ্নহীন আনুগত্য মানুষের ভবিতব্য। আমরা কি পিছনে ফিরে যাবো? সমস্ত সুস্থ স্বাভাবিক আধুনিক মানুষ নির্দ্বিধায় সমস্বরে বলবেন—না, কখনোই না। সেক্যুলারিজ়মকে বাতিল করতে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় ফ্যাসিস্তদের শিকারবস্তু তরুণ প্রজন্ম। গণতন্ত্রকে ভাঙতে স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্তরা বিভ্রান্ত তরুণ প্রজন্মকেই ব্যবহার করে। এখন এ অবেলায় ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এখন এ ভারতেই গণতন্ত্র সেক্যুলারিজ়ম বহুত্ববাদকে রক্ষার সংগ্রামে শ্রমজীবী জনতার পাশে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য ছাত্র-যুবরাও। কার্যত গোটা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে এবারেও জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংসদের নির্বাচন সেক্যুলার ভারত নির্মাণের সংগ্রামকেই শক্তিশালী করল। নবযৌবনের সুচেতনা আজকের অন্ধকারের মধ্যেও সেক্যুলারিজ়মের আলো জ্বেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

লেখক : সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

পাথরের কাছে যাই
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

পাথরের কাছে যাই বুক ভরে ভালোবাসা খুঁজি
পাথর নির্বাক কিছুই শোনে না
পাথরকে পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে তাই
আগুন জ্বালাই
এ আগুনে হিমাক্ত শরীর সেঁকে অগ্নিমন্ত্রে যৌবন রাঙাই।

শব্দহীন ঠোঁটে তার লেগে আছে চতুর চুম্বন
পাথর জানে না। পাথরের মুখে কোনো ভাষা নেই
ভালোবাসা প্রণয় রোমাঞ্চ নেই
তবু তাকে ক্ষত ও বিক্ষত করে ছবি আঁকি
নিঃশব্দে ফোটাতে চাই কবিতার ফুল
যে ফুলে গোপন প্রেমে কান্না মাখামাখি।

পাথরের কাছে যাই ভালোবাসা খুঁজি
ভালোবাসা সে এক আগুন
ঠুকরে ঠুকরে বের করি তারপর আগুনে আগুনে
অস্ত্র গড়ি, আদিম জীবন নিয়ে খেলা করি
এ খেলায় যুদ্ধ আছে রহস্যময়তা
সেই যুদ্ধ বলে দেয় কোনদিকে ভালোবাসা কোথায় পূর্ণতা

পায়ের অনেক নিচে ডুকরে কাঁদে পাষাণের কঠিন দস্যুতা।

ঘাতক
জিয়াদ আলী

সারাটা জীবন জুড়ে যে দিয়েছে অশেষ বঞ্চনা
সে-ই চায় আনুগত্য
দজ্জালের মতো খাড়া চারদিকে তারই লক্ষ সেনা।

কমণ্ডলু হাতে নিয়ে কে এসে দাঁড়ায়
একটু বিশুদ্ধ জল তার কাছে পেতে পারে তৃষ্ণার্ত চাতক!
যার হাতে হাত রেখে ঘুরছে স্বদেশ
অন্তিম দৃশ্যে হয়তো সে-ই হবে নিষ্ঠুর ঘাতক।

এক মুঠো সাদা ভাত কিছু মায়া পাবো বলে
পেতে আছি হাত
রাষ্ট্রীয় কুকুর এসে দাঁড়ায় সম্মুখে
শোঁকাশুঁকি করে অনেকক্ষণ
এভাবেই বুঝে নিতে চায়
কী আমার ধর্ম, কি-বা জাত।

ব্যাক টু ক্যামেরা
পার্থ রাহা

তুমি ক্যামেরার চোখের পিছনে
এখন বিকেল   মাঠ পেরিয়ে আকাশ
আসাখ লাল বিকেল
ধূসর গোধূলি আলো তোমার চোখের তারায়
ক্যামেরা চলার পথে সে আলো দেখতে জানে না
তোমার চোখ   চোখের গোধূলি আলোয়
                    আর আলোর তলায়
                রামধনু রঙের জলের ফোঁটা
ক্যামেরার চোখে ধরা নেই
একঝাঁক আলো, রিফ্লেক্টার, তোমার অন্ধকার চুল
                        আঁধার মাখা ঢেউ
আরও অন্ধকার করে দেয়
তোমার মুখ, মুখের ছায়ায় শত শত শতাব্দীর ইতিহাস
                                বিষণ্ণ হতাশ
ক্যামেরার পিছনে তার

সামনে সবুজ মাঠ, দীর্ঘ গাছ, দীর্ঘতর ছায়া
আকাশ ঘেরা আলো
ক্যামেরার মাথা নাড়া চোখে
আকাশ দূর সবুজ নীল ঘুড়ি
কখন কে জানে
বন্দুক গর্জনে   ঘুড়ির হৃদয় ছিঁড়ে খান খান
                রক্ত
                ভেলভেট লাল রক্ত
ক্যামেরার চোখে দূরান্তের ছবি
কিন্তু কোথাও কাছে কোথাও
ক্যামেরায় ধরা নেই।
শত শত শতাব্দীর ইতিহাস
বিষণ্ণ হতাশ

তোমার মুখ।

স্মৃতিবাড়ি
অরবিন্দ সরকার

স্বপ্নমেদুর বাল্যটানে ভেসে আসে অনেক কিছু
দোমহনীর পলাশডাঙার স্মৃতিবাড়ি দৌড়ে আসে
ভরদুপুরে উঠোন পথে দাঁড়াল ওই মূর্তিমতী
সাগর ভেঙে আনল ছেনে তারা ঝিনুক
পায়ে পায়ে জড়িয়ে আসে ধুলোর সুতো
তাই দিয়ে আজ বুনোন হলো রঙবেরঙের কাপড় জুতো
ফেলে আসা ইচ্ছাঘুড়ি এখন ওড়ে সময় সময়
তারই নেশায় মগ্ন এখন ত্রিশ বর্ষায়।

চলো ভাই, হেঁটে যাই

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

অদ্য দেখ মুখ আয়নায়
তবু করো মনটা দীপ্ত
গতি রাখো শুদ্ধ কর্মে
গড়ে তোল সুদৃঢ় চিত্ত।

আমাদের বিশ্ব ছিন্ন
হাত নেই হাতের উপরে
বিপন্ন আমরাও অদ্য
রাত কাটে নিত্যই ঘর্মে।

বসে নেই তবু আজ দুঃখে
হেঁটে যাই সাহসে তথাপি
লেনিনের ভাষ্য শুনি ভাই
মার্কসবাদ অকাট্য বিশ্বে।

তবু আজ পুঁজির বৃত্তে
শোষকেরা ঐ উন্মত্ত
বোধ নেই এহেন চিত্তে
কেড়ে নেয় অন্ন-বস্ত্র।

চলো ভাই, হেঁটে যাই, হেঁটে
বহতা নদীর মতো নিত্য
চলো ভাই, চলো—নিঃশঙ্ক
শত্রুকে করো বিচূর্ণ।

রাত্রি

দেবাশিস প্রধান

নামছে লাজুক, ঝুরঝুরে ঝুরি আর
ক্ষমার মতো নৈঃশব্দ, আকাশ
আঁকার সময় হল এবার!

কেউ নেই আমার দু-পাশে, শুধু তুমি
অক্ষর কলাবৌ, যাপন ধ্বনির সুরে
গল গল বয়ে যাচ্ছে মন্দারমনির ঢেউ...
রজঃস্বলা সম্পন্ন জল ও জঙ্ঘায়
বারবার খেলে বেড়াচ্ছে, ছুঁকছুঁক করছে
কেরি ও বকেরা। গোটা চরময়
লালফুল কাঁকড়ার
সানন্দ সমাবেশ ভেঙে দুরমুশ করছে
পরিযায়ীদের গাড়িঘোড়া।
রাত্রি এসবই দেখে, সহ্য করে দীর্ঘশ্বাস
ছাড়তে ছাড়তে কঁকিয়ে ওঠে,
প্রভু নষ্ট করো না এই
তমোঘ্ন সম্পদ, আমাদের বাঁচতে দাও
নিভৃতি দাও অন্তর আভোগে!

প্রত্যয়

সতীরঞ্জন আদক

বিপন্ন দিন
তবুও বুকের মধ্যে ঘুমন্ত পাখি জাগে
অজানার অদৃশ্য ইঙ্গিতে।

সময়ের পরিবর্তন জেনে
চেনা মুখগুলো আজ স্থির
তবু প্রত্যাশায় থাকে।

ইচ্ছে করে বারবার
জোয়ারী শরীর ভেঙে
জানাই উপস্থিতি।

ক্যানভাসে ছবি
দৃষ্টি ঝাপসা হয়
বেদনার উৎস খুঁজি।

আসলে চিরকাল একই যায় না
ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে
নিশ্চুপে অনেক কিছু ঘটে।

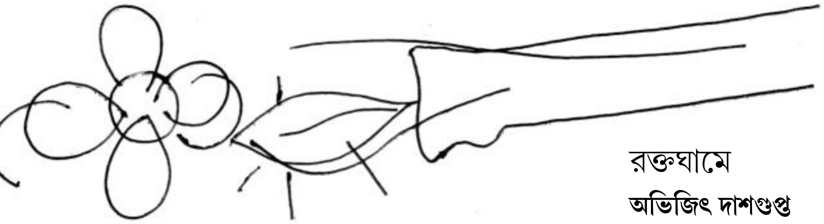

ফুল ফুটে আছে পাখি নেই

অনাথ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটে আছে পাখি নেই
ডেকে ডেকে ক্লান্ত কোকিল
দূরে ফিরে গেছে
নিরুদ্দেশে
শুনসান ভরদুপুরে
দূরে দূরে ডাহুকের ডাক
শূন্য হাওয়ায় দূরে দূরে উড়ে
জোড়া প্রজাপতি হাওয়ায় মিলায়,
জলের ছায়ায় কাঁপে কলমিলতা
কালো জলে কান্নার স্বর নেই
হাওয়ায় নিঝুম—ঘুমের আমেজ
হাত খালি, শূন্য ভাঁড়ার-মহাফেজ!

সবাই আয় চলে, চলে আয়,
করি মোকাবিলা।

হালচাল

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

জয় শ্রীরামে গাত্রদাহ
জয় হিন্দ-এ জ্বলছে কেউ
ঘর-ছাড়াদের বুকের জ্বলন
ঘর পোড়ানো থামছে না।

বদলে যায় দলবদলে
ক্ষমতাময় কেন্দ্রস্থল
আর পতাকা ফেট্টি করে
কসাই খোলে দোকানঘর।

বদলে যায় উল্কিগুলো
কল্‌কে ফাটায় সে-শাকরেদ
এখানে মার লাশ ওখানে—
ঘর-বিবাদী এজাহার।

রক্তঘামে

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

এপথ ওপথ রক্তে ঘামে
রক্তে ঘামে
মিছিল নামে, খামের ভেতর
বুকের আগুন
ছড়ায় যখন তখন ফাগুন
যন্ত্রণাতে বাজায় বাঁশি—
বাঁশি বাজে, বুকের মাঝে
অগ্নিরাঙা আমার চিঠি
তোমার হাতে পাঠিয়ে দিলাম
তোমার সাথে সুপ্রভাতে
দেখা হলো
তোমার হাতের সেই চিঠিতে
আজও আমার ভালোবাসা
ভালোবাসার বাসন্তী রং
উড়ছে হাওয়ায়, উড়তে উড়তে
এপথ ওপথ, চিরশপথ
মিছিল নামে, রক্তে ঘামে
তোমার পাশে আমিও ছিলাম।

দক্ষিণের ঝাউবনে

পরেশ ঘোষ

মেঘেদের সঙ্গে খেলতে খেলতে
দক্ষিণের ঝাউবনে একা
নীল নীল আরও ঘন নীল
অবলীলায় মিশে যায়
বালিয়াড়ি পেরিয়ে একান্ত আপন মনে
নিঃশব্দে ফিরে আসি, উড়ো মেঘ অফুরান

এখন এখানে গভীর শূন্যতা
সহজেই ফিকে হয়ে যায় চেতনার রঙ
কান পাতলেই ভেসে আসে সমুদ্রের গর্জন
এত ব্যথা জীবনে
না পাওয়ার সুদীর্ঘ ব্যর্থতা
কোথায় খুঁজে পাব আনন্দগান...

নিরিবিলিতে একা একাই কথা বলি
বিষাদ-হতাশার সুর মিশে থাকে শরীর জুড়ে
আমার বাসনা-যন্ত্রণা ক্রমাগত মুছে দিতে চাই
আমার গোপন কথা ভালোলাগা
না পারা হাজার কাজের বিবর্ণ তালিকা
দীর্ঘশ্বাসে ঝরে পড়ে অবিরাম

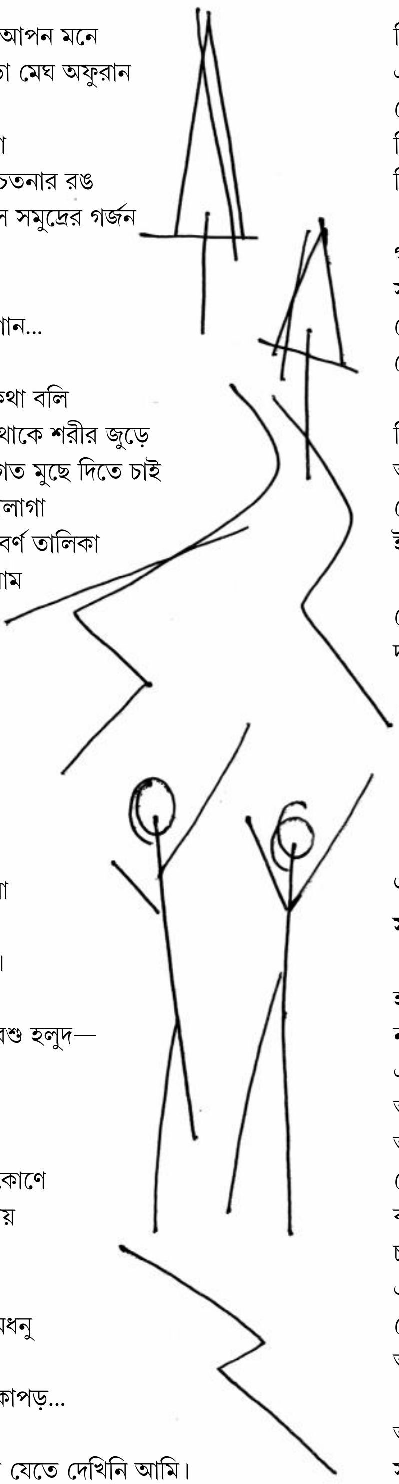

রামধনু জীবন

অভিজিৎ ঘোষ

শুধু গিরগিটি রং পাল্টায় না
খেয়াল করেছেন
পৃথিবীরও রং পালটে যায়।

আজ নীল, কাল সবুজ, পরশু হলুদ—
এইভাবে গোটা পৃথিবী
নিজের আয়ু কিনে নেয়

আর এই পৃথিবীর কোণে কোণে
নিভৃতে কিংবা খোলা রাস্তায়
একদল মানুষ হেঁটে যায়

ওদের রং আমি চিনি—রামধনু
কোনো রং দুবার ভাত,
কোনোটা ছাদ আর একটু কাপড়...

রামধনুর রং কখনো পাল্টে যেতে দেখিনি আমি।

কিছুই বলোনি

গৌতম হাজরা

কিছুই বলোনি তবু হাতে রাখি হাত।

তুমি হতবাক!

বিস্ময়ে হিমফুল ঝরে গেল খোলা বারান্দায়
একা বসেছিলে।
দেখছিলে অযত্নে কুঁকড়ে যাওয়া দেহ
কিছুটা দূরে
বিকেল খেলছে কেমন একা আনমনে!

গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল তোমার শরীর
সবুজ ছাউনিতে ঘেরা, আকাশ দেখছ
তোমার করুণ ওই দু-চোখগুলি
সে কি খুঁজছে সেই আশ্চর্য প্রোফাইল?

কিছুই বলোনি তবু হাতে রাখি হাত।
আড়াল খুঁজতে খুঁজতে ভেতরে ঢুকে পড়ি
রোদের অপেক্ষা করি সঘন বাতাসে
ইতস্ততভাবে যদি রহস্য ফিরে আসে।

শেকড়ে পাতায় আর শিরায় শিরায়
দারুণ উদ্ভাসে!

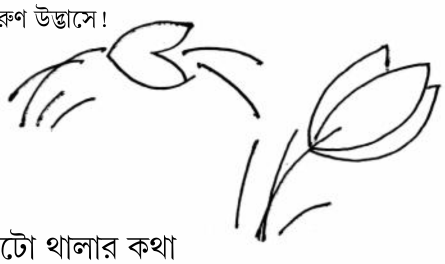

এঁটো থালার কথা

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

হলুদ রঙের একটা সুর থেকে কত পাতা বেরোলো, ফুল বেরোলো
নদীর থেকে বেরিয়ে এলো মস্ত জাহাজ
এভাবেই ভেঁপুতে আনন্দ তুলে
আমরা পাড়া বেড়াতে এলাম।
আমাদের ধরাধরি হাত ছিলো
চোখে বাদামী আভা আর কপালে রাঙা চাঁদ ছিলো
বুড়িও আসছিলো পিছু পিছু
চরকায় সুতো কেটে সে পোশাক বানিয়ে দিলো
এভাবেই আমাদের খিদের লজ্জা আমরা পোশাকে মুড়ে নিলাম
তোমাদের ভাঙা পা, ঘিলুতে গর্ত
আমরা মই বেয়ে উঠে পড়লাম। ফোস্কায় আমল দিলাম না।

আমাদের পিঠে আসতে এক মরুভূমি আছে
সময়ে, অসময়ে আমরা বালি ভিজিয়ে কাঁদি

বন্ধু হলে...

সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

ঢোক গিলে খেয়ে নিচ্ছ রুদ্ধবাষ্প
গলার কাছটা দলাদলা
কী যে কষ্ট হচ্ছে, ফুলে ফুলে উঠছে ঘাড়ের শিরা
জানি একটু কাঁদতে পারলেই সব বিষণ্ণতা ঝরে যেত
হালকা হত বুক
আবার বাঁচার জন্য আগ্রহ বাড়ত
মর্নিং ওয়াকে গিয়ে একেবারে
বাজারটাও করে নিয়ে আসতে টাটকা টাটকা
কী সবুজ পুঁইশাক, কমলা কুমড়ো
জ্যান্ত লাফাচ্ছে একেবারে মিষ্টি জলের মাছ
আরে বাবা তোমার প্রিয় আলুপোস্তও করে দিতাম।

তার জায়গায় মন খারাপ!
কে কী বলেছে, আঘাত করেছে
তাই নিয়ে মনে মেঘ, কালো হয়ে আছে মুখখানা
একবার বলছ না সেই শয়তানের নামটা
বন্ধু বলে ডাকো
অথচ অবাক লাগে তোমার এই গুটিয়ে থাকা
কুঁকড়ে কুঁকড়ে থাকা
আরে ভাই একবার বল না কে তোমার নামে
কুৎসা ছড়িয়েছে—   কোন সতী?

বাস্তব সংকেত

নীলয় মিত্র

প্রাত্যহিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ভয়ের অনুপ্রেরণা, সন্ত্রাসে
তলিয়ে যেতে যেতে
অরণ্য পাহাড় নদীর দুই পারে শস্যক্ষেত্রে
অযুত পায়ের শব্দ শব্দিত হয়ে ওঠে গভীর প্রত্যয়ে
রবি ঠাকুরের ডাকে ওরা নেমে এসেছে গ্রামগঞ্জে,
পথে ঘাটে। বিশুপাগল, নন্দিনী, কিশোরের গান
আসছে ভেসে; ফাগুলাল, পালোয়ান, চন্দ্রা,
স্পন্দমান কণ্ঠস্বরে। মুক্তির আগুন ওদের নাড়িতে নাড়িতে,
টান টান বুক, ধ্রুব প্রচেতা চেতনা শোণিতের সংকেতে।

অন্ধকারের দরজা ভেঙে বিপদকে দুপায়ে মাড়িয়ে
বুকভরা শ্বাস নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে
লক্ষ লক্ষ সংখ্যারা প্রাণের আয়োজনে
ফিরে পেতে নাম, স্বাধীনতা, অধিকার
স্পন্দমান তাদের হৃদয়
রক্ষপুরীর বাধাগুলি ভেঙে চুরে
বন্দিশালায় দরজাগুলি দেবে গুঁড়িয়ে।
মারণ কেতন ধ্বজা ছিঁড়ে ফেলে দেবে জাগিয়ে
স্পর্ধা আর বিশ্বাস। প্রেত স্পর্ধা, ভেঙে দিয়ে
চেতনার আলোকশিখা ওরা, মুক্তির অনিবার্য পথে।

মানুষ যখন

জমর সাহানী

মানুষ যখন

মানুষ যখন 'ইত্যাদি' হয়ে যায়
তাদের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পরিচয়
দেওয়ার মতো কিছু থাকে না

তখন তারা
তখন তারা জনারণ্যে হারিয়ে যায়
ইতিহাসের পাতায় তাদের আর খুঁজে
পাওয়া যায় না

তারা থেকেও থাকে না কোথ্থাও
হয়ে ওঠে যেন নিরাকার

অথচ
অথচ 'ইত্যাদি' নামে পরিচিত লোকেদের
অস্তিত্ব না-থাকলে যে-কোনো
স্মরণীয়, বরণীয় লোকেদেরও
অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে।

অশ্রুত কথাগুলি

কৃষ্ণা মালিক

ধুলোয় পড়ে থাকা
একটা ফ্যাকাসে সবুজ পাজামা
কিংবা একটা মরচে ধরা নিরীহ মাপের ছুরিতেও
কথা কথা লেগে থাকে।

এক একটা দিনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন কেটে যায়—
কত থাকে অশ্রুত বৃন্দবাজনা...
অথচ রং বদলে যায় কেমন যে-কোনো জিনিসের

সরকারি হাসপাতালের দেওয়াল বা সেতুর রেলিং...
আকাশও পতাকায় পতাকায় রঙ ধরে
এক একবার এক একরকম;
প্রকাণ্ড ঢেউ আছড়ে পড়ে—চায়ের দোকান থেকে
বসার ঘর হয়ে শোবার ঘরেও

কোনো দুব্‌লা এক হারান কাকা কিংবা
খিদে মেরে ফেলা হারুন চাচা
চেঁচাচে চেঁচাতে ছোটে অন্ধের মতো

বাজ তাড়া করে খরগোসকে...

এক সময় গা থেকে ছুরিতে খসে যায়
সবুজ পাজামা—দুদিকে ধুলোয় পড়ে থাকে তারা
না বলা কথা নিয়ে

ধরো একটি সকাল ফুটে উঠবার আগে তোমাকেও ডেকেছিল
তাপস রায়

একটা কবিতার নিচে অন্য যে কবিতাটি চাপা পড়ে আছে
ধরো, নির্বাচনে যে প্রতিপক্ষ হেরেছে অল্প ব্যবধানে
ঘুর্ণিঝড় সহ্য করে নেবে বলে যেসব বৃক্ষরা সারারাত নিজেদের
কাঙাল কাঙাল আকুলতা দেয়, কানাকানি করে
বুক চিতিয়ে রেখে ভোর ডাকে—চলো, তাদের ভাঙা ডাল থেকে
দুঃখ ও স্বেদ-দাগ যত্ন করে মুছি

যে-কোনো চিঠির টুকরো থেকে কল্পনা টুকে নিতে এই ঘরের বাহির
যেভাবে ঝাড়াই-বাছাই করে কাগজ কুড়োনিরা, অনেকটা সেরকম
অক্ষরের গায়ে লাগা লজ্জাটুকু টের পেতে তাদের শীতের চলন দেখি
আমাদের বয়ে যাওয়া দিনের ভেতরে সেইসব জাদু রং খোলে
পেশাদার সমস্ত ছায়াদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে না-পৌঁছানো উঁকি মারে তীব্র দুপুরে

একদিন পূর্বাভাস না মেনে যেভাবে জেলে ডিঙি নিয়ে ধীবরেরা উত্তাল সমুদ্র সঙ্গ করে
সারা জীবনের নুন মেখে জেলেনির আশ্রয় ফিরে পেতে চায়
মনে করো, হয়তো কখনো একটা কবিতা তোমাকে চেয়েছে ঠিক সেইভাবে
তুমি তাকে অশ্রু দিতে পারোনি তেমন

বৃক্ষনীড়
অরূপ আচার্য

তুমি কেবল হারিয়ে যাও দূরে
ভুলে যাও স্মৃতির পাখিটিকে
বন্ধনযোগ ছিঁড়ে দিয়ে একা একা
ফিরেছো ঘরের যতিচিহ্নের দিকে।

এখানে কবির বৃক্ষনীড়ের ছায়া
নির্জনতার শিকল পরেছে পায়ে
করুণ দাহ ধুয়েছে নদীর জলে
তোমার ঘুমে পড়েনি তার ছায়া

দূরে থাকার অনেক অসুবিধে
নদীর কাছে হৃদয় ফিরে যাবে
দূরে গেলেই মায়াজালের বেড়ায়
ঘিরবে তোমার জল শিমুলের মন।

কাছে থাকার একটুও নেই ভয়
পড়বে না আর মনখারাপের আলো
গোপনে ভাঙবে নরম পাঁজরখানি
আঁধারবৃত্তে ঘুরে ঘুরে দোল খাবে।

কিবা নাম ধাম
স্বপ্না রায়

'মাছ মাছ' বলে রোজ
সকালে হেঁকে—
যায় যে লোকটা তার
ঘরে আছে কে?

শুনশান দুপুরেতে
দরজায় খিল—
অদ্ভুত সুরে শুনি
'কাটাবে গো শিল?'

সন্ধে হলেই শুরু
'বাদাম বাদাম'—
ফেরিওলা ডেকে যায়
কত পায় দাম?

কত যে কিনেছি সেই
মাছ বা বাদাম—
কখনও জানিনি তার
কিবা নাম ধাম!

জীবের শ্রেষ্ঠ জীব
পরেশনাথ কর্মকার

আমরা মানুষ...
তবু আমাদের মধ্যে হয়
আমরা... ওরা...
কেন হয় বুঝি না
বুঝি না মানুষে মানুষে
এই বিভেদ কেন?
একই নিয়মে জন্ম
একই নিয়মে বড় হওয়া
একই নিয়মে পথচলা, কথাবলা
তবু—আমাদের মধ্যে এই বিভেদ
কেন জানি না বাসা বাঁধে অজান্তেই

কেউ হয়তো বুদ্ধিতে একটু কম
কেউ বা বেশি
কেউ বা হয়তো দেখতে কালো
কেউ বা ফর্সা
তাতে... কী?
তবু তো আমরা মানুষ
আমাদের বিবেক আছে
আছে জ্ঞান, আছে ভালোবাসা,
তবে এসব জলাঞ্জলি দিয়ে
একদল মানুষ কেন জানি না
হয়ে যায় অ-মানুষ।
এর থেকে মুক্তির পথ
আমাদের খুঁজতেই হবে
কারণ—
আমরা যে মান আর হুঁশ যুক্ত
জীবের শ্রেষ্ঠ জীব।।

অভিসার
কালিদাস ভদ্র

পান্থপাদপ গাছের গায়ে লেখা
তোমার নাম আজও চেয়ে আছে

পাতায় পাতায় মনকেমন হাওয়া
বিরহ সাজায় চুপিসাড়ে
বাসন্তিকা রাত দোলে রুপো-দোলনায়

পূর্ণিমা চাঁদ জানে না
তোমার নাম শ্রীরাধার মতো
অভিসার সাজায়...

গাছের মৃত শেকড়ে

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

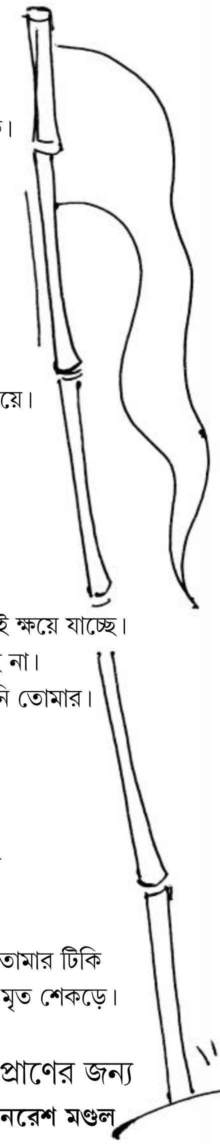

এগোতেই তো পারলে না। রিট্রিট করছ বারবার।

ব্যাকফুটে থাকতে-থাকতে এবার ফাইন্যালি কামব্যাক।

কিন্তু সেই জায়গাটাও তোমার আগের জায়গা নয়।
একটু আলাদা। একটু সলিটারি। একটু ডেজ়ার্টেড।

তবে তা মরুভূমি বা নির্জন পার্বত্য এলাকাও নয়।

এবার কী করবে তুমি!

বেরিয়েছিলে একটা টার্গেট নিয়ে। একটা পারপাস নিয়ে।
এখন তা ন দেবায়ঃ ন ধর্মায়ঃ। মানে,
এখন তুমি না ঘরকা না ঘাটকা। অর্থাৎ,
ধর্মেও নেই, জিরাফেও নেই।

তাহলে...

পায়ে এখন খিল্ ধরছে তোমার। গায়ের শক্তি ক্রমশই ক্ষয়ে যাচ্ছে।
চোখে সব দেখতে পেলেও কিছুই আর চিনতে পারছ না।
অথচ, সেরিব্রাল স্ট্রোক বা প্যারাপ্লেজিয়া এখনো হয়নি তোমার।
সুগার-প্রেসার এখনো সবই প্রায় নর্ম্যাল

চলচ্ছক্তিহীন হয়ে যাচ্ছ ক্রমশ। তাহলে শুয়ে পড়ো
নদীর ধারের ওই বটবৃক্ষের তলায়।
ঢেউ বা ঝড় যা-ই আসুক না কেন, টিকি বেঁধে রাখো
গাছের শেকড়ে। ঘুমিয়ে পড়ো...

ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাবে, গাছটা নেই! কিন্তু তোমার টিকি
তখনো আটকে আছে স্রোতহীন নদীর তটের গাছের মৃত শেকড়ে।

অন্য নাম অন্ধকার

তাপস মিত্র

মানুষ নির্জল হলে নিজেকে দেখতে পায়
স্থির জলে ছায়া পড়ে
যখন সবাই পিছন ফেরে
বিকেল মুখ লুকায়
রোদ্দুর মুছে যায় ধীরে ধীরে
তখন সে শুধু অন্ধকার

অন্ধকারেরও কি চোখ জ্বলে
জীবনের সবচেয়ে বেশি কথা তো অন্ধকারে
তবুও তো মানুষ আলো খোঁজে
আলোর কথা বলে
আলোরই কি অন্য নাম অন্ধকার

প্রাণের জন্য

নরেশ মণ্ডল

ফুলের জন্য
গাছ হতে চাই
গাছের জন্য ফুল।

বৃষ্টির জন্য নদী
নদীর জন্য গাছ।

প্রাণের জন্য রেণু
প্রেমের জন্য ভ্রমর।
আর—
বাঁচার জন্য চাই
ভাষা,
প্রতিবাদের ভাষা
প্রতিরোধের ভাষা।

পকেটেই ছিল বোধ

পুষ্পজিৎ রায়

সেদিন ছিল মে দিন
ওভেনে জমা ক্রোধ
দেরি হলে যে বিলম্ব হবে—পকেটে নিলাম বোধ
বাজারে ছিল কচুর শাক আর ওল
একশো মতন পটল
মহাজাগতিক ভাপ্
'পোড়া বার্তাকু' চাপ!

দাঁতের গোড়ায় ভাড়াটে জিবের ঠেকা
বাঁশটা ছিল বাঁয়েই কিছুটা ব্যাঁকা
তবু তো তুলতে হচ্ছেই পতাকা
পতাকা উঠছে
পতাকা উড়ছে
পতাকা কি কিছু বলছে
চলবে, না, চলছে?

পতাকার দিকে চোখ—

এইবেলা ভাই সুড়ুৎ করে রাজধানী ট্রেনে ওঠ্
অলিতে গলিতে হচ্ছে যে অবরোধ

আমার কী ভয়, কোথায় রিদয়, পকেটেই ছিল বোধ!!

সাদা কাগজ

কুশল দে

এতদিন যা-যা দেখলাম,
খুন, ধর্ষণ, সাম্প্রদায়িকতা
ভণ্ডামির সওদাগরের মিছিল
আরও কত কী ভাষার চিতাভস্ম।

যা-যা শিখলাম,
যত ভুল বকবে
ভুল পথে চলবে
ততই বাহবা আর
হাততালির পর হাততালি
গুণকীর্তন সারাক্ষণ।
ন্যায়ের সাজা অন্যায়ের পুরস্কার এইসব আর কী

সেই সবই, সাদা কাগজে লিখে রেখে গেলাম—
আর অক্ষরবারুদ ঘরে তালা বন্ধ করে
আকাশকে ভালোবেসে, জড়িয়ে ধরে
দেহকে দিলাম ছেড়ে।
আর তোমাদের জন্য রেখে গেলাম
একটা স্লেট, একটা কলম
একটা চক্ পেন্সিল
আর এক টুকরো সাদা কাগজ।

পরিচিতি পরিচয়

বিশ্বনাথ কয়াল

এইমাত্র যিনি চলে গেলেন
তাঁকে কোনো দিন দেখেছি বলে মনেও পড়ে না
কোথায় যেন দেখা হবার ছিল
পরিচিতি বৃত্তব্যূহের বাইরে
অন্ধকার বিস্মৃতিময় মনন পেরিয়ে
তার সাথে জন্মাবধি পরিচয় নিত্য সমারোহে।

এইমাত্র তিনি চলে গেলেন
অন্ধকার সরিয়ে প্রকাশ্যে ফুলের মালায়
বুক চিতিয়ে নাগরদোলায় চলে গেলেন
হাজার পা মিলিয়ে অমরত্ব ধ্বনি
যেতে যেতে মনে হল
কোনোদিন দেখেছি বলে মনেও পড়ে না।

জনকল্লোলে ডুবে যেতে যেতে
আপন ভুবনে ভেসে আছি
একান্তে বেদনামন্ত্র সুখে
বিন্দু বিন্দু পৃথক কেন্দ্রে ঠিকানা খুঁজি।

এবার বিন্দু কেন্দ্রে মেঘভাঙা হঠাৎ প্লাবনে
সারা জমিন জুড়ে অনাবৃষ্টি চোখে পড়ে।
পরিচিতি পরিখা পেরিয়ে পরিচিত স্মরণ আলোয়
উঠোন বাগান জনপথে আত্মীয় প্রতিবেশ সবাক সভায়
জানালা খুলে দরজা পেরিয়ে নীরব যাত্রাপথে
তার সাথে জন্মাবধি পরিচয় নিত্য সমারোহে।

বিপদসীমা

রসুল করিম

গভীর খাদের থেকে ছড়িয়ে পড়লো অন্ধবাতাস
জঙ্গল থেকে অরণ্যে, এমনকি আমার
গেরস্থালির উঠোন চত্বরে,
কিলবিল করছে সাপ
বনবেড়ালের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কালো হরফ
আমি অতিক্রম করতে পারিনি
আমার অসহ্য দিনযাপন
আমার বিপদসীমা

বাতাসে দোল খাচ্ছে বাবু বিকেল
অস্পষ্ট আবছায় চেনাপথ অচেনা হয়
রঙিন আলোকে জন্মান্ধ দুঃখগুলো
রাতচিবোয়

আমি এখন নৌকাডুবি মানুষ।

লড়াই

মিনতি গোস্বামী

বাঁচবো বাঁচবো করতে করতে
একদিন ঠিক বেঁচে যাবো
ভাতের লড়াই করতে করতে
একদিন পাতে ভাত পাবো।

অন্ধকারের খিলান নড়িয়ে
আনবো দিন বদলের ভোর
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে
কাটিয়ে ফেলবো ঘুমঘোর।

সময় জানি প্রকৃত বন্ধু
রাস্তাই হল মুক্তির পথ
রক্তঝরানো পায়েই হাঁটবো
আমাদের পথে চাইনা রথ।

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে খেলতে
নাশ হয়ে গেছে কুরুবংশ
অপেক্ষা শুধু দিন গোনার
বিরুদ্ধশক্তি হবেই ধ্বংস।

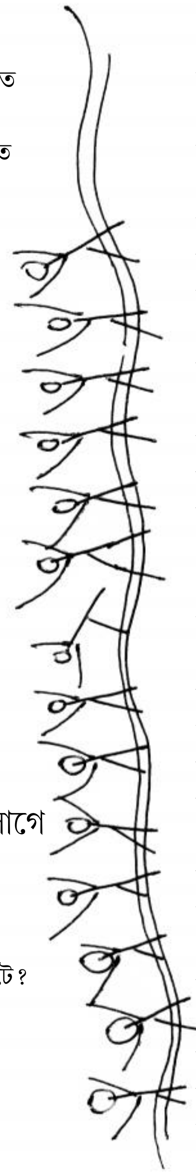

পাড়ায় যখন আগুন লাগে

স্বরাজ ঘোষ

পাড়ায় যখন আগুন লাগে
আম কুড়োতে কেউ কি ছোটে?
কোন মন্ত্রে নিভবে আগুন
কেউ দেখে না পুঁথি ঘেঁটে।
হাঁড়ি কলস বালতি ঘটি
হাতের কাছে যে পায় যেটি
জল ভরে সব আসে ছুটে।
বামুন কায়েত মজুর চাষা
সকল ধর্ম সকল ভাষা
বিভেদ ভুলে প্রাণের টানে
সবাই এসে জোটে।

আজকের এই কালবেলাতে
কে চায় বসে কাল কাটাতে?
আগুন দেখে ভয় পেয়ে কে
দুয়ারে খিল আঁটে?

নিভবে আগুন অবশ্য
নেভাবে গ্রামের ঐক্য;
সর্বনাশা কালো মেঘ
যাবেই যাবে কেটে।

ও মানুষ

মলয় রায়

বিশ্বাস ঘরছাড়া
শুকনো পুকুর
আঁতেল জলাভূমি।

নিরুত্তর সব কিছু
তুমি থেকে রোজ
হারিয়ে যাচ্ছ তুমি।

সাপ শকুন বা
পতঙ্গ নও তুমি।
মানুষ।
বাজারি রাজনীতির
লাভজনক রণকৌশল।
ও আবাদে আর
যেও না মানুষ।
দিও না সার ওষুধ জল।

তুমিই প্রকৃতির
চিন্তা চেতনা
বাউল ভাটি সারি জারি।
তুমিই ভারতবর্ষ।

রুটি সেঁকা উনুনে
আর একবার সেঁকে নাও
চেতনার ধারাপাত।
বন্ধ করে রক্তপাত।

সহ্য কর দুখ।
তবু সুখ চেয়ে আর
কিনো না অসুখ।

মানুষের হাত ধরো মানুষ।
ও মানুষ।

স্বপ্নভঙ্গ
বিকাশ বিশ্বাস

বন্ধনমুক্ত জীবনের অখণ্ড অবসরে
রংতুলি হাতে ভারতমায়ের
প্রসন্ন মুখ ভাবতেই
দেশজুড়ে দলিত আর্তনাদের ছবি
মানসপটে ভেসে ওঠে।
শোণিতধারায় সিক্ত
জনপদ থেকে রাজপথ।

লালনের গান শুনতে শুনতে ভাবলাম
একটা গান লিখব—মানবতার।
রামরাজত্ব, শান্তি-সম্প্রীতির
কথা ভাবতেই একি ভয়ঙ্কর কলরব!
ভূতের মুখে রামনাম আর তাণ্ডব।
‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে
সহে’-র বাইরে যাঁরা...
তারা সব দেশদ্রোহী!

আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ—তুমি তো বলেছিলে
ওদের পশ্চাতে রেখো না
ভীমরাও আম্বেদকর—তুমি তো চেয়েছিলে
সাম্যের ভারত গড়তে সেই কবে।
অথচ ওদের পৌরাণিক শান্তিজলে
এত রক্ত কেন? মধ্যযুগের গন্ধ কেন?

চাকরি দুপুরের একক সঙ্গীত
চয়ন ভৌমিক

সিংহের গর্তে বসে আছি। বাইরে আফ্রিকান সাভানা, শিকারি রোদ। আমার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে লাল পিঁপড়ের ধারা। তাদের শ্রমিক পিঠে অর্ধেক চিবানো হাড়, দাঁতে কামড়ানো স্বপ্নের সাদা রঙ, রানির বিয়োনো ডিম।

এমন সময় তোমার ডাক আসে রোজ। আমি তোমায় সিংহের গর্জন শোনাই ইথার তরঙ্গে, দেওয়ালে লেগে থাকা রক্তের মানচিত্রের ছবি দেখাই বায়োস্কোপ খুলে। এত হাড় জীবনে দেখিনি জানো, এত ছাড়িয়ে রাখা হরিণের চামড়াও না।

ভাবো তো পাখির ডাকের দিনগুলোর কথা। খোলা জানলায় আমগাছের ছায়ার শব্দ, আর সুপুরি ফুলের নির্মম গন্ধ, কীভাবে চিত করে রেখেছিল আমাদের উঠোনের গভীরে তা যে স্মৃতির সুখ। তাও সেসব ছেড়ে এই গুহাজীবন, অক্সিজেনহীন জেল, অন্ধকারের গান এগুলো খুঁড়ে ফেলছে আমায়। আর আমি অপেক্ষা করছি ঘড়ির কাঁটা ঘোরার। ছুটির সাইরেন বাজলে দরজা খুলো তুমি। আমি ফিরে আসার গল্প শোনাবো তোমায়। শিউরে উঠো না, এসব যুদ্ধের নিয়ম। আলো ও অন্ধকারের জটিল সংবিধান।

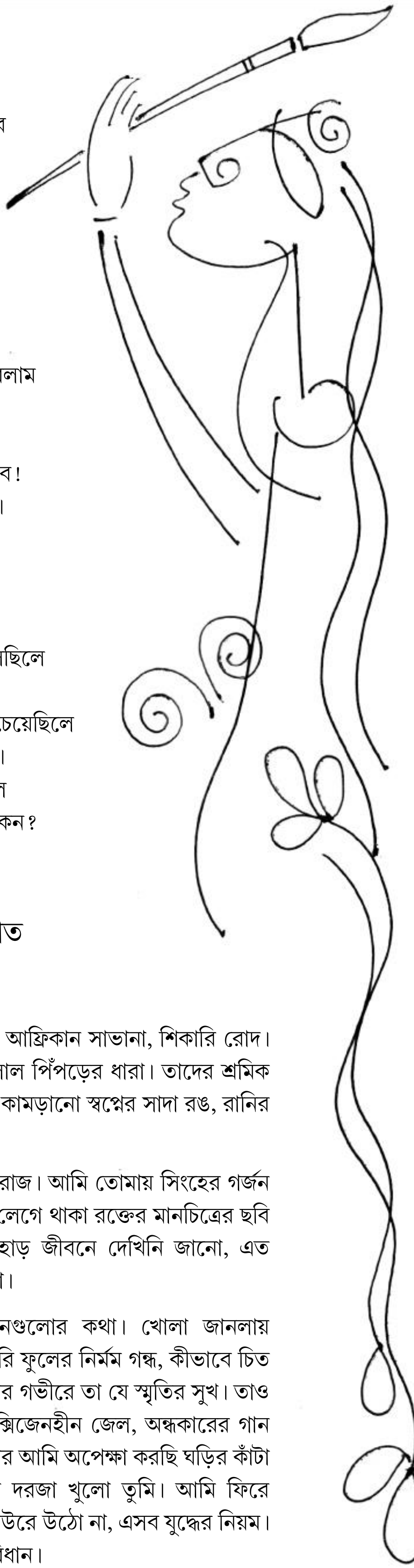

যুদ্ধকালীন গানের খাতা
সুকান্ত দে

তুফানে চুমুক দেব বলে ঘর ছেড়েছিলাম
গুলি-মর্টার পায়ের কাছে শেল
অ্যাডভেঞ্চার

বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে গান লিখেছিলাম—

‘মৃত্যুর মুখোমুখি হলে
নারীরা আরও বেশি স্নেহময়ী হয়ে ওঠে
ঘরকন্নার আওয়াজ
ফোঁটা ফোঁটা অক্সিজেন ঢালে’

রাতে যুদ্ধবিরতি
বিপক্ষের ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন
মহাবীর কর্ণ
একুশের গালে গাল রেখে কেঁদেছিলেন
আশীর্বাদ করেছিলেন
আমার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী
আর না-জন্মানো সন্তানকে

নাছোড় শিশুর মতো আবদার করেছিলেন—
‘পানপাত্রে বিষ মিশিয়ে দাও
শরীর বহনের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করো
তোমার স্ত্রীর গর্ভে
আমি অপেক্ষা করবো
যুদ্ধ থেকে ফিরে গান শিখিও আমায়’

শুক্রাশয়ে
ঘুমন্ত বিশ্বপিতার ঠোঁটে চিলতে হাসি

শেষ চিঠিতে জানিয়েছিলাম
আমার কোর্টমার্শাল-এর কথা

শত্রুপক্ষীয় এক নারীকে ধর্ষণের সময়
সেনাপতিকে গুলি করেছি
পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে

আমায় ক্ষমা কোরো প্রিয়তমা,

সন্তানকে শিখিও
কীভাবে গাইতে হবে আমার গান।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন, সংসদীয় রাজনীতি ও রাজ্যভিত্তিক আন্দোলনের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন

হরিহর ভট্টাচার্য

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন এখন এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনী রাজনীতিতে এটা এখন অস্তিত্বের সংকটে পড়ে আছে। বহু দশক ধরে রাজ্যস্তরে (তিনটি রাজ্যে) ক্ষমতায় থেকেও তার এই সংকট কেন ঘটলো তা নিয়ে দলের অভ্যন্তরে নানা কাটাছেঁড়া বিশ্লেষণ হচ্ছে এবং হবেও। এই প্রেক্ষিতে একজন মার্কসবাদী গবেষক হিসেবে মনে হয় কিছু ভিন্ন ভাবনার অবকাশ থাকে। এই আলোচনা ভারতের বিভিন্ন কমিউনিস্ট দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যদিও সর্ববৃহৎ দল সিপিআই(এম) সম্বন্ধে এটি বেশি প্রযোজ্য।

এই আলোচনায় প্রথমেই রাজনৈতিকভাবে বিবেচ্য দুটি প্রাথমিক ও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করবো। প্রথমত, ১৯৮৮ সালে ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম বামপন্থী সরকারকে—১৯৭৮ সালের পর প্রথম—পরাজিত হতে হয় তৎকালীন কংগ্রেস-টিইউজেএস প্রাক্‌নির্বাচনী জোটের কাছে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সেখানে এই জোট সরকার ক্ষমতায় থাকে। টিইউজেএস (অধুনা বিলুপ্ত) ছিল একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী দল। ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের প্রথম পরাজয়ে কংগ্রেস এক অশুভ আঁতাত গঠন করে। সঙ্গে অবশ্য ছিল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার, যে কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ২০১৮-র বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় মানিক সরকারের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট দ্বিতীয় বার পরাজিত হয়। এক্ষেত্রেও এক ভিন্ন অশুভ আঁতাত তৈরি হয় বিজেপি-আইপিএফটি-র মধ্যে। শেষোক্ত দলটিও বিচ্ছিন্নতাবাদী। আর ত্রিপুরায় বিজেপি দলটি তৈরিই হয় গোটা কংগ্রেস ও তৃণমূল দল বিজেপি-তে যোগদান করার ফলে, যা বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করে। বামেরা যদি সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস বা তৃণমূলের সঙ্গে কোনোরূপ সমঝোতা বা আঁতাঁত করার উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অবহেলা করে তাহলে শেষ বিচারে কোনো অঙ্গরাজ্যে বামদলগুলির ক্ষমতা ক্ষয় হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ত্রিপুরায় সিপিআই(এম) কিন্তু তাদের তীব্র কংগ্রেস- আইপিএফটি এবং বিজেপি-বিরোধিতার জায়গাটা ছাড়েনি। তাই ক্ষমতাচ্যুত হলেও তাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে ভোটসমর্থনের জায়গা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। অন্য একটি গবেষণাপত্রে আমি ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের নির্বাচনী পরাজয় (২০১৮-পরবর্তী) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছি যে সামগ্রিকভাবে বিজেপি বামফ্রন্টের তুলনায় মাত্র ১৩৪৪ ভোট বেশি পেয়েছে। (ভট্টাচার্য ২০১৯)

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা : ২০০৮ সালে সিপিআই(এম) হঠাৎ করে প্রায় এককভাবে প্রথম ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেয়। যতদূর জানা যায়, এই সিদ্ধান্ত যতটা তৎকালীন দলের সাধারণ সম্পাদকের ছিল, ততটা দলের ছিল না। ইন্দো-মার্কিন পরমাণু শক্তি চুক্তি (নং ১২৩) সঠিকভাবে কী ছিল, দেশের ওপর বা ভারতের বামপন্থী দলের ওপর তার প্রভাব কতটা পড়বে ইত্যাদি বিষয়গুলোতে যথাযথভাবে পার্টির তথাকথিত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের নীতি কতটা অনুসরণ করা হয়েছিল তাও বিচার্য বিষয় ছিল। এর ফল কী হল? বামেদের সমর্থন তুলে নেওয়ার পরও কেন্দ্রের সরকার ভেঙে পড়ল না। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় বাম সরকারের সর্বনাশের রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। বহু দশক যাবৎ যেভাবে বামবিরোধী ভোটভাগের ব্যবস্থা পশ্চিমবাংলায় তৈরি করা ছিল, সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষিত আমূল পাল্টে গেল। এখানে কংগ্রেস-তৃণমূল দলের জোট তৈরি হয়ে গেল। বাম-বিরোধী ভোট একত্রিত হয়ে গেল এবং ২০১১ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেল। ২০০৮ সাল থেকেই এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত স্তরে রাজনৈতিক প্রভাব অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল, ২০০৭-এর লোকসভা নির্বাচনে বামেদের ভিত অনেকটা নড়বড়ে হয়ে গেল, যা বামফ্রন্টকে একটা বড় সাবধানবাণী দেয়। প্রয়াত জ্যোতি বসু সেই সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, ‘‘আমরা কমিউনিস্টরা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কী প্রভাব হবে তা বিবেচনা করি, অর্থাৎ কেন্দ্রে ইউপিএ-১ সরকারের যদিওবা পতন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কী লাভ হবে সেটা ভাববার দরকার ছিল।’’ ২০১১-র নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভোট হয়তো সামগ্রিকভাবে কমতো, বা বিধানসভায় আসন হয়তো কমতো, কিন্তু বিপুলভাবে পরাজয় হয় তো হতো না। ওইরূপ ‘হঠকারী’ সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়লো পশ্চিমবঙ্গের দল, তার সাধারণ কর্মী-সমর্থক এবং সর্বোপরি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ওপর। মা-মাটি-মানুষের নামে ‘জনপ্রিয় একব্যক্তির স্বৈরাচারী শাসন’ এখানে কায়েম হল, যার করুণ পরিণতির সাক্ষী আজকের পশ্চিমবঙ্গবাসী।

ওপরের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত রূপরেখার আলোচনা থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমত, কেন্দ্রীভূত দলীয় কাঠামোয় রাজ্যভিত্তিক দলের আপেক্ষিক রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য কোণঠাসা হয়ে যায়। তথাকথিত সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতকে সামনে আনতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যদলের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মতোই কমিউনিস্ট বা বামপন্থী দল বা আন্দোলনও

এদেশের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য-নির্ভর এবং দলের ভিতও যে সেই কারণেই প্রধানত আঞ্চলিক—এই প্রবল সত্যটি অস্বীকৃত হয়ে যায় যদি না রাজ্যভিত্তিক কমিটিগুলির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য থাকে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে যে-সমস্ত তথ্যভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হয়েছে, সেগুলিতে দেখানো হয়েছে যে, ভারতীয়দের জাতিসত্তার মতোই কমিউনিস্ট দল বা আন্দোলনেরও এক দ্বৈতসত্তা আছে, যা অস্বীকার করা যাবে না। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে যেমন বাংলার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যাবে না, তেমনি কেরালার বামপন্থী আন্দোলনের আবির্ভাব ও বিকাশও বাংলার প্রেক্ষিতে আলোচনা করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক গবেষক প্রয়াত নসিটার মন্তব্য করেছেন—

> There is a sense in which Communists are seen by the Indian public as the regional manifestations of anti-Congressism in West Bengal, Kerala and Tripura... to the extent each is *Suigeneris*—Kerala with an extraordinary degree of institutionalized competition between communities as well as parties, West Bengal with low caste saliency the imperial heritage, and the *Bhadralok* establishment, and Tripura with indigeneous tribes and immigrant Bengalis at both ends of the social scale—none offers an easy blueprint for India at large. (নসিটার, ১৯৮৮, পৃ. ১৯৭)

অর্থাৎ ''ভারতের জনসাধারণ কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ওই তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধিতার রাজনৈতিক আঞ্চলিক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করে। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের কমিউনিস্ট আন্দোলনের চরিত্র ভিন্ন। কেরালায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বাংলায় জাত-ব্যবস্থার তেমন রাজনৈতিক প্রাবল্য নেই, এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য এবং ভদ্রলোক শ্রেণির আধিপত্য সেখানে বাম রাজনীতির চরিত্রটা নির্ধারণ করে দিয়েছে; এবং ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলন নির্ধারিত হয়েছে এক দিকে উপজাতি সত্তা এবং অন্যদিকে অভিবাসী বাঙালি দ্বারা যারা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সমাজ ও অর্থনীতিতে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। এই দুই-এর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সেখানে বাম রাজনীতি বিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত কোনো অভিজ্ঞতাই সারা দেশের জন্য কোনো সহজ ব্লু-প্রিন্ট নয়।''

কিছু তাত্ত্বিক বিষয়

কমিউনিস্ট দল হবে কেন্দ্রীভূত পিরামিডের মতো সংগঠন এবং কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং গোপন। এই দলের সদস্যরা এক তীব্র গোপনীয়তা বজায় রাখবে। কমিউনিস্ট দল সম্বন্ধে এই ধারণা বিশেষভাবে লেনিনের। ১৯০২ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বই 'What is to be Done'-এ এইরূপ একটি দলের ধারণা তিনি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে (কমিন্টার্নে) ১৯২১ সালে এই ধারণার পুনরাবৃত্তি করা হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট দলে ওইরূপ সাংগঠনিক কাঠামোর কথা লেনিন কেন সমর্থন করেছিলেন সেটা বাদ দিয়ে ভাবলে লেনিনবাদকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে না এবং তার ফলে অনৈতিহাসিকভাবে সে ধারণার প্রয়োগ করলে তার দায় লেনিনের ওপর চাপানো যাবে না। ১৮০ পৃষ্ঠার ওই বইটি তৎকালীন রাশিয়ার চলিষ্ণু বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে লিখিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মধ্যে বেশ কিছু রাজনৈতিক সূত্র ছিল যেগুলোর সার্বিক প্রায়োগিক প্রসঙ্গ ছিল। সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলির দু-একটির ওপর আলোকপাত করব।

প্রথমত, তৎকালীন রাশিয়ার বৈপ্লবিক প্রেক্ষিতে, ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট দলের (সোস্যাল ডেমোক্র্যাট) পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, শ্রমিকদের সংগঠন হবে ট্রেড ইউনিয়ন, কিন্তু শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংগঠন হবে ভিন্ন প্রকৃতির। শ্রমিকদের সংগঠন হবে পাবলিক, পারিপার্শ্বিকতা সাপেক্ষ। কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠন হবে পেশাদারী বিপ্লবীদের সংগঠন, যে সংগঠনে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। রাশিয়ার জারতন্ত্রের (Absolutist Russia) প্রেক্ষিতে সে সংগঠন হবে যতটা সম্ভব গোপন। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশে (যেখানে মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে) ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে পার্থক্য বেশ পরিষ্কার, উভয়ের সম্পর্ক বেশ সহজ ও সমস্থানিক। কিন্তু রাশিয়ার জারতন্ত্রে ছবিটা একেবারে আলাদা। গণতান্ত্রিক দেশে যেটা সম্ভব, রাশিয়ায় সেটা সম্ভব ছিল না :

> In Russia, however, the yoke of the autocracy appears at the first glance to obliterate all distinctions between the Social-Democratic organisation and the workers' association, since all workers' associations and all study circles are prohibited, and since the principal manifestations and weapons of the workers' economic struggle—the strike—is regarded as a criminal (and sometimes even as a political) offence. Conditions in our country, therefore, on the one hand, strongly 'impel' the workers engaged in economic struggle to concern themselves with political questions, and on the other hand, 'impel' social democrats to confound trade unionism with Social Democracy... (Lenin: Collected works 1964, Vol. 5, p. 453)

উপরোক্ত বক্তব্যের সারাংশ করলে এটা দাঁড়ায় যে তৎকালীন স্বৈরতান্ত্রিক জার-শাসিত রাশিয়ায় শ্রমিকরা ট্রেডইউনিয়ন করে আর্থিক দাবি দাওয়ার জন্য আন্দোলন করলে সেটাকে রাষ্ট্র অপরাধ মূলক এবং রাজনৈতিকভাবে অন্যায় কাজ বলে নিষিদ্ধ করে দিত। কিন্তু পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশে সে সমস্যা ছিল না। রাশিয়ায় এই কঠিন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট দলের প্রকৃতি ভিন্ন হতে বাধ্য ছিল। রাশিয়াতে তখন যে-কোনো সমিতিমূলক কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল তাই শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্র সম্পন্ন হয়ে উঠতে বাধ্য ছিল।

পার্টি সংগঠন সম্বন্ধে লেনিনের তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাই তাঁর বক্তব্যের মূল সূত্রটির ওপর কিছুটা আলোকপাত করা যায়।

লেনিন কিন্তু এক কেন্দ্রীভূত পিরামিড কাঠামো যা চরম শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং গোপনীয়তায় মোড়া তেমন সংগঠনকে স্থান-কাল-নিরপেক্ষ ভাবে গ্রহণ করতে বা প্রয়োগ করতে বলেন নি। গণতান্ত্রিক দেশের প্রেক্ষিতে যে দলীয় সংগঠন বৃহৎ ও প্রশস্ত হবে এবং সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত গোপনীয়তার নীতি প্রয়োগ করা যাবে না, তাও তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন (CW/5, p. 454)। ১৯২১ সালে কমিন্টার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে 'পার্টি সংগঠনের নীতি' শীর্ষক দলিলে পার্টির সংগঠনের কোনো চূড়ান্ত এবং সর্বকালীন ধরনের বিপক্ষেই মত প্রকাশ করা হয়েছে। ওই দলিলে কী বলা হয়েছিল দেখা যাক—

> The organisation of the Party must be adapted

to the conditions and the goal of its activity... There can be no absolute infallible and unaltered form of organisation for the communist parties... The peculier conditions of every individual country likewise determine the special adaptation of the form of organisation of the respective parties.'' [p. 9, CPI(M), 2015]

অর্থাৎ পার্টি সংগঠন বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও তার সামর্থ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবে। পার্টি সংগঠনের ধরন অপরিবর্তনীয়, চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত হতে পারে না। বিশেষ বিশেষ দেশের অবস্থা এর সংগঠনের খাপ খাওয়ানোর ধরন ঠিক করে দেবে।

ওপরের আলোচনা থেকে যে দুটি বিষয় সামনে আসে সেগুলি হল—এক. কমিউনিস্ট দলের পিরামিড আকৃতির কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কেন্দ্রীভূত চরিত্র সব দেশে সব সময় ব্যবহার করা হয় না। আমাদের দেশে যখন ব্রিটিশ শাসন ছিল (১৭৫৭-১৯৪৭) এবং কমিউনিস্ট রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল, তখন পার্টি সংগঠনকে হয়তো সেভাবে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু ১৯৫২ সালের পর থেকে কমিউনিস্ট দলগুলি যখন নির্বাচনী রাজনীতিকে গ্রহণ করে এবং তাতে অংশগ্রহণ করে, তার সঙ্গে উপরোক্ত সাংগঠনিক কাঠামো ঠিক খাপ খায় না। নির্বাচনী কার্যকলাপকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বলা যায় না। দুই, কী লেনিন বা কমিন্টার্ন সব ক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট দলের কার্যকলাপ বলতে বৈপ্লবিক কাজকর্মের কথাই বলা হয়েছিল। জনগণতান্ত্রিক পরিবেশ তখন হাতে গোনা এবং নির্বাচনী সংগ্রামে কমিউনিস্ট দলের সামনে অংশগ্রহণের তত্ত্ব হাজির হয় ১৯৫০ সাল থেকে। এখন প্রশ্ন হল : জনগণতান্ত্রিক (Mass Democracy) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে একটি পিরামিড-আকার উচ্চনিচ স্তর-বিন্যস্ত এবং চরম গোপনীয় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ দল কি মুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে খাপ খায়? যে প্রেক্ষিতে সভাসমিতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ নয় এবং যেখানে মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, যেক্ষেত্রে রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের অবস্থা বিদ্যমান নয়, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত রাজনৈতিক সংগঠন ঠিক কী হওয়া উচিত তা ভাবা দরকার।

উপসংহার

আমি যে সমস্যাটা মাথায় রেখে এই প্রবন্ধের সূচনা করেছিলাম সেখানে ফিরে যাওয়া যাক্। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন রাজ্য কমিটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু ওই রাজ্যকমিটিগুলির আপেক্ষিক রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বেশি রক্ষিত হতে পারে একটি অ-কেন্দ্রীভূত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক দলীয় কাঠামোর সাহায্যে, যাতে রাজ্যভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট দলের ভিত রক্ষার বিষয়টি সর্বাগ্রে স্থান পায়—যেখানে কোনো 'কেন্দ্রীয়' সিদ্ধান্ত রাজ্যস্তরে মার্কসবাদী দলের ভিত নষ্ট করার কারণ না হয়ে ওঠে। আমাদের দেশটা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং গণতান্ত্রিক—এই যুক্তরাষ্ট্রীয়তা আবার দেশের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নির্ভর—এ দেশে দলীয় কাঠামো 'অযুক্তরাষ্ট্রীয়' এবং এককেন্দ্রিক হলে চলে না।

সবশেষে, উদারনৈতিক, প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তাতে অংশগ্রহণ দাবি করে দলের আনুভূমিকতা ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি। নির্বাচনী রাজনীতির নিজস্ব ধরন, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে যাকে 'অর্থনৈতিক নিয়তিবাদ' দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। নির্বাচনী রাজনীতি ও কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ এককেন্দ্রিক দল একে অপরের পরিপূরক নয়। বরং সামঞ্জস্যহীন। বামেরা যে ভোট পায় তাকে 'শ্রেণিভোট' বললে সাংঘাতিক ভুল হবে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কেরালার বামেদের বিপর্যয়ের বড়ো কারণ ছিল সবরীমালা মন্দিরের প্রবেশের প্রশ্ন। সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও বামেরা এক কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে এবং ধর্মীয় এবং এক বৃহৎ গণপরিসর (মহিলা) তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে অবশ্য রাজ্যদল তার ত্রুটি স্বীকার করেছে। নির্বাচনী রাজনীতিতে অশ্রেণিগত নানা পরিসর থাকে—এদের রাজ্যভিত্তিক অথবা আঞ্চলিক বৈচিত্র্যও কম নয়। সাধারণ ভোটার সবসময় সুবিধা-অসুবিধা এবং লাভ-লোকসান হিসাব করেই ভোট দেয়। তাই বৈপ্লবিক কাজের জন্য তৈরি সংগঠন নির্বাচনী গণতান্ত্রিক কাজের সঙ্গে বেমানান। এ-ব্যাপারে লেনিনবাদের শিক্ষা শিরোধার্য করা ও তার সঠিক প্রয়োগ দরকার।

তথ্যসূত্র

১. Bhattacharyya, H. (2018). *Radical Politics in India's North East : The Case of Tripura.* [London: Toutlege]

২. Bhattacharyya, H. (2019). 'Tripura Left's Electoral Decline: When Good Governance is not Good Politics' *[The Socialist Perspective*, 2019 (forthcoming)]

৩. CPI-M. (2015). Documentation on Party Organisation (1964-2009), [Kolkata, NBA]

৪. Lenin, V.I. (1964). *Collected Works*, Vol. 5, May 1901-February 1902 [Moscow: Press Publishers]

৫. Nossiter, T.J. (1988). Marxist State Governments in India [London: Pinters]

Abbreviations

TUJS: Tripura Upajati Yuba Samity

IPFT: Indigenous Peoples Front of Tripura

লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক

With best compliments from

M/s. Baba Kalu Ray Heemghar Pvt. Ltd.

Vill. & P.O. Jaragram, Dist. Purba Bardhaman

Ph : 03213-258556

Sl. No. 66

কলকাতাবাসীর জন্য রইল শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
উৎসবের সময় সার্বিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন।
কলকাতা পৌরসংস্থা

Sl. No. 68

অতীত ঔপনিবেশিকতা এবং বর্তমান অনুন্নয়ন

বিভাস সাহা

অর্থনীতির সাবেকি পাঠ্যপুস্তকে অনুন্নয়নের আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয় কী করলে শিল্পে বিনিয়োগ বাড়বে, বা কৃষির উৎপাদনশীলতার উন্নতি হবে এবং কৃষকের রোজগার বাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রচলিত পলিসি (বা নীতি) কোথায় কতটা কাজ করছে বা করছে না তা বোধগম্য করাই মূল কাজ। কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদ্‌রা দেখেছেন এই পদ্ধতিতে অনুন্নয়নের গভীর কারণগুলি বোঝা যায় না। অন্যভাবে বললে, অনুন্নয়নের কিছু গভীর কারণ থাকে যা পলিসির হেরফের করে মোকাবিলা করা যায় না। প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে, এমনকি বৃত্তিমূলক উৎসাহ দিয়েও ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহ একটা পর্যায়ের পরে বাড়ানো বেশ কঠিন। মেয়েদের পণপ্রথা আইন করেও বন্ধ করা যাচ্ছে না। গরিব মানুষের সন্তান সর্বত্রই বেশি, সস্তায় জন্মনিরোধক দিয়েও খুব প্রভাব ফেলা যায় না। কন্যাসন্তানের প্রতি অবিচার ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই চলতে থাকে। এইরকম কত কী!

এইসব সমস্যার শিকড় রয়েছে কোথাও ধর্মে, কোথাও সমাজনীতি বা সামাজিক বিভেদ-বিভাজনে। কোথাও বা অতীত ইতিহাসে। বর্তমানে তাই অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দিকে তাকাচ্ছেন। গত দুই দশক ধরে একটা নতুন ইতিহাস-নির্ভর অর্থনৈতিক আলোচনা চলছে যার মূল উদ্দেশ্য হল আজকে যে দেশগুলি গরিব তাদের চার-পাঁচশো বছরের ইতিহাস বোঝা। যদিও প্রত্যেক দেশের ইতিহাস স্বতন্ত্র, তবুও কিছু সাধারণ সূত্র বা কারণ খুঁজে বের করা যাবে এই আশা নিয়েই এই গবেষণার জন্ম। অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোক নতুন নয়, প্রায় সত্তর-আশি বছরের পুরনো, কিন্তু বর্তমান অর্থনীতিবিদরা এই ইতিহাসকে অন্যভাবে দেখছেন, এবং আধুনিক সংখ্যাতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে অনুন্নয়নের 'কারণ' খুঁজছেন। উপরে 'কারণ' কথাটি কোটেশন চিহ্ন দিয়ে লিখেছি তার কারণ গত তিরিশ বছরে অর্থনীতিতে 'কারণ' নির্ধারণের পদ্ধতি আমূল পাল্টে গেছে এবং পুরনো বহু গবেষণার নতুন করে মূল্যায়ন হচ্ছে। এই নতুন ধারাতেই অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার পুনরুজ্জীবন হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমি তারই কিছু আলোচনা করব।

ইদানীংকালের দুই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডারন অ্যাসেমোগলু (Daron Acemoglu) এবং জেমস রবিনসন (James Robinson) অনেকগুলি লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে বর্তমান অনুন্নত দেশগুলির অনুন্নতির প্রধান 'কারণ' সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি বজায় থাকা ইউরোপীয়ান ঔপনিবেশিকতা।

ঔপনিবেশিকতার ক্ষতিকারক দিকের কথা নতুন কিছু নয়। ১৮৬৭ সালে দাদাভাই নওরোজি হিসাব করে দেখান মাত্র একশো বছরের শাসনে ব্রিটেন ২০০-৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড (বর্তমান মুদ্রায়) অন্যায়ভাবে (বা ছলে বলে) লুঠ করে নিয়ে গেছে। এবিষয়ে বিস্তৃত লেখা আছে এবং অতি সম্প্রতি শশী থারুর তাঁর An Era of Darkness বইতে সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখেছেন। এছাড়া অমর্ত্য সেন ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের কথা লিখেছেন। ফলন মোটামুটি ঠিক থাকা সত্ত্বেও মিলিটারির জন্য খাদ্য কিনে নেওয়ার ফলে ভয়ংকর খাদ্যাভাব হয় এবং ২৫ লক্ষ বাঙালির মৃত্যু হয়। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত'-এ এই দুর্ভিক্ষের কথা লেখা আছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে কার্ল মার্কস ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বলেছিলেন যে ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র হিসাবে ব্রিটিশ রাজত্ব এশিয়াটিক গ্রাম-ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল এবং দীর্ঘকালীন জড়তা বা অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ভেঙে নতুন টেকনোলজি আনতে সাহায্য করেছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহাসিকরা মার্কসের এই বক্তব্যের সাথে একমত হননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এশীয় গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি জড়ভড়ত ছিল না, উপরন্তু এর মধ্যে দেশজ যেসব শিল্পের ধীর অগ্রগতির ধারা ছিল, ব্রিটিশ শাসনের ফলে সেই ধারা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া মার্কসের ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়াশোনা খুবই সীমিত ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও বলতে হয় যে, অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে ভারতে রেলওয়ে পত্তনের প্রভাবে কৃষির ও রেললাইন সংলগ্ন এলাকার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। সুতরাং এক অর্থে মার্কসের মন্তব্য অযৌক্তিক বলা যায় না।

যাইহোক, প্রশ্ন হল আধুনিক অর্থনীতিবিদরা তাহলে ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে নতুন কী বলছেন? নতুন যে কথা বলছেন তা হল ওই 'কারণ' সম্পর্কে। এবার 'কারণ' বিষয়টি ব্যাখ্যা করা দরকার। আমরা জানি কাক উড়ে আসার পরে তাল পড়লে, কাক তাল পড়ার কারণ হয় না; বিষয়টি নেহাতই কাকতালীয়। কিন্তু ঝড়ে তাল পড়লে ঝড় যে তাল পড়ার কারণ হতে পারে সে বিষয়ে আমরা বিশেষ সন্দেহ করি না। বস্তুজগতে বিভিন্ন ঘটনার কারণ বা প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারেন। সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে সেই সুবিধা নেই। প্রথম কথা সামাজিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংযোগ নেই, থাকলেও তা অনৈতিক বলে গণ্য হয়, সাধারণত। দ্বিতীয় বিষয় হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদরা 'কারণ' অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করে বিভিন্ন ঘটনার সহযোগ বা সহাবস্থান বোঝার উপর জোর দেন। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা কারণ অনুসন্ধানে সদাব্যস্ত। প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতোই অর্থনীতিবিদরা তাদের গবেষণা পদ্ধতি ক্রমাগত বদলে চলেছেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক আমরা জানতে চাই বর্ধমান থেকে আরামবাগ রেল লাইন পাতা হলে, রেল লাইনের দুপাশে পঁচিশ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে লোকের রোজগার বাড়বে কিনা, এবং বাড়লে কতটা বাড়তে পারে। বোঝাই যাচ্ছে যেহেতু রেল লাইন এখানো হয়নি, তাই এটা ফোরকাস্টিং-এর ব্যাপার। ফোরকাস্টিং-এর নানা পদ্ধতি আছে এবং অর্থনীতিবিদরা সবগুলি সমানভাবে পছন্দ করেন না। একটা পদ্ধতির কথা এখানে বলা যেতে পারে। অতীতে রেল লাইন হয়েছে এমন কোনো জায়গা, যা তুলনামূলকভাবে বর্ধমান-আরামবাগের মতোই, তার সম্পর্কে গবেষণা করে সেই ফলের অনুসারে একরকম অনুমান বা ফোরকাস্টিং করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক অতীতে বর্ধমান-কাটোয়া লাইনের বিদ্যুৎ যোগাযোগ হয়েছে বা মশাগ্রাম-জামালপুর রেল যোগাযোগ হয়েছে। এই রকম কোনো একটি রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়েছে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। এরপর মশাগ্রাম জামালপুর অঞ্চলে লাইন পাতার আগে ও পরে বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করতে হবে random sampling-এর মাধ্যমে। বোঝাই যাচ্ছে বিষয়টি বেশ জটিল, কারণ প্রয়োজনীয় তথ্য সব সময় সংগঠিতভাবে থাকে না। যদি দেখা যায় রেল লাইন পাতার পর উন্নতি হয়েছে, তাহলে প্রাথমিকভাবে আশার কথা। এর পর দেখতে হবে, এই যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে, তা যে রেল লাইনের জন্যই হয়েছে তা কী করে জানবো? তাই রেল লাইন হয়নি এমন জায়গার তথ্যও জোগাড় করতে হবে ওই একই সময়ের। তারপর লাইন পাতার আগে ও পরে তাদের উন্নতির তফাৎ দেখে বলা যাবে কী হচ্ছে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্যায় কারণ খুঁজে বের করতে গেলে এই ধরনের পদ্ধতি বা এর সমতুল কিছু করতে হয়। না পারলে সেই গবেষণাকে মূল্য দেওয়া হয় না। ইতিহাস-নির্ভর কাজকর্মের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা তথ্য। গত কয়েক দশকে বিভিন্ন বিদ্যার গবেষকদের সহযোগিতায় গত পাঁচ-ছয়শো বছরের বিশ্বব্যাপী অনেক তথ্য সংকলিত হয়েছে, যা কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিবিদরা অনেক নতুন গবেষণা করছেন। তাঁদের গবেষণার ফলই যে শেষ কথা তা নয়, এবং এসব নিয়ে অনেক বিতর্কও আছে, তবে তা পরের কথা।

অ্যাসিমোগলু-রবিনসনের বক্তব্য হলো আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের যে তফাৎ দেখি তার অনেকটাই তাদের নিয়ম আইন কানুন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান (Institution) জনিত। Institution কথাটির ভালো বাংলা প্রতিশব্দ নেই তাই আমি নিয়ম-কানুন কথাটা ব্যবহার করব। নিয়ম কানুন ব্যাপারটাই এমন যে এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। কতটা দীর্ঘস্থায়ী তা আমরা ভালো জানি না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার প্রভাব যে শতাব্দী ছাড়িয়ে যায় সে ব্যাপারে অর্থনীতিবিদরা ক্রমশ একমত হচ্ছেন।

আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখি প্রায় গোটা উন্নয়নশীল দুনিয়াই একদা কোন না কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিল। যেমন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশ। আফ্রিকার ক্ষেত্রেও তাই, শুধু ইথিওপিয়া এবং লিবিয়াকে খানিকটা ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। এদের ক্ষেত্রে ইতালিয়ান উপনিবেশের মেয়াদ বেশ সংক্ষিপ্ত ছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড এবং আফগানিস্থান বাদ দিলে বাকি সমস্ত দেশই কম বেশি ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে এসেছে। চীনের কথাও উল্লেখযোগ্য। হংকং, ম্যাকাও-এর প্রত্যক্ষ দখল ছাড়া চীনের উপর ব্রিটিশদের পরোক্ষ প্রভাব, বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্য; ভারতের তুলনায় তার প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ অনেক কম ছিল। আর তুরস্ক বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশ বলে গণ্য হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দেড় দশক অবধি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবেই আধিপত্য বাড়িয়েছিল। মধ্য এশিয়ার ছোট দেশগুলি হয় অটোমান নয় রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সুতরাং এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে বর্তমান উন্নয়নশীল দুনিয়ার দারিদ্র, গৃহযুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি যেসব সমস্যার প্রত্যক্ষদর্শী আমরা, তার সাথে অতীত ঔপনিবেশিকতার একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু দুটো প্রশ্ন আছে : (১) উপনিবেশ হওয়ার আগে এই দেশগুলি কি গরিব ছিল না? (২) আজকের উন্নত দেশগুলি কি কখনো (অন্তত গত কয়েকশো বছরে) উপনিবেশ ছিল না?

প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে ভাবা যাক। আজকের হিসেবে গরিব ধনী দেশের পার্থক্য খোঁজা সুদূর অতীতে অর্থহীন। তদুপরি মাথাপিছু জাতীয় আয় সব দেশেরই বেড়ে চলেছে। সে অর্থে ভারত এখনকার থেকে ব্রিটিশ আমলে বা তার আগে আরো গরিব ছিল। সেটাই ভাবা স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের দেখা উচিত সুদূর অতীতে পৃথিবীতে আয় বা সম্পদ বৈষম্যের হিসাবে দেশগুলির আপেক্ষিক স্থান কী ছিল।

দেখা যাচ্ছে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর অত্যন্ত ধনী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ভারত, চীন, অটোমান সাম্রাজ্য (বর্তমান তুরস্ক), আজটেক সভ্যতা (মেক্সিকো) ও ইনকা সাম্রাজ্য (দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল)। এই হিসাব করা হচ্ছে জাতীয় আয়ের হিসাবে নয়, কারণ আয় মাপার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না তখন। দেশের কত অংশ শহরাঞ্চলের মধ্যে ছিল তার হিসাবে একটা আনুমানিক সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই হিসাব মোটামুটি অবিতর্কিত। মনে রাখতে হবে ১৫০০ সালে আমেরিকা তখনো অনাবিষ্কৃত। ১৪৯২ সালে কলম্বাস হাইতি পৌঁছান, আর ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে আসেন। পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশই তখন মোটামুটি অবস্থায়। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবসা, বাণিজ্য এবং ঔপনিবেশিকতার এত দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে এবং ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লবের পরে বিশ্ব-অর্থনীতির এত উত্থান-পতন হতে থাকে যে একদা ধনী দেশগুলি দরিদ্রতম দেশে নেমে এল এবং অতীতের মধ্যবিত্ত দেশগুলি (কেউ কেউ গরিবও ছিল) ধনী দেশে পরিণত হল। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আয় ও সম্পদ বৈষম্যের ব্যাপক উলটপালট হয়ে গেল।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে হাইতি উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ ছিল, কিন্তু তিনশো বছর বাদে সে বিশ্বের এক দরিদ্রতম দেশ। ১৭০০ সালে বার্বাডোজ বর্তমানে আমেরিকার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) থেকে ৫০ শতাংশ অধিক ধনী ছিল; মানে ওই সময় এক বার্বাডোজ-অধিবাসীর আয় একজন আমেরিকানের আয়ের দেড়গুণ ছিল। একই সময়ে দেখা যাচ্ছে একজন মেক্সিকানের আয় আমেরিকানের আয়ের ৮৯ শতাংশ ছিল, মানে প্রায় কাছাকাছি। ১৯৯৭ সালে একজন মেক্সিকানের আয় আমেরিকানের আয়ে ২৮ শতাংশ নেমে আসে। আর্জেন্টিনা ও আমেরিকা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ১৮০০ সালে একই আয়ের দেশ ছিল। ১৯৯৭-তে আর্জেন্টিনার মাথাপিছু আয় আমেরিকার ৩৫ শতাংশ হয়ে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বের আয় বন্টনের যে চিত্র ছিল তা আমূল বদলে গেছে তার পরবর্তী চারশো বছরের মধ্যে। যেহেতু এই সময়ে ঔপনিবেশবাদের সাথে আধিকৃত দেশগুলির নিয়ম-কানুনের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে—তাই এটা ভাবা অমূলক নয় যে এই নিয়মকানুন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একরকম দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয়রোগ প্রসারিত হয়েছে। এই তত্ত্ব সুদীর্ঘ তথ্যাবলী দিয়ে অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে আসা যাক। সমস্ত উপনিবেশগুলিই দরিদ্র দেশে পরিণত হয়নি। আজকের ধনী দেশগুলির অনেকগুলিই একদা উপনিবেশ ছিল, যেমন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড। আমেরিকায় সমস্ত ইউরোপীয়ান শক্তিরই উপনিবেশ ছিল, যদিও ব্রিটিশদের ভূমিকা ও সাফল্য সবচেয়ে বেশি ছিল। ১৫১০ সালে ফ্লোরিডায় স্পেনদেশীয় পোনসে ভি লিওন পদপাতের মধ্যে দিয়ে যে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের শুরু হয়, তা ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ উপনিবেশে সংহত হয়। তার আগে প্রায় একশো বছর ধরে ফরাসি, ডাচ, স্প্যানিশ ও স্ক্যানডেনেভিয়ান যেসব অধিকৃত এলাকাগুলি ছিল সবই নানা প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশদের হাতে আসে। যেমন নিউইয়র্ক একদা ডাচ-অধিকৃত নিউ অ্যামস্টারডাম ছিল এবং ১৬৬৪ সালে ব্রিটিশদের হাতে এক আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়। আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয় ১৭৭৫-এ American Revolutionary War-এর মধ্যে দিয়ে। কানাডা ১৭৬৩ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত কলোনি ছিল। যদিও কেবেক প্রদেশে ফরাসি উপনিবেশ ছিল, তবুও কানাডা মূলত ব্রিটিশদের অধীনে ছিল। আর অস্ট্রেলিয়া (১৭৮৮-১৯০১) এবং নিউজিল্যান্ড (১৮৪১-১৯০৭) সম্পূর্ণই এবং একাধিপত্যভাবে ব্রিটিশ কলোনি ছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উপনিবেশবাদ যদি সত্যি সত্যিই অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণ হয় তাহলে আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড কেন এত উন্নত দেশ আজ? এই প্রশ্নের উত্তরে অ্যাসিমোগলু-রবিনসন বলেছেন যে উপনিবেশগুলিতে যে ধরনের institution বা নিয়মকানুন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে তাদের ভবিষ্যতের ভাগ্যের পূর্বাভাস। তাঁদের বক্তব্য কোনো কোনো উপনিবেশে প্রগতিশীল (progressive) নিয়মকানুন সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেমন আমেরিকা কানাডা ইত্যাদি বর্তমান উন্নত দেশগুলিতে। আবার অন্য উপনিবেশগুলিতে শোষণ বা লুণ্ঠনের নিয়মকানুন সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভারত, আফ্রিকা, এবং মধ্য আমেরিকার দেশগুলি এর বিশেষ উদাহরণ।

এই তত্ত্ব বিতর্কহীন না হলেও অনেকেই একমত হচ্ছেন। বিতর্কের বিষয়টি আলোচনা করার আগে এখানে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বলা দরকার যে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ রোনাল্ড কোস (Ronald Coase) সম্পত্তির অধিকার এবং Institution বা নিয়মকানুনের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলেন। সম্পদের অধিকার যে সর্বত্রই ব্যক্তিগত হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। সামাজিক মালিকানাতেও বহু সম্পদ থাকে এবং তার রক্ষা ও ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলী হয় ঐতিহাসিকভাবে তৈরি হয়, অথবা নতুন করে সৃষ্টি করা যেতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, নদীদূষণ। কলকাতা ও শহরতলীর কল কারখানা ও গেরস্থালীর দূষণে গঙ্গা দূষিত এবং ইলিশ মাছ শেষ। অর্থাৎ যেসব মাঝিরা গঙ্গায় মাছ ধরে একদা জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাদের আয়ের রাস্তা বন্ধ। কোস বলবেন এই সমস্যার মূলে রয়েছে গঙ্গানদীর ব্যবহারের অধিকারের অভাব। যদি মাঝিদের মাছ ধরার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে কলকাতাবাসীদের পয়সা দিতে হবে মাঝিদের জল দূষিত করতে গেলে। অন্যদিকে কলকাতাবাসীদের যদি জল দূষিত করার অধিকার দেওয়া হয়,

উপনিবেশবাদ যদি সত্যি সত্যিই অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণ হয় তাহলে আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড কেন এত উন্নত দেশ আজ? এই প্রশ্নের উত্তরে অ্যাসিমোগলু-রবিনসন বলেছেন যে উপনিবেশগুলিতে যে ধরনের institution বা নিয়মকানুন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে তাদের ভবিষ্যতের ভাগ্যের পূর্বাভাস।

তাহলে মাঝিরা কলকাতাবাসীদের পয়সা দেবে জল দূষিত না করার জন্য। দুটোই জলদূষণ রক্ষা করবে, যদিও কোন পক্ষ কতটা লাভবান হবে তা নির্ভর করছে কাকে জলের অধিকার দেওয়া হচ্ছে।

এই উদাহরণটি একটু ছেলেমানুষি মনে হলে বলি, এই তত্ত্বের জন্য কোসকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই আন্তর্জাতিক কার্বন বাণিজ্যব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। কোসের ধারণাটিকে কাজে রূপায়ণ করতে গেলে আমরা দেখব যে অধিকার সৃষ্টি করা এবং তাকে রক্ষা করতে গেলে বিস্তারিত আইন কাঠামো এবং প্রশাসনিক সুব্যবস্থা চাই, যা হয়তো সহজ নয়। এই কারণেই আমরা বহু অধিকার রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করে দিই। কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিলে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকে, যার অর্থনৈতিক কুপ্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাই রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রগতিশীল নিয়মকানুন সৃষ্টি করে বাজার-ব্যবস্থা বা আইনসিদ্ধ বাজার-ভিত্তিক বিনিময়ের মাধ্যমে এই সব সমস্যার অনেক সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। আমরা যদি এইভাবে চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলে দেখব আমাদের চেনা অনেক সমস্যা—তোলাবাজি, গুণ্ডাবাজি, ইত্যাদি, এমনকি সিঙ্গুরে শিল্পায়নের সমস্যা—এগুলিকে এক বৃহদর্থে অধিকার-জনিত সমস্যা বলে ভাবতে পারি।

যাই হোক, কোসের বক্তব্য অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ অধিকার (Secure property rights) যে-কোনো সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান শর্ত। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা কোসের এই তত্ত্বকে সকলেই মেনে নিয়েছেন এবং সেই সূত্রে ইতিহাসের গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। অর্থাৎ সম্পদ সুরক্ষার আইন-কানুন ব্যবস্থায় কখন প্রগতি হয়েছে এবং কখন অধোগতি হয়েছে তা নির্ধারণ করে আমরা দেখতে পারি যে কয়েক শতাব্দী বাদে তার প্রভাব এখনো রয়েছে কিনা।

এইখানে এসে পাঠক বুঝতে পারছেন যে নিছক ঔপনিবেশবাদে আমাদের আগ্রহ নয়, আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল সম্পদ-সংযুক্ত আইন-কানুন ব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে, তা বোঝা। পুঁজিবাদের অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক আইন-কানুনের পরিবর্তন হয়েছে পশ্চিম দুনিয়ায়, যাতে বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া যায়, পুঁজির সুরক্ষা হয় এবং মুনাফা বা লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের হাতে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৬৮৮ সালে যখন ডাচ রাজপুত্র তৃতীয় উইলিয়াম (William of Orange) তাঁর ইংরেজ স্ত্রী দ্বিতীয় মেরীর দেশ আক্রমণ করে, তখন থেকে গোটা ব্রিটেনে এক নতুন ব্যবস্থার সূত্রপাত হলো, যাকে গৌরবজনক বিপ্লব বা Glorious Revolution বলা হয়। উইলিয়াম তাঁর সম্পর্কে-শ্যালক জেমস-এর (James II and VII) রাজত্বের অবসান ঘটান এবং তার সাথে ক্যাথলিক রাজত্বেরও অবসান ঘটে। রাজা উইলিয়াম এবং রানী মেরীর রাজত্বে ১৬৮৯ সালে বিল অফ রাইটসের মাধ্যমে পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং বর্তমানে পরিচিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের (constitutional monarchy) প্রতিষ্ঠা হয় বলা যেতে পারে। এই বিলে রাজা বা রানীর ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায় এবং একই সঙ্গে কী বংশপরম্পরায় রাজা বা রানীর সিংহাসনের হস্তান্তর হবে তাই ঠিক করে দেওয়া হয়। এই সময়েই ঠিক হয় প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী না হলে তাঁকে রাজা বা রানী করা হবে না। এর পরে ১৬৯৪ সালে ব্যাংক এফ ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা হয় যা ১৬০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক অব অ্যামস্টারডামের আদলে তৈরি হয়েছিল। যদিও ১৬৯০-এর দশকটি নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে ইউরোপ ও ব্রিটেনের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি দেখেছে, তবুও 'বিল অফ রাইটস', পার্লামেন্টের আধিপত্য এবং বাংক অফ ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে যা পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ব্রিটেনের উন্নতির একটা বড় কারণ বলে ধরা হয়।

এখন ফিরে আসা যাক উপনিবেশবাদের কথায়। অ্যাসিমোগলু ও রবিনসন বলছেন যে কতকগুলি উপনিবেশে প্রগতিশীল ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল এবং অন্য কতকগুলি উপনিবেশে লুণ্ঠনমূলক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম ধাঁচের দেশগুলি পরে উন্নত দেশ হিসাবে পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয় ধাঁচের দেশগুলি হয় অনুন্নত। প্রশ্ন হলো কেন এই বৈষম্য? তার উত্তর ভৌগোলিক অবস্থা এবং পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কিছু আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও নিয়মকানুনের সমন্বয়। ভারত, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বর্তমান অনুন্নত দেশগুলিতে প্রকৃতি চিরকালই নিষ্ঠুর—অধ্যধিক গরম, বন্যা, মহামারী, মশা, ম্যালেরিয়া কী নেই? ব্রিটিশরা গরমকালে হিল স্টেশনে চলে যেত আমরা জানি। ব্রিটিশ সৈনিকদের অবশ্য সেই সুযোগ ছিল না। বছরভর নানা জায়গায় তাদের ডিউটি করতে হতো। দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ রাজত্বে বেঙ্গল ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ভারতীয় সৈন্যদের মৃত্যুর হার ছিল ১০০০-এ ১১ থেকে ১৩ জনের মধ্যে, গড় হিসাবে। সে তুলনায় ব্রিটেন থেকে আগত সৈন্যদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল বাংলায় ৭০ জন এবং মাদ্রাজে ১৭০ জন প্রতি ১০০০ পিছু। এই হার অস্বাভাবিক বেশি। ব্রিটেনে কর্মরত ব্রিটিশ সৈন্যদের মৃত্যুহার ছিল প্রতি ১০০ জনে ১৫ জন। ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর ইত্যাদি অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে তাদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ছিল না। তাই মৃত্যুর হার এত চড়া ছিল (সূত্র : Curtin, 1968)

ঐতিহাসিক Curtin লিখছেন যে উপনিবেশিগুলিতে ইউরোপীয়ানদের মৃত্যুর ৮০ ভাগের কারণ ছিল ম্যালেরিয়া ও ইয়োলো ফিভার। উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য কলোনির তুলনায় নিউজিল্যান্ড ছিল স্বর্গরাজ্য। নিউজিল্যান্ড শুধু যে ম্যালেরিয়ামুক্ত ছিল তাই নয়, ইউরোপীয়ান অসুখবিসুখ যেমন টিবি, নিউমোনিয়া এবং গুটি বসন্ত, এসবের থেকেও মুক্ত ছিল। আফ্রিকাতে দেখা গেছে ইয়োলো ফিভারে আক্রান্ত আফ্রিকানরা সামলে উঠলেও ইউরোপীয়ানরা আক্রান্ত হলেই মরার সম্ভাবনা ছিল শতকরা ৯০ ভাগ।

এইসব উপনিবেশগুলির তুলনায় উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ছিল দীর্ঘস্থায়ীভাবে বসবাসযোগ্য—ইউরোপীয়ানদের ক্ষেত্রে। তাই তারা সেখানে চিরস্থায়ী ব্যবসাস শুরু করে এবং ইউরোপের আদলে সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ইতাদি প্রগতিশীল নিয়মকানুনের পত্তন করে। অন্যদিকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় রোগ-অসুখের ভয়ে তাদের দীর্ঘস্থায়ী বসবাসের উৎসাহ হারিয়ে যায়। তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় কত তাড়াতাড়ি লুঠতরাজ করে দেশে ফিরে যাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যেই তারা এইসব দেশগুলিতে অত্যন্ত শোষণমুখী নিয়মকানুনের ব্যবস্থা জারি করে।

সাক্ষরতার হিসাবে কানাডায় ১৮৬১ সালে ৮২.৮ শতাংশ পড়তে লিখতে পারতো, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৫০ সালে ১০ বছর বয়সের উর্ধ্বে শেতাঙ্গদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ৯২ থেকে ৯৭ শতাংশের মধ্যে। মোটামুটিভাবে উন্নত দেশ আর্জেন্টিনায় ১৮৬৯ সালে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ২৩.৮ শতাংশ যা ১৯২৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৩ শতাংশে। অন্যদিকে চিলিতে ১৮৬৫ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে সাক্ষরতা বাড়ে ৪৭ শতাংশ থেকে ৭৬ শতাংশে। আরো গরিব দেশ কলম্বিয়ায় ১৯৫১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৬২ শতাংশ, আর মেক্সিকোতে ১৮৪৬ সালে সাক্ষরতা

ছিল মাত্র ৪৮.৪ শতাংশ। অর্থাৎ আমেরিকা ও কানাডায় যেখানে শিক্ষার সুযোগ প্রায় সার্বজনীন হয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে, সেখানে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে লাতিন আমেরিকার গরিব দেশগুলিতে সাক্ষরতা খুব বেশি হলে দুই-তৃতীয়াংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ হয়। আর্জেন্টিনার বিষয়টি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। আর্জেন্টিনা একদা আমেরিকার সমকক্ষ উন্নত হবে ভাবা হতো, কিন্তু তা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার হারের পার্থক্য একটা কারণের আভাস দিচ্ছে। এছাড়া দেখা যাচ্ছে, ১৮৯৬ সালে আর্জেন্টিনায় মাত্র ১.৮ শতাংশ লোক ভোট দিত, ভোটের জন্য সম্পত্তি ও শিক্ষা পূর্বশর্ত ছিল এবং ব্যালটের গোপনীয়তা ছিল না। প্রায় একই সময়ে আমেরিকায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সম্পত্তির পূর্বশর্ত ছাড়া ভোট দেওয়া যেত এবং ১৮.৪ শতাংশ লোক ভোট দিত। অর্থাৎ, যদিও উত্তর দক্ষিণ গোটা আমেরিকা মহাদেশদ্বয় একদা উপনিবেশ ছিল, প্রগতিশীল নিয়মকানুনের প্রসার ঘটে দ্রুত উত্তর আমেরিকায় এবং এর একটা বড় কারণ ইউরোপীয়ানদের জন্য উত্তর আমেরিকা অনেক বেশি বাসযোগ্য ছিল।

অবশ্যই এই যুক্তিগুলি অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানবিদ্যার সাহায্যে উপনীত হওয়া, এবং কিছুটা সরলীকৃত বটেই। উত্তর আমেরিকার উপনিবেশবাদ এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশবাদ এক ছিল না। একই ভাবে এশিয়ার ব্রিটিশ রাজত্ব আফ্রিকার ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে খুবই আলাদা ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এই পার্থক্যগুলিও খুঁটিয়ে বোঝার মতো। ভারতের মধ্যেই 'প্রিন্সলি' রাজ্য আর সরাসরি ব্রিটিশ-শাসিত এলাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। এমনকি ব্রিটিশ-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যেও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পার্থক্য ছিল। আমরা জানি বাংলায় ১৭৯৩ সালে জমিদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে (permanent settlement) রাজস্ব আদায় শুরু হয়। পরে এই ব্যবস্থা বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাডুর কিছু কিছু জায়গায় প্রসারিত হয়। বাকি ভারতের রায়তওয়ারি এবং মহলাওয়াড়ি ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমিরাজস্ব সংগৃহীত হতো। জমিদারি ব্যবস্থার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে জমিদারের রাজস্ব আদায়ের অধিকার চিরস্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক ছিল। অন্য দুটি ব্যবস্থায় এই জমিদার শ্রেণি ছিল না। অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জী এবং লক্ষ্মী আয়ার দেখিয়েছেন এই জমিদারি ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি কুফল হিসাবে ১৯৯১ সালের জমির উৎপাদনশীলতা, ধান ও গমের উৎপাদন এবং শিশুশিক্ষার হার ইত্যাদির হিসাবে একদা জমিদারি ব্যবস্থার আওতায় থাকা জেলাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মানে এই নয় যে এই জেলাগুলি বাকি ভারতের জেলাগুলির তুলনায় অনুন্নত। কিন্তু তাদের উন্নতির হার যাই হোক না কেন, সমস্ত সম্ভাব্য কারণ হিসাব করে দেখা যাচ্ছে এই জেলাগুলি অন্য জেলাগুলির তুলনায় যা হতে পারত, তা হতে পারেনি, দেড়শো দুশো বছর আগের জমিদারি ব্যবস্থার জন্য। জমিদারি ব্যবস্থা শুধু এক পরগাছা ব্যবস্থাই নয়, বিনিয়োগ ও উদ্যোগের পথে বিরাট অন্তরায়, এবং বাংলার মানুষ জানে জমিদারির শেষ বংশধররা ভূমিসংস্কারের কতটা প্রতিবন্ধক ছিল। অর্থাৎ রোনাল্ড কোসের ভাষায় জমিদারি রাজস্ব-ব্যবস্থায় নিয়মকানুন অত্যন্ত শোষণমূলক ছিল। এবং তার প্রভাব শতাব্দী পার করেও বোঝা যাচ্ছে।

উপরিউক্ত তত্ত্বের একটা বড় সমালোচনা হ'লো যদি এশিয়া ও আফ্রিকা বাসের অযোগ্য বলে ইউরোপীয়ানরা শোষণমূলক নিয়মকানুন সৃষ্টি করে, তাহলে তো সেই বিচারে নিয়মকানুন বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে দায়ী না করে এই উপনিবেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থান বা পরিস্থিতিকেই দায়ী করা উচিত। বিষুবরেখার কাছাকাছি দেশগুলিতে মশার আধিক্য ও ম্যালেরিয়া থাকবেই এবং তার আক্রমণে ইউরোপীয়ানরা যে নাজেহাল হবে—এটাই তো প্রত্যাশিত। সুতরাং অর্থনৈতিক অনুন্নতির সঙ্গে একটা দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের একটা সম্পর্ক নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেই সম্পর্ক কতটা অনুষঙ্গের আর কতটা কার্য-কারণের সেটাই প্রশ্ন।

একটা দেশের ভাগ্যে তার ভূগোলের সাথে জড়িত, এমন একটা চিন্তাধারা কিন্তু বহু পুরানো। ১৭৪৩ সালে লেখা The Spirit of the Law বইতে মন্টেস্কু বলেছেন শীতের দেশের মানুষ অনেক পরিশ্রমী ও উদ্যমী হয়। একইভাবে টয়েনবি বলেছিলেন, প্রকৃতি যেখান অত্যন্ত উদার, অথবা অত্যন্ত নিষ্ঠুর—এই দুই জায়গাতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভূগোলের আধিপত্য ম্যালথাসের লেখাতেও পাওয়া যায়; খাদ্যোৎপাদনের সীমাবদ্ধতা সমাজ ও অর্থনীতির পক্ষে একটা বিরাট প্রতিবন্ধক ছিল তাঁর মতে।

ভূগোল-নির্ভর চিন্তাভাবনা দীর্ঘকাল প্রাচীনপন্থী বলে গণ্য হলেও ১৯৯৭ সালে লেখা Jared Diamond-এর Guns, Germs and Steel : The Fates of Human Societies বইটি ভূগোলের গুরুত্ব আবার ফিরিয়ে আনে। ইউরোপীয় সভ্যতা বন্দুক (অর্থাৎ মিলিটারি আধিপত্য) এবং ইস্পাত (শিল্পবিপ্লবের প্রতীক) দিয়ে তৃতীয় দুনিয়া যে দখল করেছে তাই নয়, অসুখ ও মহামারী চালান দিয়ে উপনিবেশগুলিতে মানুষের আয়ু কমিয়ে দিয়েছে। অর্থনীতিবিদরা এর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বিষয় বেশ গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন—যেমন যেসব দেশে সমুদ্র-সীমান্ত নেই, অর্থাৎ যারা স্থলবন্দি তাদের অর্থনীতি সাধারণত দারিদ্রদুষ্ট, যেমন নেপাল ও আফগানিস্থান, প্যারাগুয়ে বা বতসোয়ানা। এছাড়া কাজাকস্থান, মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলিও রয়েছে। যদিও মধ্যএশিয়ার দেশগুলি সুদর অতীতে সিল্করুটের কল্যাণে বেশ অবস্থাপন্ন ছিল। সেসময় আফগানিস্থানের অবস্থাও বেশ ভালো ছিল।

আরো কয়েকটি ভৌগোলিক বিষয়ের কথা বলা যেতে পারে। যেমন তেল ও খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য বহু দেশের পক্ষে অভিশাপ হয়েছে। এই সম্পদের বাহুল্য অশুভ বিদেশি শক্তিকে ডেকে এনেছে। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকা ধারাবাহিকভাবে আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান (এবং বর্তমানে চীনা) বহুজাতিক কোম্পানির দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে। এর বাইরে রয়েছে ১৯৯০-এর পর থেকে ম্যালেরিয়ার প্রত্যাবর্তন। যদিও ম্যালেরিয়া প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভয়ংকর নয়, শিশুদের ক্ষেত্রে কিন্তু মারাত্মক। পৃথিবীতে প্রায় প্রতি বছর ১৮ লক্ষ শিশু ম্যালেরিয়ায় মারা যায় এবং এর ৯০ ভাগ আফ্রিকাতেই। যেসব শিশু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পরেও বেঁচে যায় তারা প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে বেশ কমজোরি হয়ে যায় এবং বেশ কিছু হিসাবে দেখা যাচ্ছে তাদের আয় অন্যদের তুলনায় অর্ধেক। ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা এমন ১৫০টি দেশে পৃথিবীর ৯৯ শতাংশ মানুষ বাস করে। এর মধ্যে ৪৪টি দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চূড়ান্ত এবং এই ৪৪টি দেশের মধ্যে ৩৫টি দেশই আফ্রিকায়। দেখা যাচ্ছে এই দেশগুলির মাথাপিছু আয় ম্যালেরিয়াহীন দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের বিশ শতাংশেরও কম। সুতরাং ভৌগোলিক শর্তগুলির গুরুত্ব এড়ানো যায় না।

ভৌগোলিকবাদীদের মতে কোন্ দেশে কোন্ ধরনের উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছিল তা অবশ্যই মুখ্যত ভূগোল-নির্ধারিত। যেমন ব্রাজিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশেই বহু ক্রীতদাস আনা হয়েছিল, কিন্তু ব্রাজিলে এই সংখ্যা অত্যধিক হয়ে যায় তার কারণ ব্রাজিল চিনি/আখ উপদানের জন্য আদর্শ ছিল এবং

এই চাষে প্রচুর কাঁচা শ্রমের দরকার হয়। অত্যধিক ক্রীতদাস আনার প্রভাবে আজ ব্রাজিলের আয়-বৈষম্য অনেক বেশি।

প্রাতিষ্ঠানিকবাদীরা (যাঁরা রোনাল্ড কোসের অনুসারী) বলবেন ভৌগোলিক অবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য কিন্তু আনুষঙ্গিক নিয়মকানুন ছাড়া অগ্রগতি বা অধোগতি ঘটে না। আমেরিকার দক্ষিণ অংশে কটন খামারে এবং অন্যান্য চাষে বহু ক্রীতদাস ব্যবহার হলেও আমেরিকার উত্তর অংশের (যেখানে ক্রীতদাস ব্যবহার বিশেষ হতো না) কৃষক এবং শিল্পপতিরা প্রগতিশীল নিয়মকানুনের প্রসার ঘটায় এবং তা আমেরিকার দক্ষিণ অংশেও ছড়িয়ে দেয়। ব্রাজিলের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। ১৯১৪ সালে ব্রাজিলে মাত্র ২.৪ শতাংশ লোক ভোট দিত, ১৯৩০-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র ৫.৭ শতাংশ। ১৯২০ সালে ব্রাজিলের সাক্ষরতা ছিল ৩০ শতাংশ। এর পঞ্চাশ বছর আগেই আমেরিকা ও কানাডায় সাক্ষরতার হার প্রায় একশো হয়ে গিয়েছিল।

দুই ক্যাম্পের মধ্যে এই বিতর্ক অমীমাংসিত। ভৌগোলিকবাদীরা তাঁদের যুক্তিকে নিয়ে গেছেন আরও সুদূর অতীতে। ভূতত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞানীদের সাহায্যে বহু তথ্য এখন আছে যার সাহায্যে কয়েক হাজার বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা আমরা জানি। প্রাতিষ্ঠানিকবাদীদের সে সুবিধা নেই। পাঁচশো বছরের পিছনের নিয়মকানুনের ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য খুবই ক্ষীণ। বর্তমানে Bio-geography-র গবেষকরা বলছেন যে খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ সালে পৃথিবীর সব মহাদেশেই সভ্যতার অগ্রগতির সমান সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু একমাত্র ইউরেশিয়া অঞ্চলেই (ইউরোপ এবং বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য) সভ্যতার প্রসার ঘটে। এই সময় পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশেই মানুষ ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং সর্বত্রই তারা শিকার এবং সংগ্রহের উপর নির্ভর করত। এই পর্যায় থেকে কৃষিকাজে উত্তরণ হতে বহু সময় লাগে। খ্রিস্টপূর্ব ৮৫০০ সালে এই উত্তরণ ঘটে ইউরেশিয়া অঞ্চলে। চীনে কৃষিকাজের পত্তন হয় খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০ অব্দে, আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে, মেক্সিকোয় খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে এবং আমেরিকার পূর্ব অংশে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ করে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের একটা বড় কারণ মানুষের চলাচলের সুবিধা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগের অভাব। ইউরোপ এবং এশিয়ার পূর্ব পশ্চিম বিস্তার এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল।

মোটের উপর ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি সুদূর অতীতে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনাপ্রবাহে এবং মানুষের নিরন্তর এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভ্রমণ করার মধ্যে দিয়ে বিরাট বিরাট আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কসবাদীরা এই বিষয়গুলিকে উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখেন। সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাজবীক্ষণ। কিন্তু সেই চিন্তাভাবনার সাথে বহু দেশ-কাল নির্ভর তথ্য মিলিয়ে নিতে পারলে আমরা ইতিহাসবোধে আরো সমৃদ্ধ হবে।

একইভাবে বলা যেতে পারে ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি। পঞ্চদশ শতাব্দী অবধি বিশ্ববাণিজ্য মূলত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্য এশিয়ার সিল্করুটের মাধ্যমে চীন ও ভারতের সাথে ইউরোপের বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যমে স্পাইস ট্রেড চলত, যার মূল নিয়ন্ত্রণ ছিল আরব ব্যবসায়ীদের হাতে। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি থেকে নাটমেগ (যাকে আমরা জায়ফল বলি) কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে আরব ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ধনী হয়। এই ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ এবং ওলন্দাজদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং নাটমেগ চাষ করার বিকল্প জায়গার সন্ধানে ব্রিটিশরা ভারতে আসে। এদেরই হাত দিয়ে ভারতে চা আসে এবং পরে ভারত চা এবং স্পাইস-এর জন্য বিখ্যাত হয়ে যায়। অন্যদিকে ১৫০০ সালের পর আমেরিকা আবিষ্কার বিশ্ববাণিজ্যের আমূল হেরফের ঘটিয়ে দেয়। এশিয়াতেও আরব ব্যবসায়ীদের প্রভাব কমে যায়। শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্যায় অবধি উপনিবেশবাদের লক্ষ্য ছিল কেনাবেচা—সস্তায় এক জায়গায় কিনে বেশি দামে অন্যত্র বিক্রি করা।

কিন্তু শিল্পবিপ্লব জোর কদমে চলতে থাকলে উপনিবেশগুলির চরিত্র পাল্টে যায়। এগুলি তখন কাঁচামালের যোগানদার হয়ে যায়। শাসনব্যবস্থা নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে এবং নিয়ম-কানুনও ভয়ঙ্কর শোষণমুখী হয়ে পড়ে। ভারতে নীলচাষিদের উপর অত্যাচার, বেলজিয়ান কঙ্গোতে রাবার চাষিদের উপর নৃশংসতা, এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী দেশগুলিতে ক্রীতদাস সংগ্রহের অমানবিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই দীর্ঘস্থায়ী এক অধোগামী প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, যার ফল আজও বোঝা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের গভীর কারণগুলি তাই বুঝতে গেলে গত পাঁচশো বছরের বিশ্ববাণিজ্য এবং উপনিবেশবাদের ইতিহাস বুঝতে হবে। একদিক দিয়ে ভারত, কঙ্গো বা ব্রাজিলের অর্থনৈতিক সমস্যা সমগোত্রীয়, কিছু সাধারণ সূত্র দিয়ে বোঝা যাবে। আবার আর একদিকে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং অতীত আছে যা স্বতন্ত্রভাবে বোঝা দরকার। বলাই বাহুল্য আমাদের এই বোঝা খুবই অসম্পূর্ণ এবং এই বোঝার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

অবশ্যই অনুন্নতির আরো অনেক কারণ রয়েছে। সেগুলি বহু আলোচিত। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, সরকারি পলিসি ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটিয়ে অনুন্নয়নের মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু সুদূর অতীতের ঘটনাবলী এমন কিছু প্রভাব রেখে যায়, যা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। এই প্রবন্ধে আমরা সামান্য আলোকপাত করলাম।

তথ্যসূত্র

- Acemoglu, D., & Robinson, J.A. (2006). *Economic Origins of Dictatorship and Democracy.* Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J.A. (2001). Colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *The American Economic Review,* 97(5), 1369-1401.
- ———— . (2002). Reversal of fortune: Geography and institutions in the making of the modern world income distribution. *Quarterly Journal of Economics,* 117(4), 1231-1294.
- ———— . (2005). The rise of Europe: Atlantic trade, institutional change, and economic growth. *The American Economic Review,* 95(3), 546-579.
- Banerjee, A.V., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics.* Noida, UP: Random House Publishers India.
- Banerjee, A.V., & lyer, L. (2005). History, institutions, and economic performance: The legacy of colonial land tenure systems in India. *The American Economic Review,* 95(4), 1190-1213.
- Bloom, David E., & Sachs, Jeffrey D. (1998). Geography, demography, and economic growth in Africa. Brookings Papers on Economic Activity 2, USA: Brookings Institution.
- Curtin, Phillip D. (1964). *The Image of Africa,*

University of Wisconsin Press, Madison, WI, USA.

- — — —— -. (1968). Epidemiology and the slave trade, *Political Science Quarterly*, June 83(2), 181-216.
- Diamond, J.M. (1997). *Guns, germs and steel: The fate of human societies.* New York, NY: W.W. Norton & Co.
- Engerman, S.L., & Sokoloff, K.L. (2005). The evolution of suffrage institutions in the Americas. *Journal of Economic History,* 65(4), 891-921.
- Gallup J.L., Sachs, J.D., & Mellinger, A.D. (1999). Geography and economic development. InB. Pleskovic, & J.E. Stiglitz (Eds), *World Bank Annual Conference on Development Economics 1998* (pp. 127-178). Washington, DC: World Bank.
- Gallup, J.L., & Sachs, J.D. (2001). The economic burden of malaria. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 64(1-2),* 85-96.
- Myrdal, G. (1968). *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations.* New York, NY: Pantheon.
- North, D.C. (1990). *Institutions, institutional change, and economic performance.* New York, NY: Cambridge University Press.
- North, D.C., & Thomas, R.P. (1973). *The rise of the Western world: A new economic history.* New York, NY: Cambridge University Press.
- Olsson, O., & Hibbs, Jr. D.A. (2005). Biogeography and long-run economic development. *European Economic Review, 49(4),* 909-938.
- Roy, Tirthankar (2000). *The Economic History of India, 1857-1947.* New Delhi: Oxford University Press.
- Sachs, Jeffrey D. (2001). Tropical Underdevelopment. *NBER Working Paper No. 8119.* National Bureau of Economic Research, USA.
- Bibhas Saha (2013) Geography or Institutions: Which matters most for development? *Journal of Interdisciplinary Economics,* 25 (1&2) : 69-89
- Sokoloff, K.L., & Engerman, S.L. (Summer 2000). History lessons: Institutions, factor endowments and paths of development in the new world. *Journal of Economic Perspectives, 14(3),* 217-232.

লেখক ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট এনজিডিয়া ও ডারহাম ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

উত্তর শ্রীরামপুর এস.সি.এস. লি.

পোঃ শ্রীরামপুর, পূর্ব বর্ধমান

পূর্বস্থলী ১নং ব্লক

Sl. No. 3

With best compliments of

JAISHREE TIMERS

MILL
Amrasota More, Suri Road
P.O. Searsole Rabari-713358
Phone : 0341-2444002
E-mail : jaishreetimbers@rediffmail.com

RESI
18/1, N.S.B. Road
P.O. Raniganj (W.B.)
Phone : 0341-2449707
Fax : 0341-2444019

Sl. No. 118

আমরা এখন কোথায়? সচেতন মানুষই শেষ কথা বলবে

রথীন রায়

আমাদের দেশ এখন এক শুষ্ক তৃণভূমি। ভয়ংকর কৃষি সংকট। ফসলের দাম নেই। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা লোপাট করা হচ্ছে। কৃষক এখন বিপুল ভাবে মহাজনি ঋণের ওপর নির্ভরশীল। খরা-বন্যা-অতিবৃষ্টিতে ফসলহানি নৈমিত্তিক ঘটনা। বৃহৎ সেচ প্রকল্পের কোনো পরিকল্পনার কথা শোনা যায় না। যা আছে তা হয় অসম্পূর্ণ অথবা সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তার কার্যকারিতা কমছে দ্রুত হারে। ক্ষুদ্র সেচ নিয়ে বহু রংবেরং-এর স্কিম নিয়ে ঢক্কানিনাদ যত হয়, কার্যকর হয় অনেক কম। অবৈজ্ঞানিক ও অপরিকল্পিত ভাবে মাটির নিচের জল ব্যবহার করা হচ্ছে। জলস্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে মাটির নিচে, জলস্তরের প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য নষ্ট হচ্ছে। আর্সেনিক ইত্যাদির সমস্যা বেড়েই চলেছে। ভবিষ্যতে পানীয় জলের সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। কৃষক আকাশের জলের ওপর নির্ভর করবে। অন্যদিকে, ব্যাপক হারে কৃষি জমি সংকুচিত হচ্ছে তথাকথিত উন্নয়নের জন্য। জনসংখ্যা বাড়ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা লাগামছাড়া। জমি দো-ফসলি, তিন-ফসলি করা যাচ্ছে না। ক্ষতবিক্ষত পা নিয়েও অন্নদাতারা উৎপাদন করেই চলেছে। প্রতি বছর কেন্দ্র ও রাজ্যবাজেটে কৃষিতে ও কৃষিসম্পর্কিত বরাদ্দ কমেই চলেছে। অন্যদিকে, নেপোর দই মারা রমরমিয়ে চলছে। কৃষিপণ্যের ওপর কর্পোরেটের আগাম বাণিজ্য আরও অবাধ হয়েছে। ফলে কৃষক আত্মহত্যা দ্রুত হারে বাড়ছে।

কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশ বাড়ছে। যন্ত্রের প্রয়োগ বাড়ছে। লক্ষ কৃষিশ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে এ শহর সে শহর, বিভিন্ন রাজ্যে কাজের খোঁজে শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। কৃষকরা কৃষিকে জীবিকা হিসেবে আর পছন্দ করছে না। এর সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ। কিন্তু কোথাও কাজ নেই। খুঁটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষে পরিণত লক্ষ লক্ষ কৃষক। বাজার সংকুচিত হচ্ছে। শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

□

১৯১৪ সাল থেকে অর্থনৈতিক সংকট দ্রুত গভীরতর হচ্ছে। সংকট মোকাবিলায় কোনো পদক্ষেপ নেই। শুধু বিভাজনের রাজনীতি তীব্র করা হয়েছে।

সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্স জানাচ্ছে মন্দার ফলে গাড়ি শিল্প ও তার অনুসারী শিল্পে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কাজ হারিয়েছে। ডিলারদের ৩০০ শো-রুম বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ইতিমধ্যে প্রায় তিন লক্ষ কর্মী কাজ হারিয়েছে। আবাসন কারবারে মন্দা। বাড়ি বিক্রি হচ্ছে না। আবাসন শিল্পের অনুসারী ২৫০-এর মতো শিল্পে মন্দা নেমে এসেছে। ইট, সিমেন্ট, ইস্পাত, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রঙের বিক্রি কমে গিয়েছে। শুধু গাড়ি বা আবাসন শিল্প নয়, শিল্পবাণিজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই মন্দা চরম আকার নিয়েছে।

মুদিখানা বা স্টেশনারি দোকানের ডাল, নুন, তেল, বিস্কুট, সাবান ইত্যাদি পণ্যের বিক্রি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমার প্রভাব পড়েছে বাজারে। হিন্দুস্থান লিভার-এর এই জাতীয় পণ্যের একচেটিয়া বাজার। ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস সমীক্ষা জানাচ্ছে—এপ্রিল-জুন মাসে তাদের বিক্রির বৃদ্ধির হার ছিল ১২ শতাংশ, বর্তমান এপ্রিল-জুন তিন মাসে কমে হয়েছে ৫.২ শতাংশ, ডাবরের বিক্রির হার একই সময়ে ১২ থেকে ৯ শতাংশ, ব্রিটানিয়ার ১২ থেকে ৬ শতাংশ, এশিয়ান পেন্টস-এর ১২ থেকে ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। ইস্পাত, পেট্রোপণ্য, সার, লোহা পরিবহণে বৃদ্ধির হার ছিল ২০১৮ সালে ৬.৮ শতাংশ আর ২০১৯ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২.৭ শতাংশে।

এই অবস্থায় বছরে ২ কোটি যুবকের চাকরি দেওয়া সম্ভব? বাক্যবাগীশ প্রধানমন্ত্রীর কোনো উত্তর নেই। আর পশ্চিমবঙ্গে সব সমস্যার সমাধান হয়েই গিয়েছে।

নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে জুনে নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ কমেছে ৭৯.৫ শতাংশ। শিল্পপতিরা বিনিয়োগে ভরসা পাচ্ছেন না ক্রমক্ষীয়মান বাজারের জন্য। এই সময়ে বিনিয়োগের অভাবে ৫৮ শতাংশ কাজ বকেয়া পড়ে আছে। রপ্তানিও বাড়েনি। বিভিন্ন শিল্পমহল মন্দার মোকাবিলায় যে যে ত্রাণ প্যাকেজ চেয়েছিল, ইচ্ছা থাকলেও তা যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। জিএসটি ইত্যাদি নিয়ে ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও যেখানে ২০১৮ সালে তিন মাসে কর বাবদ কর বৃদ্ধির হার ছিল ২২ শতাংশ, ২০১৯ সালে তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) কর বাবদ আয় বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১.৫ শতাংশ।

□

সংসার চালাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে এবং করবে বলে ঘোষণা করেছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম রিজার্ভ ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ড থেকে জবরদস্তি টাকা নিয়েছে। যার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর উর্জিত প্যাটেলকে পদত্যাগ করতে হয়। বিভিন্ন মন্দিরে টনটন সোনা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। রামভক্তরা নিলেই পারে। রাষ্ট্রের অনেক সুরাহা হয়।

ঘোমটা দিতে ন্যাংটা হয়ে যায়, তায় আবার যুদ্ধযুদ্ধ খেলা শুরু করেছে থার্ড আম্পায়ার ট্রাম্পের সৌজন্যে। এমন প্রবঞ্চক, মিথ্যার

বেসাতি করা সরকার আগে কখনও আসেনি। মেক-ইন-ইন্ডিয়া শ্লোগানের আড়ালে এ-যাবৎকাল তৈরি হওয়া সমস্ত সম্পদ বিক্রি করছে। চা বিক্রি দিয়ে শুরু, এখন গোটা গোটা ইস্পাত কারখানা বিক্রি করে দিতে উদ্যোগী। রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত শিল্পে তিনটি কারখানা বিক্রি করার টেন্ডার ইত্যাদি ডেকেছে, ক্রেতা পায়নি। তার মধ্যে দুর্গাপুরের মিশ্র ইস্পাত কারখানাও আছে। আন্দোলন চলছে। দুর্গাপুরের মিশ্র ইস্পাত বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ। রঙিন ইস্পাত মিশ্র ইস্পাত ছাড়া কোথাও তৈরি হয় না। পেটেন্ট আছে। কামানের খোল, ইসরোর উপগ্রহ উৎক্ষেপণের লঞ্চিং প্যাড, ডুবোজাহাজের খোলের বিশেষ ধরনের ইস্পাত, ঈশ্বরকণা আবিষ্কারের জন্য বিশেষ ধরনের ইস্পাত সরবরাহ করেছিল দুর্গাপুরের কারখানা। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বেচে দেবে। সমস্ত সমরাস্ত্র কারখানা বেচে দেবে। শ্রমিকরা কারখানাসমূহ বাঁচাবার জন্য ধর্মঘট সহ আন্দোলন করছে। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা সহ রেলের অধীন সমস্ত কারখানা নিয়ে একটি আলাদা কোম্পানি তৈরি করে বিক্রি করে দেবে।

এবার যে প্রতারণাপূর্ণ বাজেট পাশ হয়েছে তাতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচে ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকা আয় হবে। এ যেন বাড়ির গৃহিণীর সোনার হার বিক্রি করে সংসার চালানো। বেঙ্গল কেমিক্যাল, ব্রিজ অ্যান্ড রুফ প্রভৃতি লাভজনক কারখানাও বিক্রি করে দেবে। সারা দেশে এ-রকম শিল্প তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ছাত্র ও বেকার ছেলেরা এখন প্রধানমন্ত্রীর নাম দিয়েছে বেচারাম। রেল ধীরে ধীরে সবই ব্যক্তিপুঁজির হাতে তুলে দিচ্ছে। তিন লক্ষ রেল-শ্রমিক ছাঁটাই-এর পরিকল্পনা চূড়ান্ত।

ইদানীংকালে কোটাক গ্রুপের যুগ্ম-প্রধান সঞ্জীব প্রধান, বাজাজ গ্রুপের চেয়ারম্যান রাহুল বাজাজ, এসিএমএ-র প্রধান ভেঙ্কটরামানি প্রত্যেকেই দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির মন্দা নিয়ে সরকারি নীতির প্রকাশ্যে নিন্দা করছেন। কিন্তু ওসব নিয়ে আমরা এখন মাথা ঘামাব না, কারণ এখন গরু, নাগরিকপঞ্জি, হিন্দি ভাষা, ৩৭০ ধারা বাতিল এবং দেড় কোটি কাশ্মীরী স্বদেশবাসীর সাথে যুদ্ধে এখন ব্যস্ত। আইনটা এনেও পিছিয়ে যেতে হয়েছে। এখন তুমুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ব্যাংকে জনগণের গচ্ছিত টাকায় মেহুল চকসি, নীরব মোদি—আরও সব মোদিরা যারা টাকা ধার নিয়ে পালিয়েছে, সেজন্য দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেল-আউট করতে সঞ্চিত টাকা নিয়ে নেওয়া হবে। সঞ্চয়কারীরা সর্বাধিক ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে।

প্রচারমাধ্যমের কী ভূমিকা! শ্রেণিস্বার্থ আছে। এর সাথে টাকা। বিজ্ঞাপন সুবিধা ইত্যাদি গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পচন ধরিয়ে দিয়েছে। কর্পোরেট-বিরোধী, শাসকের নীতি-বিরোধী সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠের কোনো খবর থাকবে না। মুদ্রণ এবং দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে সর্বত্রই চলছে মিথ্যার নির্মাণ। আসল সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে মেকি দেশভক্তি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরতান্ত্রিক ভাবধারা, ইতিহাসের বিকৃতি, বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাৎমুখী দর্শন, বিনোদনের কুৎসিত আবিলতা, ধর্মবিদ্বেষ ও মনুবাদী ভাবধারায় সত্যের নির্মাণ বন্ধ।

কোনো কোনো পণ্ডিত বলছেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে সুতরাং ইচ্ছামতো তাদের এজেন্ডা কার্যকর করবেই তো। সাংবিধানিক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই সবকিছু করা যায়?

মনে রাখা দরকার, সংখ্যাগুরু যা করে বা ভাবে সব সময় তা সত্য বা ন্যায় নয়। গ্যালিলিওকে আজীবন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। নিতান্তই সংখ্যালঘু ছিলেন। অত দূরে যাওয়ার দরকার নেই। রামমোহন রায় যখন সতীদাহ প্রথা রদ করার আন্দোলন করেন, সেই সময়ের সংখ্যাগুরুরা সঠিক ছিল?

□

এখন যারা শাসনক্ষমতায়, তারা অন্তত যেভাবেই হোক সাংসদের বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যা গরিষ্ঠতার অর্থ এদের কাছে দখলদারি। গণতন্ত্র, স্বাধিকার, সংখ্যালঘুর অধিকার নিয়ে ভাবা দেশদ্রোহিতার সামিল। অসহিষ্ণুতাই সংস্কৃতি। কুৎসা, মিথ্যা রটনা ইত্যাদিতে আনন্দ। অপর ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা তৈরি করাই সাহিত্য। মানসিক ও দৈহিক নিপীড়নকারীরা সাহসী এবং বীর। এরা ‘শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ’-র উত্তরসাধক নয়। এদের প্রধান উপাসনা বৃহৎ পুঁজির সেবাদাসত্ব। সেই কাজটার এত বিকাশ হয়েছে যে স্বাধীনতার পর দেশের আর্থিক অবস্থা এত ভয়ংকর সংকটের সম্মুখীন হয়নি। একথা বামপন্থীদের নয়, এমনকি অন্যান্য বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলিরও নয়। যাদের সেবা করছে তাদেরই কারও কারও আর্তস্বর শোনা যাচ্ছে—

ক. ‘‘বর্তমানে ভারতের অর্থনীতি পরিকাঠামোগত মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পরিকাঠামোগত মন্দা বলতে এটা কেবল চক্রাবর্ত মন্দা নয়। আয় না বাড়লে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে অর্থনীতির এই পরিকাঠামোগত মন্দা দীর্ঘমেয়াদী’’—সঞ্জীব প্রসাদ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কোটাক ইনস্টিটিউশনাল ইক্যুইটিস (ব্লুমবার্গ, কুইন্ট, ৩০ জুলাই)

খ. ‘‘সরকার স্বীকার না-ই করতে পারে, কিন্তু আই.এম.এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য থেকে পরিষ্কার যে, গত ৩-৪ বছরে দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। বাস্তবটা বাস্তবই যে বাজারে কোনো চাহিদা নেই, কোনও বিনিয়োগ নেই, অর্থনীতির বৃদ্ধি কোথা থেকে আসবে? আকাশ থেকে পড়বে?’’—রাহুল বাজাজ, চেয়ারম্যান, বাজাজ গ্রুপ (ইকনমিক টাইমস, ২৯ জুলাই)

গ. ‘‘বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো আশার আলো আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না। অর্থনীতির এই মন্দাবস্থাই আপাতত বাস্তব এবং দীর্ঘমেয়াদি।’’—নিশ্চল মাহেশ্বরী, সি.ই.ও. ইন্সটিটিউশনাল ইক্যুইটিস (ইকনমিক টাইমস, ২৩ জুলাই)

ঘ. ‘‘বাজারে চাহিদা নেই তাই উৎপাদনও নেই। উৎপাদনের প্রয়োজন না থাকলে কাজেরও প্রয়োজন থাকবে না। দ্রুত কিছু পরিবর্তন না হলে আগামী কয়েকমাসে অটোমোবাইল সেক্টরে ১০ লক্ষ মানুষ কাজ হারাতে পারেন।’’—রাম ভেঙ্কটরামানি, প্রেসিডেন্ট অটোমোটিভ কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৮ জুলাই)

ঙ. ‘‘ভারতের অর্থনীতি নিঃশব্দে রাজকোষ ঘাটতির দিকে চলেছে, যার কারণ রাজস্ব ঘাটতি। এই ঘাটতি মেটাতে ডলারে ঋণ নিলে, আর্থিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে উদ্বেগ রয়েছে। অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিয়েও উদ্বেগ আছে।’’—রথীন রায়, প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। (..., ২৩ জুলাই)

চ. ‘‘জিএসটি, আইবিসি (ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড), আরআরএ (রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি)—সরকারের একের পর এক সংস্কার নীতি আজকের অর্থনীতির মন্দার নেপথ্য কারণ।’’—অমিতাভ কান্ত, সিইও, নীতি আয়োগ (দ্য হিন্দু, ৩ আগস্ট)

ছ. ‘‘বেসরকারি-বিশ্লেষকরা বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারের অনুমান করেছেন এবং প্রায় সবগুলিই সরকারের বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক কম। আমিও মনে করি বর্তমানে ভারতের অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা খুবই উদ্বেগজনক।’’—রঘুরাম রাজন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর। (সিএন বিসি টিভি১৮, ১৮ আগস্ট)

জ. অতীতে কর্মখালির বিজ্ঞাপন হত। এখন ছাঁটাই-এর বিজ্ঞাপন দিচ্ছে মালিকরা। টেক্সটাইল মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন বিজ্ঞাপন ছেপে জানিয়েছে 'ইন্ডিয়ান স্পিনিং ইন্ডাস্ট্রিজ সর্ববৃহৎ মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেজন্য প্রচুর কর্মী ছাঁটাই করতে হচ্ছে।" গাড়ি শিল্প, রিয়েল এস্টেট, বিস্কুট কোম্পানি—সর্বক্ষেত্রে ছাঁটাই চলছে। বছরে দু-কোটি বেকারের চাকরি সম্পূর্ণ ভাঁওতা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এই মন্দা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী মন্দারই অংশ। আরও ভয়াবহ এই কারণে যে তা পরিকাঠামোগত মন্দায় পরিণত হচ্ছে।

রাজস্ব ঘাটতি ক্রমেই বাড়বে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত সম্পদ সরকারের কোষাগারে আসতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রির ১০০ দিনের লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য সর্বকালীন তলানিতে ঠেকেছে। সোনা-রুপোর দাম সর্বকালীন শীর্ষে পৌঁছেছে।

গত ছয় আর্থিক বছরে সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ হারিয়েছেন ৯২ লক্ষ মানুষ, কৃষিক্ষেত্রে ২ কোটি ৬৭ লক্ষ, শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ। কৃষকের আত্মহত্যার তথ্য আর প্রকাশিত হয় না। তথ্যের অধিকার আইন সংশোধিত হয়েছে। ভারতকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি বানানোর ফানুস ইতোমধ্যেই চুপসে গেছে। জিডিপি-র বিশ্বর‍্যাঙ্কিং-এ ভারত পঞ্চম থেকে সপ্তম স্থানে নেমে গেছে। দ্রুত উন্নয়নশীলতার তালিকায় এখন বাংলাদেশেরও নিচে। কর্মহীনতা, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে গণরোষ দানা বাধবে জেনেই ইউএসিএ ও এনআইএ আইন সংশোধন করা হয়েছে।

সংকটের সম্পূর্ণ বোঝাটাই সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। সংকটের কারণে পুঁজিপতিদের মধ্যেও মতপার্থক্য দেখা দিলেও বৃহৎ কর্পোরেট হাউসগুলির সম্পদের কেন্দ্রীভবন অব্যাহত আছে।

□

জনগণের সমস্যা নিয়ে বামপন্থীরা ইতিমধ্যেই রাস্তায়। প্রতিবাদের মিছিল ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। বামপন্থীরা ছাড়াও সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। দেশকে ভালোবাসার আবেগকে বিপথে চালিত করে যুক্তিহীন উগ্র জাতীয়তাবাদকে উস্কে আসল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরানো হচ্ছে। এখন যে শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের বিন্দুমাত্র অবদান নেই। মাত্র কয়েকমাস আগেই চারটি রাজ্যে ভরাডুবির পর বিকাশের কথায় কাজ হবে না বুঝে আবার ধর্মীয় বিভাজনের পথে হাঁটছে। উগ্রসাম্প্রদায়িকতাকে আঁকড়ে ধরেছে। কাশ্মীরী স্বদেশবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেশপ্রেমের কথা বলা হচ্ছে। সঙ্গে আছে পোঁ-ধরা সংবাদমাধ্যম।

মোহন ভাগবত ইতিমধ্যে দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়েছেন শূদ্রদের সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়া উচিত। তাঁর মতে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণির সংরক্ষণের কারণে আমাদের মেধাবী ছাত্ররা আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। সেখানে উন্নতি হচ্ছে। আমাদের দেশ পিছিয়ে পড়ছে। এরা সব পারে। সব ধরনের ফ্যাসিবাদের একই চরিত্র। হিটলার যেমন আর্য রক্তের পবিত্রতা রক্ষার ধুয়ো তুলেছিলেন। আরএসএস-বিজেপি মনুবাদী দল। উচ্চবর্ণের আধিপত্যবাদে বিশ্বাসী। নিম্ন বর্ণের মানুষের পদতলে থাকাই মনুর বিধান। বিভাজনের রাস্তায় এই অস্ত্রই ব্যবহৃত হবে।

নাগরিকপঞ্জির কথা ভুলে গেলে চলবে না। আসামে ইতোমধ্যে ২৯ লক্ষ মানুষকে রাষ্ট্রহীন করেছে। বংশপরম্পরায়, দশকের পর দশক ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তারা। কৃষি থেকে নানা রকম জীবিকার সাথে যুক্ত। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ-এর পরিবারের মানুষ থেকে শুরু করে সীমান্তে কর্মরত সামরিক বাহিনীর জওয়ান পর্যন্ত মানুষও নাকি ভারতের নাগরিক নন। কেন? মুসলমান বলে। স্বাধীনতার জন্য দেশভাগের কারণে লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দু আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তাদের একটি বড়ো অংশকে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রহীন। তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে। হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতো। কী ভয়ঙ্কর রাজনীতি! কর্মহীনতা, আর্থিক দুরবস্থা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর অপকৌশল। বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভয় দেখাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি করা হবে। উদ্দেশ্য একটাই, বিভাজনে হিন্দু ভোট পাওয়া।

ইতিমধ্যেই বাজারে হিন্দি ভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু করা হয়েছে। ভারতে বিশুদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র তৈরির জন্য আরএসএস জাগিয়ে তুলছে বহু পুরোনো রণধ্বনি 'হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান'। এই শ্লোগানে আবার মাতানোর চেষ্টা হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই বলে থাকেন—এক দেশ, এক আইন, এক নির্বাচন ইত্যাদি। আসলে এই অশুভ শক্তি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মর্মকথা বোঝে না। ভারত যে বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্ম, বহু বর্ণ, বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক—এই সত্য মানতে চায় না। এরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। ফলে এদের চেতনাতেই নেই ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম—সর্বত্র জাতি-ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে—সহিংস অথবা অহিংস। এভাবেই ভারতে বহুত্বের ঐক্য গড়ে উঠেছে। যারা ইংরেজদের দালালি করেছে তাদের এর মর্মবস্তু বুঝতে না পারারই কথা। আদানি, আম্বানিদের জন্য, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির জন্য, ধান্দার ধনতন্ত্রের জন্য ওরা যত নিচে নামা দরকার নেমে যাবে। দেশপ্রেমিক মানুষকে ক্রমাগত বিভ্রান্ত করেই চলবে।

এই হিংস্র ধান্দার ধনতন্ত্রের দালাল ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পরাস্ত করাই এখন প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে চাই যৌবনদীপ্ত শক্তিশালী কর্মিবাহিনী। অসংখ্য এরকম রাজনীতি সচেতন মতাদর্শগতভাবে বলীয়ান কর্মী গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে—

- প্রতিটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় পথে নামতে হবে।। জনগণের ব্যাপকতম অংশকে সঙ্গে পেতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আদায়যোগ্য দাবি আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।
- স্থানীয় পরিসরে ব্যাপকতম মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ক্লাব ইত্যাদির মধ্য ঢুকতে হবে।
- গণসংগঠনগুলির নিজস্ব উদ্যোগ বাড়াতে হবে। রাজ্য ও জাতীয় অন্যান্য সংগঠনের সাথে যৌথ মঞ্চ গড়তে হবে। যেমন মিশ্র ইস্পাত, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলির শ্রমিকরা মঞ্চ গড়ে আন্দোলন করছেন। বিশেষ করে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাঁচাতে আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।
- বিভিন্ন নির্বাচনে বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠন মজবুত করতে হবে। সবই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। স্টেজে মেকআপ দেওয়ার মতো সরল পথের দিন শেষ। সাহস, মতাদর্শ, শ্রেণিচেতনা, বামপন্থার প্রতি অবিচল আস্থাই পারে মানুষকে সাথে নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।
- বামপন্থী প্রচার খুবই দুর্বল। পত্র-পত্রিকার প্রচারসংখ্যাও খুব সীমিত। বিপরীতে বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম অতীব শক্তিশালী এবং শাসকশক্তিগুলির তাঁবেদার। ওরা মানুষের জ্বলন্ত সমস্যাকে সামনে

আনে না। গা-গোলানো গল্প বাজারে ছেড়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সেজন্য স্থানীয় রাজ্য বা জাতীয় বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাবার মতো সংঘবদ্ধ ও রাজনীতি সচেতন সংগঠন চাই। কৌশল নানা রকম হতে পারে। প্রচারপত্র, পোস্টার, মিছিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি এবং নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

• সাংস্কৃতিক জগতের অবক্ষয় শঙ্কিত হবার মতো। আধুনিক ভারতে বাঙালির বৌদ্ধিক বিকাশ অতুলনীয়। বাংলা আজ যা ভাবে কাল সেটা ভাবে ভারত।—এসব কথা আমরা খুব পছন্দ করি। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগন্দ্রেনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন, বিবেকানন্দ, নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের ভূমিকা, সুদূর সন্দীপ থেকে উঠে আসা মুজফ্‌ফর আহমদ, নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, বাংলার বিপ্লববাদ, সত্যজিৎ রায়, ভগিনী নিবেদিতা, সাহিত্যে শরৎচন্দ্র তারাশংকর, বিজ্ঞানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু—আর বলা যাবে না। অপরাধ হবে। যা বললাম তা আকাশে তারা গোনার মতো। সব তারাদের বিনম্র প্রণাম জানাই।

এখন বাংলার সাংস্কৃতিক মুখ নাকি মমতা ব্যানার্জি, মিথ্যা ভুয়ো ডিগ্রি দিয়ে যাঁর যাত্রা শুরু। আজ বঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবির পাশে মমতা ব্যানার্জির ছবি! বিবেকানন্দের ছবির পাশে বা উপরে তাঁর ছবি! তাঁর আঁকা ছবি বিক্রি হয় এক কোটি দেড় কোটিতে। অবনঠাকুর, গগন ঠাকুর, রামকিংকররা ভাগ্যিস আগেই মারা গেছেন!

সংস্কৃতির এই মুখ বাংলায় নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। নিজের ভোট অন্যরা দেবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভাঙিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ সবই এখন এ-রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ। কাটমানি, তোলা আদায় ইত্যাদি তারই অনুপ্রেরণায় হয়। ধর্ষণে আমরা বিমর্ষ হই না। কারণ ছোটো ঘটনায় ক্ষতিপূরণের বিধান হয়েছে। শিক্ষক থেকে অধ্যাপক সকলকেই শিক্ষাঙ্গনে মারা যায়, কেননা এসব ছোটোছেলের কাজ! এহেন মহান সংস্কৃতির বন্দনায় মিমি, নুসরত থেকে সুবোধ, শ্রীজাত, দেবকৃপা ব্যাপার লিঃ সবাই সমবেত হয়ে বলছেন—বাহবা! এই তো চাই। এই সংস্কৃতিতেই কম অক্সিজেনওয়ালা অনুব্রত শঙ্খ ঘোষকে দু-কথা বলতে পারে! আর সংবাদমাধ্যম লেখে—'জো জিতা হ্যায় ওহি সিকান্দার।' এর থেকে বেশি নিচে নামা যায় না।

এরই পটভূমিতে পশ্চিমবাংলায় আরএসএস-বিজেপির অনুপ্রবেশ। গণতন্ত্র ব্যতীত ধর্মীয় মৌলবাদকে রোখা যায় না। এই সমগ্র পটভূমিতে শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে হবে। শুধু কটা গণসংগীত গাইলেই চলবে না। তার সাথে সাথে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যা জন্ম দেবে যুক্তিবাদ, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা, শ্রেণিসংগ্রামে দায়বদ্ধতা এবং বামপন্থার প্রতি আস্থা।

• প্রতিটি নির্বাচনে বামপন্থীদের যুদ্ধ করতে হয়। প্রতিক্রিয়ার শক্তি যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত করে—যেমন বাংলায়, তেমনি বিজেপি ত্রিপুরায়—সংসদীয় গণতন্ত্রের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য। বর্তমানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের অঙ্গ। কিন্তু এক চক্ষু হরিণের মতো নির্বাচন সর্বস্ব হলে ভুল হবে। সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামে গুরুত্ব দিতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি চাই।

• জনসংযোগ বাড়ানোর কথা বলা হয়। এটা শুধু নির্বাচনের সময় অথবা কোনো সংগ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘোরা নয়। কিংবা গরিব পাড়া বৈঠক, সভা করলেই হবেনা। কারণ সেখানেও বৈদ্যুতিন প্রচারযন্ত্র পৌঁছে গেছে। বুর্জোয়া প্রচারের জালে তারাও আছে। সেজন্য শক্তিশালী কর্মীভিত্তিক সংগঠন চাই। যারা জলের মধ্যে মাছের মতো বিচরণ করবে। সেজন্য এখন অনেকদূর যেতে হবে। চটজলদি কোনো সমাধান নেই।

শত্রুপক্ষ যেমন প্রচারে আধুনিক কৃৎকৌশল ব্যবহার করছে সে-রকমই করতে হবে। অন্য দেওয়ালে উপস্থিতি জানান দিতে হবে। এর জন্যও সুশিক্ষিত বাহিনী গড়ে তোলা জরুরি।

প্রথম ও শেষ কথা হল সংগঠন—সচল সংগঠন, জনগণের মধ্যে বিচরণশীল সংগঠন। অতীতকে নিয়ে বসে থাকলে হবে না। সামনের দিকে তাকাতে হবে। নতুন প্রজন্মকে ধরতে হবে।

মনে রাখতে হবে শাসকশ্রেণি কিন্তু উৎফুল্ল নয়, শঙ্কিত। জনসমর্থন ধরে রাখার জন্য ৩৭০কে ধরছে অথবা রাজ্যে জনসংযোগ বাড়াতে গরিব পাড়াতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন। কিন্তু এতে করে মানুষের ক্ষোভের আগুন দমানো যাবে না। অর্থনৈতিক সংকট বাড়বে, ক্ষোভও বাড়বে। বিভ্রান্ত করার নতুন কায়দাও বাজারে চালু হয়েছে। দুই শাসকদলের মধ্যে মারামারি। কে কত রংবাজ তার প্রতিযোগিতা চলছে। কে কত ভদ্র, গণতন্ত্রী তার প্রতিযোগিতা নয় কিন্তু। সুতরাং সাধু বুঝে পা ফেলবেন।

সামনে সুযোগ আসবে। সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য সংগঠন মানসিকতাকে প্রস্তুত রাখতে হবে। বামপন্থার জয় অবশ্যম্ভাবী।

লেখক : দুর্গাপুর পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

গুসকরা পৌর কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি

প্রসাদ ঘোষ
সভাপতি

উত্তম পাত্র
সম্পাদক

Sl. No. 44

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শতবর্ষ ও সি.আই.টি.ইউ-র পঞ্চাশ বছর

সুকান্ত কোঙার

'শ্রেণিঐক্য এবং শ্রেণিসংগ্রাম' এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য শোষণের অবসানে শ্রেণি সংগ্রাম—এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ)-এর প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান বছর সি.আই.টি.ইউ-র প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি নেই। সি আই টি ইউ-এর গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, ''সি আই টি ইউ বিশ্বাস করে, উৎপাদনের বন্টনের এবং বিনিময়ের সমস্ত উপায়সমূহের সামাজিকীকরণ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণির উপর থেকে শোষণের অবসান ঘটতে পারে।'' সমাজতন্ত্রের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সমস্ত ধরনের শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করবে সি আই টি ইউ। সি আই টি ইউ-র গঠনতন্ত্রে একথাও বলা হয়েছে যে, ''সি আই টি ইউ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে শ্রেণিসংগ্রাম ব্যতিরেকে কোনো রকম সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় এবং শ্রমিকশ্রেণিকে শ্রেণি সহযোগিতার পথে নিয়ে যাবার যে-কোনো চেষ্টার বিরোধিতা করে।'' অনেক ঘাত-প্রতিঘাতকে অতিক্রম করে এই দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আমরা যদি এখন পিছনে ফিরে তাকাই তাহলে দেখব, প্রায় সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে একটি যৌথমঞ্চে নিয়ে আসা, একটি সাধারণ দাবি সনদ তৈরি করা এবং সমস্ত যৌথ প্রচারে ও সংগ্রামে একে সামনে নিয়ে আসতে সিআইটিইউ-এর ভূমিকা খুবই সন্তোষজনক। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ এবং নয়া-উদারনীতিসমূহ সম্পর্কে একটি সাধারণ বোঝাপড়া গড়ে তুলতে এই যৌথ সংগ্রাম সহায়তা করেছে।

হাজার হাজার শ্রমিক ও কর্মীর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের সেই ঐতিহ্যকে সি আহ টি ইউ বহন করে চলেছে—যাঁরা সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলি থেকে বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের পরিবর্তন এবং সমস্ত রকমের শোষণের সমাপ্তির পথ হলো শ্রেণিসংগ্রাম এবং শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকল্প হলো সমাজতন্ত্র। সি আই টি ইউ সেই ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। যাঁরা শতবর্ষ আগে দেশের প্রথম জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র স্থাপনের সময় একটা শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন—শ্রমিকশ্রেণির সেই ১০০ বছরের সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ এবং ৫০ বছরের শ্রেণিঐক্যের জন্য সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সি আই টি ইউ অঙ্গীকারবদ্ধ। এক বছর ধরে এই ইতিহাসকে শ্রমিকশ্রেণিসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যাবার কর্মসূচি পালিত হবে।

গত প্রায় তিন দশক ধরে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত পুঁজিপতি ও জমিদারদের দলগুলি দ্বারা পরিচালিত সরকারগুলির অনুসৃত নয়া উদারনীতিসমূহের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণি এবং শোষিত জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি শাসনে শ্রমিক শ্রেণির উপর আক্রমণ ফের তীব্র হয়েছে। স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পাওয়ার মধ্য দিয়ে কর্মস্থলগুলির চরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, এমনকি ঠিকা শ্রমিকরাও ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়িজ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, শিক্ষানবিশ প্রভৃতিতে বদলি হচ্ছেন এবং উৎপাদন ও বিভিন্ন কাজ বাইরে থেকে (আউটসোর্স) করিয়ে আনা হচ্ছে। শ্রমিকদের কষ্টার্জিত অধিকার ও প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত করতে শ্রম আইনসমূহের সংশোধন করা হচ্ছে। প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাচ্ছে। মহিলা শ্রমিকরা কর্মস্থলে আরো বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কর্মস্থলে মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা সহ নানাবিধ হেনস্থা আজ ক্রমবর্ধমান। বেকারত্ব গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। বিজেপি সরকার এই সমস্যাকে মোকাবিলা করতে ন্যক্কারজনক ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ বেকারদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়েছে এবং তাদের কষ্ট আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাগাড়ম্বরপূর্ণ 'জাতীয়তাবাদ' এবং 'দেশপ্রেম'-এর বক্তব্য সত্ত্বেও গত বিজেপি সরকার ছিল এখনো পর্যন্ত দেখা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাতীয়তা-বিরোধী একটা সরকার। প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে, টেলিকম, বীমা, ব্যাংক প্রভৃতির মতো স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি সহ সমস্ত জাতীয় সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বেসরকারীকরণ করে দেওয়ার আওয়াজ তুলেছে। দেশের সমস্ত স্বশাসিত ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছে তারা। এর সাথেই বিজেপি এবং আরএসএস ধারাবাহিকভাবে এই যৌথ সংগ্রামকে দুর্বল করতে বিভাজনের রাজনীতির মাধমে শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যকে আক্রমণ করে চলেছে। এইভাবে তারা দেশ ও বিদেশের কর্পোরেট প্রভুদের স্বার্থে কাজ করছে।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে বিরাজমান ক্ষোভ ও অসন্তোষকে সঠিক পথে চালিত করে উন্নত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার ব্যাপারে সি আই টি ইউ সচেতন ও সক্রিয়। একইভাবে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে শ্রমিকশ্রেণির সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়েও সি আই টি ইউ সমানভাবে সচেতন। সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সি আই টি ইউ এই কাজকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও জরুরি হিসেবে গ্রহণ করছে। সি আই টি ইউ মনে করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে আন্দোলন

করলেই হবে না, শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য যে নীতি দায়ী এবং তার পিছনে যে রাজনীতি আছে সেই বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণিকে সচেতন করতে হবে।

সি আই টি ইউ যে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দেশের শ্রমিকশ্রেণি তাদের জীবন-জীবিকার উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণে ক্ষোভ অসন্তোষে গুমরাচ্ছিল। ক্লোজার, কর্মচ্যুতি, ক্রমবর্ধমান হারে ঠিকাদারীকরণ, যৌথ দরকষাকষির অধিকারকে অস্বীকার, সামাজিক সুরক্ষাসমূহের উপর আঘাত প্রভৃতির ফলস্বরূপ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলন ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। চট, বস্ত্র, পরিবহণ শ্রমিকেরা এবং বিভিন্ন শিল্পের হাজার হাজার শ্রমিক তখন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে ছিলেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণি একেবারে সম্মুখ সারিতে ছিল।

সেই সময়ের দাবি ছিল, এই আক্রমণ এবং তৎকালীন সরকারের নীতি ও শোষণমূলক নীতি রাজত্বের বিরুদ্ধে সমস্ত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। এটা করার জন্য সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করাও এই সময়ের আওয়াজ ছিল। কিন্তু সেই সময়ের বাম ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান অংশ এ আই টি ইউ সি শ্রেণি-আন্দোলনের পথে না গিয়ে শ্রেণি-সমন্বয়ের পথে যাওয়াকেই পছন্দ করেছিল। শ্রেণিসংগ্রামের পথকে সেই সময়ে উপহাস করা হতো। এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে নেতৃত্বের যে অংশ শ্রেণিঐক্য এবং শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলতেন তাদের হেনস্তা, লাঞ্ছনার শিকার হতে হতো এবং অগণতান্ত্রিকভাবে ও কোনো নিয়ম-কানুন ছাড়াই ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বের পদ থেকে তাদের অপসারণ করা হতো। যেসব ইউনিয়ন শ্রেণিসংগ্রামকে সমর্থন করত তাদের অনুমোদন দিতে অস্বীকার করা হতো, তাদের অনুমোদন বাতিল করা হতো।

এর সাথেই যেসব জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন শ্রেণিসমন্বয়ের নীতিসমূহকে বাতিল করেছিল এবং জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদের নেতা-কর্মীরা রাজ্য সরকারগুলির আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়। পশ্চিমবঙ্গে এইরকম হাজার হাজার নেতা-কর্মী কংগ্রেস সরকারের আক্রমণের মুখোমুখি হন এবং তাঁদের জেলে পোরা হয়। এমনকি গত শতাব্দীর সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির উপর আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস শুরুর আগেই যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব সি আই টি ইউ প্রতিষ্ঠার সম্মুখ সারিতে ছিলেন এবং শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য ও সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় ছিলেন তাদের হেনস্তার শিকার এবং আক্রান্ত হতে হয়েছিল।

১০ বছর ধরে চেষ্টা চলে বিপথগামী এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে সরিয়ে আনার। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সরকারের নীতিসমূহের বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে নিয়ে আসতে একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র তৈরির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ১৯৭০ সালের ৯-১০ এপ্রিল গোয়াতে শ্রমিকদের জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শাসক শ্রেণিসমূহের শ্রমিক-বিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে দেশের সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নিয়ে আসার ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে একটা নতুন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই কলকাতায় ১৯৭০ সালে ২৮-৩১ মে প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে এক প্রস্তাবে সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। শ্রমিকশ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সমস্ত শোষণের সমাপ্তির লক্ষ্যে শ্রেণিসংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার ঐতিহাসিক কাজ সমাধানে সি আই টি ইউ-র জন্ম হয়েছিল। প্রথম সভাপতি বি টি রণদিভে এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পি রামমূর্তি নির্বাচিত হন।

সি আই টি ইউ গঠিত হবার পর থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে সি আই টি ইউ-কে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী আর কে খাদিকর আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি এবং এইচ এম এস-কে নিয়ে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস্ (এন সি টি ইউ) তৈরি করে সরকারের জনবিরোধী নীতিসমূহকে সমর্থন করার জন্য। সি আই টি ইউ এর যোগ্য জবাব দেয়—আমাদের সংগঠন সমগ্র শ্রমিকশ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করতে, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণিকে সমবেত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একে কার্যকর ভাবে মোকাবিলা করতে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র এবং শিল্পভিত্তিক ফেডারেশনগুলিকে একত্রিত করে সি আই টি ইউ ইউনাইটেড কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস্ (ইউ সি টি ইউ) তৈরি করে; বেতন নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতামূলক আমানত প্রকল্প প্রভৃতির মতো সরকারি নীতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সি আই টি ইউ-র বলিষ্ঠ উদ্যোগের ফলে শাসকশ্রেণি কর্তৃক সি আই টি ইউ-কে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। তিন বছরের মধ্যেই এন সি টি ইউ-এর পতন ঘটে। শ্রেণি-সহযোগিতাবাদী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে সিআইটিইউ-র ধারাবাহিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অভ্যন্তরে নতুন পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সূচনা হয়েছিল।

১৯৭৪ সালে রেলওয়ে শ্রমিকদের গৌরবময় সারা ভারত ধর্মঘটে সি আই টি ইউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই ধর্মঘট দেশের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে বল সঞ্চার করেছিল। ২০ দিনের এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের অংশগ্রহণে ভীতি প্রদর্শন, অমানবিক নির্যাতন এবং শাস্তিদানের ঘটনা ঘটে। দেশ জুড়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে রেলওয়ে শ্রমিকদের নিয়ে আসতে সি আই টি ইউ উদ্যোগ নেয়। আই এন টি ইউ সি বাদে সমস্ত প্রধান কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ে দ্য ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর রেলওয়ে মেন্‌স স্ট্রাগল (এন সি সি আর এস) গড়ে তোলা হয়। এরাই এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এতে এক সক্রিয় অংশীদার ছিল সি আই টি ইউ। এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত এবং গ্রেপ্তার হওয়া শ্রমিকদের আইনি সহায়তা ও অন্যান্য সমস্ত ধরনের সাহায্য প্রদান এবং ধর্মঘটের সমর্থনে সংহতিমূলক কর্মসূচি সংগঠিত করতো এই কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

জরুরি অবস্থার সময়ে স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের উপর আক্রমণ এবং ব্যাপক নির্যাতন সত্ত্বেও সি আই টি ইউ সক্রিয়ভাবে জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় অভিযোগ নথিভুক্তির মতো আন্তর্জাতিক ফোরাম সহ সে সময়ে সমস্ত পথ ব্যবহার করে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসমূহের উপর সরকারের আক্রমণকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, কেন্দ্রের জনতা পার্টির সরকারের আনা শ্রমিকবিরোধী ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন বিল ১৯৭৮-র বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই বিল প্রত্যাহার করে নিতে সরকার বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই ১৯৮১ সালের কংগ্রেস সরকারের সময় আই এন টি ইউ সি বাদে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং স্বাধীন ফেডারেশনগুলিকে সমবেত করে ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন কমিটি অব ট্রেড ইউনিয়নস্ গঠিত হয়।

শ্রেণিসংগ্রামকে শক্তিশালী করার ও শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজের অংশ হিসাবেই শ্রমজীবী মহিলাদের সংগঠিত করার কাজ

একটা শ্রেণিকর্মসূচি—এই স্পষ্ট বোঝাপড়ার ভিত্তিতে শ্রমজীবী মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে সি আই টি ইউ দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। ১৯৭৯ সালে সি আই টি ইউ শ্রমজীবী মহিলাদের সর্বভারতীয় কনভেনশন সংগঠিত করে। এটাই ছিল কোনো ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা সংগঠিত শ্রমজীবী মহিলাদের প্রথম সর্বভারতীয় কনভেনশন। গঠিত হয় অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব ওয়ার্কিং উইমেন। গত ৪ দশক ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সি আই টি ইউ-তে মহিলা সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ শতাংশের বেশি হয়েছে। সংগঠনের সমস্ত সিদ্ধান্ত অংশগ্রহণকারী স্তরে এবং সমস্ত কাজকর্মে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি আই এন টি ইউ সি বাদে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রথম সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করে। এটা ছিল তৃতীয় ঐতিহাসিক যৌথ সংগ্রাম যাতে সি আই টি ইউ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দাবি সোচ্চারে তুলে ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আকর্ষিত করেছিল। ধর্মঘটের দিন পুলিশের গুলিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১০জন শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর প্রাণ হারিয়েছিল। এই শহিদদের স্মৃতিতে শ্রমিক, ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের সাধারণ দাবিসমূহের ভিত্তিতে যৌথ প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করে সি আই টি ইড। সি আই টি ইউ অবগত আছে যে, সমস্ত ধরনের শোষণের অবলুপ্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যকে অর্জন করতে এই ধরনের সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ‘মজদুর কিষাণ সংঘর্ষ র‍্যালি’ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজধানীতে এই ধরনের মিছিল-সমাবেশ আগে কখনও হয়নি। এই কর্মসূচিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর অংশ নিয়েছিলেন। সমগ্র দেশের শোষিত জনগণ এবং প্রগতিশীল অংশকে অনুপ্রাণিত করেছিল এই মিছিল-সমাবেশ।

সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ইউনিয়নগুলিকে একত্রিত করতে এবং কমিটি অব পাবলিক সেক্টর ট্রেড ইউনিয়নস্ (সি পি এস টি ইউ) গড়ে তুলতে সি আই টি ইউ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশে নয়া-উদারনীতি চালু হওয়ার পর থেকে যৌথ সংগ্রামে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ এবং সর্বভারতীয় স্বাধীন শিল্প ফেডারেশন সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল সি আই টি ইউ। ‘স্পনসরিং কমিটি অব ট্রেড ইউনিয়নস্’ এবং তৎকালীন আরো বৃহৎ মঞ্চ ‘ন্যাশনাল প্লাটফর্ম অফ মাস অরগানাইজেশনস্’ অনেকগুলি দেশ জোড়া সাধারণ ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ২০০৯ সালে প্রথমবার আই এন টি ইউ সি এবং বি.এম.এস সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন একটি সাধারণ মঞ্চে যুক্ত হয়, এই যুক্ত মঞ্চ তিনটি দেশ-জোড়া সাধারণ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছে, যার মধ্যে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ধর্মঘট ছিল ৪৮ ঘন্টার। যদিও, বি জে পি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর বি এম এস যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিত্যাগ করে। যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্বে মোট ১৮টি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৯ সালের ৮-৯ জানুয়ারি দু-দিনের ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়। সেই সাধারণ ঘর্মঘটে ২০ কোটি শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। এই ধর্মঘট সাধারণ জনগণের কাছ থেকেও বিস্তৃত সমর্থন লাভ করেছিল। এর সাথেই, সি আই টি ইউ-র বিভিন্ন ফেডারেশন—কয়লা, ইস্পাত, বাগিচা, অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড-ডে -মিল সহ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শক্তিশালী যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

লক্ষ লক্ষ প্রকল্প শ্রমিক, যাদের সিংহভাগই মহিলা—তাদের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নিয়ে আসা এবং জঙ্গি আন্দোলনের পথে তাদের পরিচালিত করা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সি আই টি ইউ-র অন্যতম একটি প্রধান অবদান। এটা সি আই টি ইউ-কে দেশের অর্ধেক সংখ্যক জেলায় গ্রামস্তর পর্যন্ত সংগঠনকে নিয়ে যেতে এবং সেখানে কর্মী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

সি আই টি ইউ একদিকে যেমন যৌথ সংগ্রামের উপর জোর দেয়, অন্যদিকে নিজেদের স্বাধীন প্রচার ও সংগ্রামগুলির উপর জোর দেওয়া হয়। এই স্বাধীন প্রচার ও সংগ্রামগুলি যৌথ প্রচার ও সংগ্রামকে প্রভূতভাবে সাহায্য করে। সি আই টি ইউ কখনও একা হয়ে যাওয়ার ভয়ে শ্রমিকশ্রেণির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। যখন সব শ্রমিক সংগঠনগুলি সরকার অনুগামী পন্থা অবলম্বন করে শ্রমিক-বিরোধী ১৯৭১-র ফ্যামিলি পেনশন প্রকল্প এবং ১৯৯৫-র কর্মচারী-পেনশন প্রকল্পকে সমর্থন করে, তখন সি আই টি ইউ এর তীব্র বিরোধিতা করে।

এই উদারনীতিসমূহের জমানায় অসংগঠিত ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। এদের সংগঠিত করার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে সি আই টি ইউ। শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগের অংশ হিসাবে অসংগঠিত ক্ষেত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ করেছে সি আই টি ইউ। বর্তমানে সি আই টি ইউ সদস্য-সংখ্যার ৭০ শতাংশ আসে অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে।

সি আই টি ইউ সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। ‘নেতৃত্বের ধামাধরা কর্মিবাহিনী’ কখনও সমাজ পরিবর্তনের লড়াই তো দূরের কথা শ্রমিকদের প্রকৃত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে না। যেখানে এই ধরনের বিচ্যুতি আছে, সেখানে তার প্রধান দায় নেতৃত্বের। সংগঠনের মধ্যে প্রশ্ন করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারলে সংগঠন এগোতে পারবে না। মনে রাখতে হবে যে এ আই টি ইউ সি-র অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করেই সি আই টি ইউ-এর জন্ম।

সংগঠন প্রসঙ্গে এই সময়ে দুটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলিল গ্রহণ করা হয়। প্রথমটি গৃহীত হয় ১৯৯৫ সালের ওয়ার্কিং কমিটির সভায়, যা ‘সংগঠন প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বর দলিল’ নামেই পরিচিত। এখনও পর্যন্ত ঐ দলিল সংগঠনকে শক্তিশালী করার মৌল নির্দেশাবলী। ২০১৮ সালে কোঝিকোডে সি আই টি ইউ-এর জেনারেল কাউন্সিল বৈঠকে এই দলিলকে সময়োপযোগী করা হয়। গণতান্ত্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত কর্মীদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত মান উন্নয়নের মূল লক্ষ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সময়োপযোগী দলিলে। দুইটি দলিলে বলা হয়েছে যে, দ্বিধাহীন ও খোলাখুলি সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে দুর্বলতাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে এবং এইগুলিকে অতিক্রম করে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সি আই টি ইউ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সি আই টি ইউ-র এ ব্যাপারে স্পষ্ট বোঝাপড়া আছে যে, রাজনৈতিক কাজকে সাংগঠনিক কাজ থেকে বিযুক্ত করা যায় না।

পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় সংগ্রাম হলো একটি সহজাত প্রবণতা। এটা শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে সুপ্ত থাকে, কখনও কখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটা ফেটে পড়ে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাজ হলো আন্দোলনগুলি গড়ে তোলা এবং একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া।

উনিশ দশকের শেষ ২৫ বছর এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে

অনেক ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিল শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী, কল্যাণকেন্দ্র, সাধারণ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন যা ব্যক্তিগতভাবে জনহিতৈষীবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত। ঠিক এই সময় ভারতের শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে, যা স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করে। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে যখন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলককে ৬ বছরের জন্য জেলে পোড়া হয়, তখন সমগ্র বোম্বাই ভেঙে পড়ে। বস্ত্র শিল্প এবং রেলের কর্মশালার শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। মিলিটারি নামে, ১৬জন শ্রমিক মারা যায়, ৫০জনের বেশি আহত হয়। কমরেড বি টি রণদিভে লিখেছেন, ‘‘এই প্রথম দেশের শ্রমিকশ্রেণি তার শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করে সমস্ত শিল্পে ধর্মঘট করে একটি রাজনৈতিক কারণে এবং এই আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির কার্যক্ষমতা দেখায় সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে।’’

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিভিন্ন ঘটনার কারণে দ্রুত সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সময়ে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণির জীবনে দুর্ভোগ নামিয়ে আনে। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, কম মজুরি, দীর্ঘ কাজের ঘন্টা এবং বিভিন্ন ধরনের শোষণমূলক ব্যবস্থার ফলে শিল্পে অস্থিরতা এবং বিক্ষোভ গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণির রাজ গঠনের পরে ভারত সহ সারা বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম দ্রুত বেড়ে ওঠে।

ভারতে প্রথম আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয় ১৯১৮ সালের ‘মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন নামে’। ওই বছরেই গান্ধীজি ‘এলাহাবাদ টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন’ গঠন করেন। গান্ধীজির অর্থনৈতিক ভাবনা ছিল এইরকম—‘শ্রেণি এবং শ্রমের মধ্যে বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে শ্রেণি শান্তি এবং শ্রেণি সমঝোতার জন্য’। শোষণের সমাজ ব্যবস্থায় বাস্তবে যা কখনই সম্ভব নয়। দ্রুত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে শিল্প এলাকাগুলিতে—মূলত বাংলা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই রাজ্যে জাহাজ, রেল, যোগাযোগ, চটকল, বস্ত্র শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে। শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল এবং ধর্মঘট ও সংগ্রাম দুটোই বাড়ছিল ঝড়ের গতিতে। জাতীয় স্তরে কোনো ইউনিয়ন না থাকায় ব্রিটিশ শাসিত ভারত সরকার আই.এল.ও-তে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এন.এম. যোশীর নাম পাঠায়। অনেক ইউনিয়ন এতে আপত্তি করে। শেষমেষ ঠিক হয় এই বিরোধ মেটানোর জন্য ট্রেড ইউনিয়নের একটা সর্বভারতীয় কমিটি করা হবে। এইভাবেই ১৯২০ সালের ৩১ অক্টোবর বোম্বাই-এ এ.আই.টি.ইউ.সি গঠিত হয় ৬৪টি ইউনিয়নের ১০১ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। যাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১লাখ ৪০ হাজার। আরো ৪৩টি ইউনিয়ন সংহতি জানায়। এই সভা লালা লাজপত রায়কে সভাপতি এবং এন.এম যোশীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে। এই নূতন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ২টি ধারা ছিল। একটি বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল শ্রমিকদের সংগঠন গিরনি কামগর ইউনিয়ন যারা জঙ্গি ধর্মঘট এবং শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে নীতি পরিবর্তনের পক্ষে। অন্যটি হলো আমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন যারা শ্রেণি সমঝোতায় বিশ্বাসী এবং অর্থনৈতিক দাবির মধ্যেই ট্রেড ইউনিয়নকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এ.আই.টি.ইউ.সি-র মধ্যে এই দুটি ধারা অব্যাহত থাকে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন পাশাপাশিভাবে উচ্চতায় উঠতে থাকে এই সংগঠন গড়ে ওঠার পর থেকে। ধর্মঘট বাড়তে থাকে। শুধুমাত্র ১৯২১ সালে প্রায় ৪০০ ধর্মঘট হয়, যার অর্ধেকের বেশি সাফল্য অর্জন করে। এই সময়ে প্রথম পূর্ণ স্বরাজের দাবি তোলে কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন। ১৯২৩ সালের ১ মে মালায়াপুরাম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে ভারতবর্ষে প্রথম পতাকা তোলেন।

শ্রমিকদের আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে থামিয়ে দেবার জন্য ব্রিটিশ সাম্র্যাজ্যবাদ ‘ট্রেড ডিসপিউট বিল’ এবং ‘পাবলিক সেফটি বিল’ ১৯২৮ চালু করে। এই বিলে দমন-পীড়নের ব্যবস্থা থাকে। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল ‘ট্রেড ডিসপিউট বিল’ কেন্দ্রীয় বিধানসভায় আলোচনা হয়। এই সময় বিধানসভায় একটি বিস্ফোরণ হয়। বিধানসভা ধোঁয়ায় ভরে ওঠে। তার মধ্যে ৩টি শ্লোগান ওঠে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’, ‘সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক’ এবং ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত এই শ্লোগান তোলেন। এরপর থেকে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ শ্লোগানটি ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

শ্রমিক আন্দোলন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ধ্বংস করার জন্য একটার পর একটা ষড়যন্ত্র মামলা হয়। কানপুর (১৯২৫), মিরাট(১৯২৯) ষড়যন্ত্র মামলা তার মধ্যে অন্যতম। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার ৩১জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ ছিল এই যে তারা ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করতে চায়। এত আক্রমণ করেও এই আন্দোলনকে দমন করা যায়নি। ব্রিটিশ সরকার এইসব আক্রমণগুলিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তারা সফল হয়নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। আলবার্ট আইনস্টাইন, রোমাঁন রোল্যাঁ, এইচ.জি.ওয়েলস, ইয়র্কের আর্চ বিশপ, হ্যারল্ড লাস্কি প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম। এতসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার আক্রমণকে তীব্র করে এবং ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অনেক ট্রেড ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুসারে।

বোম্বাই-এ হাজার হাজার রয়েল ইউনিয়ন নেভি ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্মঘট শুরু করে। ব্রিটিশ-এর পতাকা নামিয়ে দিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের পতাকা তোলে, শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে পড়ে। সাধারণ মানুষও এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমে পড়ে। তারা কলকাতা, করাচি এবং ভাইজাকের নৌ বিদ্রোহে যুক্ত হয়ে পড়ে। এয়ার ফোর্সেও বিদ্রোহ শুরু হয়। ব্রিটিশ রাজের পতনের ইঙ্গিত দেখা দেয়। শ্রমিক এবং জনগণের এই বিপুল সমর্থন সত্ত্বেও কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ এই আন্দোলনকে সমর্থন না করে এই আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তারা নৌ বাহিনীকে কাজে যোগ দিতে বলে।

স্বাধীনতার ঠিক ৩ মাস আগে ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস দল আই এন টি ইউ সি গঠন করে এ আই টি ইউ সি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। গঠনের সময় সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেন, ‘‘শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে এবং কমিউনিস্টদের মূল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে লড়াই করতে হবে। শ্রেণিসংগ্রাম নয়, প্রয়োজন শ্রেণি-সমঝোতার নীতি।’’ উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, ‘‘ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে কিছুই অর্জন করা যায় না শুধুমাত্র অরাজকতা এবং দুর্দশা ছাড়া।’’

১৯৪৮ সালে এইচ এম এস গঠিত হয়, ১৯৪৯ সালে ইউ টি ইউ সি গঠিত হয়। যেটা আবার ১৯৫৮ সালে ভাগ হয়ে যায়। গঠিত হয় ইউ টি ইড সি এল এস, এদের নাম পরিবর্তিত হয় এ আই ইউ টি ইউ সি নামে। ১৯৫৫ সালে আর এস এস অনুমোদিত বি এম এস গঠিত হয়। ‘ঐক্য এবং সংগ্রাম’ এই শ্লোগান দিয়ে সি আই টি ইউ গঠিত হয় ১৯৭০ সালে।

মিথ্যার নির্মাণকে ভেঙে বিকল্পনীতি নির্মাণের সংগ্রাম

অপূর্ব চ্যাটার্জি

যত গর্জায় তত বর্ষায় না

না—আর আড়াল করা সম্ভব হল না। ৫ ট্রিলিয়ন (লাখ কোটি) ডলারের অর্থব্যবস্থায় পরিণত করার ঢাক পেটাতে মত্ত ৫৬ ইঞ্চি ছাতির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর বাহিনী আড়াল করতে পারলেন না দেশের অর্থনীতির এমন হাড়-জিরজিরে রুগ্ন চেহারাটাকে। মোদী সরকারের একটা মূল বৈশিষ্ট্যই হল জনগণের সামনে চটকদারি শ্লোগান বা ট্যাগলাইন হাজির করা—তা কার্যকরী হোক বা নাই হোক। দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিজেপির মিডিয়া দোসররাও এমনভাবে শোরগোল তুলল যে মোদী-শাহরা সবকিছুই হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছেন। এমন নীতিপুষ্ট—সবল প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে নমুনা হিসাবে এক লহমায় নোট বাতিল করেছেন, ধর তক্তা মার পেরেকের মতো জি.এস.টি চালু করেছেন; আবার সম্প্রতি সংবিধানকে তোয়াক্কা না করে কাশ্মীরে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতন্ত্রকে টুঁটি চেপে ধরে হিম্মত দেখিয়েছেন—অর্থনীতি সেখানে খুবই ছোট বিষয়। কিন্তু মোদী-শাহদের সুখস্বপ্ন ও অবাস্তব আত্মবিশ্বাসকে ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে সম্প্রতি সরকারের কিছু পরিসংখ্যান ও বিবৃতি। জিডিপি গণনার ভিত্তিবর্ষ ও গণনা পদ্ধতি বদলে দিয়ে বৃদ্ধির যে হার দেখানো হচ্ছিল তাকে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা সমালোচনা করে আসছিলেন। কথাতেই আছে, 'যত গর্জায় তত বর্ষায় না'। সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তর জানিয়েছে চলতি অর্থবর্ষের (২০১৯-২০) প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) বৃদ্ধির হার নেমে গেছে ৫ শতাংশে। গত ৬ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। গত আর্থিক বছরে এই পর্যায়ে যা ছিল ৮ শতাংশের মতো। এই রকম যখন চলছে তখন ভারতীয় অর্থনীতির একের পর এক সূচক নিম্নমুখী। ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মুম্বাই শেয়ার বাজারের সূচক পড়েছে প্রায় ৮০০ পয়েন্ট—জাতীয় শেয়ার সূচক নিফটিরও পতন হয়েছে ২২৫ পয়েন্ট। টাকার দামেরও পতন অব্যাহত। মোদী-অনুগত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর বলতে বাধ্য হয়েছেন যে পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগজনক; আর এক অনুগত নীতি-আয়োগের রাজীব কুমার তো বলেই ফেলেছেন—আর্থিক ক্ষেত্রে এমন গভীর সঙ্কট গত ৭০ বছরে দেখা যায়নি। আরও কয়েকটি বিবৃতিতে আমরা চোখ রাখতে পারি—

"সরকার স্বীকার না করলেও কিন্তু IMF বা WB -র তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, গত ৩-৪ বছরে দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। বাস্তবটা বাস্তবই যে বাজারে চাহিদা নেই, বিনিয়োগ নেই—কোথা থেকে বৃদ্ধি আসবে? আকাশ থেকে পড়বে?"—রাহুল বাজাজ, চেয়ারম্যান বাজাজ গ্রুপ / ET, ২৯ জুলাই, '১৯

"ভারতের অর্থনীতি নিঃশব্দে রাজকোষ ঘাটতির দিকে চলেছে। যার কারণ রাজস্ব ঘাটতি। এই ঘাটতি মেটাতে ডলারে ঋণ নিলে আর্থিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে উদ্বেগ রয়েছে।"—রথীন রায়, প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, /স্ক্রল, ২৩ জুলাই, '১৯

"জি এস টি, আই বি সি (Insolvency and Bankruptcy Code) আর আর এ (Readl Estate Reogulation Authority)—সরকারের একের পর এক সংস্কার নীতি আজকের অর্থনীতির মন্দার নেপথ্য কারণ।" —অমিতাভ কান্ত, সিইও, নীতি আয়োগ / দ্য হিন্দু, ৩ আগস্ট

আসলে সাময়িকভাবে আড়াল করলেও মিথ্যার নির্মাণ কখনোই চিরস্থায়ী হয় না। মোদীরও ছলচাতুরি ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার এমন বাঁধভাঙা প্রবল জলোচ্ছ্বাস বালির বাঁধে ঠেকানো যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই অসত্য, ভ্রান্ত পথে যাত্রী হতে না চেয়ে অনেকেই সসম্মানে সরে গেছেন—রঘুরাম রাজন, উর্জিত প্যাটেল, অরবিন্দ সুব্রমনিয়ম, বিরল আচার্য, পিসি মোহন, জে ভি মীনাক্ষী প্রমুখ। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। সরকার একদিকে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতির স্বপ্নের রান্নায় ঘি ঢালছেন, অন্যদিকে দেশের শিল্পের 'এক একে নিভেছে দেউটি' অবস্থা। অর্থনীতির বেহাল অবস্থার কারণগুলি নিত্য আমাদের গায়ে কাঁটা ফোটাচ্ছে। দুঃখী মানুষের দুঃখ ভোলার এক পন্থা যেমন সুরপান—তেমনি দেশের এই মুখ-থুবড়ে-পড়া অর্থনীতি ভোলাতে সরকারের পন্থা হল উগ্রজাতীয়তাবোধ—ঘৃণার রাজনীতির চাষ। তাই এই পরিস্থিতিতে সরকার বিতর্ককে অর্থনীতির উঠান থেকে সরিয়ে ৩৭০ ধারা, কাশ্মীর, তিন তালাক, এন আর সি, পাকিস্তান, মন্দির, হিন্দুত্ব প্রভৃতি অভিমুখে ঘুরিয়ে দিতে অত্যন্ত তৎপর। একাজে যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে সরকারের দোসর কর্পোরেট মদতপুষ্ট মিডিয়া। এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অস্থিরতা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? জরুরি সংসদ ডেকে বিরোধীদের সাথে খোলামেলা আলোচনা সাপেক্ষে রোডম্যাপ নির্ধারণ কি প্রয়োজন নয়? এই অর্থনৈতিক মন্দা যা সরকারি নীতির উৎস, তাকে কাঠগড়ায় তোলা কি সংবাদ মাধ্যমের কর্তব্য নয়?

না। ২০১৯-এর মোদীর 'নতুন ভারত' নির্মাণে গণতন্ত্রের এসব সাধারণ অনুশীলন সম্ভব নয়। সংবাদমাধ্যমগুলির কাছে এখনও অর্থনীতি কোনও অ্যাজেন্ডাই নয়—এই মন্দাবস্থার থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতে উপরি-উল্লিখিত সরকারি ন্যারেটিভ প্রচার করতেই বেশি মত্ত। কাশ্মীরকে স্বাভাবিক দেখাতে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিতে মোদী-শাহের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের প্রশংসা, পাকিস্তান, তিন তালাক, মোদী-ট্রাম্পের খুনসুটি—এসবই গত দেড় মাসের টিভিতে প্রাইম টাইমে বিতর্কের আলোচ্যসূচি। টাইমস নাউ, রিপাবলিক টিভিতে এয়ারটাইম গণনায় দেখা যাচ্ছে প্রতি ১০০ মিনিটে অর্থনীতির জন্য বরাদ্দ ১.৭ মিনিট অথচ পাকিস্তানের জন্য ১৮.৭

মিনিট। আবার জি.নিউজ ও আজতক-এর আগস্টের হিসাবে লক্ষণীয় যেখানে পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ প্রায় ২৭.৩ মিনিট, সেখানে অর্থনীতি নিয়ে কোনো বিতর্কই হয়নি। আসলে আগ্রাসী দক্ষিণপন্থা গণতন্ত্রের এই ‘চতুর্থস্তম্ভ’কে নির্লজ্জ তোষামোদের চোরাবালিতে টেনে নামিয়েছে। ‘আচ্ছে দিন’, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ ‘স্বচ্ছ ভারত’ ‘নতুন ভারত’ নির্মাণের হৈ-হুল্লোড় যে সাধারণ নাগরিকের ‘সম্মতি নির্মাণ-এর এক মহাপ্রকল্প তা বুঝতে পাঠকদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গও এই মিডিয়ার কাছে এখন নতুন ল্যাবরেটরি। বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম ঘাঁটিতে বিকৃতভাবে মিডিয়া রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিসরকে তৃণমূল বনাম বিজেপি দ্বিপাক্ষিক চেহারা দিতে নিরলসভাবে সক্রিয় রয়েছে। পুঁজির স্বার্থে মিডিয়া একাজে সাময়িক সাফল্য পেলেও—পুঁজির ক্লেদাক্ত চেহারা বা দেশের ও রাজ্যের এই ভেঙেপড়া অর্থনীতিকে আড়াল করতে ব্যর্থ হবেই। এখানেই জনগণের সাথে নিবিড় সংযোগ পুনঃস্থাপন করাটাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মোদী-অমিতশাহ আর এই কর্পোরেট মদতপুষ্ট মিডিয়ার কুছপরোয়া নেহি মনোভাবে দেশের ভালো হচ্ছে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের নিরিখে এখন মজবুত সরকার—কিন্তু বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হল : অর্থনীতির স্টিয়ারিং-হাতে এহেন মজবুত সরকারের ত্রাহি ত্রাহি রব কেন? এমন হাবুডুবু অবস্থাই বা কেন? ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে এমন দুর্বল করা হল কেন? কৃষি-শিল্পে এমন শোচনীয় পরিস্থিতি হল কেন? কেন এখন স্বাধীনতার পরে সর্বোচ্চ বেকার দেশে? কেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা কার্যত ছিনিয়ে নিতে হল? কেন মোদী সরকার টাকার দামের রেকর্ড পতনের সাক্ষী করল দেশকে? উত্তর চাই—উত্তর দিতে হবে।

দৃষ্টিকোণ

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। সরকার, বিরোধী ও অর্থনীতিবিদদের ভাবা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের অর্থনীতির ক্ষতটা কতটা গভীর এবং এই আর্থিক মন্দায় আক্রান্ত হওয়ার কারণ নির্ণয় জরুরি। দ্বিতীয়ত, সঠিক কারণ নির্ণীত করেই সমাধানের রাস্তা খুঁজতে হবে দ্রুত।

ভারতীয় অর্থনীতির নিম্নবর্ণিত কয়েকটি সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিলে অর্থনীতির বর্তমান চেহারাটা কিছুটা পরিষ্কার হতে পারে।

আর্থিক বৃদ্ধি—রপ্তানি—বিনিয়োগে ভাটা

এটা ঠিক ২০০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট এখনও কাটেনি। আবার অনেকে মনে করছেন বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থা কিছুটা চাঙ্গা হলেও আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়েনি। সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্যযুদ্ধ বিশ্ববাজারে অনিশ্চিয়তা, উত্তেজনা বাড়িয়েছে এবং আর্থিক বৃদ্ধির হারকে শ্লথ করেছে। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরাই দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে ভারতে প্রকৃত প্রস্তাবে জিডিপি বৃদ্ধির হার এ সময়ে ৩ শতাংশ। প্রাক্তন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়মও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত জুন মাসে এক গবেষণাপত্রে প্রায় এরকমই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সবচেয়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধির অর্থনীতির মর্যাদাও হারিয়েছে। এমনকি স্বাধীনতার পর এই প্রথম পাকিস্তানের আর্থিক বৃদ্ধির হারের (৫.৪ শতাংশ) তুলনায় ভারতের বৃদ্ধির হার (৫ শতাংশ) কম হল। কী বলবেন মোদী-শাহরা? শুধু কি তাই—এই মুহূর্তে এশিয়ার অর্থনীতিতে প্রথম দশটি দেশের মধ্যে আমরা দশম। বাংলাদেশ (৮.১৩ শতাংশ), নেপাল (৭.৯ শতাংশ), ভুটান (৭.৪ শতাংশ), চীন (৬.৯ শতাংশ), মায়ানমার (৬.৮ শতাংশ), ফিলিপাইন্স (৬.৭ শতাংশ), মালয়েশিয়া (৫.৯ শতাংশ), পাকিস্তান (৫.৪ শতাংশ) ইন্দোনেশিয়া (৫.১ শতাংশ), ভারত (৫ শতাংশ)।

আবার বর্তমান বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় বাজারে অনিশ্চয়তা, মন্দার ছায়া, সেহেতু আমাদের দেশের রপ্তানি কমছে। এখন রপ্তানি হ্রাস পেলে বৃদ্ধির হার কমবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যদি বিনিয়োগ বাড়ে বা সরকারি ব্যয় বাড়ানো হয় কিংবা ভোগ্যপণ্যের উপর জনগণের খরচ বাড়ে—তাহলে রপ্তানি হ্রাস পেলেও আর্থিক বৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। কিন্তু এ সময়পর্বে আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন এদেশের রপ্তানিকারকরা—রপ্তানি কমার সাথে সাথে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারেও ভারতীয় পণ্যের অংশভাগ ক্রমশ কমছে। যে সরকার নিজের দেশের অভ্যন্তরেই দেশীয় পুঁজির বিকাশ ঘটাতে পারে না, রপ্তানিকারকরা বিদেশের বাজার ধরতে পারে না সরকারের ভ্রান্তনীতির জন্য, সেখানে আশার আলো আসবে কোন দিক থেকে।

ভারতে বিনিয়োগে ভাটা আসছে কারণ ভারতে পণ্যের বাজারে যথেষ্ট প্রসার ঘটছে না। বিনিময়োগের মাত্রা নির্ধারিত হয় পণ্যের বাজারের প্রকৃতির ওপর। নোট বাতিল ও জি.এস.টি লাগু হওয়ার ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্র বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কমেছে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা। ফলে পণ্যের চাহিদা কমেছে। পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করার ঝুঁকি নিতে অপারগ।

বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও মোদী সরকার নতুন বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটাতে ব্যর্থ—কর্পোরেট বিনিয়োগ তলানিতে। ২০১০-১১ সালে এ দেশে নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব ছিল ২৫ ট্রিলিয়ন টাকা (১ ট্রিলিয়ন = ১০০০ বিলিয়ন), ২০১৭-১৮তে এটা কমে দাঁড়াল ১০ ট্রিলিয়নের মতো—গড় ১ বছরে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৪.২৫ ট্রিলিয়ন, প্রায় ৬০ শতাংশ কমেছে। বিনিয়োগ বাড়ছে না—নির্মলা সীতারামনের সুদের হার কমানোর দাওয়াইতেও পরিস্থিতি পাল্টাবে না।

ভ্রান্ত নীতির পাঁকে শিল্প, পরিষেবা

উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে শিল্প-কলকারখানায় উৎপাদনে। দেশের গাড়ি শিল্প ধুঁকছে। নয়া উদারবাদের জামানায় নয়া শিল্পের সূর্যোদয় হয়েছিল—হরিয়ানার গুরুগাঁওতে। অটোমোবাইল শিল্পে সেখানে হাহাকার! গাড়ি বিক্রি ১৯ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। যাত্রীবাহী ও দু-চাকার গাড়ি বিক্রি গত মে ২০১৮-র তুলনায় এবছর মে মাসে ২০ শতাংশ কমেছে। প্রায় ৩০০ গাড়ি ডিলার বন্ধ হওয়ায় এখানেই আনুমানিক ২ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। মারুতি, মাহীন্দ্রা, টাটা তাদের কারখানা কয়েকদিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। বি.এস.এন.এল-এর অবস্থা ভয়াবহ—কলকাতাতেই এখন ২৫০০০ ল্যান্ডলাইন খারাপ। এখানে যারা লাইনম্যান হিসাবে কর্মরত প্রায় ৫০০০ জন—কেউ ৫ মাস, ৭ মাস বেতন পায়নি। বর্ধমানে সম্প্রতি নায্য পাওনা থেকে কম বেতন দেওয়া হয়েছে। রেলের পণ্য চলাচলও অতীতের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে। রেলমন্ত্রক পরিকল্পনা নিয়েছে যে, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ রোলিং স্টক কোম্পানি নামে নতুন কর্পোরেট সংস্থা গড়ে রেলের ৭টি লাভজনক কারখানা সহ সবগুলিকে তার অধীনে এনে দায়মুক্ত হবে। ৫০টি স্টেশনকে সাজানোর কথা বলা হয়েছে, তা আসলে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার পদক্ষেপ।

লাভজনক এয়ার ইন্ডিয়াকে বিক্রি করতে তৎপর মোদী-শাহরা। দেশে মোট বিমানবন্দর ১২৩-এর মধ্যে ২৫টি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ১৪টি লাভজনক। ৬টি পাচ্ছে আদানী গোষ্ঠী—আমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ম্যাঙ্গালুরু, তিরুবন্তপুরম, জয়পুর,

গুয়াহাটি। প্রথম তিনটির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন মিলেছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রও উন্মুক্ত হচ্ছে।

ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে হিন্দুস্তান লিভার, ডাবর, পার্লে, আইটিসি, নেস্লের মতো সংস্থাগুলিতে বিক্রি ও মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। গ্রামের মানুষ কোণঠাসা অবস্থায়—পার্লের ৫ টাকার বিস্কুট কেনার চাহিদা এত কমে গেছে যে ১০,০০০ কর্মী ছাঁটাই করতে হবে। একই ছবি ব্রিটানিয়াতেও। রিয়েলএস্টেট—বাড়ি, জমির ক্ষেত্রেও ভয়াবহ চিত্র—৩০টি শহরে ১২ লাখ ৮০ হাজার ফ্ল্যাট বিক্রি না হয়ে পড়ে আছে, এর মধ্যে কলকাতাতেই ৩০ হাজারের বেশি ফ্ল্যাট অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে।

কৃষিতে সঙ্কট—গ্রামীণ ভারত ধুঁকছে

নয়া-উদারনীতির জমানায় ও মোদী সরকারের নীতিতে কৃষিতে সঙ্কট বেড়েছে, কৃষকের জীবন-জীবিকা গুরুতর বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার এক বছরে ৫.১ শতাংশ নেমে ২ শতাংশ হয়েছে । উৎপাদন খরচ বেড়েই চলেছে অথচ ফসলের নায্য দাম মিলছে না। কৃষকের ক্রমাগত লোকসান হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও আমেরিকার চাপে ভারত সরকার লক্ষ লক্ষ কৃষককে দেওয়া মূল্য সহায়তা দানে ও সংগ্রহ প্রক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাচ্ছে। আমেরিকার হুমকিতে ইরান থেকে সরাসরি ফসফেট না কিনে মিডলম্যান (আরব আমিরশাহির) মারফৎ অতিরিক্ত ৩০ শতাংশ বেশি ব্যয় করে কিনতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিদিন দেশে গড় ৩০ জন কৃষক এখন আত্মহত্যা করছে। আমাদের রাজ্যেই গত ৮ বছরে ২৩০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন—গত ৩১ আগস্ট বামপন্থী কৃষকসভা ও খেতমজুর সংগঠনগুলি এই পরিবারগুলিকে রাসমণি রোডে উপস্থিত করে এক বড় সমাবেশ করলেন। অনেকেই কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। সম্প্রতি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভালপমেন্ট একটি সমীক্ষা করেছে—যার নাম 'অলইন্ডিয়া রুরাল ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন'। এই সার্ভে রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ পরিবারের ২২ কোটির মধ্যে মাত্র ১০ কোটি পরিবার কৃষির সাথে যুক্ত এবং গ্রামীণ পরিবারের মাসিক গড় আয় যেখানে ৮০৫৯ টাকা সেখানে কৃষি থেকে গড় আয় মাত্র ১৮৩২ টাকা। আয় মারাত্মক কমছে—গ্রামীণ চরিত্র বদলে যাচ্ছে। দেশ জুড়েই ক্যাল ক্রপ আর কর্পোরেট ফার্মিং বাড়ছে। নদী, জমি, পাহাড়, অরণ্যের অধিকার চলে যাচ্ছে কর্পোরেটদের হাতে। তামিলনাড়ুর থুটুকোড়ি জেলায় একটি মাল্টিন্যাশনাল সংস্থার ইউনিটের বিষবর্জ্য গোটা জেলায় ভূগর্ভস্থ জল ও মাটির উর্বরতাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। গ্রামবাসীদের ৫ কিমি দূরে গিয়ে পানীয় জল আনতে হয়। ২০ হাজার গ্রামবাসী দিনের পর দিন জেলাশাসকের অফিসে অবস্থান করেছিল যাতে সংস্থাটি কপার কারখানা খোলার অনুমোদন না পায়, চাষ বন্ধ হয়ে যাবে। সেখানে পুলিশ আন্দোলনে গুলি চালায়—১৪ জন মারা যায়। সম্প্রতি সংস্থাটি কারখানা খোলার অনুমতিও পেয়েছে। এই সংস্থাটি কত দামে জল পেয়েছে—১০ টাকায় হাজার লিটার, অথচ গ্রামবাসীকে জল কিনতে হচ্ছে ১০ টাকায় ২৫ লিটার। ভাবুন। এই হচ্ছে গ্রামভারতের চেহারা।

কর্মসংস্থানে সঙ্কট

এর সাথেই জড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—কর্মসংস্থানের সঙ্কট। অবশেষে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে। এই তথ্যে দেখা যাচ্ছে দেশে বেকারত্বের হার সর্বকালীন রেকর্ড। এটা ঠিক মনমোহন বা মোদী উভয় জমানায় আর্থিক বৃদ্ধি ও নিয়োগের বৃদ্ধি সাধারণ চিত্র একরকম—২০০৪ থেকে ২০০৯ ইউপিএ জামানায় আর্থিক বৃদ্ধির হার ৮.৭ শতাংশ হলেও নিয়োগ বৃদ্ধির হার ছিল ০.১ শতাংশ। মোদীর প্রথম ৫ বছরের জামানায় আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৭ শতাংশ, নিয়োগ বৃদ্ধির হার ০.৬ শতাংশ। বাজারমুখী উৎপাদন যে মুনাফার নিয়মে চলে, সেই নিয়মেই একটা সম্ভাবনা যে একটা পর্যায়ে মজুরের মজুত বাহিনীর লাইন বাড়তে থাকবে আর সেটাই প্রেসার তৈরি করবে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর—ফলে কাজ হারানোর ভয়ে শঙ্কিত মজুর মজুরি হ্রাস, ছাঁটাই মানবে, কাজের চাপ বাড়া স্বাভাবিক হিসাবে দেখবে। এ যেন 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডে মার্কসের লেখার ফটোকপি—ভারতের শ্রমবাজার এরকমই অবস্থায়। বিজেপির কথা বাদ দিলাম, কংগ্রেসও এর গভীরতা বুঝে শ্রমজীবীর পক্ষে দাঁড়িয়ে পুঁজির আক্রমণ রুখে দেবার অবস্থাতেই নেই। একমাত্র বামপন্থীরাই এই আক্রমণের সামনে শ্রমজীবীরও স্বপক্ষে লড়াই-আন্দোলনের রাস্তায় আছে। অবশ্যই আরও সক্রিয়—আরও তীক্ষ্ণ করতে হবে এই সংগ্রামকে। গত ৬টি আর্থিক বছরে সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ হারিয়েছেন ৯১ লক্ষ মানুষ, কৃষিতে ২ কোটি ৬৭ লক্ষ মানুষ, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ ৩৫ লাখ। সম্প্রতি উত্তর ভারতের সংবাদ-মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে বস্ত্রশিল্পের অবস্থা শোচনীয়—৩ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন। গত বছর এপ্রিলে রপ্তানি যেখানে ছিল ১০৬ কোটি ডলার, এবারে এপ্রিলে তা মাত্র ৬৭ কোটি ডলার—৩০ শতাংশ রপ্তানি কমেছে। হীরে-জহরত রপ্তানিতেও মন্দা—ওই একই সময়ে ১৮ শতাংশ হারে কমছে। হীরে কারবারিরা জানিয়েছেন শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে।

একদিকে নতুন নিয়োগ নেই, ছাঁটাই হচ্ছে, অন্যদিকে শ্রমিকের নূন্যতম মজুরি, বোনাস, ভাতা নানা আর্থিক বিষয়সংক্রান্ত আইনগুলি বাতিল করে 'মজুরি কোড' তৈরি হয়েছে—ন্যুনতম মজুরি ১৭৮ টাকা অর্থাৎ প্রতি মাসে ৫৩৪০ টাকা মাত্র। এটা ঘোষণা—অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা এই মজুরিও পায় না। আজকের দিনে এই টাকায় জীবনধারণ ভাবা যায়? আসলে আদানি-আম্বানিদের মুনাফা নিশ্চিত করতে হবে—তাতে মন্দা হোক, শ্রমিক-কৃষকের পেটে ভাত জুটুক বা না জুটুক—বেকাররা কাজ পাক বা না পাক।

বিকল্প নীতির লড়াই

এই গ্রামভারতের অর্থনীতি চাঙ্গ করতে, সেখানে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে আরও বেশি সরকারি বিনিয়োগ দরকার। সরকারের বোঝা উচিত রাষ্ট্রায়ত্ত লগ্নি ও প্রকল্প ছাড়া কোনও পুজিবাদী অর্থনীতিতেও অর্থনীতির বুনিয়াদি কাঠামো, পরিষেবা, উন্নয়নের প্রকরণ ধরে রাখা যায় না। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, সুইডেনের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় লগ্নি ও প্রকল্পের গুরুত্ব কতটা, তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যাবে এদেশের পরিচালকরা উল্টোপথে ছুটছেন। রাষ্ট্র-পরিকল্পিত অর্থনীতি রূপায়ণে চীনের অগ্রগতিও চমকপ্রদ।

কিন্তু বাজেট বা আর্থিক মন্দা-পরবর্তী সরকার ও অর্থমন্ত্রীর দাওয়াইগুলি বিপজ্জনক। করত্রাণ বা কর্পোরেট কর মুকুব করা হল—এতে বিনিয়োগ বাড়ে না। দ্বিতীয় 'উপা' সরকারের জামানায় মোট কর্পোরেট ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৩.৪ লক্ষ কোটি টাকা আর মোদী জামানায় ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা। এই অর্থনৈতিক সিস্টেমে ঋণের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। বিনিয়োগে ঋণ জরুরি। কিন্তু আমাদের দেশে পর্যাপ্ত ঋণের যোগান থাকছে না, কারণ বিপুল পরিমাণে অনাদায়ী ঋণ—১০ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ফলে

ব্যাঙ্কগুলি সঙ্কটে পড়ছে। আই.এফ.এল.এস-এর মতো অ-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পরে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। সার্বিকভাবে ঋণের জোগান বাজারে কমেছে। আবার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তিকরণ ও বেসরকারিকরণ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা কমিয়ে দেবে—মানুষের থেকে ব্যাঙ্ককে আরও দূরে ঠেলে দেবে। আরও তিনটি সিদ্ধান্তে দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব পড়বে—প্রথমত, আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা কার্যত ছিনতাই করে অর্থনীতিতে টাকার জোগান বাড়িয়ে চাহিদা বাড়ানো। এতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে, টাকার দাম আরও পড়বে, কর্মসংস্থান কমবে।

দ্বিতীয়ত, এই প্রথম সরকার সিদ্ধান্ত নিল আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়া হবে—আন্তর্জাতিক বাজারে ঋণপত্র বেচে টাকা তুলবে। ঋণ দেওয়ার সময় শক্তিশালী আর্থিক পুঁজি যে শর্ত চাপাতে পারে—তাতে দেশের সার্বভৌমত্বের ক্ষতি করবে। আবার ডলারের দাম বাড়লে সরকারকে বেশি টাকা ঋণ মেটাতে ব্যয় করতে হবে।

তৃতীয়ত, সরকারি জমি আন্তর্জাতিক পুঁজিকে বেচা ও ৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিলগ্নীকরণের জন্য চিহ্নিতকরণ কর্মসংস্থান বা উন্নয়নের কোনো কাজে আসবে না।

এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য এ-সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এটা 'ম্যানমডে ব্লান্ডার', তাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব 'ম্যানমেড অ্যাকিউরেসি'তে। কিন্তু মনে হয় না সরকার এপথে হাঁটবে। পুঁজির এই খুল্লামখুল্লা আক্রমণের মোকাবিলায় বামপন্থীদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আন্দোলন-সংগ্রামের রাস্তাকেই চওড়া করে শ্রমজীবী মানুষের সাহস বাড়াতে রাজনৈতিক এজেন্ডা সাজাতে হবে। নয়া-উদারবাদী ও বুর্জোয়া ভূস্বামীদের বিকল্প নীতির কথা তুলে ধরতে হবে—বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্পই গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতন্ত্রকে মজবুত করতে হবে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিকাশ ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের জন্য দায়বদ্ধ সংগ্রামের তীব্রতা বাড়াতে হবে।

দেশের ধনীদের সম্পদের পরিমাণের ওপর কর লাগু করে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব। ধনীদের উপর বর্ধিত আয়কর লাগু করে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো যায়। ব্যাঙ্কগুলি থেকে অনাদায়ী ঋণের টাকা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। নীতি-আয়োগ নয়, ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বনির্ভর বিকাশের লক্ষ্যে যোজনা ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। মৌলিক ভূমিসংস্কার প্রণয়ন ও কৃষি সম্পর্কের গণতান্ত্রিক রূপান্তর সুনিশ্চিত করতে হবে।

গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ একদিকে আর্থিক বৃদ্ধি ও অন্যদিকে কর্মসংস্থান দুই-ই বাড়াবে। কৃষিতে বিনিয়োগ, সামাজিক প্রকল্পগুলিতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ালে কৃষি ও কৃষক এবং আর্থিক মন্দার সমস্যা কমানো সম্ভব। এর ফলে অর্থব্যবস্থায় জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। অর্থব্যবস্থায় বাড়তি ক্রয়ক্ষমতার যোগান হলে— 'অর্ডার' ব্যবসা বাড়বে—পণ্যের চাহিদা হবে—বেসরকারি বিনিয়োগও বাড়তে পারে।

স্বাভাবিকভাবে নজর ঘোরাতে হবে—কেন্দ্রের এই শোষণ ও আক্রমণের শিকার কৃষক-শ্রমজীবী জনগণের সব অংশকে সমবেত করে কাজ, জমি, খাদ্য, মজুরি, জীবনজীবিকার জন্য লড়াই তীক্ষ্ণ করতেই হবে। সংগ্রামের রাস্তাতেই বামপন্থীরা আছে, সেই রাস্তাকে আরও চওড়া করে আরও বেশি মানুষকে শামিল করতেই হবে।

With best compliments from

M/s. BENGAL CONSTRUCTION & CO.

T.C. ROAD (CHAUL PATTY)
P.O. TARAKESWAR, DIST. HOOGHLY
PIN : 712410

Sl. No. 61

প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর : দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী এবং জেলা বর্ধমান

শেখ সাইদুল হক

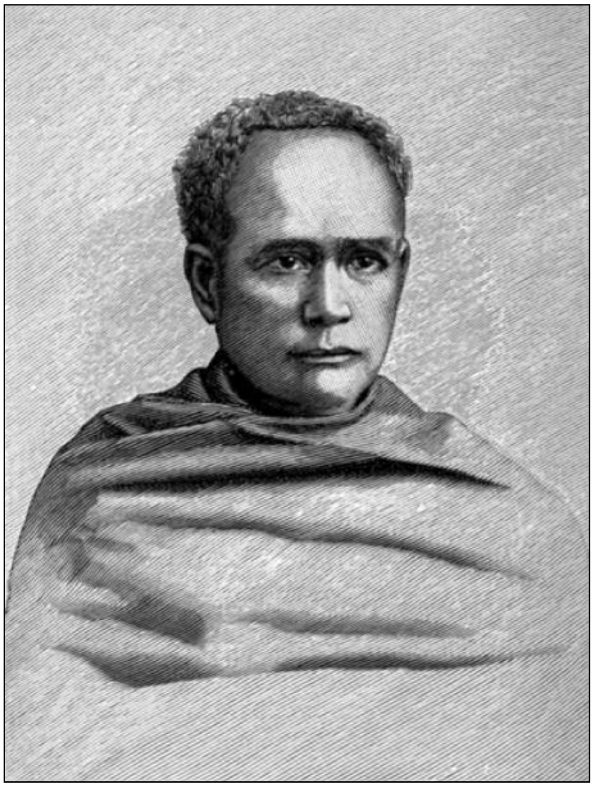

ভূমিকা

প্রবাদপুরুষ বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। প্রয়াত হন ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই। সেই হিসেবে এ-বছর ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে বিদ্যাসাগরের জন্মের দুশো বছর শুরু হচ্ছে। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম রূপকার মহান মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ঘিরে নানা সংগঠন বর্ষব্যাপী বহু কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি পালিত হবে। সরকারও ইতিমধ্যে কিছু কর্মসূচি রূপায়ণের অঙ্গীকার করেছে। রাজ্যস্তরে সাক্ষরতা কর্মী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র, যুব, মহিলা, বিজ্ঞানী, সাংস্কৃতিক, সরকারি কর্মী প্রভৃতি সংগঠন মিলে উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করেছে। রাজ্যের আদলে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও উদ্‌যাপন কমিটি গঠিত হয়েছে। এই সমস্ত কর্মসূচিগুলির মূল লক্ষ্য হল আজকের পটভূমিতে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরা। কেননা বিদ্যাসাগর আজও আমাদের জীবনে অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। শিক্ষা প্রসারে (বিশেষত, বালিকা ও নারীশিক্ষা বিস্তারে), সমাজ সংস্কারে (বিশেষত, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে ও বাল্যবিবাহ রোধে), বাংলা ভাষার বিকাশে (বিশেষত, বাংলা গদ্যের শৈলী নির্মাণে) তিনি যে কীর্তি ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা আজও চিরস্মরণীয়। সর্বোপরি তাঁর তেজস্বিতা, আদর্শবোধ, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবোধ, লোকহিতৈষণা ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ভাবনা—আজকের পটভূমিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনে যখন খণ্ডিত চেতনা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ, আত্মসর্বস্বতা, কূপমণ্ডুকতা আমাদের চেতনাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে, তখনই বিদ্যাসাগর প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। আমাদের কাছে তিনি বহুরূপে বিরাজিত হয়ে আমাদের মলিনতা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, আত্মম্ভরিতা ও দ্বিচারিতাকে বিদীর্ণ করে সম্প্রীতির, প্রগতির ও মানবতার নতুন বার্তা উপস্থাপিত করেন, আমাদের নতুন দিশা দেখান এবং চলার পথকে অনুপ্রাণিত করেন। বিশ্বকবির ভাষায়, ‘‘তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা/প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা/বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা/রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা/হে বিদ্যাসাগর, পূর্বদিগন্তের বনে উপবনে/নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।’’

পথ প্রদর্শক বিদ্যাসাগর

আজও বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে পদর্শক। সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বিদ্যাসাগর চরিত’ প্রবন্ধ শুরু করেছেন এই ভাবে যে, ‘‘বিদ্যাসাগর চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ—যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন... তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহাও নহে, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।... বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যদুর্লভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়।’’ রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁর প্রতিভার ওপর নির্ভর করে না, এটা প্রতিভাত হয় তাঁর মনুষ্যত্ব চেতনায় ও মহৎ ব্যক্তিত্বে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মহৎ ব্যক্তিরা নিজস্ব প্রভাবে এক দিকে স্বতন্ত্র, একক,

অন্যদিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। তাই বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থেই আমাদের কাছে পথপ্রদর্শক।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গুণ কী? শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, ''তাহা মানব জীবনের মহত্ব জ্ঞান।'' শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'প্রবন্ধাবলী'তে লিখেছেন : ''বিদ্যাসাগরের নিজের মনুষ্যত্বের মহত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখকাতর হৃদয় ছিল। সেই জন্যই অপরের প্রতি অত্যাচার দেখিলে, কাহাকেও অন্যায়রূপে কোনো মনুষ্যত্বের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত দেখিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না।... বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসত্য ও অন্যায়ের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই যে, অসত্য বা অন্যায়কে তিনি মানবজীবনের পক্ষে এত হীনতা মনে করিতেন যে তাঁহার চিত্ত তাহার চিন্তনেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত।''

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের তেজস্বিকতাই তাঁকে অনন্য করেছে। তাই তিনি পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবা বিবাহে সায় দিয়ে ভ্রাতা শম্ভুনাথকে লিখতে পারেন, ''বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ-বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।... আমি দেশাচারের দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যিক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।'' তেজস্বিতার কারণেই আবার পুত্র কুপথগামী হইলে বিদ্যাসাগর উইলে নির্দ্বিধায় লিখতে পারেন, ''পুত্রের সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি।'' তিনি নির্মম ছিলেন না, আবার দুর্বলও ছিলেন না। তিনি ছিলেন দৃঢ় ও যুক্তিনিষ্ঠ। আধুনিক মনন ছিল তাঁর। তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল পৌরুষ ও হৃদয়বত্তা। মাইকেল মধুসূদন তাঁর হৃদয়বত্তার মধ্যে পৌরুষকে চিহ্নিত করেছিলেন 'ম্যানলিনেস অব হার্ট' বলে। মাইকেল লিখেছিলেন, ''তাঁর মধ্যে ছিল একাধারে প্রাচীন ঋষির মনীষা ও প্রজ্ঞা, ইংরেজের প্রাণশক্তি এবং বাঙালি মায়ের হৃদয়।''

তাঁর কাজের জন্য তাঁকে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, নিন্দামন্দ শুনতে হয়। তিনি যেমন দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সাথে তার মোকাবিলা করেছেন তেমনি কখনও কখনও সহিষ্ণুতাও হারিয়েছেন। যখন তথাকথিত উচ্চবিত্ত সভ্যসমাজের নাগরিকদের দ্বারা তিনি অপমানিত হয়েছেন তখন তিনি কর্মাটাঁড়ে আদিবাসী মানুষের মধ্যে জীবনের ছন্দ খুঁজে পেয়েছেন, মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করেছেন। আর উচ্চবিত্ত সভ্য মানুষদের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি লিখেছেন, ''পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভালো হয়।''

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের বিবিধ ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর জীবনমুখী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগর তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানকে ব্যবহার করে সেকালের মৌলবাদীদের হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলন, নারীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও জাতপাতের বিরুদ্ধে তাঁর মরণপণ লড়াইয়ের জন্যই তিনি আজও অনন্য হয়ে আছেন। যদি তিনি কেবল বিদ্যার্জন, শিক্ষাপ্রসার ও বঙ্গভাষার সাধনাতেই মগ্ন থাকতেন, তাহলে তাঁকে হয়তো জীবনসংশয়, শত্রুতা, ঘৃণা ও নিন্দার সম্মুখীন হতে হতো না। তিনি ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। সেই অর্থে তিনি ছিলেন পাগল। মানবতার জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য পাগল। আর তাই জগতের সম্ভোগের পথ পরিত্যাগ করে, সংসারের আরাম, বিশ্রাম, সুখ পায়ে ঠেলে, সমাজের হিতার্থে দেশের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে বলেছেন, ''আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মনীষী জগতের হিত সাধনে ব্রতী হওয়াকে সর্বগরিষ্ঠ ব্রত মনে করতেন। ঈশ্বরবিশ্বাস আর সেই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সামাজিক প্রথা-রীতি ইত্যাদিকে যুক্তি বিচার বিনা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন।... বিদ্যাসাগর মহাশয় জানতেন দেশের দুর্দশা। যথাসাধ্য প্রয়াসে নেমেছিলেন সেই দুর্দশা দূরীকরণে। শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য বিকাশ, পরোপকার প্রভৃতি নিয়ে সর্বতোভাবে নিজের সর্বস্ব দান তিনি করে গেছেন।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নিজ অর্থ ব্যয়ে তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন, বহু মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, বহু মানুষকে প্রয়োজনে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ উইল-এ একটি কানাকড়িও কোনো 'দেবসেবা' বা দেবমন্দির বাবদ বরাদ্দ করেননি। তাই তিনি শুধু বিদ্যার সাগরই ছিলেন না, ছিলেন দয়ার সাগর। মাইকেলের ভাষায়—''বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে/করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে/দীন যে, দীনের বন্ধু...।''

বর্ণপরিচয় ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার শৈলীকে স্বীকার করে নিয়ে অনেকেই তাঁকে বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী বলেছেন। বিদ্যাসাগরই প্রথম লক্ষ করেন যে গদ্যের মধ্যে একটা স্বাভাবিক তাল বা ছন্দ স্পন্দন আছে। বাক্যবিন্যাসে তিনি এই ছন্দ ও স্পন্দনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রচনা করিয়া, সৌম্য এবং সবল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।'' বিদ্যাসাগর বিরাম-চিহ্নের সঠিক ব্যবহার করে বাংলা গদ্যের কাঠামোকে ঠিক করেছেন। এইসব নিয়ে প্রচুর গবেষণাধর্মী লেখা আছে। আমি এখানে কেবল 'বর্ণপরিচয়' সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। কেননা 'বর্ণপরিচয়' ছিল বিদ্যাসাগরের এক মহান সৃষ্টি। ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগ এবং ওই বছর জুন মাসে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এর আগেই তিনি লিখেছেন শিশুশিক্ষার দ্বিতীয় পুস্তক 'বোধদয়'।

বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালার আদলে তৈরি। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের পূর্বেই বাংলা বর্ণমালা নিয়ে কিছু পুস্তক লেখা হয়েছিল। যেমন রাধাকান্ত দেবের 'বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১), স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত 'বর্ণমালা' প্রথম ভাগ (১৮৫৩) এবং 'বর্ণমালা' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৪), মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' (১৮৪৯) ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর বহু পূর্বে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল হ্যালহেডের 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'। এখানে বাংলা স্বরবর্ণ ছিল ১৬টি। মদনমোহনের পুস্তকেও স্বরবর্ণ ১৬টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল ৩৪টি। বিদ্যাসাগর স্বরবর্ণকে ১২টি এবং ব্যাঞ্জনবর্ণে আরও ৬টি বর্ণ যুক্ত করে ৪০টি করেন। এ নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর নিজেও ১৮৫৫ সালে 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগ প্রকাশকালে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শুধু এইটুকু বলতে পারি 'বর্ণপরিচয়' রচনার পর একশত ষাট বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে স্বরবর্ণ থেকে কেবল 'ঌ' (লি) বাদে ১১টি স্বরবর্ণ এবং অন্তস্থ (ব) বাদে ৩৯টি ব্যঞ্জন বর্ণ এখনও বিদ্যমান আছে। তবে এটাও উল্লেখ করা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সময়ের ব্যবধানে ভাষা ব্যবহারে বানান ও লিপিতে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে পিতৃঋণ স্বীকার করে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুসারে 'বর্ণপরিচয়'

পুস্তকের নবরূপায়ণের আবশ্যিকতা মনে হয় উপস্থিত হয়েছে।

'বর্ণপরিচয়'-এ ২০টি পাঠ রয়েছে। একে বাংলা শিশু সাহিত্যের সূচনাপর্ব বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। শিশু বর্ণক্রমিক পদ্ধতিতে বর্ণ শিখবে, বর্ণের সঙ্গে মুখে মুখে ছোটো শব্দ শিখবে। এরপর বর্ণ যোজনা ও ফলা সংযোগে বানান শিখবে। তারপর সহজবোধ্য ছোটো বাক্যের সাহায্যে ছোটো ছোটো প্রাঞ্জল গদ্য রচনা শিখবে। ছোটো ছোটো বাক্য। তাতে ছবি ও ছন্দ ফুটে ওঠে। যেমন—জল পড়ে। মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে। (পাঠ-৩) আর একটি বিষয় লক্ষণীয়, ধর্ম নিয়ে সতত ব্যাকুল পরিবেশে বাঙালি শিশুকে অক্ষর পরিচয় করাতে গিয়ে কোথাও দেবদেবীর নাম আনলেন না। কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ টানেননি। বাক্য গঠনের মাধ্যমে সহজ সরল মানবিক চিন্তার উন্মেষ ঘটালেন।

বর্ধমান এবং বিদ্যাসাগর

বর্ধমানের সাথে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ১৮৫৫ সালের মে মাসে তিনি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের দক্ষিণবঙ্গের অ্যাসিসট্যান্ট স্কুল ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন। তাঁর দায়িত্বে ছিল তৎকালীন সময়ে বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি এবং মেদিনীপুর। তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এটি ছিল তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব। তবে প্রশাসনিক কাজে বর্ধমান শহরে ঠিক কবে এসেছিলেন এ-নিয়ে মতপার্থক্য আছে। আমরা সে-বিষয়ের আলোচনায় যাব না। বিদ্যাসাগর গবেষকরা সে কাজ করছেন ও করবেন। বর্ধমান শহরে আসার আগে তিনি ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে কালনা এসেছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছ থেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদের জন্য দরখাস্ত নিয়ে যাবার জন্য। সম্ভবত ১৮৫৪ সালে তিনি প্রথম বর্ধমান শহরে আসেন। ১৮৫৫-৫৬ সময়পর্বে তিনি বর্ধমানে বেশি থেকেছেন। পরেও মাঝে মাঝে এসেছেন। বর্ধমানের রাজপরিবারের সাথে তাঁর সখ্য ছিল। তবে তিনি তাঁদের আনুকূল্য বা কৃপা গ্রহণ করেননি।

গবেষকদের মতে, বর্ধমানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের থাকার জায়গা এবং প্রধান বিচরণক্ষেত্র হিসেবে মূলত বর্ধমান শহরের তিন-চারটি স্থান চিহ্নিত করা যায়। একটি হল পার্কারস রোড (বর্তমানে মহম্মদ ইয়াসিন রোড), বর্তমান প্যারিচাঁদ মিত্র (পি. এন. মিত্র) লেন-এ প্যারিচাঁদ মিত্রের বাড়ি (বর্তমানে পরমানন্দ মণ্ডলদের বাড়ি), তারপর বাড়ি বদল করে যেখানে ছিলেন এখন সেটি চন্দ্রচূড় মুখার্জিদের বাড়ি। অপর স্থানটি হল শ্যামসায়রের দক্ষিণপাড়ে বিখ্যাত আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষের বাড়ি। অপরটি হল কমলসায়রের দক্ষিণপাড়ে বর্ধমানরাজ মহতাবচন্দ্-এর বাগানের দ্বিতল বাগানবাড়ি, যা একসময় সাহেববাড়ি নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া তিনি রাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের পুরাতনচকের বাড়িতেও মাঝে মাঝে যেতেন মূলত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে। শোনা যায়, পি.সি. মিত্র লেনে থাকাকালীন পার্কারস রোডে মুখার্জি পেট্রোল পাম্পের উত্তরদিকে জি. টি. রোড সংলগ্ন যে পুকুর ছিল (পুট্টিপুকুর বা কুট্টিপুকুর) সেখানে তিনি স্নান করতেন। পুকুরটি বর্তমানে ভরাট হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এটি উদ্ধারে প্রশাসনের ভূমিকা নেওয়া উচিত।

শোনা যায়, শ্যামসায়রের দক্ষিণপাড়ে রাসবিহারী ঘোষের বাড়িতে যখন বিদ্যাসাগর ছিলেন তখন মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছিলেন। শ্যামসায়রের স্বচ্ছ জলে স্নান করার লোভ সামলাতে না পেরে মধুসূদন শ্যামসায়রে স্নান করতে নামেন। বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের স্মৃতিবিজড়িত সেই শ্যামসায়রও এখন অসাধু ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাচ্ছে, নোংরা জল পড়ছে, অবৈধ ভাবে ভরাট হচ্ছে।

বর্ধমানের রাজা মহতাবচন্দ্-এর সাথে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে সামাজিক কাজকর্মের সূত্রে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বর্ধমানরাজ মহতাবচন্দ্ জনহিতকর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যেমন চতুষ্পাঠী চালাতেন, তেমনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য কিছু বিদ্যালয়ও পরিচালনা করতেন বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করতেন। বিদ্যাসাগর তাঁর এই জনহিতকর কাজের জন্য তাঁকে বাংলার অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলে অভিহিত করতেন। অপরদিকে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকে মহতাবচন্দ্ সমর্থন করেছিলেন। বিধবা বিবাহের আইনি স্বীকৃতির জন্য বর্ধমান জেলার বহু মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পর ওই বছর ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর নিজ উদ্যোগে প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান করেন। পাত্রী ছিলেন বর্ধমানের পলাশডাঙার দশ বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতি মুখার্জী। বর্ধমানরাজ বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ নিবারণের উদ্যোগকেও সমর্থন করেন। বাংলার নবজাগরণের যেমন উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি ইতিবাচক দিক আছে তেমনি এর একটি দুর্বলতার দিকও আছে। আর তা হলো রেনেসাঁসপন্থীরা অনেকে প্রত্যন্ত গ্রামের গরিব সাধারণ মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়ে তেমন কিছু কাজ করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর এখানে ব্যতিক্রম। আর এই ব্যতিক্রমী হওয়া সম্ভব হয়েছিল বর্ধমানে এসে। এখানে এসে একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি, তেমনি অপরদিকে বর্ধমানে বাসকালে তিনি এই শহর ও শহরের সংলগ্ন এলাকায় জ্বরে আক্রান্ত মানুষের পাশে (যার মধ্যে দলিত ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল সর্বাধিক) দাঁড়িয়েছিলেন। নিজে যেমন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, তেমনি প্যারিচাঁদের ভাইপো ডাক্তার গঙ্গানারয়ণ মিত্রকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ওষুধ পথ্য দিয়ে সেবা করেছিলেন। সরকার ও মহারাজকে দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার আবেদন জানিয়েছিলেন।

স্কুল ইন্সপেক্টর হিসেবে বর্ধমান সহ আর তিনটি জেলার সাথে যুক্ত হয়ে তিনি শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষত নারীশিক্ষা বিস্তারে জোর দিয়েছিলেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর দায়িত্বে থাকা চারটি জেলার প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে মোট কুড়িটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। বর্ধমান জেলায় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত এই পাঁচটি স্কুল হল—আমাদপুর (২৬ আগস্ট), জৌগ্রাম (২৭ আগস্ট), খণ্ডঘোষ (১ সেপ্টেম্বর), মানকর (৩ সেপ্টেম্বর), দাঁইহাট (২৯ অক্টোবর)।

আমাদের সমাজের অর্ধেক নারী। বিদ্যাসাগর দেখলেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন নারী। নানাভাবে তারা অবদমিত। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের প্রথম পুস্তকের প্রথম অনুচ্ছেদে লিখলেন যে স্ত্রীজাতিকে অবদমিত করে রাখাটাই আমাদের সমাজের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর। ধর্মের নামে রক্ষণশীলতার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মেয়েদের আবদ্ধ করে রেখেছে। তাই নারীশিক্ষার বিস্তার ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যতম ব্রত।

ছোটোলাট হ্যালিডে সাহেবের কাছ থেকে তিনি কলকাতার পাশের জেলাগুলিতে মেয়েদের জন্য স্কুল খোলার অনুমতি আদায় করলেন। তারপর তিনি প্রবল উৎসাহে ১৮৫৭ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫মে-র মধ্যে তাঁর পরিদর্শনভুক্ত চারটি জেলাতে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুললেন। তার মধ্যে বর্ধমান

(অবিভক্ত) জেলায় এই সংখ্যা ছিল ১১টি। বিদ্যালয়গুলি হল—১. রাণাপাড়া (১ ডিসেম্বর, ১৮৫৭), ২. জামুই (২৫ জানুয়ারি, ১৮৫৮), ৩. শ্রীকৃষ্ণপুর (২৬ জানুয়ারি, ১৮৫৮), ৪. রাজারামপুর (২৬ জানুয়ারি, ১৮৫৮), ৫. জ্যোৎশ্রীরামপুর (২৭ জানুয়ারি, ১৮৫৮), ৬. দাঁইহাট (১ মার্চ, ১৮৫৮), ৭. কাশীপুর (১ মার্চ, ১৮৫৮), ৮. সানুই (১৫এপ্রিল, ১৮৫৮), ৯. রসুলপুর (২৬ এপ্রিল, ১৮৫৮), ১০. বন্তীর (২৭ এপ্রিল, ১৮৫৮), ১১. বেলগাছি (১ মে, ১৮৫৮)। বিদ্যালয় খোলার পর তিনি নিজে এগুলির ব্যয়ভার চালাতেন। বিদ্যালয়গুলি চালু থাকার জন্য তিনি প্রতি মাসে কমবেশি ২৫ টাকা করে মাসোহারা দিতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বর্ধমানে থাকাকালীন তিনি গোদা, কমলসায়র, কেশবগঞ্জ, কৃষ্ণপুর, সরাইটিকর, বেড় প্রভৃতি শহর লাগোয়া এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই সময় বর্ধমানে জ্বরের প্রকোপ ছিল বেশি। একে বলা হতো 'বর্ধমান জ্বর'। এছাড়া তিনি বিভিন্ন এলাকার সাথে ও বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের বাড়িতে থাকার সময় বর্ধমানের তৎকালীন সময়ে বেশ কয়েকটি মুসলমান পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন তিনি। তার মধ্যে অন্যতম হলেন সৈয়দ শহীদুল্লা-মেহবুব জাহেদিদের পূর্বপুরুষ গোলাম আসগর খান বাহাদুর, যিনি বিদ্যাসাগরকে কর্মাটাঁড়ে স্থায়ী ঠিকানার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কমলসায়রের দক্ষিণপাড়ের বাসিন্দা আব্দুল খালেক মিস্ত্রির দাদি (ঠাকুরমা) জরিমন বিবির বাড়িতে বিদ্যাসাগর আসতেন ওই এলাকার মুসলিম গরিব মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার জন্য। বিদ্যাসাগরের শিক্ষক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের বাড়ি ছিল রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামে। প্রেমচন্দ্র কবিগানের ভক্ত ছিলেন। প্রেমচন্দ্রের বাড়ির উৎসব-পার্বণে বিদ্যাসাগর এইসব কবিগানের আসরে সতীর্থদের সাথে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। মেমারি থানার রসুলপুরের উমেশচন্দ্র তর্কালঙ্কার ছিলেন বিদ্যাসাগরের বাল্যবন্ধু। তাঁর বাড়িতেই বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়টি চালু করেছিলেন ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে। বর্ধমানে থাকাকালীন সময় বিদ্যাসাগর বেশ কিছু লেখা লিখেছিলেন বা সংযোজন করেছিলেন। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বর্ধমানে বসেই পরিমার্জন করেছিলেন। লিখেছেন 'বিধবা বিবাহ প্রচলন বিষয়ক' দ্বিতীয় পুস্তক, 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'মহাভারত' (উপক্রমণিকা ভাগ) ইত্যাদি।

জন্মের দুইশত বর্ষ ও বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা

শুরুতেই উল্লেখ করেছি এ-বছর বিদ্যাসাগরের জন্মের দুই শতবর্ষ শুরু হচ্ছে। দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি হবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। এই সমস্ত কর্মসূচির লক্ষ্য হওয়া উচিত বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরা। তাঁর মূর্তিতে কিছু ফুলমালা দিলাম বা কয়েকটি সেমিনার করলাম কিংবা ভাঙা মূর্তি গড়ে তুলে বিদ্যাসাগরপ্রীতি দেখালাম—এটাই একমাত্র বিদ্যাসাগর-প্রাসঙ্গিকতা হতে পারে না। বর্তমানে আমাদের দেশে ও রাজ্যের পটভূমি কী? ২০১১ আদমসুমারী অনুযায়ী আমাদের দেশের গড় সাক্ষরতা হার ৭৪ শতাংশ। নারী সাক্ষরতা হার ৭০ শতাংশ। অর্থাৎ এখনও আমাদের দেশের ১০০ জনের মধ্যে ৩০ জন নারী নিরক্ষর। চোখ থাকতে অন্ধ। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে সারা দেশে ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ নিরক্ষর। আমাদের রাজ্যেও গড় সাক্ষরতার হার ৭৭ শতাংশ। নারী-সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ আমাদের রাজ্যেও প্রায় দু-কোটি মানুষ নিরক্ষর। যদি আমরা নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করতাম, যদি সরকার সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৬০ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সব ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে আনার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখাত পারত, তবে ভারতবর্ষ এত নিরক্ষর মানুষের দেশ হত না। তাই বর্তমানে বিদ্যাসাগর-প্রাসঙ্গিকতা হলো নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেওয়া, যাতে ওই বয়সী সব ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আনা যায় এবং ধরে রাখা যায়, যাতে বিদ্যালয়ছুট না হয়। এই পদক্ষেপ যেমন সরকারকেই নিতে হবে, তেমনি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও এগিয়ে আসতে হবে। বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করার জন্য বহুমাত্রিক কর্মসূচি নিতে হবে, যেখানে সাক্ষরতার পাশাপাশি সচেতনতা ও সক্ষমতার জ্ঞান লাভ করবে। নানা ধরনের কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে হবে।

পাশাপাশি বর্তমানে দেশজুড়ে ধর্মের নামে বিভাজন করার প্রচেষ্টা চলছে এবং অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান, অপসংস্কৃতি ও পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণাগুলি আমাদের মধ্যে প্রোথিত করার এক সর্বাত্মক প্রয়াস চলছে। বর্তমানে নারীদের ওপর নির্যাতন চলছে, তাদের প্রতি বৈষম্য বাড়ছে। এইখানেই বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা। বিদ্যাসাগরের জীবন ও রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক, কুসংস্কারমুক্ত এবং বাস্তববাদী মানুষ। তিনি প্রথাগত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করতেন না। তিনি নারীমুক্তির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছেন। বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সমস্ত বাধাকে মোকাবিলা করে তিনি আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ১৮৫০ সালে 'বাল্যবিবাহের দোষ' তাঁর প্রথম সামাজিক লেখা। এই লেখার মধ্য প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা। বিদ্যাসাগর সামাজিক অবক্ষয়কে দুহাতে সরিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে গেছেন মানুষের শিক্ষা পাবার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে ও নারীপুরুষের সমানাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবন ও কর্ম দিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন কথা ও কাজের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকবে না। বিশ্বাস এবং তা রূপায়ণে কোনো ফারাক থাকবে না। বিদ্যাসাগরের সাথে আমাদের পার্থক্যের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় এইভাবে বর্ণনা করা যায়—"আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না, আড়ম্বর করি, কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভুরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।" এখানেই বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা। এই কারণেই মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে সমকালের সেরা মনীষীদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর জন্মের দ্বিশততম বর্ষ উদ্‌যাপনের সময় আমরা যেন এগুলি ভুলে না যাই।

লেখক : প্রাক্তন সাংসদ, ইংরাজি সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক

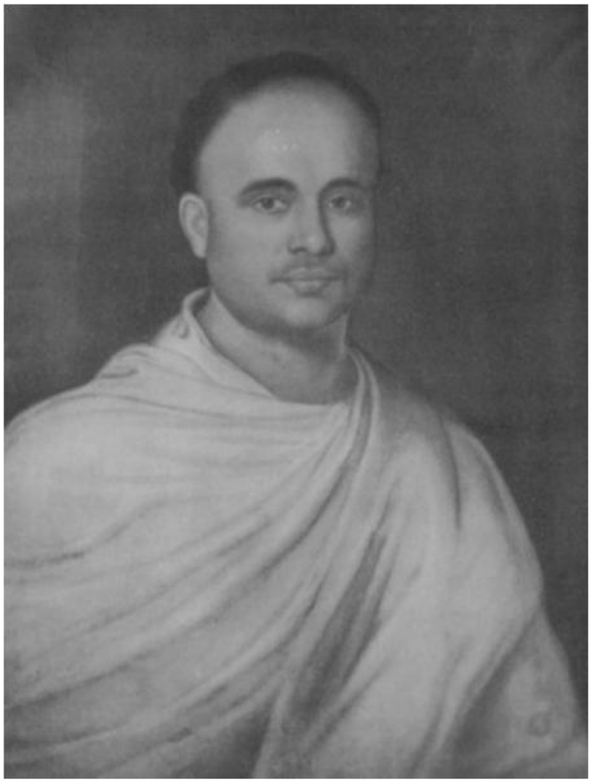

প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ

শ্যামাপ্রসাদ বসু

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলায় সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ১৮৫৬ সালে (২৬ জুলাই) বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পর থেকে বিদ্যাসাগর নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন হয় স্কুল-কলেজ পরিচালনায় (মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও কলেজ), নতুবা বিধবাদের বিবাহের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে।

ঘটনাক্রমে বিবেকানন্দ এটিকে বিরাট কোনো কাজ বলে মনে করেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল বিধবারা বিয়ে করবে কিনা সেটা তারাই ঠিক করবে। '' বিধবা বিবাহ আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন ভারতীয় নারীর কোনই স্বার্থ নেই।'' (উদ্ধৃতির জন্য, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' : শঙ্করীপ্রসাদ বসু; তৃতীয় খণ্ড., পৃ. ২৬২, কলকাতা, ১৯৮০)। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এর উত্তরে লিখেছিলেন, ''স্বামীজির কথার ভাব এইরূপ যে, বিধবারা বিবাহ করিবে কিনা, তাহা বিধবারাই জানে। আমরা বিধবা নই।'' (স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উংবিংশ শতাব্দী, পৃ. ২৪৩, উদ্বোধন, ১৩৩৪)।

শতকরা সত্তর জনের স্বার্থ নেই বলে উচ্চবর্ণের মধ্যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন বিরাট কোনো কাজ নয় বললে প্রকৃত সমস্যার অতি-সরলীকরণ হয়—বিশেষ করে যখন আমরা জানি এই উচ্চশিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষদেরই একাংশ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে নিজেদের নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রথম প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি। সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর সেই পথিকৃতের কাজটি করেছিলেন—তাঁর শ্রেণি ও সমাজই ছিল তাঁর প্রধান টার্গেট। একে কোনোভাবেই লঘু করে দেখা যায় না।

বিধবা-বিবাহ বিষয়ে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু উপরিউক্ত গ্রন্থে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির দীর্ঘ আলোচনা করেও স্বীকার করেছেন স্বামীজির 'অনধিক উৎসাহের' কথা। তথাকথিত কিছু নিম্নতর বর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, কিন্তু একথা নিশ্চয় স্বামীজির অজ্ঞাত ছিল না উচ্চবর্ণ 'বাবু' সমাজের দাপটে তার ঔচিত্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন সংস্কৃতি ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে সমাজের নীচ ধাপের লোকেরা উপরের ধাপকেই অনুসরণ করে।

বিবেকানন্দ অবশ্য বিদ্যাসাগরের বিরাট সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। আলমোড়ায় সিস্টার নিবেদিতার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''উত্তর ভারতে আমার বয়েসি এমন কোনো লোক ছিল না, যার উপর তাঁর ছায়া পড়েনি।''

বিদ্যাসাগরের লেখা 'বোধদয়' গ্রন্থে ঈশ্বরকে 'নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ' বর্ণনা করায় বিবেকানন্দ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ-র লেখা 'স্বামীজির স্মৃতি' থেকে জানা যায় একদিন বিবেকানন্দ শিশুদের উপযোগী কোনো পাঠ্যপুস্তক না থাকার জন্য আক্ষেপ করলে উপস্থিত একজন তাঁকে বিদ্যাসাগরের লেখা শিশু পুস্তকগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন তিনি উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন এবং বলেন, ''....'ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য স্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'—এতে কোনো কাজ হবে না,ওতে মন্দ বই

ভাল হবে না।...” (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃ. ৪০৫; উদ্বোধন, ১৯৭৩)।

শ্রী'ম' (মাস্টার ম'শায়) একবার বিবেকানন্দকে ঈশ্বর সম্পর্কে মতামত জানান। 'কথামৃত'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে :

মাস্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)—'বিদ্যাসাগর বলেন—আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেব?'

নরেন্দ্র— 'যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া পরোপকার বুঝলে কেমন করে?'

মাস্টার— 'আর পাঁচটা কি?'

নরেন্দ্র— 'যে একটা বোঝে নাই, সে দয়া পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে, ছেলেমেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে? যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।'

আসলে ঈশ্বর সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এক ধরনের অনীহা বিবেকানন্দকে আদৌ খুশি করতে পারেনি। বস্তুত, বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের মনোভাব কিছুটা মোনালিসার হাসির মতো। কারণ আলমোড়ায় নিবেদিতার কাছে বিদ্যাসাগরের যে মূল্যায়ন তিনি করেছিলেন, তা ছিল তাঁর একেবারে নিজস্ব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত সঠিক—অর্থাৎ সত্যই উত্তর ভারতে তাঁর বয়েসি যুবকদের উপর বিদ্যাসাগরের অসাধারণ প্রভাব। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি ছিল তাঁর সাধারণভাবে বস্তুগত বিচার। তবে তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি—এমনকি কোনো ঘটনারও।

বিদ্যাসাগরকে জড়িয়ে মাঝেমধ্যে বিবেকানন্দ যেসব মন্তব্য করেছেন, তা খুবই অস্বস্তিকর। আমরা পূর্বেই উল্লেখি করেছি বিধবা-বিবাহ এবং শিশুপাঠ্য সম্পর্কে তাঁর তির্যক মন্তব্যের। এছাড়া বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের শ্যামবাজার শাখার প্রধান শিক্ষক শ্রী'ম' (মাস্টার ম'শায় /মহেন্দ্রনাথ দত্ত) সংক্রান্ত ঘটনাটিতে তাঁর অযাচিত মন্তব্য আদৌ বিদ্যাসাগরের সম্মান বৃদ্ধি করে না।

১৮৮৬ সালের ২০ মে, শ্রী'ম'র জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল এক দুঃসময়। সে বছর বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হয়নি।

বিদ্যাসাগর এর জন্য 'শ্রীম' তথা মাস্টার ম'শায়কে দায়ী করলেন। কারণ হিসেবে জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঘনঘন যাতায়াত এবং তার ফলে বিদ্যালয়ের কাজ কর্মে গাফিলতি। এ ধরনের অভিযোগ শ্রী'ম'-র কাছে খুবই অপমানজনক মনে হয়েছিল এবং তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করে শেষপর্যন্ত চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন।

কাশীপুর উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রী'ম' ইস্তফার কথা জানালে তিনি শুধু বললেন, 'বেশ করেছো।' উপরিউক্ত ঘটনার তিন দিন পর (২৩শে মে, ১৮৮৬) নরেন্দ্রনাথ যখন সমগ্র বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড চটে গিলেন। শ্রী'ম' অবশ্য নিজের থেকে কিছু বলেননি। সেদিন রামকৃষ্ণকে রোজের মতো দেখতে এসে নরেন্দ্রনাথ, মাস্টার ম'শায় (শ্রী'ম'), ছোট নরেন প্রমুখ অনেক ভক্ত কাশীপুর উদ্যানের দালানঘরে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় গঙ্গাধর নামে এক ভক্ত মাস্টার ম'শায়ের সামনে নরেন্দ্রনাথকে জানালেন, ছাত্ররা মাস্টার ম'শায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল বিদ্যাসাগরের কাছে।

শুনেই ''নরেন্দ্রনাথ ফোঁস করে ওঠেন। তিনি বলেন, কি বলছিস মাস্টার ম'শায় কি Care করেন? তোর বিদ্যাসাগর বুঝি মনে করলে মাস্টার ম'শায়ের ছেলেপুলে আছে, তিনি আর চাকরি ছাড়তে পারবেন না।” (রামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, দ্বিতীয় খণ্ড, স্বামী প্রভানন্দ; পৃ. ৩০৯)

নরেন্দ্রনাথ সাহসী কথা বললেও, মাস্টার ম'শায় পরিবারবর্গ নিয়ে সত্যই আর্থিক বিপদে পড়ে গেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেন রিপন কলেজের অধ্যাপনার পদ পাইয়ে দিয়ে। এ ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথ যে বাস্তবে তাঁকে কোনো সাহায্য করেছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই।

যাইহোক উপরিউক্ত ঘটনায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিবেকানন্দ যে তাচ্ছিল্যের মন্তব্য করেন তাকে কিছুটা হঠকারী বলতে হবে। লক্ষণীয়, 'কথামৃত'তে বিবেকানন্দ বা নরেন্দ্রনাথ অনেকের সম্পর্কে সরাসরি প্রশংসাজনক মন্তব্য করলেও একমাত্র প্রসঙ্গ না উঠলে তিনি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সরাসরি নীরব থেকেছেন—যেন বিদ্যাসাগর বিষয়ে তাঁর নিজস্ব কোনো বলার মতো উক্তি নেই। প্রসঙ্গ তুলেছেন শ্রী 'ম', ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, কিন্তু তিনি কখনো নিজের থেকে বিষয়টিকে আলোচনায় আনেননি।

পিতার মৃত্যুর পর যখন দারুণ আর্থিক কষ্টে ভুগছেন, চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে অনেক সময়ে অনাহারে থেকেছেন, সেই দারুণ বিপদের সময়ে পরিচিতদের অনুরোধে বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসে বিবেকানন্দকে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের বৌবাজার শাখার প্রধান শিক্ষকের চাকরি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে চাকরি টিকিয়ে রাখতে পারলেন না এক মাসের বেশি। পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাটে প্রায়শই স্কুলে অনিয়মিত হয়ে পড়লেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ছিলেন বিদ্যাসাগরের জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী। ঘটনা সুস্পষ্টভাবে কতটা কী ঘটেছিল তা আজ পর্যন্ত সঠিক জানা যায়নি। তবে বিবেকানন্দ তাঁর পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা, সূর্যকুমার অধিকারীর চাপে তিনি চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন এবং বিদ্যাসাগর তা জানতেন এবং তাতে তাঁর সম্মতি ছিল। তবে একথা সুনিশ্চিত তাঁকে কোনো বরখাস্তের নোটিশ ধরানো হয়নি। হতে পারে যুবক বয়সের এই দুর্ভাগ্যজনক স্মৃতি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেরিয়েছে এবং যার ফলে মাঝে-মধ্যে উপরোক্ত অসতর্ক উক্তি। তবে একই সঙ্গে মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে তিনি যখন সিস্টার নিবেদিতাকে আলমোড়ায় বললেন, ''রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করেছি” (''After Ramkrishna, I follow Vidyasagar''), তখন সেটিকে ধরে নিতে হবে বিবেকানন্দর সতর্ক ও সচেতন উক্তি। খুব সম্ভবত এক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগরের স্বাজাত্যাভিমানের কথাকেই স্মরণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর স্পষ্টোক্তি এবং অতি সাধারণ বেশভূষা। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মনে রাখতে হবে ১৮৯১ সালে (২৯শে জুলাই) বিদ্যাসাগর যখন মারা যান, তখন নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী বিবিদিশানন্দ হয়েছেন এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ (ত্রৈলঙ্গ স্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ) করেছেন, অথচ ঘরের পাশে সুকিয়া স্ট্রিটে তিনি কদাপি যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। যদিও একদা তাঁরই গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যেচে বিদ্যাসাগরের গৃহে সাক্ষাতের জন্য গেছিলেন এবং আশাকরি সে কাহিনি তাঁর অবিদিত ছিল না।

সারকথা, ঈশ্বরে বিশ্বাসী বিবেকানন্দের অজ্ঞেয়বাদী বা তথাকথিত 'নাস্তিক' বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কৌতূহল খুব সামান্যই হবে যদি তিনি কোনো ভক্তের মুখে শোনেন ''একজন বলিলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বর ব্রহ্ম কিছু মানেন না। তিনি বোঝেন

জগতের কল্যাণ, বিদ্যাচর্চা—ইহাই প্রধান।” (উদ্ধৃতি : জীবনসন্ধানী বিদ্যাসাগর, রামরঞ্জন রায়, পৃ. ১৬৪)।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষণাগ্রন্থ ‘বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ’ (তৃতীয় খণ্ড)-তে মেট্রোপলিটান স্কুলের বৌবাজার শাখায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিবেকানন্দ সংক্রান্ত কাহিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে দিয়েছেন। এই ঘটনাটি স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর ‘যুগনায়ক বিবেকানন্দ’ গ্রন্থে স্থান (প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২২, ২০০২) দিয়েছেন, তবে তিনিও অতি সংক্ষিপ্তভাবে। আর তাঁর ইংরেজি জীবনচরিত গ্রন্থে (‘লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ, ইস্টার্ন এন্ড ওয়েস্টার্ন ডিশাইপলস’, পৃ. ১২২, ১৯৯৫) লেখকরা বিষয়টি পাঁচ লাইনে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে তাঁরা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের চাকুরি পাওয়ার তারিখ (জুন ১৮৮৬)টি দিয়েছেন, যা শঙ্করীপ্রসাদ দেননি। ইংরেজি জীবনচরিতে লেখা হয়েছে উপরোক্ত চাকুরি বিবেকানন্দ করেছিলেন কয়েক সপ্তাহের জন্য, আর স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেন তিনি একমাস ওই চাকরিতে ছিলেন। ইংরেজি জীবনচরিতের লেখকরা বলেছেন, পরিস্থিতির চাপে বিবেকানন্দ চাকুরি পরিত্যাগ করেছিলেন।

এখন দেখা যাক শঙ্করীপ্রসাদ কী লিখেছে। তিনি লিখেছেন, “পিতার মৃত্যু হলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নরেন্দ্রনাথ সামান্য সময়ের জন্য মেট্রোপলিটান স্কুলের বৌবাজার শাখায় প্রধান শিক্ষকের চাকরি করেন। সে চাকরি অবশ্য টেঁকেনি এবং সেজন্য নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ অভিযোগ বোধও করতে পারতেন।” (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৩৫)।

লক্ষণীয়, চাকুরি যাওয়ার ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথের যে কিছু অভিযোগ থাকতে পারে সেকথা ইংরেজি জীবনচরিতকাররা বা স্বামী গম্ভীরানন্দ, কেউই লেখেননি। এটি শঙ্করীপ্রসাদের নিজস্ব বক্তব্য (‘নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ অভিযোগ বোধও করতেন পারতেন’)। কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যজনক হল বৌবাজার (সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, চাঁপাতলা) স্কুলের চাকুরিটি যে নেহাৎ বিদ্যাসাগরের বদান্যতায় বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন সে বিষয়টির উল্লেখ মূল টেক্সটে না করে ফুটনোট বা পাদটীকায় তিনি ঠেলে দিয়েছেন, যা কেবল সর্তক পাঠক ছাড়া অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে।

ফুটনোটে শঙ্করীপ্রসাদ এ বিষয়ে যাবতীয় ঘটনার উল্লেখ করেছেন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ সংকলিত ‘শ্রীম-দর্শন’ (চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬) থেকে। উদ্ধৃতি : “বাড়ির লোক তখন খেতে পায় না। নরেন্দ্র....চাকরির জন্য কত চেষ্টা করছেন।...একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমরা বললাম। তিনি বৌবাজার হাইস্কুলের হেড মাস্টার করে দিলেন।” (শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পাদটীকা-২৪)। ‘শ্রীম-দর্শন’ থেকে আরো জানা যায়, ফার্স্ট ও সেকেন্ড ক্লাসের (বর্তমান ক্লাস টেন এবং নাইন) ছাত্ররা নরেন্দ্রনাথের নামে অভিযোগ করে যে তিনি পড়াতে পারেন না। আর এই কথা শুনে “বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বললেন, ‘তাহলে নরেন্দ্রকে বলো আর না-আসে”...”। ‘শ্রীম-দর্শন’-এর মতে, বিদ্যালয়ের তৎকালীন সেক্রেটারি বিদ্যাসাগরের জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী বিবেকানন্দকে ‘দাবিয়ে রাখতে’ চেয়েছিলেন বলে তিনি ‘ফন্দি’ করে ছেলেদের দিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে অভিযোগ করিয়েছিলেন।

যে নিত্যাত্মানন্দের দেওয়া বিবরণকে শঙ্করীপ্রসাদ সাক্ষ্য হিসেবে খাড়া করেছেন, একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে তা পরিস্থিতির বিশ্লেষণে আদৌ কার্যকরী নয়। কারণ বিবেকানন্দের মতো এক সুবক্তা ভালো পড়াতে পারেন না, একথা ছাত্ররা বললেও আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এক সময়ের স্কুল ইন্‌সপেক্টর এবং পরবর্তী সময়ের সংস্কৃত কলেজের দুঁদে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন শিক্ষক নির্বাচনে পাকা জহুরি। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তিনি শুধু নরেন্দ্রনাথের অভাবমোচনের কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেননি, একজন সম্ভাব্য ভালো শিক্ষক হিসেবেই তাঁকে নির্বাচিত করেছিলেন।

যে নিত্যাত্মানন্দের দেওয়া বিবরণকে শঙ্করীপ্রসাদ সাক্ষ্য হিসেবে খাড়া করেছেন, একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে তা পরিস্থিতির বিশ্লেষণে আদৌ কার্যকরী নয়। কারণ বিবেকানন্দের মতো এক সুবক্তা ভালো পড়াতে পারেন না, একথা ছাত্ররা বললেও আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এক সময়ের স্কুল ইন্‌সপেক্টর এবং পরবর্তী সময়ের সংস্কৃত কলেজের দুঁদে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন শিক্ষক নির্বাচনে পাকা জহুরি। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তিনি শুধু নরেন্দ্রনাথের অভাবমোচনের কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেননি, একজন সম্ভাব্য ভালো শিক্ষক হিসেবেই তাঁকে নির্বাচিত করেছিলেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের একটি সুবিদিত অভ্যাস ছিল, তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের অজ্ঞাতসারে দরজার আড়াল থেকে শিক্ষকের পাঠ দান শুনতেন। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে শ্রী ‘ম’ ছিলেন বিদ্যাসাগরের স্কুলের শ্যামবাজার শাখার হেড মাস্টার, যে কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, বিদ্যাসাগর পূর্বাহ্নে না বলে যখন-তখন স্কুল পরিদর্শনে যেতেন। এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৮৮৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, “আজ স্কুল দেড়টার সময়ে ছুটি হয়ে গেছে। কারণ বিদ্যাসাগর এসেছিলেন। স্কুল বিদ্যাসাগরের...” (কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬৫, ১৩৮৮)। তাছাড়া বিবেকানন্দ নিজেও ছাত্র বয়সে দেখেছেন যখন তিনি কিছু সময়ের জন্য বিদ্যাসাগরের স্কুলে পড়েছিলেন, কীভাবে সবার অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর শ্রেণিকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। একদিন সামান্য এক অপরাধে (নরেন্দ্রনাথ ক্লাসের মধ্যে মাস্টার ম'শায়ের অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলেছিলেন) শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক যখন নরেন্দ্রনাথকে প্রচণ্ড মারছেন, তখন বিদ্যাসাগর দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষককে ছাত্রদের সামনেই দারুণভাবে তিরস্কার করেন। (স্বামী বিবেকানন্দ : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়; সাপ্তাহিক বর্তমান, ১লা এপ্রিল, এবং ৮ এপ্রিল, ২০০৬)।

আসলে বিদ্যাসাগর দেখতেন স্কুল নিয়মিত বসছে কিনা এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের হাজিরার ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থে (বিদ্যাসাগর : দ্য ট্রাডিশনাল মর্ডানাইজার) মন্তব্য করেছেন, তিনি শিক্ষক এবং ছাত্র কোনো স্তরে বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করতেন না।

সুতরাং নরেন্দ্রনাথ খারাপ পড়াতেন এবং বিদ্যাসাগরের জামাই চক্রান্ত করে ছাত্রদের দিয়ে সেই অভিযোগ বিদ্যাসাগরের কানে তুলেছিলেন এবং সেকথা শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, ‘তাহলে নরেন্দ্রকে বলো আর না আসে’—যা স্বামী নিত্যাত্মানন্দ আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর সংকলনে (‘শ্রীম-দর্শন’), তা কিন্তু পরিস্থিতির বিশ্লেষণে ধোপে টেকে না। তাছাড়া জামাই যা বলবেন বিদ্যাসাগর সরল মনে তা মেনে নেবেন, এমন অন্ধ শ্বশুর তিনি ছিলেন না। মনে রাখা প্রয়োজন এই জামাই সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে

বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি হিসেবে টাকা পয়সার গরমিলের অভিযোগ উঠলে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ তাঁকে বরখাস্ত করেন। গরমিলটা ছিল কেবল দু'-তিন হাজার টাকা মতো। সুতরাং জামাইয়ের তথাকথিত চক্রান্তকে বিনা তদন্তে স্বীকার করে নেওয়ার পাত্র আর যেই হোক বিদ্যাসাগর ছিলেন না।

প্রকৃত সত্য আজও পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত থাকলেও (পরবর্তী সময়ে বিবেকানন্দ এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, এমন কি মৃত্যুর দু'দিন আগে নিবেদিতার কাছে স্মৃতিচারণাতেও) যুক্তিসম্মত যে কথা অস্বস্তিকর হলেও অনুমান করা যায় তা হল নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দকে পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমার জন্য প্রায়শই বিদ্যালয় চলাকালীন কোর্টে যাতায়াত করতে হতো—ফলে অনিবার্যভাবে স্কুল হাজিরায় ঘটতো অনিয়ম—যা নিশ্চয় সারপ্রাইজ ভিজিটে কঠোর নিয়মরক্ষক বিদ্যাসাগরের চোখ এড়ায়নি। স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি পিতা বিশ্বনাথ দত্তের ''জীবনকালেই সম্পত্তি বিভাগের মকদ্দমা শুরু হইয়াছিল।'' (পৃ. ১২০)। স্বভাবতই বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে পিতার মৃত্যুর পর তাঁকেই এ বিষয়ে নজর রাখতে হতো এবং কোর্টে হাজিরা দিতে হতো। একথা সবার জানা যে সিভিল মামলা দীর্ঘকাল ধরে চলে।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ লিখছেন, প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিলেও নরেন্দ্রনাথ কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি, কারণ তিনি 'noble soul, মহাপুরুষ'! তাঁর ভাষায় 'না আত্মপক্ষ সমর্থন, না অপরের উপর অভিযোগ' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু; পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পাদ-টীকা, পৃ. ২৩৫)। এ বিষয়ে তর্কাতীত বিবেকানন্দ ছিলেন 'noble soul, মহাপুরুষ'। তবে ঘটনাটি যদি সত্য হয় তাহলে তিনি কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন এবং অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করবেন?

গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নরেন্দ্রনাথের চাকুরিতে ইস্তফা দেওয়ার ঘটনাকে বোধহয় সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাই লিখেছেন, 'সেজন্য নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ অভিযোগ বোধ করতেও পারতেন।' কিন্তু কিসে 'ঈষৎ অভিযোগ বোধ করতেও পারতেন', সে বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। সমস্ত বিষয়টি তিনি ফুটনোটে স্বামী নিত্যাত্মানন্দের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত এ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথের তরফে অভিযোগ করার কিছুই ছিল না। হাইকোর্টে মামলার তদ্বিরের জন্য বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার অনিয়মিত হয়ে পড়া—ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ তাঁর বইতে (স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী; পৃ. ৪৭, কলকাতা, ১৯৬৮) পরোক্ষে সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। প্রথমে লিখেছেন, ''কিছুদিন বাদে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে একটি শিক্ষকতা পেলেন।'' আর তারপরের লাইনেই লিখলেন পারিবারিক মামলার কথা এবং নরেন্দ্রনাথ তাতে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

'শ্রীম-দর্শন'-এ বলা হয়েছে বিবেকানন্দ একমাস চাকরি করেছিলেন। যতদিন না কোনো গবেষক জানাবেন এই একমাসে নরেন্দ্রনাথ স্কুল ছেড়ে আদৌ মামলার তদ্বিরের জন্য হাইকোর্ট যাননি, ততদিন তাঁর বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি সম্পর্কে যুক্তিসম্মত সন্দেহ থেকেই যাবে। আবার অন্যদিকে ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী মাত্রেই জানেন 'স্মৃতি-কথা' এবং 'আত্মজীবনী'কে কখনো পাথুরে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করা হয় না। এর মূল্য বিকল্প সাক্ষ্য হিসেবে।

লেখক : পুরুলিয়া নিস্তারিণী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক

With best compliments from

DURGAPUR CONSTRUCTION

MECHANICAL, STRUCTURAL & PIPE LINE CONTRACTOR

J. P. Avenue, Durgapur-713211, Dist Paschim Bardhaman

Sl. No. 9

বিদ্যাসাগরের চোখে ‘ভ্রান্ত দর্শন’

হরিলাল নাথ

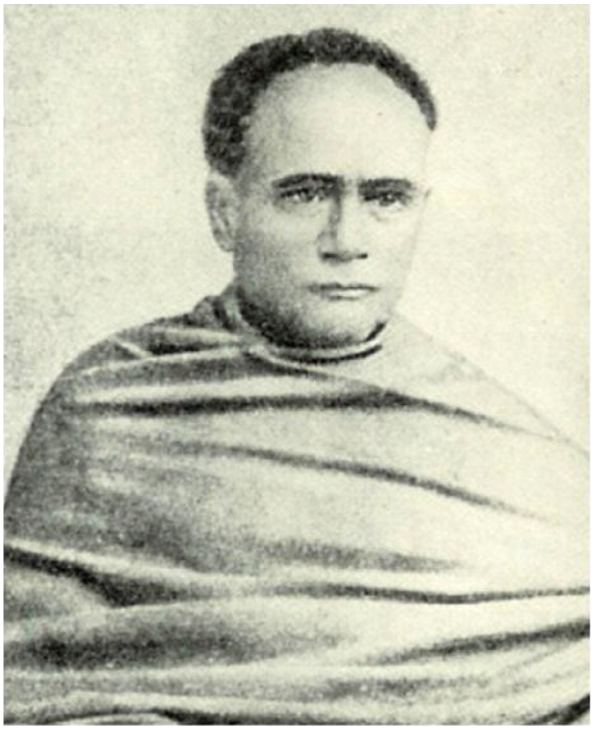

এ তথ্য আমাদের অনেকেরই জানা যে ১৮৫২ সালের ১২ এপ্রিল বিদ্যাসাগর বলেছিলেন ‘‘এ কথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, ...’’। এর প্রায় দেড় বছর পর ১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তিনি আরও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন, ‘‘বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।’’

ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে ভারতীয় ধর্মকেন্দ্রিক বেদনির্ভর ভাববাদী দর্শনগুলি সম্পর্কেই বিদ্যাসাগর এমন মতামত প্রকাশ করেছেন। এর বিপরীতে ভারতীয় দর্শন-পরম্পরার ইতিহাসে লোকায়ত বা চার্বাক অপর যে বস্তুবাদী দর্শনটি বিকশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি সরাসরি কোনো মতামত হাজির করেননি। যদিও সেই দর্শনটির প্রতি যে তাঁর পরোক্ষ পক্ষপাতিত্ব ছিল এবং তাঁর জীবন দর্শনে তার প্রভাব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এখন প্রশ্ন হল বিদ্যাসাগর হঠাৎ করে হিন্দু-দর্শন, বিশেষ করে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন অর্থাৎ ভাববাদী দর্শনকে এভাবে সরাসরি আক্রমণ করতে গেলেন কেন? কেউ কেউ বলতে পারেন এটা তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। যেটাকে তিনি সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত মনে করতেন তার পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিতেন। আর যেটা তিনি যুক্তি-বুদ্ধি-বাস্তবতার বিচারে বেঠিক বা ভুল বলে মনে করতেন, তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতেন না। কিন্তু এইটুকু বললে প্রশ্নটির মীমাংসা হচ্ছে না। তাই আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন তথা ভারতীয় হিন্দুদর্শন-এর কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য বা মতামত অথবা সিদ্ধান্তগুলিকে বিজ্ঞানচেতনায় জারিত তাঁর যুক্তিবাদী মন সঠিক বা অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করতে পারেনি। তখনই আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ হবে কেন বিদ্যাসাগর ভারতীয় হিন্দু-দর্শন তথা বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন সম্পর্কে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে দুঃসাহসিক মতামত ব্যক্ত করেছেন।

২

বিদ্যাসাগর বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের নাম উল্লেখ করে সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে তিনি এই দুটি দর্শন ছাড়া বাকি সব দর্শনের পক্ষে ছিলেন। আসলে বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী মন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাজগতে যুক্তিহীন ও আবেগ-নির্ভর কষ্টকল্পিত কোনো ভাবনার প্রবেশাধিকার ছিল না। সেই বিচারে তিনি সাংখ্য ও বেদান্ত মতকে অস্বীকার করেছেন।

ভারতীয় দর্শনমতগুলিকে দার্শনিক পরম্পরায় দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। একটি বৈদিক দর্শন। অর্থাৎ যে দর্শনমতগুলি বেদকে প্রামাণ্য করে বা বেদের দার্শনিক তত্ত্বকে মেনে নিয়ে সেই তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং বেদের জ্ঞানতত্ত্ব তথা দার্শনিক মতামতগুলিকেই যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে তারাই বৈদিক দর্শন হিসাবে পরিচিত। বৈদিক দর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, মীমাংসা, সাংখ্য ও বেদান্ত। এছাড়াও কয়েক ডজন দর্শনমত আছে যারা বেদের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তবে সেগুলিকে একেবারে স্বতন্ত্র দর্শনমত হিসেবে গণ্য করা যায় না। সবগুলিই প্রায় কোনো না কোনো মূল দর্শন সম্প্রদায়ের শাখা অথবা অনেকাংশেই মূল দর্শনগুলির মতামতের সঙ্গে মিশে যায়। এই দর্শনগুলি যেহেতু বস্তু ও বাস্তবকে অস্বীকার করে কাল্পনিক সত্যকে আঁকড়ে ধরে, তাই এরা ভাববাদী দর্শনও বটে। আবার বৈদিক দর্শনগুলিকে আস্তিক দর্শনও বলা হয়ে থাকে। প্রচলিত ধারণায় আস্তিক শব্দের অর্থ ধর্মে বিশ্বাস। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে আস্তিক বলতে বৈদিক বোঝায়। এক্ষেত্রে ধর্মের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বেদ। ধর্ম বা ঈশ্বর গৌণ, মুখ্য হল বেদ। ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা না থাকা বড় কথা নয়, বড় কথা বেদে বিশ্বাস আছে কি নেই। তাই বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেও আস্তিক দর্শন নয়, কারণ তারা বেদকে অবিশ্বাস করে। বেদের সর্বাধিপত্যই ভারতীয় আস্তিক ও ভাববাদী দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এগুলিকেই সহজ কথায় বিদ্যাসাগর হিন্দু দর্শন বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্যটি অবৈদিক দর্শন। অর্থাৎ এরা বেদের জ্ঞানতত্ত্বকে গ্রাহ্য করে না বা মান্যতা দেয় না। বেদের প্রামাণ্যতাকে স্বীকার করে না। অনেকাংশে এরা বেশি যুক্তিবাদী। অলৌকিক বিশ্বাস ও কল্পনাকে প্রাধান্য দেয় না বা কম প্রাধান্য দেয়। এরা বস্তুর বাস্তব সত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। অবৈদিক দর্শনগুলি তাই অনেকটাই বস্তুবাদ-ঘেঁষা। বস্তুবাদী চিন্তার প্রবণতাগুলি কম-বেশি এদের মধ্যে স্পষ্ট। অবৈদিক দর্শনগুলির মধ্যে প্রধান তিনটি হল চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন।

বিদ্যাসাগরের চিন্তাজগতের সূত্র ধরে অগ্রসর হলে বোঝা যাবে সাধারণভাবে তিনি সমস্ত ধরনের বৈদিক দর্শনেরই বিরোধী ছিলেন। তেমনি অবৈদিক দর্শনগুলি তাঁর চিন্তাজগতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও চার্বাক দর্শনের প্রতি ছিল তাঁর সর্বাধিক আকর্ষণ। চার্বাক দর্শনের মধ্যেই তিনি তাঁর চিন্তার অনেক মিল ও সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি হিন্দু দর্শন বলতে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে অবৈদিক দর্শন, বিশেষ করে লোকায়ত / চার্বাক ছিল না।

বৈদিক দর্শনের বিরোধিতার প্রশ্নে সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাস। বেশিরভাগ বৈদিক দর্শনই ঘোরতর ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং প্রচ্ছন্ন ও প্রকটভাবে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। ফলে সেগুলি ধর্মীয় দর্শন হিসেবেই সমাজে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ধর্মকে যেহেতু বিদ্যাসাগর ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করতেন, তাই ধর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন। তেমনি ঈশ্বর আছে কি নেই, থাকলেও তার আদৌ কোনো ভূমিকা বা প্রয়োজন আছে কিনা, তা নিয়েও বিদ্যাসাগরের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও ঈশ্বর-সাধনা বা ধর্মাচরণের কোনো বালাই ছিল না। ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোকে তিনি সময়ের অপচয়, বিদ্যা-বুদ্ধির অপচয় মনে করতেন। পরিবর্তে তাঁর কার্যশক্তি ও সময় ব্যয় হয়েছে নানাবিধ মহান সামাজিক কর্মকাণ্ডে।

অবৈদিক দর্শনগুলির সঙ্গে ধর্মের সেই অর্থে ওতপ্রোত কোনো সম্পর্ক ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষভাবেই অবৈদিক দর্শনগুলি গড়ে উঠেছিল। এই প্রশ্নে সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ লোকায়ত / চার্বাক দর্শন। গৌতম বুদ্ধও কোনো ধর্মমত প্রচার করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে ধর্মাচরণ যুক্ত করে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। চার্বাক দর্শনের সঙ্গে কোনো কালেই ধর্মের কোনো যোগ ছিল না। বস্তুত ভারতীয় দর্শনের মধ্যে একমাত্র চার্বাককেই খাঁটি বস্তুবাদী দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যা সম্পূর্ণত ধর্মসংস্রব-বর্জিত এবং অবশ্যই বেদের বিরোধী। এহেন চার্বাক দর্শন বিদ্যাসাগরকে আকর্ষণ করবে এবং চার্বাকের প্রতি তাঁর পরোক্ষ পক্ষপাতিত্ব থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গত আরও একটা বিষয় লক্ষ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর দর্শন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার সময় ‘হিন্দু’ দর্শন কথাটি ব্যবহার করতেন। ভারতীয় দর্শন বলতে প্রধানত যেহেতু বৈদিক দর্শনেরই ছড়াছড়ি এবং সেগুলি বেশিরভাগই কোনো না কোনো ভাবে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই তিনি সোজা কথায় সহজভাবে তাদের ‘হিন্দু দর্শন’ বলেই উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের সঙ্গে ধর্মের যোগ থাকলেও সেগুলির প্রভাব ভারতের মাটিতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাবার ফলে সেগুলিকে বিদ্যাসাগর ততটা গুরুত্ব দেননি। আর চার্বাক দর্শনের সঙ্গে তো ধর্মের কোনো সম্পর্কই নেই।

৩.

ভারতে ভাববাদী দর্শনগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী বেদান্ত দর্শন। ভারতীয় জনসমষ্টির একটা বড় অংশকে এই দর্শনভাবনা চিন্তায় নিষ্ক্রিয় ও চেতনায় অন্ধ করে রেখেছে। ভারতে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অন্তরায় বেদান্ত দর্শনের প্রভাব। বেদান্ত দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের দৃঢ় অবস্থান নেবার পেছনে সম্ভবত এটাই ছিল প্রধান কারণ। বিদ্যাসাগর বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছিলেন, কিন্তু কেন ভ্রান্ত তার কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেননি। তবে অনুমান করা যেতে পার দ্বিবিধ কারণে তিনি একে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রথমত, কোনো মতামত বা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শঙ্করাচার্য বেদান্ত দর্শনের যে রূপরেখা নির্মাণ করেছেন এবং ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে যুক্তি পরম্পরা সাজিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেটা পুরোপুরি অবরোহী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আগে থেকে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করা থাকে। পরে যুক্তি-তর্ক সাজানো হয় সেই সিদ্ধান্ত বা ফলাফলের সমর্থনে। অনেকটা অঙ্কের ব্যাক কালকুলেশনের মতো। এটা পুরোপুরি যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের বিরোধী। ‘দর্শনের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে মনোরঞ্জন রায় লিখেছেন, ‘‘যুক্তির ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্য ছিলেন অবরোহীধর্মী। সত্য নিরূপণের জন্য তিনি যুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ থেকে বিশেষ, কারণ থেকে কার্য, সংশ্লেষণের পথই অনুসরণ করেছেন। এই একদেশদর্শী অবরোহীধর্মী যুক্তি অনুসরণ করার ফলে প্লেটোর মতোই শঙ্করাচার্য পূর্ব থেকেই জানেন তাঁর সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু কী? এই পন্থা যে বিজ্ঞানসম্মত নয় সেকথা বলা বাহুল্য। বিজ্ঞান প্রথমে ঘটনা বা বস্তুটিকে আরোহীধর্মী যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করে। তাঁর সামনে যেসব উপাত্ত থাকে তার থেকে কী সিদ্ধান্ত হবে তা বৈজ্ঞানিকের জানা থাকে না। পরে যখন তিনি ওইসব উপাত্তগুলির সংশ্লেষণ করেন বা সম্বন্ধযুক্ত করেন তখনই সেই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। সত্য নিরূপণের এই যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণমূলক পথ যুক্তিশাস্ত্রে থাকে যাকে অবরোহীধর্মী যুক্তি বলা হয়, সেই পথই যথার্থ পথ।’’ বলাই বাহুল্য শঙ্করাচার্য এই পথ অবলম্বন করে বেদান্ত দর্শনকে দাঁড় করানোয় প্রয়াসী হননি। তাই ভুল পথে ভুল যুক্তিতে গড়ে ওঠা বেদান্ত দর্শনকে বিদ্যাসাগর সঠিক বলে গ্রহণ করতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত, যে-কোনো ভাববাদী দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাদের সিদ্ধান্তটি থাকে পূর্ব-নির্ধারিত। সেই নির্ধারিত সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য তাঁরা যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধূম্রজাল বোনেন সেখানে সত্য ও বাস্তবের বিকৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্লেটো ও শঙ্করাচার্য সেটাই করেছেন। বিদ্যাসাগরের কাছে তা মান্যতা না পাওয়াই স্বাভাবিক।

বেদান্ত দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শঙ্করাচার্য অন্যান্য দর্শন মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং সত্যের চূড়ান্ত অপলাপ ও বিকৃতি ঘটিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচিতে বেদান্ত দর্শনকে বিদ্যাসাগর স্থান দিয়েছেন এই যুক্তিতে ও বাস্তববোধ থেকে যে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে এই দর্শনের বিস্তর প্রভাব আছে। উদার বাস্তববাদী মানসিকতার এটা এক অনন্য পরিচয়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধায় লিখেছেন, বেদান্ত দর্শন মানেই উপনিষদের দর্শন—অন্তত বৈদান্তিকদের মতে একান্তভাবে তাই। অবশ্যই উত্তরকালের বৈদান্তিক আচার্যরা বিপক্ষ-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এমন অনেক দার্শনিক প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন যার পরিচয় উপনিষদগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রামাণ-প্রমেয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে পরবর্তী বৈদান্তিকদের আলোচনা উল্লেখ করা যায়। কেননা ইতিমধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা এ-জাতীয়

প্রসঙ্গের অবতারণা করে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন যার সঙ্গে উপনিষদ-প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গতি হয় না। স্বভাবতই উপনিষদের সমর্থনে এ-জাতীয় প্রসঙ্গেরও প্রত্যুত্তর রচনা করা প্রয়োজন হয়েছে। অতএব এখানেও মনে রাখা দরকার উত্তরকালের বৈদান্তিকেরা যত নতুন ও জটিল দার্শনিক আলোচনার অবতারণাই করুন না কেন, তারা সবটুকুই একটি মূল কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। অর্থাৎ, স্বাধীন যুক্তি বা বিচার-বিশ্লেষণের নির্ভরে তাঁরা কেউই বিশ্বের কোনো নতুন ব্যাখ্যা খোঁজেননি; তার বদলে উপনিষদ-প্রতিপাদ্য পুরনো ব্যাখাটিরই নতুন সমর্থন অন্বেষণ করেছেন।

এহেন বেদান্তকে বিদ্যাসাগর ভ্রান্ত দর্শন বলবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তবে সাংখ্য দর্শনকেও একইভাবে ভ্রান্ত দর্শন বলার কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। প্রশ্ন, আদতে দর্শন দুটিকে একই বন্ধনীর মধ্যে ফেলা যায় কি?

৪.

সাংখ্য-মতে অচেতন বা জড়রূপা প্রকৃতিই জগৎকারণ, উপনিষদ-মতে চেতন ব্রহ্মই পরম সত্য। কার্য-কারণ সম্পর্কে সাংখ্য দর্শনে একটি সুনির্দিষ্ট মত আছে। তার নাম সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ। এই মত অনুসারে কার্য একান্তভাবেই কারণের পরিণাম। কার্যের মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে না যা কারণের মধ্যে—অবশ্যই অস্ফুট বা বীজাকারে—বর্তমান নয়। অতএব কার্যের মধ্যে যা বর্তমান কারণের মধ্যেও তার সত্তা অনুমেয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ আসলে কার্য এবং তা জড়রূপ। তার কারণ হিসেবেও জড়রূপ কিছু অনুমেয়। সাংখ্যে এই জড়রূপ জগৎকারণকে প্রকৃতি বা প্রধান আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সাংখ্য সমালোচনায় শঙ্করাচার্য বলেছেন—এ-দর্শন শুধু বেদ-বিরোধী তাই নয়, এমনকি মনু প্রমুখ বেদানুসারী শিষ্টদের বক্তব্য-বিরোধীও। শঙ্কর এটাও বলেছেন, সাংখ্য-প্রতিপাদ্য কিছু কিছু কথা (যেমন সৎকার্যবাদ) শ্রুতি প্রতিপাদ্য বিষয়ের সদৃশ বলেই তা শিষ্টরা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শঙ্করের মতে সাংখ্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত প্রকটভাবেই শ্রুতিবিরুদ্ধ। সাংখ্য মতে অচেতন বা জড়রূপা প্রকৃতিই জগৎকারণ, উপনিষদ-মতে চেতন ব্রহ্মই পরম সত্য।

সাধারণভাবে মনে করা হয় শঙ্করের কাল পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রকৃত বেদনুসারী বা আস্তিক দার্শনিকরা সাংখ্যকে বেদমূলক দর্শন বলে স্বীকার করতে রাজি হয়ননি। শঙ্করাচার্যের বেদান্তের আদি প্রতিষ্ঠাতা বাদরায়ন সাংখ্য দর্শনকে বেদান্ত দর্শনের অর্থাৎ উপনিষদ বা শ্রুতি প্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রধানতম প্রতিপক্ষ বলেই গ্রহণ করছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, মোদ্দা কথা হলো : উপনিষদ-প্রতিপাদ্য জগৎকারণ বা ব্রহ্ম চেতন-পদার্থ, সাংখ্য-প্রতিপাদ্য জগৎকারণ বা প্রকৃতি অচেতন-পদার্থ। স্বভাবতই উপনিষদ-প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বাদরায়ন সাংখ্য-খণ্ডনের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং বদারায়নকে অনুসরণ করে সাংখ্য-খণ্ডনের পর শঙ্করাচার্যও বলেছেন, শ্রুতিবিরুদ্ধ মতবাদগুলির মধ্যে প্রধানতম মতবাদই খণ্ডিত হল ; অতএব এই কারণে অপরাপর শ্রুতিবিরুদ্ধ মতবাদগুলির নিরসন হতে বাধ্য। প্রসঙ্গত, বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও ঠিক এই বিষয়টিতে কোনো মতভেদ নেই। অর্থাৎ রামানুজের মতেও সাংখ্য ঘোরতর শ্রুতিবিরুদ্ধ—বস্তুত শ্রুতি-বিরুদ্ধ দর্শনের মধ্যে প্রধানতম বা অগ্রণী।

সাংখ্য দর্শন আলোচনাকালে মনোরঞ্জন রায় লিখেছেন, কপিলের মতে এই জগৎ সৃষ্টি হয়নি, এই জগতের কেউ স্রষ্টা নেই। জগতের ক্রমবিকাশ হয়েছে। কপিলের যুক্তি ছিল যান্ত্রিক বস্তুবাদীদের মতো আরোহীধর্মী। এই আরোহীধর্মী যুক্তির একদেশদর্শিতা তার দর্শনে সুস্পষ্ট। কার্যের সঙ্গে কারণের একটা সম্বন্ধ থাকে। কার্য কখনও কারণ থেকে ভিন্ন হয় না। সুতরাং সমস্ত কার্যই সৎ। এই তত্ত্বকে সৎকার্যবাদ বলা হয়। এই তত্ত্বের দ্বারাই উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। ব্রহ্ম যদি কারণ হয় জগৎ যদি কার্য হয়—তাহলে কারণ ও কার্যের মধ্য বিসদৃশতাই দেখা দেয়। অথচ কারণ ও কার্য অসদৃশ হতে পারে না। প্রকৃতিই এই জগতের কারণ। প্রকৃতির পরিণাম বা রূপান্তর বিশ্ব। প্রকৃতি সর্বব্যাপী, নিত্য ও এক। কার্য হচ্ছে বহু, দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। জগৎ সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। সত্য ও মিথ্যা থেকে স্বতন্ত্র বস্তু থাকতে পারে না বলে জগৎ অবর্ণনীয় নয়।

কপিলের মতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন রকম প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। যুক্তির দ্বারা যে বস্তু পাওয়া যায় না, তার অস্তিত্ব নেই। সেই জন্য ঈশ্বর অসিদ্ধ।

মনোরঞ্জন রায়ের মতে, হিন্দু ষড়দর্শনের মধ্যে কপিলের সাংখ্য ও কনাদের বৈশেষিক দর্শনেই প্রকৃত দার্শনিক চিন্তাধারা সুপরিস্ফুট। কপিল অপেক্ষা কনাদের চিন্তাধারা উন্নত হলেও কনাদ কপিলের অনেক পরের লোক। সেই হিসেবে দর্শনের ক্ষেত্রে কপিলের কৃতিত্ব যথেষ্ট। ধর্মের প্রাণ অহেতুক বিশ্বাস, রহস্যবাদ ও কুসংস্কার। গতানুগতিকতায় স্রোতে তা গা ভাসিয়ে দেয়। দর্শনের প্রাণ যুক্তি। চিন্তা যেখানে বিধি-নিষেধের দ্বারা কন্টকিত প্রাণহীন আচারের মরুবালির মধ্যে, যেখানে বিচারের সতেজ স্রোতধারা লুপ্ত, সেখানে দর্শনের বিকাশ সম্ভব হয় না। কপিলই ষড়দর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম ধর্মের বিধিনিষেধ, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব থেকে দর্শনকে মুক্ত করে যুক্তির ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। তিনি এক নূতন স্বাধীন চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন যার ফলে প্রাণ আবার মুক্ত বায়ুতলে এসে দাঁড়ায়।

এপর্যন্ত সাংখ্য দর্শনের যা পরিচয় আমরা পেলাম তাতে সাংখ্যকে বিদ্যাসাগরের সরাসরি ভ্রান্ত বলার কথা নয়। আসলে সাংখ্য দর্শনের আদিরূপ বা বিকশিত রূপ বিদ্যাসাগরের গোচরে আসেনি। সেই সময় ভারতীয় দর্শন নিয়ে চর্চা এতটা প্রসারিত হয়নি। আদি দর্শন-গ্রন্থগুলির খোঁজও সেভাবে ছিল না। বিদ্যাসাগর প্রচলিত যে সংখ্যাগ্রন্থ পড়েছেন সেগুলি পরবর্তীকালে রচিত। প্রধানত বেদান্ত-অনুসারী দার্শনিকরা সাংখ্যর অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্যকে পরিবর্তন করে অনেকটাই উপনিষদ-অনুসারী ও বেদান্ত ঘরানায় নিয়ে এসেছেন। সেই রূপান্তরিত সাংখ্যকেই বিদ্যাসাগর ভ্রান্ত দর্শন বলেছিলেন।

With best compliments of

DURGAPUR SAW MILL

TIMBER MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G. T. Road (Main Gate), P.O. Durgapur-713203, West Bengal
Phone : 0343 2585184, 6452480, Mobile : 9832163188

Sl. No. 119

ঈশ্বরের শেষ ঠিকানা কর্মাটাঁড়ের নন্দনকানন

শ্যামসুন্দর বেরা

তাঁর জীবনপর্ব সত্তর বছরের। একুশ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ থেকে পাঠপর্ব শেষে অসাধারণ মেধা এবং পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিলাভ করেন (ডিসেম্বর, ১৮৪১)। কর্মজীবন শুরু তারপর থেকেই। অর্থাৎ কর্মজীবন কমবেশি ৫০ বছরের। জীবনের শেষ আঠোরো বছরের সিংহভাগ সময় বিদ্যাসাগর কাটিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগনার কর্মাটাঁড়ে। সুতরাং কর্মাটাঁড়ে অবস্থান বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। ২০০০ সালের আগে বিহার ও বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া জেলার কর্মাটাঁড় হল জামতাড়া এবং মধুপুরের মধ্যবর্তী একটি রেল স্টেশন। ইস্টার্ন রেলের উদ্যোগে অবশ্য অক্টোবর, ১৯৭৮ সালে স্টেশনটির নামকরণ করা হয় 'বিদ্যাসাগর'।

সর্বজনীন শিক্ষা, বিশেষত নারীশিক্ষার বিস্তার, বিধবাবিবাহ চালু, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ রোধে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সামাজিক কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকা একদিকে যেমন বিদ্যাসাগরকে সম্মান এনে দিয়েছিল, তেমনই জুটেছিল অপমানও। তিনি দেখেছিলেন ধর্মের ধ্বজাধারী মানুষদের পুরোনো প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি। ভেঙে গিয়েছিল তাঁর শরীর ও মন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভব ছিল—'পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভালো হয়।'

কলকাতার কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্তি নিয়ে পূর্ণ বিশ্রাম এবং নিশ্চিন্তে লেখাপড়ার জন্য পশ্চিমের কোনো স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে বাস করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দেওঘরে একটি বাংলো বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপিত হলে তা তিনি নেবার পরিকল্পনা করেন। অবশ্য আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় পিছিয়ে আসতে হয়। পরের বছরই অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কর্মাটাঁড় স্টেশন সংলগ্ন তিন একরের কিছু বেশি একটি জমি কেনেন তিনি। সে-সময় সংলগ্ন এলাকাগুলি ছিল জঙ্গলে ভরা। বিদ্যাসাগর তাঁর জমিটিকে পরিষ্কার করিয়ে মনের মতো একটি বাংলো নির্মাণ করান। অবশিষ্টাংশে ফুল ও ফল, বিশেষ করে নানা রকম আমগাছ বসান। এখনও তাঁর বসানো একটি আমগাছ দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর পাশের জমিতে। তিনি চত্বরটির নাম দেন 'নন্দনকানন'। কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের জীবনচর্যার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের ভূমিকাংশে। ভূমিকা লিখেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত পড়ানোর উদ্দেশ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে লখনউ যেতে হয়। সঙ্গী ছিলেন সতীশ বসু। টানা যাত্রা এড়াতে একদিনের বিশ্রামের জন্য থেকেছিলেন কর্মাটাঁড়ে। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে 'কর্মাটাঁড়'-এর 'টাঁড়' শব্দের অর্থ হল উঁচু জমি, যা বন্যাতেও ডুবে যায় না। আর 'কর্মা' ছিল সাঁওতাল

জনগোষ্ঠীর একজন মানুষ। কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের প্রতিবেশী ছিলেন তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে দূরের বাসিন্দা সাঁওতালরা।

বিকেল তিনটে নাগাদ পৌঁছে মালপত্র স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় রেখে 'নন্দনকানন'-এ গিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সন্ধ্যার গল্পগুজবে বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন যে শাস্ত্রীমশাই লখনউতে 'হর্ষচরিত' পড়াতে যাচ্ছেন। তাঁকে এ-বিষয়ে পড়ানোর কিছু কিছু কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। পরদিন সকালে শাস্ত্রীমশাই ঘুম থেকে উঠে দেখলেন বিদ্যাসাগর বারান্দায় পায়চারি করছেন আর মাঝে মধ্যে টেবিলে বসে 'কথামালা' কিংবা 'বোধোদয়'-এর প্রুফ দেখছেন। বিস্তর কাটাকুটি করা অনেক প্রুফ পড়ে থাকাতে বুঝলেন যে বিদ্যাসাগর রাত জেগে প্রুফ দেখছেন। সেই বয়সে

'নন্দনকানন'-এ বিদ্যাসাগরের শয়নকক্ষ

ধকল নেবার মানসিকতা দেখে অবাক হয়েছিলেন শাস্ত্রীমশাই।

রোদ উঠতে না উঠতেই দেখলেন সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর গরিব মানুষজন পরের পর নানা পরিমাণ ভুট্টা নিয়ে আসছে এবং সেগুলি দিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে কেউ পাঁচ গণ্ডা, কেউ পাঁচ আনা ইত্যাদি পয়সা চাইছে। বিদ্যাসাগর তা দিয়েও দিচ্ছেন। দেখলেন, বিক্রেতা দাম বলছে, ক্রেতা নয়। ভুট্টাগুলি নিয়ে বিদ্যাসাগর তাকে রেখে দিচ্ছেন। বেলা আটটা পর্যন্ত এভাবে ভুট্টা কেনার পর্ব চলল এবং তাকগুলি ভরে গেল। এত ভুট্টা দেখে শাস্ত্রীমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করবেন?" উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, "দেখ্‌বি রে দেখ্‌বি।" এরই মধ্যে বিদ্যাসাগর বেশ কিছুক্ষণের জন্য বেপাত্তা হয়ে গেলেন। পরে শাস্ত্রীমশাই দেখলেন বিদ্যাসাগর মাঠের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে আসছেন। কথাবার্তায় জানলেন যে মাইল দেড়েক দূরে সাঁওতালপল্লিতে গিয়েছিলেন একটি ছেলের চিকিৎসা করতে।

তারপরই শুরু হল ভুট্টা দেবার পালা। দলে দলে সাঁওতালপল্লি থেকে ছেলেমেয়েরা শুকনো পাতা, কাঠ ইত্যাদি নিয়ে হাজির খাবার

বিদ্যাসাগরের বাংলো

চাইতে। বিদ্যাসাগর তাদের সবাইকে ভুট্টা দিলেন এবং পাশেই কাঠ, পাতা জ্বালিয়ে ভুট্টা পুড়িয়ে খাবার পর্ব চলল ভুট্টা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। দুপুরে স্নানাহার সেরে আবার বিদ্যাসাগর কলকাতার অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তায় বসলেন। এরই মধ্যে স্টেশনের ঘন্টা জানিয়ে দিল যে ট্রেন আসছে। প্রণাম সেরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রওনা দিলেন স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

এই ছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কর্মাটাঁড়ে থাকা এবং বিদ্যাসাগরের জীবনচর্যা দেখার একদিনের বর্ণনা। কর্মাটাঁড়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগ ছিল জীবনের শেষ আঠারো বছর। প্রকৃতির কোলে থাকা অত্যন্ত সৎ, সরল এবং ভারতের প্রাচীনতম জনজাতির সাঁওতাল মানুষজনদের সঙ্গে আন্তরিক সখ্য গড়ে ওঠে বিদ্যাসাগরের। তাদের অনাহারে খাবার, বস্ত্রহীনতায় পোশাক, অসুস্থতায় চিকিৎসা দিয়েছেন অকাতরে। স্কুল করেছিলেন সাঁওতাল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে। বয়স্কদের পড়াতেন রাত্রে। বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে। এই কাজের মাধ্যমে প্রকারান্তরে বিদ্যাসাগর নতুন মানবসম্পদের উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেখানকার সাঁওতালরাও বিদ্যাসাগরকে ভক্তি করতেন দেবতার মতো।

পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে তাঁর নিজের উইলে পুত্রের জন্য কোনো সংস্থান রাখেননি বিদ্যাসাগর। পিতার প্রয়াণের (২৯ জুলাই, ১৮৯১) পর অবশ্য আইন বলে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন পুত্র নারায়ণচন্দ্র। জানা যায়, তিনি কর্মাটাঁড়ের সম্পত্তি বিক্রি করে দেন কলকাতার সিংহদাস মল্লিককে। দীর্ঘদিন পর ১৯৭৪-র ২৯ মার্চ বিহার বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন বীরেন্দ্রনাথ এবং জিতেন্দ্রনাথ মল্লিকের কাছ থেকে ২৪ হাজার টাকায় সম্পত্তি কিনে নেন। জানা যায়, প্রথমে দাম ঠিক হয়েছিল অনেকটাই বেশি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে তাঁরা সংরক্ষণ করবেন জানতে পেরে দাম কমিয়ে ২৪ হাজার টাকা করেন। জমি কিনতে বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আব্দুল গফ্ফর

১৫ হাজার টাকা দান করেন এবং অবশিষ্ট টাকা তোলা হয় এক টাকার কুপন বিক্রি করে। ১৯৭৫ সালে গঠিত হয় বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা কমিটি এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালে নন্দনকাননে বিদ্যাসাগর বাগানে যেখানে বসতেন সেখানে একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি বসানো হয়। ১৯৯৪ সালে কলকাতার 'বিশ্বকোষ পরিষদ' এবং 'পথের পাঁচালি'-র অর্থ সাহায্যে বিদ্যাসাগরের মায়ের নামে 'ভগবতী ভবন' নির্মিত হয়। একই বছরে 'ফ্রেন্ডস অব স্টেডিয়াম'-এর পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা কমিটিকে এক লক্ষ টাকা দান করেন তৎকালীন ক্রীড়া ও পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। ১৯৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ভবনটির উদ্বোধনও করেন তিনি। ২০১২ সালে নন্দনকানন চত্বরে নির্মিত হয়েছে একটি গেস্ট হাউস। ৬টি ঘর আছে। প্রতিদিন ১০০ টাকায় থাকা এবং খাওয়ার দরুন ১৫০ টাকার বিনিময়ে নাগরিক জীবন থেকে নির্জনে বিশ্রাম নেওয়া যায় মনে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি জড়িয়ে।

বিদ্যাসাগরের জন্মের দুশো বছরের শুরুতে (৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) গিয়েছিলাম কর্মাটাঁড়ে। সঙ্গী ছিল জামতাড়ার বাসিন্দা অনুজপ্রতিম নবারণ মল্লিক। দেখা গেল বন্ধ হয়ে গেছে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত স্কুল। বন্ধ ভগবতী ভবনের দরজা, আগাছায় ঢাকা পড়েছে সামনের চত্বর। যত্রতত্র গরুছাগলের বিষ্ঠার প্রাচুর্য দেখে বোঝাই যায় এটি তাদের অবাধবিচরণক্ষেত্র। অনিয়মিতভাবে এক বা দু-ঘন্টার জন্য খোলা হয় ছোট্টো অবহেলিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র। শুধু গেস্ট হাউসে চালু আছে স্থানীয় মেয়েদের স্বনির্ভর প্রকল্পের একটি সেলাইশিক্ষা কেন্দ্র।

ধর্মভীরু মানুষেরা পুণ্যলাভের আশায় নাম খোদাই করা প্রস্তরফলক লাগান তীর্থস্থানে। নন্দনকাননেও চোখে পড়বে যত্রতত্র বসানো অনুদান দিয়ে নামখোদাই করা পাথরের ফলক। বড়োই দৃষ্টিকটু। যে বিদ্যাসাগর তাঁর উইলে কোনো ধর্মস্থানকে বা দেবতার উদ্দেশ্যে কোনো দানপত্র করে যাননি সেই বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তির পিছনে বৃহৎ বটগাছে মানুষ লাল সুতো জড়িয়ে আসেন পুণ্যলাভের আশায়!

লেখক : আঞ্চলিক ইতিহাস সন্ধানী। (ছবি : লেখক)

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

বোহার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম : হরিণডাঙা, পোঃ সোঁতলা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৭১১১১১

এই গ্রাম পঞ্চায়েত SLWM প্রকল্প গড়ে সকল গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করেছে। বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে পেরে পঞ্চায়েত গর্বিত। SLWM প্রকল্পে এলাকার চাষিদের জন্য প্রস্তুত সার কৃষিকাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন এনেছে। পঞ্চায়েতের আশু লক্ষ্য হল সমগ্র অঞ্চলকে প্লাস্টিক মুক্ত করা।

হাসমত মোল্লা
উপপ্রধান

পুষ্প টুডু
প্রধান

ও সকল কর্মচারী বৃন্দ

Sl. No. 139

সকলকে উৎসব শুভেচ্ছা জানাই

সাতগাছিয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

সাতগাছিয়া, পূর্ব বর্ধমান

পঞ্চায়েতের সফলতা

পানীয় জল বেশিরভাগ মানুষের বাড়িতে পৌঁছানো।
বেশিরভাগ মানুষের বাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা।
বাংলার আবাস যোজনায় বেশিরভাগ গরিব মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে গীতাঞ্জলি প্রকল্পের ঘর
গ্রামীণ সড়ক প্রত্যেক সংসদে তৈরি করা হয়েছে।

আগামীর পরিকল্পনা

সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়ন।
উপরোক্ত অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করা।
ব্যাপক ভাবে সামাজিক বনসৃজন করা।
জল সংরক্ষণ ও প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া।

সঞ্জীব বাঁশফোড়
উপপ্রধান

মুকুল সাহা
প্রধান

Sl. No. 1

দ্বিশত প্রয়াণবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

সঞ্জীব চক্রবর্তী

আজ থেকে দুশো বছর আগে প্রয়াত হন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক পাঠ্যক্রমের চাহিদায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম ও কৃতিত্ব স্মরণ করতে বাধ্য হন মাত্র। এই পরিসীমার বাইরে তাঁর নাম খুব বেশি উচ্চারিত হয় বলে মনে হয় না।

বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি বলে দুর্নাম যেন স্থায়ী হয়ে গেছে। এখানে প্রকৃতির অকৃপণ দানে যেমন ফসলের অভাব নেই, তেমনি আকাল পড়েনি মনন ও সৃজনশীলতার জগতে। হয়তো অতিরিক্ত প্রাচুর্যের সমস্যার কারণেই বেশিরভাগ জনই বিস্মৃতির পলিতে চাপা পড়ে আছেন। আইকনের মর্যাদা পান মাত্র আঙুলে গোনা ভাগ্যবান কয়েকজন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সে দলে পড়েন নি।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রতিভা নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু আইকন না হওয়ার পেছনে সম্ভবত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, তাঁর জীবৎকাল এবং মৃত্যুর বছর অর্থাৎ ১৮১৯ সাল অতিক্রান্ত হয়েছে এমন একটা যুগের মধ্য দিয়ে যখন শিক্ষিত বাঙালিসমাজ ছিল ইউরোপীয় শিক্ষার দ্যুতিতে চোখে ধাঁধা লাগা এক জাতি। তার কাছে ভারতীয় সব কিছুই কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অন্ধকার। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক মৃত্যুঞ্জয় খানিক অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হন। প্রাথমিক উন্মাদনা কেটে যাবার পর আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মানসিক স্থিতি খানিক ফিরে আসে; তখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইতিমধ্যেই প্রায় এক বিস্মৃত চরিত্র।

দ্বিতীয় কারণ, যখন বাঙালি সমাজের পুনরাবলোকনের অবসর হয় তখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মূল্যায়ন হয় 'অভিনব সাহেবজাতের নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তকের লেখক' এই মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

তারও পরে যখন বাংলা গদ্যের গড়ে ওঠার পর্বের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা শুরু হল তখন স্বীকার করতেই হল যে তিনিই সর্বপ্রথম 'অব্যবহৃত অপ্রচলিত এবং সদ্য গড়িয়া তোলা বাংলা গদ্যের একটা সচল সহনীয় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।' একটা অপোগণ্ড ভাষাকে সম্ভাবনাময় রূপদানের গৌরব প্রাপ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরই।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন যাঁরা তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের এই অবদান সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং পরীক্ষা পাশের বাজার-চালু নোটের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের দ্বিশত মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ করবেন কিনা সেটাও তাঁদের অভিরুচি। একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে মনে হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরই আরো একটি অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণের যোগ্য। আজ থেকে দুশো বছর আগে এই সময় সনাতন সমাজ সহমরণ প্রথা থাকা উচিত না তার বিলোপ করা উচিত সেই প্রশ্নে তুমুল ভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। নানা শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যেমন দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে সহমরণ একটি লোকাচার মাত্র, যার কোনো শাস্ত্রীয় অনুমোদন নেই, তেমনি প্রাচীন শাস্ত্রের একটি মানবিক মুখও তিনি প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন যা রামমোহন রায়ের যুক্তিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

রামমোহন রায় ও উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের পর্যায়ের ঘটনাগুলি এতটাই আলোকবৃত্ত দখল করে থাকে যে তার প্রস্তুতিপর্বে উইলিয়াম কোলব্রুক, পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা, ইংরেজ কালেকটর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের কথা ভুলে যাই। গুরুত্ব দিই না উইলিয়াম কেরী, ক্লডিয়াস বুকানন ও মিশনারি পেগস-এর কথা, যদিও মিশনারিদের মানবতাবাদ সবসময় অহৈতুকী ছিল না। ভারতবর্ষের সনাতন সমাজের তুলনায় খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা ছিল তাঁদের খাটাখাটনির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তবু এই সামাজিক কুপ্রথা দমনের জন্য তাঁদের সমালোচনার সুফলটুকু অস্বীকার হবে অনৈতিহাসিক। ১৮১৭ সাল থেকে শুরু হওয়া সহমরণ বিলোপের প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তর থেকে প্রতিবাদের সূত্রপাতটুকু করে দিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটু গরুড়াবলোকন পাঠকের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্ম ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যার অংশ ছিল। সেই হিসেবে তিনি

উড়িষ্যাজাত। 'প্রকৃত প্রস্তাবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, খণের চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান'। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিদ্যালাভ করেন নাটোরের সভাপণ্ডিতের কাছে। যৌবনে স্থিতিলাভ হয় কলকাতায়।

দেশীয় লোকেদের সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে গেলে দেশীয় ভাষা শিক্ষা প্রয়োজন। বাণিজ্যের প্রয়োজনেই লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হল। ১৮০১ সালের ৪ মে তারিখে কলেজ কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলভী প্রভৃতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। বাংলা (পরে সংস্কৃত ও মারাঠী) বিভাগের অধ্যক্ষ হলেন পাদরি উইলিয়াম কেরী। কেরীর অধীনে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মাসিক বেতন দুশো টাকা।

কলেজে পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণ করার জন্য পণ্ডিতদের বাংলা গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচনা করলেন 'বত্রিশ সিংহাসন', পারিশ্রমিক পেলেন দুশো টাকা। কলেজ ক্রয় করলো এক শত খণ্ড পুস্তক।

১৮০৫ সালে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা শুরু হল। সংস্কৃত পণ্ডিতের দায়িত্ব পড়ল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উপর। পণ্ডিত মহলে তখন খ্যাতি তাঁর তুঙ্গে। তিনি একে একে রচনা করলেন 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' প্রকাশিত হয় তাঁর জীবদ্দশায়। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশক পর্যন্ত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' পাঠ্যপুস্তক রূপে চালু ছিল।

পাণ্ডিত্যের বিচারে তাঁর গ্রন্থগুলির মান নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু তিনি আরো বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকলেন বাংলা গদ্যের একটা আদল গড়ে দেবার জন্য। সাধু ও চলিত এই দুই গদ্য রীতির পার্থক্য সর্বপ্রথম তিনি উপলব্ধি করেছেন। তিনি হলেন বাংলা গদ্যের প্রথম 'কনশাস আর্টিস্ট'—শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি মিলছে। ১৮১৬ সালের ২১ মে তারিখে হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠিত হল। সে কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ১৭ জুলাই স্থাপিত হল স্কুল বুক সোসাইটি। সেখানেও পরিচালন সমিতির এক সদস্য তিনি।

১৭৭২ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ১৭৭৫ সালে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি অন্তত ভারতীয়দের 'বর্বর' বলে মনে করতেন না। তাঁর উৎসাহে যে প্রাচীন ভারত উদ্ধারের কাজ শুরু হয় তাকে 'ওরিয়েন্টালিজম' নামের ছাপ লাগিয়ে লঘু করে দেখানোর প্রবণতা তখনই শুরু হয় পাশ্চাত্যপন্থী মহলে, এবং সেই মনোভাব থেকে আজও খুব মুক্তি ঘটেছে বলে সাধারণ ভাবে মনে হয় না। যাই হোক বিচারের সুবিধার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে সংস্কৃত ও ফারসি থেকে 'আ কোড অব জেন্টু ল'জ' (১৭৭৬) প্রকাশিত হল। অনুবাদ করলেন হ্যারো ও ক্রাইস্ট চার্চের প্রাক্তনী, ১৭৭২ সালে কুড়ি বছর বয়সে ভারতে পা রাখা ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০)। ১৭৯৫ সালে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় হেনরি কোলব্রুকের 'অন দা ডিউটিজ় অব আ ফেইথফুল উইডো' প্রকাশিত হল। কোলব্রুক 'মনুসংহিতা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে সহানুগমন হিন্দু বিধবা নারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নয়; ব্রহ্মচর্য পালন শ্রেয়স্কর।

সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ইউরোপীয় বিচারকদের সাহায্য করবার জন্য হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলভীরা নিযুক্ত হতেন। তাঁদের গুরুত্ব ছিল অনেক। সেকালে ধনী ব্যক্তিদের কাছে মামলা মোকদ্দমা ছিল খানিকটা ব্যসনের মত। যাঁর নামে যত বেশি মামলা তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা তত বেশি। মামলা করে করে নিঃস্ব হয়ে যেতেন অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি।

১৮১৬ সালের মাঝামাঝি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে ঐ কোর্টের হেড পণ্ডিত পদে নিয়োগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সে সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কমে এসেছে, কারণ ইংল্যান্ডের হ্যালিবেরি কলেজে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নবাগত সিভিলিয়ানদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বেতনও গত ১৫ বছরে বাড়ে নি। তাই কোর্ট পণ্ডিত পদে নিযুক্তির প্রস্তাব হাতছাড়া করলেন না তিনি। ১৮১৬ সালে ৯ মে তারিখে তিনি কলেজ কাউন্সিলে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকনটনের অধীনে অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে কোর্ট পণ্ডিতের দায়িত্ব পালন করে চললেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

১৮১৭ সালে সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি সহমরণ সম্পর্কে শাস্ত্রের সুস্পষ্ট বিধান জানার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের শরণাপন্ন হলেন। আসলে সহমরণ ছিল হিন্দু সমাজে প্রচলিত এমন একটি সামাজিক প্রথা যা জন কোম্পানিকে কয়েক দশক ধরে বিব্রত করে এসেছে। ফরাসিরা তাদের উপনিবেশ চন্দননগরে সহমরণ নিষিদ্ধ করে দেয় কোন প্রতিবাদের সম্মুখীন না হয়েই। কিন্তু ইংরেজ সরকারের কাছে পরিস্থিতিটা ছিল অন্য রকম। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করার সময় লর্ড কর্নওয়ালিস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কোম্পানি দেশীয়দের ধর্মাচরণে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। তাই এই ঘোষিত নীতি কোনপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ইংরেজ কালেকটার ও ম্যাজিস্ট্রেটরা সবাই বিবেকহীন লুঠেরা মাত্র ছিলেন একথা মনে করার কোন কারণ নেই। তাই ১৭৮৯ সালেই সাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট এইচ এম ব্রুক এক বিধবাকে চিতা থেকে বাঁচালেন এবং ফোর্ট উইলিয়ামে এই জাতীয় ঘটনায় তাঁর কর্তব্য বিষয়ে নিজামত আদালতের নির্দেশিকা চাইলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস অস্বীকার করতে পারেন নি যে ব্রুক বিবেক অনুসারে ঠিক কাজ করেছেন, কিন্তু তারপরে পরিষ্কার বলে দিলেন যে নেটিভদের ধর্মীয় ব্যাপারে যেন কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ না করা হয়। প্রায় বারো বছর পর ১৮০৫ সালে গয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট জে আর এলফিনস্টোন একটি মাদকাচ্ছন্ন নাবালিকাকে চিতা থেকে উদ্ধার করেন। তারপর তিনি এ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের বিধান জানার জন্য নিজামত আদালতে চিঠি দিলেন। কোর্টের নির্দেশে পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মার স্বাক্ষরিত এক 'ব্যবস্থা' এল। সেখানে ব্যাস, অঙ্গিরা ও বৃহস্পতির মত স্মার্তদের মত অনুসারে সহগমনকে শাস্ত্রানুমোদিত বলা হল। কয়েকটি ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নির্দেশ করা হল, যেমন বিধবার প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা হওয়া প্রভৃতি। ১৭৯৯ সালে ৮ম রেগুলেশনে আত্মহত্যা অপরাধ বলে ঘোষিত হল। নিষিদ্ধ হল গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন ও রাজপুতদের কন্যা সন্তান হত্যা প্রভৃতি আরো বিষয়, কিন্তু তখন সহমরণ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগেই লর্ড ওয়েলেসলির কার্যকাল শেষ হয়ে গেল। তাঁর উত্তরসূরি গভর্নর-জেনারেলেরা সাম্রাজ্য সামলাবার কাজে যুদ্ধবিগ্রহে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে সহমরণের বিষয়টি ফাইলবন্দি হয়ে গেল। ১৮১২ সালের ৩ আগস্ট সুস্পষ্ট নির্দেশিকা চেয়ে চিঠি লিখলেন বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিস্ট্র জে ওয়াচুপে। উত্তরে ঘনশ্যাম শর্মার এতদিন ফাইল চাপা 'ব্যবস্থা' অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর তারিখে চিফ সেক্রেটারি জি ডাওডেজওয়েল-স্বাক্ষরিত এক নির্দেশিকা জারি করা হল।

দারোগা ও ম্যাজিস্ট্রেটদের বলা হল তাঁরা যেন কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ ঘটনায় সহমরণে মোটের উপর সহনশীলতা প্রদর্শন করেন। এখন গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংস। ১৮১৩ সালের ২৯ এপ্রিল তারিখে স্পষ্ট করে জানানো হল যে সহমরণেচ্ছু বিধবার বয়স কমপক্ষে ১৬ হতেই হবে। এই ধরনের নির্দেশিকার ফল হল বিপরীত। যা ছিল লুকোছাপার ব্যাপার সেই সহমরণ কোম্পানির স্বীকৃতি পেয়ে সদরি হয়ে গেল। সতীদাহের চিতা সংখ্যায় কমার বদলে আরো বেশি জ্বলতে লাগল। সারা ভারতের মধ্যে কলকাতার আশপাশে, বিশেষ করে হুগলি অঞ্চলে সতীদাহের সংখ্যা হল সর্বাধিক। কারণ ছিল অনেক। তার মধ্যে একটি বড় কারণ হল কলকাতার বাবুদের কুচরিত্র। অসহায়া অল্পবয়স্কা বিধবার কলকাতার পতিতালয়ে নব্য ধনী নববাবুদের লাম্পট্য বিলাসের উপকরণ হওয়ার থেকে স্বামীর চিতায় সহমৃতা হওয়ার গৌরব ও সম্মান ছিল অনেক বেশি।

নিজামত আদালতের নির্দেশিকাগুলি পালন করতে গিয়ে বাস্তবে নতুন নতুন সমস্যা জন্ম নিচ্ছে। ১৮১৩ সালের ২০ জুলাই পুর্ণিয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ডি স্কট জানতে চাইলেন সুরযোগী সম্প্রদায়ের নারীদের জীবন্ত সমাধি গমন শাস্ত্রসম্মত কিনা। ১৫ অক্টোবর বুন্দেলখন্ডের ম্যাজিস্ট্রেট বি বি গার্ডিনার এক সমস্যার বিধান চাইলেন। বেপু নামে এক ব্রাহ্মণের বিধবা স্বামী মারা যাবার সতেরো বছর বাদে একটি তলোয়ার সম্বল করে অনুমৃতা হতে চায়—এই ইচ্ছা শাস্ত্রসম্মত কিনা। ২৮ অক্টোবর বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লু বি বেলি জানতে চাইলেন কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা সহমৃতা হতে চাইলে শিশুটির ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে। ১৮১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর দিগম্বরী নামে বারো বছরের এক বিধবা জেদ করে তিন দিন অনাহারে থেকে সহমৃতা হওয়ার অনুমতি আদায় করে নিল ২৪ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট সেজের কাছ থেকে। প্রশাসনিক তদন্তের পর সেজ অত্যন্ত তিরস্কৃত হন কারণ তিনি কোম্পানির নির্দেশিকা মত ১৬ বৎসরকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বছর না ধরে ১৮১২ সালের অস্পষ্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী ১২ বছর-কে সতী হওয়ার ন্যূনতম বছর ধরে ব্যাখ্যা করেন এবং একটি বালিকার প্রাণনাশের পরোক্ষ কারণ হন।

এই জাতীয় নানা রকম বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কোর্ট পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের দেওয়া ব্যবস্থায় ১৮১৭ সালের ২১ মার্চ সই করলেন অ্যাক্টিং ডেপুটি রেজিস্টার ম্যাকনটন। পূর্বের সমস্ত নির্দেশিকা বাতিল করে ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে নির্দেশ জারি করা হল। এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হল যে সহমরণ রূপ আত্মহত্যা ধর্মের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এবং স্মৃতিশাস্ত্রকার মনু বিধবার জন্য ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান দিয়েছেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল নতুন রেগুলেশন। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বাংলার রক্ষণশীল সমাজ। লর্ড হেস্টিংসের কাছে বহু স্বাক্ষর সম্বলিত এক পিটিশন জমা পড়ল। এই পিটিশনের প্রতিবাদ প্রকাশিত হল এশিয়াটিক জার্নালের জুলাই ১৮১৮ সংখ্যায়। প্রতিবাদপত্র রচনায় রামমোহন রায়ের হাত ছিল বলে অনুমান করা যায়। ১৮১৮ সালের শেষের দিকে রামমোহন রায় 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' ও ১৮১৯ সালের শেষ দিকে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাগীশের লেখা 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' পুস্তিকার উত্তরে 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিষেধকের দ্বিতীয় সম্বাদ' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। রামমোহনের দেওয়া যুক্তিসমূহের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অভিমতের প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। সে সময়ে সহগমণের সমর্থকরা সহানুমরণকে বিধবার পক্ষে প্রধান এবং পরম শ্রেয়স্কর পন্থা বলে ঘোষণা করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রচলিত স্মার্তদের মতের থেকেও বেশি করে অবলম্বন করেছেন মনুস্মৃতিকে। তিনি প্রথম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিমত দেন যে সহানুমরণের চেয়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন বেশি শ্রেয়স্কর। এবং বললেন সহানুগমন লোকাচার মাত্র, যার কোন শাস্ত্রীয় অনুমোদন নেই। সহানুগমন এক সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত। শেষে তিনি এক আত্মপ্রত্যয়ী মন্তব্য করেছেন, 'যেহেতু অনুমরণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, এটি কখনই শাস্ত্রের বিধান হতে পারে না। সহস্র শাস্ত্রও কখনও মৃত্যুর বিধান দিতে সমর্থ নয়; কারণ মৃত্যু হল এমন একটি ঘটনা যাকে মনুষ্যজাতির সকলেই ভয় পায়' (As the act of *anoomarana* is purely voluntary – it cannot be an ordinance of the Shasters . A thousand shasters are not capable of inducing death—for that is an event universally dreaded by the human species. p.125; *Hindoo Widows*; &c, 1821)। প্রবল রক্ষণশীলতার মুখে দাঁড়িয়ে এমন বলিষ্ঠ মত যিনি প্রকাশ করতে পারেন তিনি অবশ্যই আজও স্মরণীয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল 'ব্যবস্থা'টি হারিয়ে গেছে। ইংরাজি অনুবাদের সম্পূর্ণটি পাওয়া যায় ১৮২১ সালে প্রকাশিত 'অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড পেপারস' গ্রন্থের 'হিন্দু উইডোজ' নামক অংশে। তবে ১৮১৯ সালের অক্টোবর সংখ্যার মাসিক 'ফ্রেন্ডজ় অব ইন্ডিয়া' সেই অনুবাদের সারাংশ প্রকাশ করে।

রাজা রামমোহন রায়ের ১৮১৮-১৯ সালের বিতর্ক, ১৮২৯ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সাহসী সিদ্ধান্ত এবং ১৮৩২ সালে লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে রাজার শেষ লড়াই সহমরণ প্রথা বিলোপের ইতিহাসে এক একটি সূচক হয়ে আছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অস্ত্র ব্যবহার করে যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রথম লোকাচারের অসারত্ব প্রমাণ করেছেন, তেমনি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মানবিক মুখও দেখাতে পেরেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের (১৮;৮) 'উত্থাপনীয়' নামে বিখ্যাত পরম মানবিক বিধানও পাঠদুষ্টির কারণে বহু মৃত্যুর কারণ হয়। তবে পাঠদুষ্টির বিষয়টি অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা রামমোহন রায় কেউই উল্লেখ করেন নি। পাঠদুষ্টির বিষয়টি ধরা পড়ে অনেক পরে।

১৮১৮ সালের শেষাশেষি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার চার মাসের অবসর নিয়ে তীর্থভ্রমণে বের হলেন। কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করে ফেরার পথে মুর্শিদাবাদের কাছে গঙ্গাতীরে তাঁর সজ্ঞানে মৃত্যু হল। সেযুগের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করলেন 'কলোসাস অব লিটারেচার' বলে। যে বাংলা গদ্যকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কার্যকরী রূপ দিলেন সেই ভাষার পরবর্তী চর্চাকারী মহল তাঁর 'পণ্ডিতী ভাষা'কে উপহাসের খোরাক করে ফেললেন। তাঁর রচনা দুষ্প্রাপ্য নয় এবং তাঁর চলিত ভাষা পাঠ করে মনে হয়েছে যিনি খাঁটি বাংলা চলিত গদ্যের আদল তৈরি করে দিয়ে গেলেন তিনি এই পরিহাস বা অনাদরের যোগ্য নন। দ্বিশত মৃত্যুবর্ষে এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে স্মরণ করলাম শাস্ত্রজ্ঞ সাহসী পণ্ডিত ও বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আঞ্চলিক ইতিহাস সন্ধানী

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মানকর ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ

বি.এড. কলেজ

মোবাইল নং : ৮৩৭১৮৫০৮৫৬

আমরা বিশ্বাস করি যথার্থ শিক্ষক শিক্ষাবিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব।
আমরা ডিগ্রির জন্য পড়াই না, যথার্থ শিক্ষক-শিক্ষিকা গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

বছরে TET-এর চারটি Mock Test হয়।
৭৫% উপস্থিতিতে কোর্স ফি-তে ৩০% ছাড় দেওয়া হয়।

সঙ্গীত এবং খেলাধূলায় পারদর্শীদের ৫ শতাংশ বাড়তি স্কলারশিপ দেওয়া হয়।

Sl. No. 130

জন্মের দ্বিশতবর্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত

রামপ্রণয় গাঙ্গুলী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের একই বছরে আর এক মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত-এর জন্ম। বিদ্যাসাগরের ভাষায়, ‘‘তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কৃত-সংকল্প হইয়া, অবিশ্রান্ত অত্যুৎকট পরিশ্রম দ্বারা শরীরপাত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না। তিনি যে অতিবিষময় শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত্ত শরীরপাত করিয়াছেন, সেই মহোদয়কে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক; না করিলে, ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র সভ্যদিগের কর্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়।”

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন চরম দারিদ্র-পীড়িত ছিল। বিদ্যাসাগরের মাসিক আয় যখন পাঁচশত টাকা, অক্ষয়কুমারের মাসিক আয় তখন মাত্র ষাট টাকা। বিদ্যাসাগর যখন অঢেল টাকার মালিক, অক্ষয়কুমার তখন দুই মহাশত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছেন। একদিকে তাঁর কঠিন ‘শিরোরোগ’, অন্যদিকে দারিদ্র্য। এমন অবস্থায় পড়লে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক দুই-ই বিষাক্ত ও বিকৃত হয়ে পড়ে। লেখক জীবনে অক্ষয়কুমার তাঁর ব্যাধির জন্য দুঃখ করলেও সাংসারিক জীবনে তাঁর সে-দুঃখ ছিল না। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি তাঁর ব্যক্তিত্বের পক্ষে বড় অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। ‘অবিচার’ প্রবন্ধে তিনি সে-কথা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন : ‘‘যে রাজা প্রজাদিকের ধর্ম রক্ষা করিবেন ও তাহাতে অনাদর করিবেন না এমত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকারস্থ বিচারালয়ে এপ্রকার ন্যায়বিরুদ্ধ নিস্পত্তি হইয়া পূর্ব প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হওয়া অত্যন্ত অধর্মজনক তাহার সন্দেহ নাই। রাজপুরুষেরা যেরূপ অসঙ্গত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। অন্য দেশে এ প্রকার ঘটনা হইলে একটা খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা যেমন দুর্দান্ত, ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে তেমনি মৃদুস্বভাব পাইয়াছেন। রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্যসাধন বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্ন, নৈপুণ্য ও বিক্রম প্রকাশের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না, কিন্তু প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সমস্ত বিষয়েই তাহার সম্যক বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে।”

আজকের ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এই উদ্ধৃতিটির মিল-অমিল পাঠক-পাঠিকাদের ধর্মীয় ভেদাভেদবৃদ্ধির জন্য রাজপ্ররোচনা ও পক্ষপাতের প্রেক্ষাপটে সমকালীন রাজপুরুষ, অর্থাৎ পরদেশদখলকারী ব্রিটিশদের সম্পর্কে তিনি কিরূপ তীব্র ঘৃণা পোষণ করতেন এবং নির্ভীকভাবে তা প্রকাশ করতেন তাঁর এই সামান্য রচনাংশটুকুতেই অসামান্যভাবে তা ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গে তাঁর দেশপ্রেম, দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের পক্ষে তাঁর লড়াকু মানসিকতার বিচ্ছুরণ ঘটেছে।

তাঁর সমগ্র রচনাবলী দুঃষ্প্রাপ্য, তাঁর নিজ জন্মস্থানে, চুপি গ্রামে তাঁর নামাঙ্কিত ‘চুপি আকিঞ্চন কুটির ও অক্ষয় গ্রন্থাগার’ (স্থাঃ ১৯২৮) ও ‘পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগারে’ (স্থাঃ ১৯২৩) গিয়েও ১৬ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত তা পাওয়া যায়নি। তবে যে ‘চারুপাঠ’ পড়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিজ্ঞানপাঠে কৌতূহল ও আগ্রহের উদ্রেক হয়, এবং সেই সময়ে বাঙালি সন্তানদের বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজনে যা অক্ষয়কুমার রচনা করেছিলেন, সেটির সামান্য অংশে নীচে দেওয়া হলো—

‘‘গগন মণ্ডলে মধ্যে মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও এক অদ্ভুত জড়ময় বস্তু, অন্তরীক্ষে অতি দ্রুতবেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, যখন আমাদের নিকটবর্তী হয়, তখনই আমরা দেখিতে পাই। এই সমস্ত আশ্চর্য বিষয় অধ্যয়ন করিতে করিতে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইতে থাকে।”

মহাকাশবিজ্ঞানে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকা দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম। অক্ষয়কুমারের ভাবনা সেই সময়ের তুলনায় আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল। তাঁর গ্রন্থ চারুপাঠের অন্তর্গত এই বিষয়গুলি যেমন সিন্ধুঘোটক, সচিত্র আগ্নেয়গিরি, পৃথিবীর পরিমাণ, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম, দীপমণিকা, শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান, পৃথিবীর গতি, পরমাণু তার বড় প্রমাণ।

তিনি পদচারণা করেছেন বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায়, যা এককথায় অভাবনীয়, অত্যাশ্চর্যকর প্রয়াস বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

এদেশে লোকায়ত দর্শনের অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বর্তমান সময়ের মাপকাঠিতে তাঁর স্থান কীরূপ নিরুপণ করেছেন তা জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের গোচরে আনা জরুরি। ‘অক্ষয়কুমার দত্ত : বাংলার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান চেতনা’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—‘‘বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞান-চেতনা বা

বৈজ্ঞানিরক মেজাজের (Scientific Temperament) কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করার আছে। বিজ্ঞানী না হয়েও কেউ কেউ বিজ্ঞানের সপক্ষে দাঁড়াতে পারেন, চালাতে পারেন জোর লড়াই। এদেশে প্রথম যিনি বিজ্ঞান-চেতনার সপক্ষে লড়াই করেছিলেন—কারো চেয়ে কম জোরদারভাবে নয়—তিনি নিজে বিজ্ঞানী ছিলেন না। বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রে তিনি কোনো গৌরবের ভাগীদার নন। কিন্তু বিজ্ঞান চেতনার সমর্থনে তিনি যদি প্রবলভাবে উঠে না দাঁড়াতেন তাহলে ভারতে বিজ্ঞানের জমি তৈরি হতো কিনা সন্দেহ। আরও মনে হয়, কাজটা বেশ সহজও হতো না। এই মানুষটি ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৯৮৬)। বিজ্ঞানে উৎসাহ থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠেছিলেন পাকা নিরীশ্বরবাদী। প্রার্থনা করে যে কোনো ফল হয়না তা প্রমাণ করার জন্যে তিনি এরকটা অদ্ভুত সমীকরণ খাড়া করেছিলেন।

"জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনার কারণে কোনো কৃষাণের কস্মিন্‌কালেও শস্যলাভ হয় নাই।" তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে প্রার্থনার শক্তি যে কিছু নয় তাহা নিম্নলখিতভাবে দেখিয়েছিলেন—

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা = ০

সমকালীন বিত্তবান ও বিদ্যোৎসাহী, সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালীদের অন্যতম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু (পরশুরাম) প্রমুখের এই সমীকরণটির বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষক্ষয়কুমারের মৃত্যুর ছিয়াত্তর বছর পরে 'র‍্যাসনালিস্ট অ্যানুয়াল' (পৃ. ২৭) ১৯৬২ সালে প্রকাশ করেছিল যে মন্তব্যটি তা প্রকাশের অর্ধশতাব্দী পরেও আজকের জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের কাছে সমান পাথেয়—"আমাদের কাছে সমীকরণটি যতই কাঁচা লাগুক, পুরুষানুক্রমে বুনিয়াদি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত আমাদের বিশালসংখ্যক দেশবাসীর চেতনায় তার ছাপ পড়েছিল বলে মনে হয়।" অসিত কুমার ভট্টাচার্যের লেখনীতে—"এই সমীকরণ যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলের মতো, আর অক্ষয়কুমারের পরে যুক্তিবাদীরা এটি কাজে লাগিয়েছিলেন মননগত শ্লোগান হিসেবে।"

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রয়াণের শতবর্ষে পশ্চিমবাংলায় 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ' নামে যে সমন্বিত জনবিজ্ঞান আন্দোলনের জন্ম হয় (২৯.১১.১৯৮৬), সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের 'Ask why & how' (প্রশ্ন করো ক্যানো) শ্লোগান বাস্তবায়ন সেই ধারারই অনুসারী। অক্ষয়কুমারের মতে "ঈশ্বরের মন অনুধাবন করতে হলে পদার্থবিদ্যা ও প্রকৃতিবজ্ঞানের দিকে তাকালেই হবে। সব ধর্মগ্রন্থই 'কাল্পনিক'।" (পৃ. ২৫, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার 'উপক্রমনিকা', কলকাতা, ১৭৩৩ শক)

এর ফলে স্বভাবতই অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের ব্যবধান বেড়েই চললো। দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন : "তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনবার জন্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহাও আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ;—আকাশ পাতাল প্রভেদ!" (আত্মজীবনী, পৃ. ৩৭)। "ফলে ওই পত্রিকার (তত্ত্ববোধিনী) সম্পাদক হিসাবে অক্ষয়কুমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হলেন। তাঁকে খুবই কষ্টে পড়তে হলো। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করলেন সে-যুগের অসাধারণ যুক্তিবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নর্মাল স্কুল তখন সবে তৈরি হয়েছে, অক্ষয়কুমারকে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদটি দিতে চাইলেন। অক্ষয়কুমারের জীবনীকার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছেন, "পীড়া ও অন্য কোনো কারণবশত অক্ষয়কুমার তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্ম সমাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছু হন। ঐ অবস্থায় তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের কথা বলিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিলেন, তাহলে বাঁচি।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অক্ষয়কুমার দত্ত', সাহিত্য-সাধকচরিত মালা, ১২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬ পৃ. ২৩-এ উদ্ধৃত) উল্লেখ্য যে অক্ষয়কুমার সম্পাদনা ত্যাগ করায় তত্ত্ববোধিনীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং অক্ষয়কুমারের লেখা থাকলেও তত্ত্ববোধিনীতে পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় কিছুকাল ভাটা পড়ে। অক্ষয়কুমারের লড়াইটা ঠিল একটা নতুন সত্যানুসন্ধান ও মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই, তা বলে ব্যক্তিগতভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি কখনো আক্রমণ করেননি—বন্ধুর সম্মান তিনি সারাজীবন রক্ষা করেছেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত করার প্রধান হেতু হওয়ায় তিনি যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন সেটা গোপন রাখেননি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর অক্ষয়কুমারের প্রভাব কীরূপ পড়েছিল তা মাত্র তিনটি বাক্যেই প্রণিধানযোগ্য—"আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নতুন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচার-পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা গিয়েছিল।" কবি ললিত কুমার মিত্র ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর উপর তাঁর প্রভাব ও তাঁর অবদান পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁদের রচিত সনেট ও ছন্দবদ্ধ কবিতার মাধ্যমে—বাংলা পরিভাষা রচনাতেও তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্থান অতি উচ্চে। দীর্ঘকাল জীবিত থেকে এই পত্রিকা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে। এই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশ হয়েছিল। যে কারণে এদেশের নবজাগরণের ইতিহাসের অন্যতম অগ্রপথিকরূপে তাঁর অবদান মান্যতা পেয়েছে স্নাতকস্তরে ইতিহাসের সাম্মানিক-পাঠক্রমে তাঁর জীবনী অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। গত নভেম্বর (২০১৮) প্রকাশিত 'ভারতে বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার' শীর্ষক পুস্তকের প্রবন্ধকারগণ অত্যন্ত সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে তাঁর অবদানকেও স্থান দিতে ভোলেননি।

মুক্ত চিন্তার ঐতিহ্য যা তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষে তা আজ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। আজকের দিনে বিশেষ করে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থানের অন্যতম কারণ বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব, যুক্তিবাদের অভাব। এই বাস্তবতায় বিগত দ্বিশতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতিকে মানুষের স্বার্থে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে 'অক্ষয়কুমার দত্ত'-র জীবন দর্শন হোক অন্ধকারের আলো।

ঋণস্বীকার

১. প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক (এন. আই. টি, দুর্গাপুর) ড. মানিক মণ্ডল
২. গ্রন্থাগারিক ও সহকর্মীবৃন্দ (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি)
৩. বিজ্ঞান বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালী সমাজ, মহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদক), বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা
৪. ডা. দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়, চুপি, পূর্ব বর্ধমান

লেখক : বিজ্ঞানকর্মী

বিস্মৃতপ্রায় অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ বিনয় কুমার সরকার

নিশীথ কুমার দত্ত

অনন্য প্রতিভাধর ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী দীর্ঘদেহী বিনয় কুমার সরকার এখন এক বিস্মৃতপ্রায় নাম। ১৯৮৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর তাঁর জন্মশতবর্ষ পার হয়ে গেছে। তাঁর অত্যুজ্জ্বল ছাত্রজীবনেই ইঙ্গিত ছিল যে তিনি ভবিষ্যতে দেশবরেণ্য মানুষ হবেন। ১৯০১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ব্রহ্মদেশের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজী ও ইতিহাসে ডবল অনার্স নিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় কিছুদিন ইডেন হোস্টেলে ছিলেন। পরে হোস্টেল ছেড়ে উঠে আসেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেস বাড়িতে। এই হোস্টেলে বহু ছাত্রই আসতেন যাঁরা পরে ভারত-বিখ্যাত ব্যক্তি হয়েছেন। যেমন রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখার্জী। পরে যাঁরা ভারত বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ হয়েছিলেন এখানেই আসতেন। আসতেন যুবক ক্ষিরোদ প্রসাদ, যিনি পরে বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমী নাট্যকার হয়েছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের দশকে সারা বাংলা জুড়ে বিনয় কুমার ছাত্র সমাজের কাছে প্রেরণার এক উৎস। এই আন্দোলনের সময় বিনয় সরকার জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যুক্ত হলেন। এই বিদ্যালয়ে ক্ষিরোদ প্রসাদও বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। স্বদেশী যুগের বয়কট আন্দোলনের দশকে বিনয়কুমার বাঙালী পোষাকে খালি পায়ে কলকাতার পথে হেঁটেছেন। মেসে থাকাকালীন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা করতে যেতেন। ছাত্রাবস্তায় মেসে থাকতেই ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সতীশ মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য তাঁকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ ছাত্রাবস্থা থেকেই। এলাহাবাদের পানিনি বিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। ১৯০৫ সালেই কলকাতায় থাকতে তিনি লেখেন চারখণ্ডে ‘বাংলার ধনবিজ্ঞান’, ‘সমাজ বিজ্ঞান’ প্রভৃতি বই।

একজন নিরলস গবেষকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তই ছিল বিনয় সরকারের জীবন বৃত্তান্ত ১৯১৪, ৮ এপ্রিল জলজাহাজে যাত্রা লন্ডনের উদ্দেশ্যে। এখানে বেশ কিছুদিন থাকার পর বেশ কয়েকটি শিল্প-সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে পরিচয় হয়। এই সুবাদে একদিন এখানকার বিখ্যাত Tesium Club-এর সাহিত্য সভায় আমন্ত্রণ পেলেন। এখানে এসে দেখা হল সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে। তিনি মূলত হায়দ্রাবাদেরই মানুষ, কিন্তু তাঁর বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুবক বিনয় কুমার সরকারের আলাপ ছিল তিনি যখন কলকাতার Love Lock লেনে থাকতেন। দ্বিতীয়ত,

সরোজিনীর পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশের সানিহাটির পাশের গ্রাম। সানিহাটিতে ছিল বিনয় সরকারের পৈতৃক ভিটে। সরোজিনীর সঙ্গে রাসেল, হয়েটসা, দস্তয়ভস্কি, বার্নার্ড-শ-এর সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ অবশ্য আসে কেননা আগের বছরই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং কলকাতায় থাকার সময় তিনি জোড়াসাঁকের ঠাকুর বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। এইভাবে নানা সাহিত্য আলোচনায় যোগ দেন ও বক্তৃতা দেন। এখানের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই লেখেন—‘ইংরেজের জন্মদিন’। বিলেতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংল্যান্ড এই বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়ে ইংল্যান্ডের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে। বিরাট সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। এই নিয়ে বিনয় কুমার লিখলেন—‘বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র’।

বিলেতে বছর খানেক থাকার পর আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা।

আবার সেই জলপথেই সহযাত্রী পেলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তাঁকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছেন (জগদীশচন্দ্রের জন্ম ১৮৫৮, ৩০ নভেম্বর)। New York-এ থাকাকালীন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পান। New York Time-দৈনিক তাঁর একটি সাক্ষাৎকার তাদের কাগজে প্রকাশ করে। এতে তাঁর পরিচিতি বাড়ে। এখানকার Political Science Quarterly তে তাঁর লেখা প্রকাশিত হল। আমেরিকায় থাকতেই তাঁর বিখ্যাত বই 'Hindu Theory of International Relation' প্রকাশিত হয়। ১৯১৭, ১৪ই মার্চ এলেন Sanfrancisco শহরে। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত আমেরিকায় থাকাকালীন সময়ে বিনয় সরকার সেখানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এখানে থাকতেই Science of Hinduo বই লেখেন, যা নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি কোনো চাকরি করার উদ্দেশ্যে কোথাও যাচ্ছেন না, গবেষণা ভাতা কিংবা বক্তৃতা থেকে লব্ধ আয় থেকে একার সংসার চালাচ্ছেন। জীবনে বেশির ভাগ সময়ই চাকরির বেড়াজালে আটকে যাননি।

New York, Sanf rancisco, Oston প্রভৃতি শহরে অধ্যাপনা ও গবেষণার পর এলেন ফ্রান্সের প্যারিস শহরে। এখানে থাকতে থাকতে লিখেছেন Foreign Policy of Young India। কিস্তিতে কিস্তিতে এই লেখা পাঠিয়ে দিতেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের Modern Review পত্রিকায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থা থেকেও বিশেষ বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পেতেন।

১৯২১ সালে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র যখন এখানে আসেন, তাঁর আবিষ্কারের বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আসেন। তখনও বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এর আগে কোনো ভারতীয় এত সংবর্ধনা পাননি। ফ্রান্সের গ্রোনাব (Gronab) শহরে এসে কিছুদিন থাকলেন। গ্রোনাব ফ্রান্সের এক বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে ছিল নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র। গ্রোনাব-এর পর এসে থাকলেন তুকোঁয়া শহরে। এইসব শহরে থাকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত কলকাতায় তাঁরই সম্পাদিত 'বর্তমান জগৎ' পত্রিকায় লিখে পাঠাতেন। এইসব পত্রিকা এখন দুষ্প্রাপ্য।

ফ্রান্সের পর্ব শেষ করে কিছুদিন থাকলেন মিশরে। এখানকার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন লিখলেন—'কবরের দেশে'।

১৯২২-এ মিশর থেকে জার্মানির বার্লিন শহরে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে কয়েকটি বক্তৃতাতে আমন্ত্রণ জানায়। বার্লিনের সরকারি আর্ট গ্যালারিতে ভারতীয় শিল্পকলার এক প্রদর্শনী হয়। কলকাতার Indian Society for Oriental Art থেকে বহু শিল্পসামগ্রী পাঠানো হয়েছিল এ প্রদর্শনীর জন্য। বিনয়বাবুকে ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে এক বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তার সেই বক্তৃতা সেখানকার দৈনিকে প্রকাশিত হয় (৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৩)।

জার্মানিতে থাকাকালীন বেশিরভাগ বক্তৃতা তিনি জার্মান ভাষাতেই দিতেন। কারণ জার্মান ভাষা ভালোই জানতেন। দৈনিক সংবাদপত্রে এইসব বক্তৃতার অংশবিশেষ প্রকাশিত হত। এতে তাঁর পরিচিতির প্রসার ঘটত। অস্ট্রিয়ায় বসবাস করার সময় বিদুষী সুন্দরী কন্যা 'ইদা স্টিলার' -এর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। হিন্দু মতেই তিনি বিবাহ করেছিলেন। কিছুদিন পর তাঁদের একটি কন্যাসন্তান হয়, বাঙালি মতে তার নাম রাখেন 'ইন্দিরা'।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতাসমূহ শহরের Imperial Libray-তে সংরক্ষিত করা হয়।

জার্মান ভ্রমণ শেষে এলেন সুইজারল্যান্ডের অতি মনোরম উপত্যকা শহর লুগানো (Lugano) তে। Lugano হ্রদের তীরে এটি এক পর্যটনকেন্দ্র। এই শহরে মানুষজন ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করেন। পরে ইটালিয়ান ভাষাতেই বক্তৃতা দিয়েছেন। লুগানো বহু প্রাচীন শহর। প্রথম শতাব্দীতে এই অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, তাই রোমান সভ্যতার বহু নিদর্শন আছে এই শহরে।

(১৯২৪-২৫) লুগানো শহরে থাকাকালীন ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে হঠাৎ তার পেলেন যে তার প্রতিষ্ঠিত Forward পত্রিকার বিদেশি সংবাদদাতা (Foreign coraespouduct)-এর দায়িত্ব নিতে হবে। সাংবাদিকতা তার সহজাত প্রবৃত্তি। বিদেশে থাকতেই বিনয় কুমার নিজের প্রতিষ্ঠিত 'বর্তমান জগত' পত্রিকা (কলকাতা থেকে প্রকাশিত) তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও বক্তৃতার অংশ বিশেষ লিখে পাঠাতেন। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ মতো তিনি বেশ কিছুদিন Forward পত্রিকায় বিদেশি সংবাদদাতার ভূমিকা পালন করেন। সুইজারল্যান্ডের নানা জায়গা ঘুরে তিনি এলেন জাপানের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনুলুলু তে জাহাজে এলেন টোকিও শহরে। এখানে এসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তন নিয়ে বই লেখেন। টোকিও শহরে বসেই ভারতীয় সাহিত্যে 'প্রেম' নিয়ে বই লিখলেন—'Love in Hindu Ltirature'। এই বই-এর খুব চাহিদা হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের সময় যুদ্ধ পরবর্তী জাপানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্যে আবার জাপানে এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। তখন দেখেন জাপান কিভাবে ধীরে ধীরে সব সামলে নিয়ে নতুন উদ্যমে দেশ গড়ার কাজে লেগেছে। জাপান বিষয়ে নানা লেখা টোকিও থেকে কলকাতার প্রবাসী, উপাশনী, 'গৃহস্থ' পত্রিকায় লিখে পাঠাতেন। বিনয় সরকারের বহু লেখাই আজ পর্যন্ত সংকলিত হয়নি।

টোকিও শহরেই আলাপ হয়েছিল ড. তারকনাথ দাসের সঙ্গে যিনি ভারতে বিপ্লবীদের বোমা তৈরিতে নানা কলাকৌশল জোগাড় করে দিতেন। জাপান বিষয়ে বিনয় কুমারের ছিল বিশেষ আকর্ষণ, কারণ জাপান তখনও ভারতের মতো মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। জাপানের অর্থনীতি ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বই লিখেছেন—"নবীন এশিয়ার জন্মদাতা জাপান।"

চিন দেশে প্রায় দেড় বছর থেকে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তাদের সমাজ সংস্কৃতি, সাহিত্য ও প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে কয়েকটি বই লিখেছিলেন যা পড়ে ভারতীয় যুবককেরা চিন দেশ সম্বন্ধে জানতা পারে।

জার্মানিতে থাকাকালীন বেশিরভাগ বক্তৃতা তিনি জার্মান ভাষাতেই দিতেন। কারণ জার্মান ভাষা ভালোই জানতেন। দৈনিক সংবাদপত্রে এইসব বক্তৃতার অংশবিশেষ প্রকাশিত হত। এতে তাঁর পরিচিতির প্রসার ঘটত। অস্ট্রিয়ায় বসবাস করার সময় বিদুষী সুন্দরী কন্যা 'ইদা স্টিলার' -এর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। হিন্দু মতেই তিনি বিবাহ করেছিলেন। কিছুদিন পর তাঁদের একটি কন্যাসন্তান হয়, বাঙালি মতে তার নাম রাখেন 'ইন্দিরা'।

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, চিন ভ্রমণ শেষে এসেছিলেন ইটালির বোলৎসান শহরে, এটি পার্বত্য উপত্যকা ঘেরা এক বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। ইটালিয়ান ভাষা জানায় এখানে কোনো অসুবিধেই হয়নি। মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইটালিয়ান ভাষাতেই কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মিলানে থাকাকালীন তিনি লিখেছিলেন—'Politics of Boundaries'।

প্রায় বারো বছর বিদেশ বাসের পর স্ত্রী কন্যা সহ ভারতে ফেরা। যাত্রা করেছিল সেই ১৯১৪ এপ্রিলে। আর ভারতে বোম্বাই বন্দরে নামতেই তার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা তাজ হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে। বোম্বাই শহরে আসতেই Indian Daily News-এর সাক্ষাৎকার নেয় এবং পরের দিনই তা ঐ সবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরলে Bengal Technical Institute তাঁর বিপুল সংবর্ধনা করে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় যুবক অবস্থায় তিনি যতীশ মুখার্জীর সঙ্গে যে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন যাদবপুরে সেই প্রতিষ্ঠানেই গড়ে উঠেছে Bengal Technical Institute। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কৃতী প্রাক্তনীকে সংবর্ধনার বিপুল আয়োজন করে এবং এখানে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। পরে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। এখানে অধ্যাপনাকালেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর Modern Review পত্রিকার জন্যে লিখেছিলেন Economic Planning for New India। ১৯২৬-২৭ এপ্রিল কলকাতায় ফিরে 'আর্থিক উন্নতি' নামে অর্থনীতি বিষয়ক এক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকলেন। এই পত্রিকা সম্পাদন ছাড়া অধ্যাপনার কাজেও লিপ্ত হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও যাদবপুরের Enginering College-এ অর্থনীতি বিভাগে অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে।

কলকাতায় এসে এক নতুন ধরনের শ্রমিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। সেই সময় ভারতে শিল্প কয়লা, পাট, রেল তুলো, বস্ত্র দেশের এই প্রধান পাঁচটি শিল্পে লক্ষ-লক্ষ নারী পুরুষ কর্মরত ছিল কিন্তু তাদের অবর্ণনীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা প্রকৃতভাবে তুলে ধরার বিশেষ কোনো পত্রিকা ছিল না। তিনি এইসব শ্রমিকবস্তি পর্যবেক্ষণ করে মোট বিবরণ প্রকাশ করতেন তার সম্পাদিত শ্রমিক পত্রিকায়। সেই সময় ইংরেজরা রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণ করছে, তাতে সারা ভারতে শহরে ও গ্রামে বিপুল আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে, সেই পরিবর্তনের ভালো-মন্দর দিকও প্রকাশিত হত তাঁর এই পত্রিকায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Howard বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রণ পেয়ে। ১৯৪৯ সালে অক্টোবর মাসে যাত্রা করলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি"। বক্তৃতা দিতে দিতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাত্র কয়েকদিন রোগভোগের পর ২৫ নভেম্বর ১৯৪৯-এ মাত্র ৬২ বছর বয়সে তাঁর অকাল প্রয়াণ হয়। কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সহ বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করে।

বই আর পুস্তিকা মিলিয়ে বিনয় সরকারের মোট রচনার সংখ্যা প্রায় শতাধিক। এসব ইংরেজি, জার্মান, ইটালিয়ান, বাংলা ও হিন্দি ভাষাতে রচনা। তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকতা বিদেশে বহু পণ্ডিতকে বিস্মিত করেছিল। আমেরিকাবাসীকে জানিয়েছেন প্রাচীন ভারতীয়দের বিজ্ঞানচর্চার কথা। বইও লিখেছিলেন—Hindu Achievement in Exact Science। চীনে থাকতে লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি বই। ১৯০৫ সালে কলকাতায় থাকাকালে লেখেন—'বাঙলায় ধনবিজ্ঞান', 'সমাজবিজ্ঞান' প্রভৃতি বই।

বাংলায় 'নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন'—মোট ৮০০ পৃষ্ঠার বই এক বিস্ময়কর জ্ঞানভাণ্ডার। ঠিক তেমনি চিত্তাকর্ষক বই 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' সাক্ষাৎকার ভিত্তিক। ঐতিহাসিক হরিদাস মুখোপাধ্যায় তা সংকলন করেছেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বই।

বাংলা জীবনচর্যায় মুসলমান সংস্কৃতির প্রচার নিয়ে তিনি অনেক লেখালিখি করেছেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের আগে খোলাখুলিই লিখেছেন যে মুসলমান শব্দটা হিন্দুর মুখে কিছুটা অবাঙালী বোঝাত। কিন্তু বাংলার সমাজ সংস্কারে তারা নিবিড় ভাবেই জড়িত। মুসলমানের অবদান বিষয়ে অনেক লেখালেখি ও বক্তৃতা দিয়েছেন। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই উক্তি ছিল বঙ্গভঙ্গের—"তখনকার দিনে বাঙালী বলিলে, বুঝিতাম একমাত্র হিন্দুকে। মুসলমান শব্দটা অন্তত বাঙালী হিন্দুর মুখে যেন ভাগই বুঝাইত।" কিন্তু ১৯৩২ সালে লিখলেন—"কিন্তু মুসলমানরাও যেন বাঙালী, তাহা আজকাল যখন-তখন, যেখানে-সেখানে বিনা গবেষণায়, বিনা গবেষণায় সকলেই বুঝিতে পারতেছি।

বিনয় সরকারের বাংলা গদ্য ছিল সাবলীল ও চলিত গ্রাম্য কথার মিশ্রণ। কলকাতায় ফিরে এসে এঙ্গেলস-এর সমাজবিজ্ঞানের বই-এর মূল জার্মান থেকে বাংলায় অনুবাদ করে লিখেছেন—'পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র'।

Bengal National Chamber of Commerce-এর মুখপত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন দীর্ঘ পাঁচ বছর। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বহু অধ্যয়ন ছিল, তাই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদও প্রথম সংখ্যার জন্যে তাঁকে লিখতে অনুরোধ করলে তিনি লিখেছিলেন—'রামেন্দ্রর পথ, না জগদীশ প্রফুল্ল-র পথ'। কলকাতায় থাকাকালীন Indian Commercial Statistical Review পত্রিকা সম্পাদন করেন।

বিনয় সরকার ইংরাজি Economics-এর তর্জমা 'অর্থনীতি' করেননি। তিনি অর্থনীতি শাস্ত্রকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার সঙ্গে একসাথে বসিয়ে নাম দিয়েছিলেন 'ধনবিজ্ঞান'। অর্থাৎ কিছু বই পড়ে ও তথ্য সংগ্রহ করে অর্থনীতি বিদ্যা হয়ে যাবে অচল পয়সা। সংগৃহীত তথ্যকে অঙ্ক ও রাশিবিজ্ঞানে বিশ্লেষণ না করলে তার বিচিত্র গতিপথ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আজ থেকে ১০০ বছর আগে এরকম ধারণা করা সহজ ছিল না। ২০০৫ সালে ২০ অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রেসিডেন্সি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল কুমার মুখোপাধ্যায়-এর লেখা প্রবন্ধ-এর অংশ বিশেষ : "ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান তখনও পশ্চিমের সাবেকি ধ্যানধারণায় বন্দি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে মার্কসীয় সাহিত্যের প্রবেশ নিষেধ। এই নিশ্চলতার অবসান ঘটাতে সর্বপ্রথম সচেষ্ট হন অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার। কিন্তু ১৯৪৯-এর নভেম্বরে তাঁর জীবনাবসান হয়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় কলকাতার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত From Raj to Swarj। প্রবন্ধটি ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক পথিকৃৎ, আমরা যথারীতি মনে রাখিনি।"

পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের লক্ষ্য

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে সামিল করে স্বচ্ছ ও সততার সঙ্গে সমাজের সর্বক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের অবিরাম প্রয়াস আজ সাফল্যের চূড়ার দিকে ধাবমান। আর সেই উন্নয়নের আলোকপথে সকলের সহযোগিতা পাব - এই আশা রাখি।

উন্নয়ন

একনজরে কয়েকটি সরকারি প্রকল্প

- আনন্দধারা
- আমার ফসল আমার গোলা
- আমার ফসল আমার গাড়ি
- আমার ফসল আমার চাতাল
- আলোশ্রী
- উৎকর্ষ বাংলা
- কন্যাশ্রী
- খাদ্যসাথী
- খেলাশ্রী
- গতিধারা
- গীতাঞ্জলি
- যুবশ্রী
- রূপশ্রী
- লোকপ্রসার
- শিক্ষাশ্রী
- শিশুসাথী
- সবলা
- সবুজশ্রী
- সবুজসাথী
- সমর্থন
- সমব্যথী
- সমাজসাথী
- সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
- জল ধরো জল ভরো
- নিজ গৃহ নিজ ভূমি
- পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প
- বাংলার বাড়ি
- মানবিক
- মুক্তির আলো
- মুক্তিধারা
- ঐক্যশ্রী
- কৃষকবন্ধু
- সুফল বাংলা
- সেচবন্ধু

পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার রূপকার মহত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধ শতবার্ষিকীতে পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের শ্রদ্ধাঞ্জলী

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে কয়েকটি উন্নয়নের ধারা

- মহত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প
- বাংলার আবাস যোজনা
- মিশন নির্মল বাংলা
- জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচী
- সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা
- এম এস ডি পি প্রকল্প
- আই এম ডি পি প্রকল্প

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প

Sl. No. 129

■ গল্প

শ্রীকালীগতি ভট্‌চায ও বনভ্রমণ

তরুণ মজুমদার

উত্তর বাংলায় লোকেশন দেখতে বেরিয়েছিল হিরণ। হঠাৎ কলকাতা থেকে তার ড্রাইভার পরেশের ফোন।

— 'স্যার, একটু কথা বলা যাবে স্যার?'

গরুমারা ছেড়ে চাপড়ামারির দিকে ছুটছে হিরণের ফোর-হুইলার। গুরুং ছেলেটার হাত ভালো। হিরণ ফোনে জবাব দেয়, 'কী ব্যাপার? তাড়াতাড়ি সারো। টাওয়ার গড়বড় করছে খুব।'

—'সেই লোকটা আবার এসেছিল স্যার। আজ সকালে।'

—'সেই লোক? কে? কার কথা বলছ?'

—'সেই যে সেই, একবার এসেছিল না? কালো কোট, রোগা-পাতলা, বোড়াল পেরিয়ে কোথায় যেন থাকে—'

বাকিটা শোনা হয় না। টাওয়ার গেছে।

বোড়াল পেরিয়ে থাকে? কালো কোট? হিরণের ঝট্ করে মনে পড়ে যায়। কালীগতি ভট্‌চায নন তো?

জীবনে যতরকম বিচিত্র চরিত্র দেখেছে হিরণ, কালীগতিবাবু তাদেরই একজন। বিচিত্র, আর বিশিষ্টও। প্রথম আলাপ হয়েছিল একটা ছবির অভিনয়সূত্রে। প্রোডাকশন ম্যানেজার নিখিলবাবু ওঁকে নিয়ে এসেছিলেন হিরণদের সানি পার্কের ফ্ল্যাটে। প্যাদাটিপানা হাড় জিরজিরে চেহারা, তোবড়ানো গাল, বয়সও সত্তরের কম নয়। সঙ্গে ওঁরই একজন সাকরেদ, তিনিও ষাটোর্ধ, নগা না নগেন কী যেন নাম, কালীগতিবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার সেকরেটারি'। একই গ্রামের বাসিন্দা। কালীগতিবাবুর প্রত্যেকটি কথায় নীরবে সায় দেওয়া ছাড়া বলতে গেলে আর কোনও ভূমিকাই নেই তাঁর।

ড্রইংরুমে ঢুকে ওঁর ধূলিধূসর ক্যাম্বিসের জুতোজোড়া একপাশে রেখে সোজা পা তুলে সোফায় বসে যান। নগেনকেও ডেকে নেন পাশে। দিনটা রবিবার। অহনার কিটি পার্টিতে যাবার দিন। সাজগোজ করে বেরিয়েই সামনের চরিত্রদুটিকে দেখে গুম হয়ে যায় সে। ওর সদ্য-কেনা সোফার ওপর খাটো ধুতি আর ছাতার মতো বিবর্ণ কালো রংয়ের কোট পরা লোকটি পা তুলে বসে আছে! হু দি হেল্ ইজ হি? সঙ্গে আবার সাদা ঝুপো গোঁফওয়ালা আরেক মূর্তি!

আজকাল অহনা আর সামনাসামনি ঝগড়া করে না। লাভ ম্যারেজ তাদের, কিন্তু সেই রংয়ের জেল্লা বেশিদিন টেঁকেনি। তবু এক ছাদের তলায় কেন আছে তারা এর উত্তর জানা নেই। এমনও হতে পারে যে দুজনের কেউই 'গসিপে' জড়াতে চায় না। হিরণ ফিল্ম ডিরেক্টর, অহনা ফ্যাশন ডিজাইনার। চারপাশেই অগুনতি 'গসিপ'-এর মাল-মশলা প্রত্যক্ষ করার পর নিজেদের আর ওতে জড়াবার প্রবৃত্তি নেই। তাছাড়া আরো একটা কথা মানতেই হবে, অহনা মুডি, অহনা বদমেজাজি, একটু উন্নাসিকও হয়তো, কিন্তু কাউকে ওর চরিত্রের দিকে আঙুল তোলার সুযোগ দেয় না।

হঠাৎ আবার মোবাইলটা বেজে উঠল।

—'কে? পরেশ নাকি?'

—'হ্যা স্যার। হঠাৎ তখন লাইনটা কেটে গেল।'

—'আবার কাটতে পারে। কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো।'

—'সকালে হঠাৎ এসে হাজির। সঙ্গে আরো একজন। বিশাল একটা বস্তা সঙ্গে নিয়ে।'

—'বস্তা? কীসের?

—'কাঁঠাল।'

—'কী?'

—'কাঁঠাল স্যার। আপনার জন্যে। গেট্-য়ে সিকিউরিটি আটকেছে। তাতেই খাপ্পা বেজায়। তক্কাতক্কি, কথা কাটাকাটি, তারপর 'ধুত্তোর!' বলে ওটা ফেলে চলে গেছে। সঙ্গে একটা চিঠি। আপনার নামে। এখন কাঁঠালের বস্তাটা নিয়ে—

আবার কেটে যায় লাইন। ফোর-হুইলার এখন ঘুনিয়া বস্তির কাছাকাছি। অনেকগুলো 'এলিফ্যান্ট করিডর' পর পর। একটু সাবধানে পেরোতে হবে।

'ধুত্তোর' বলে চলে গেলেন ভদ্রালোক? হিরণ জানে ওদিকের ব্যাপারটা, নইলে আর কেউ ওঁকে চট করে ভদ্দরলোক বলে মানবে না। খেঁকুরে গলা, দুর্মুখ গোছের—ক'টা লোকই বা খবর রাখে যে উনি ওঁর গাঁয়ের ইসকুলটার রিটায়ার্ড হেড-স্যার। স্ত্রী গত, দুই ছেলে বিয়ে করে অন্য শহরে, বউমারাও এদিকে ঘেঁষবার পক্ষপাতী নন, কিন্তু একা মানুষটার ওদিকে থোড়াই কেয়ার। স্বপাকে খান, তার ওপর আবার একাহারী। কাজের মধ্যে দুটি। গাঁয়ের রাস্তা-ঘাট, ইসকুলবাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপ—কোথায় কোনটা ভাঙলো, কোথায় বিচালি খসে পড়ল—এসব নিয়ে খবরদারি আর সন্ধে হলেই বারোয়ারি আটচালায় লোক জড়ো করে নিজের লেখা পালার মহলা দেওয়া। পালা আসরে নামে দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমীতে, কিন্তু মহলা চলে বছরভর।

বাইরে থেকে দেখে মনে হবে মানুষটার ধন-সম্পদ বলতে কিছুই নেই, শুধু পেনশনের টাকাটা ছাড়া। আর সামান্য কিছু ধানি জমি। কিন্তু না, আরো একটা জিনিস আছে, বিরাট সম্পদ, যা এ-ধরনের গাঁয়ে এ-ধরনের বাড়িতে ভাবাই যায় না। অজস্র বই। নাটক-নভেল নয়। 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে শুরু করে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অবধি। ইংরিজি-বাংলা মিলিয়ে ডিকশনারি প্রায় ডজন-দেড়েক। আর কৌতূহলেরও সীমা নেই লোকটার। বোটানির 'মনোকটিলিডন্' 'ডাইকটিলিডন্' থেকে শুরু করে থরে থরে বিজ্ঞানের বই। একবার শুটিং করতে এসে স্বয়ং সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত অবাক। সেই থেকে কালীগতি ফিল্মের নানা বিষয়ের ওপর বইও নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছেন।

আবার রিং টোন বেজে ওঠে, 'এসো শ্যামল সুন্দর'।

—'বলো।'

—'কাঁঠালের বস্তাটা নিয়ে কী করব স্যার?'

—'লিফ্‌টে করে ওপরে ওঠাও। আমার স্টাডিরুমের এক কোণে রেখে দাও।'

—'ম্যাডাম যদি বকাবকি করেন?'

—'বলবে যে, ওগুলো আমার স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনানো।'

—'আচ্ছা।'

—'আর হ্যাঁ, চিঠি না কী দিয়ে গেছেন বললে। ওটা আমার টেবিলের ওপরে।'

—'ঠিক আছে স্যার।'

এবার হিরণ নিজেই লাইনটা কাটে।

দুদিন পরে কলকাতায় ফিরে হিরণ চিঠিটা খোলে।

মান্যবরেষু,

আশঙ্কা ছিল আপনার প্রহরীরা কিছুতেই আমাকে উপরে উঠিতে দিবে না। তাই কাঁঠালের বস্তা রাখিয়া গেলাম। অনুরোধ, আপনি নিজে খাইবেন ও আপনার অর্ধাঙ্গিনীকেও খাওয়াইবেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এ কাঁঠাল কোথা হইতে এবং কেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, আমার বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বহুপ্রসবিনী কাঁঠালগাছ আছে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইতিপূর্বে আপনার আমন্ত্রণে আপনার আলয়ে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, বেশ কয়েক বৎসর বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আপনারা নিঃসন্তান। দুঃখিত হইয়াছিলাম। অতঃপর বাড়ি ফিরিয়া বহু বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া জানিতে পারি যে, কাঁঠাল নাকি অপুত্রক জননীর সন্তানলাভে অত্যন্ত সহায়ক। কোনও কোনও আর্যঋষি এই মত পোষণ করেন। অতএব।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে এত কাঁঠাল কেন? একটি বা দুইটিতেই তো অনায়াসে কার্যসিদ্ধি হইতে পারে। স্বীকার করি, পারে। তাই বলি যে, সব কাঁঠাল আপনার বা আপনার অর্ধাঙ্গিনীর জন্য নহে।

ইতিপূর্বে সামান্য কিছু পঠন-পাঠনের অভ্যাস ছিল। কিন্তু আপনার সঙ্গে, বিশেষ করিয়া মহামতি সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের সহিত আলাপ হইবার পর, নতুন একটি জ্ঞানোদয় হইয়াছে। চলচ্চিত্র একটি মহান শিল্প, ধারালো তরবারির মতো। সঠিক ব্যাবহার করিতে জানিলে শত্রুর নাক কাটে। ভুল ব্যবহারে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। অক্ষম হাতের তরবারি নিজের নাসিকাকেও স্থানচ্যুত করিয়া দিতে পারে!

তাই এই ক্ষেত্রের মহান কারিগর যাঁহারা তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যেই আমার এই বিনম্র উপহার। বড় বড় দুইটি কাঁঠাল সত্যজিৎ বাবুর ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। তপন সিংহ মহাশয় কি কাঁঠাল খান? রাজেন তরফদার? মৃণাল সেন? অজয় কর? ঋত্বিক ঘটক মহাশয়কে পৌঁছাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বড় বেশি ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে।

আপনার নতুন ছবিতে আমি আছি তো? পাহাড় আর জঙ্গল কোনওটাই আমার দেখা হয় নাই। আমাদের গ্রামেও বিস্তর জংলা জায়গা আছে বটে। একমাত্র শিয়াল ছাড়া সেখানে আর কোনও জন্তুর অস্তিত্ব নাই।

লজ্জাহীনের মতো আপনার কাছে কাজ চাহিয়া বসিলাম। ভাবিবেন না, আত্মপ্রচার অথবা অর্থোপার্জনের জন্য। ওসব কিছু আমার চাই না। চাই শুধু একটি সুযোগ। কিছুদিন যাবৎ আপনাদের সহৃদয়তার ফলে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত কিছু বহি ও সাময়িক পত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। বিষয়টির তাত্ত্বিক দিকগুলি, কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্তু আলোকচিত্র সম্পর্কে আর্থার কক্স অথবা চিত্র-সম্পাদনা সম্পর্কে ক্যারেল রিজ যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, কার্যক্ষেত্রে হাতে-কলমে তাহা ব্যবহার করিবার কৌশল কী, তাহা আমাকে জানিতেই হইবে। নচেৎ ঘরে বসিয়া বইয়ের পাতা উল্টানো আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

'ফোকাল সিরিজি'-এর আরও কিছু বই সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। আমার সেক্রেটারি শ্রীমান নগেনকে লইয়া কলকাতার চৌরঙ্গি পাড়ার ওখানে-ওখানে টুঁ মারি। আর্থিক সাধ্যে কুলায় না। তাই দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া বইয়ের পাতা উলটাইয়া দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার চেষ্টা করি।

এক-এক সময় মনে হয়, জীবন সম্পর্কে যতই গর্ব করি, জীবনটা বোধহয় বৃথাই গেল। প্রাচীন শাস্ত্র, চিরায়ত শিল্প

ইত্যাদির চর্চা করিতে করিতে দেখি জ্ঞানের দিগন্ত ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে। কতটুকুই বা জানিলাম, অবশিষ্ট জীবৎকালেও কতোটুকুই বা জানিতে পারিব?' তারাশঙ্কর মিথ্যা লিখেন নাই, 'জীবন এত ছোট কেনে, হায়!'

তাই আবার বলি, আগামী ছবিতে আমি আছি তো? পারিশ্রমিক চাই না, একটু সুযোগ চাই। শ্রীমান নগেনও আমার সঙ্গে যাইবে। তাহার দরুন খরচাদি আমিই বহন করিব।

আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

ইতি
নির্লজ্জ—
কালীগতি ভট্টাচার্য

ঠিক আটত্রিশ দিন পরের কথা। হিরণরা আবার উত্তরবাংলায়। দলে লোক প্রায় ষাট জন—কালীগতিবাবু আর নগেনবাবুকে নিয়ে। দিনের বেলায় জঙ্গলে জঙ্গলে শুটিং, রাতে বিশ্রাম—নানা জায়গার ফরেস্ট লজ্-এ। আসলে এটা বনদপ্তরেরই ছবি। নামজাদা শিল্পী নেই তেমন, শুধু কিছু ছোটখাটো চরিত্রাভিনেতা আসা-যাওয়া করবেন কলকাতা থেকে। বন-দপ্তরের ছবি মানে জঙ্গলের হরেকরকম সমস্যা। চোরাশিকারী থেকে গাছের চোরা কারবারি পর্যন্ত সমস্ত উৎপাতের মোকাবিলা। সঙ্গে আছে ওয়াইল্ড লাইফ সামলাবার সমস্যা।

ইউনিট ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ এখানে ক্যাম্প তো কাল ওখানে। শুরু হয়েছিল সুকনা থেকে। মহানন্দা রিজার্ভ ফরেস্ট হয়ে গুলমা স্টেশনের পাশ কাটিয়ে আপাতত মংপং বাংলোয়। হিরণের ঘর বরাবরই আলাদা কিন্তু আর সকলের বেলায় অনেকটা ডরমিটারি গোছের ব্যবস্থা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আয়োজন নিখুঁত। কারো কিছু বলবার নেই। উঁচু মাপের কিছু অফিসার বরাবর সঙ্গ দিচ্ছেন। মুখ্য বনপাল অর্থাৎ চিপ কনজারভেটার মিস্টার লাহিড়ি খুব আলাপী মানুষ। সবার সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলেন। পদমর্যাদা বোঝাবার কোনও ঝোঁকই নেই।

মংপং বাংলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সন্ধে থেকে ওখানে একটা অদ্ভুত হাওয়া বইতে শুরু করে। উথাল পাথাল হাওয়ায় সব কিছু বিপর্যস্ত করে দেয়। সামনের লন থেকে চোখে পড়ে গজলডোবার তিস্তা। এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় হঠাৎ সামনের দিকে আঙুল তুলে মিস্টার লাহিড়ি হিরণকে বলে ওঠেন, 'ওই দেখুন, কতো বড় হাতির হার্ড।'

সত্যিই তাই। তিস্তা অবশ্য খুব কাছে নয়। তবে সামনেটা বাধাবন্ধহীন বলে এই জ্যোৎস্নাতেও অনেকটা ঠাহর করা যায়। ওপারের জঙ্গল থেকে কালো স্রোতের মতো কী যেন নেমে আসছে জলে। সঙ্গে সঙ্গে চলকে-ওঠা জলের ঢেউগুলো যেন একটু বেশি বেশিই ঝলসে উঠছে।

— 'আ রেয়ার সাইট! এতগুলো হাতি একসঙ্গে? দাঁড়ান, বাইনোকুলারটা আনাই।' বলে উনি উঠতে যাবেন হঠাৎ পিছন থেকে একটা গলা, 'টোট্যাল ওয়ান হান্ডরেড্ অ্যান্ড টুয়েলভ্ স্যার। একশো বারোটা...'

আশেপাশে কেউ ছিল না, হঠাৎ এ কার আওয়াজ?

অবাক হিরণ পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কালীগতি ভট্টাচার্য মশাই। পাশেই ওঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ— 'সেকরেটারি' নগেন।

—'এ কী! আপনারা?'

—'আর বলেন কেন? এমন হাওয়ায় ঘরে বসে থাকা যায়? কোত্থেকে হাওয়ার ফ্লো-টা আসছে জানতে হবে না?' কালীগতি স্বভাবসিদ্ধ অদম্য কৌতূহল প্রকাশ করে বলেন, 'তাই নগাকে নিয়ে ওদিকটা ঘুরতে বেরিয়েছিলুম। হাওয়াটা আসছে সিকিমের দিক থেকে, তিস্তার খাত বেয়ে। কারোনেশন ব্রিজের কাছে একটা চট্টানে ধাক্কা খেয়ে বাইফারকেট্ করে গেছে। ফেরবার পথে দেখি ফোরগ্রাউন্ডে আপনারা দুজন বসে, আর লং শটে হাতির পাল। ওই দেখুন দেখুন, কী কাণ্ডটা করছে!'

মিস্টার লাহিড়ি যৎপরোনাস্তি অবাক। বলে ওঠেন, 'মাই গড্! আপনি এর মধ্যেই গুণে ফেলেছেন?'

হেঁ হেঁ করে একটু হেসে অপরপক্ষ জবাব দেন, 'আমার কোনও ক্রেডিট নেই। 'সিনেরারিয়া মারিটিমা'।

—'অ্যাঁ!'

—'গ্লিসারল টেন গ্র্যামস, মিখাইল আর প্রপাইল প্যারোটেবনে মিশিয়ে একরকম হোমেপ্যাথি ওষুধ। ডেইলি টু ড্রপ্স্ টু টাইমস্। চালশের যম।'

—'স্ট্রেঞ্জ! আপনি কি এসবেরও চর্চা করেন নাখি?'

—'একটু-আধটু। সেই চরক-সুশ্রুত-র টাইম থেকে মেডিক্যাল সায়েন্স কোন পথে এগোলো, জেনে রাখতে ক্ষেতি কী?' বলেই আবার সামনের দিকে চেয়ে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন কালীগতি, 'ওই দেখুন, চেয়ে দেখুন, কী কাণ্ড করছে এলিফ্যান্টাস ম্যাক্সিমাসগুলো!'

এবার শুধু হিরণ নয়, মিস্টার লাহিড়িও হাঁ হয়ে যান।

—'এসব টেকনিক্যাল টার্মস আপনি জানেন?'

—'ওই যে বললুম, একটু-আধটু। জ্যাক অফ অল ট্রেড্স্, মাস্টার অফ নান। কথায় বলে না অল্পবিদ্যে ভয়ঙ্করী, সেই টাইপ আর কি।'

মিস্টার লাহিড়ির কী হয়ে যায় কে জানে। —'আপনি তো ভারী ইন্টারেস্টিং লোক মশাই। দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু চা আনাই।' পাশের দুখানা খালি চেয়ার দেখিয়ে 'বসুন আগে' বলে হেঁকে চায়ের অর্ডার দেন।

—'হাতি সম্বন্ধে আর কী জানেন?

—'কিছু না, কিছু না। ওসব বই কেনা কি আর আমাদের সাধ্যি স্যার? দাম শুনলে পিলে আউলে ওঠে। এই নগা একবার নিয়ে গেস্লো লাইট হাউসের উল্টো গলিতে। রাশি রাশি বই। তার মধ্যে একখানা শুধু হাতি নিয়ে। ওই, উল্টোপাল্টে যতটুকু দেখা যায়।'

—'আর কী দেখলেন?'

—'সব কি আর মনে আচে? তবে মজা লেগেছিল একটা কথা জেনে।'

—'মজা? কোন মজা?'

—'এশিয়ান হাতির কানদুটো নাকি হয় ইন্ডিয়ার ম্যাপের মতো দেখতে। আর আফ্রিকান হাতির কান ঠিক যেন আফ্রিকার ম্যাপ। ভাবা যায়? ওদেরকে বলে লক্সিডোন্টা আফ্রিকানা।'

হাতিগুলো তিস্তার বুকে জলকেলি করে বেড়াচ্ছে। সে এক দৃশ্যই বটে। শুঁড় দিয়ে শূন্যে জল ছুঁড়ছে, ছুটছে এদিক ওদিক, আবার ঠিক ফিরে আসছে জায়গা মতো।

হঠাৎ সব কিছু ভুলে কালীগতি বলে ওঠেন ওঁর সঙ্গীকে

—'নগা নগা! ভালো করে মিলিয়ে দ্যাখ, ওই যে একবার বলেছিলুম না কালিদাস থেকে—

'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে
মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ'

তোর তো ছাই কিছুই মনে থাকে না, আমার কথায় ঘাড় নাড়তে নাড়তেই জন্মো কাবার করে ফেললি, চেয়ে দ্যাখ 'বপ্রক্রীড়াপরিণত গজ' কাকে বলে। আহা, 'প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ!'

মিস্টার লাহিড়ি সেদিন আর কিছু বলেননি। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একবার তিস্তার দিকে তারপরেই আড়চোখে কালীগতির দিকে চেয়ে কী যেন

ভাবছিলেন। ব্যাপারটা ওইখানেই চুকে গেল।

কিন্তু চুকলো না পুরোটা। বার-তিনেক ক্যাম্প পালটে সবাই এখন জলদাপাড়ায়। চারপাশে ঘন জঙ্গল। পায়ের কাছে সরুমতো হলং নদী। এপারে কাঠের বড়সড়ো বাংলোটা আর ওপারে একটা সল্ট লিক—জানোয়ারেরা নুন চাটতে আসে। দিব্যি চলছিল শুটিং। দিনভর ক্যামেরা নিয়ে টৈ টৈ। সন্ধ্যায় বাংলোয় ফিরে গল্প, আড্ডা, পরদিনের কাজের টুকটাক প্ল্যানিং। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন কাজের শেষে দোতলার অরুণ, পিন্টু সঙ্গে আরো দু-জনের আবির্ভাব। তেতলায় হিরণের ঘর। দরজায় টোকা মেরে ঢুকে পড়ে ওরা।

—'কী ব্যাপার?'

—'একটা রিকোয়েস্ট।'

—'কীসের?'

—'ওই যে আপনার দুজন স্পেশাল গেস্ট—লাইফ তো হেল্ করে দিল।'

—'মানে?'

—'এত জ্ঞান তো হজম হচ্ছে না আর', অরুণ বলে ওঠে। একটু চাপা স্বভাবের ছেলে সে, তার মুখে এই কথা। 'আপনার ঘরের আশেপাশে কোথাও তুলে আনুন না স্যার, রক্ষে পাই তাহলে।'

—'একটু খুলে বলো তবে না বুঝবো।' হিরণ বলে।

এবার শুরু করে পিন্টু।

—'কী আর বলব বলুন? দুপুরে লাঞ্চ ডিক্লেয়ার্ড হলো, আমরা ক'জন প্যাকেট হাতে খানিক দূরে গিয়ে বসতে যাবো, দেখি ওনারা দুটিতে খানিক আগেই হাজির। টুকটাক কথা হচ্ছে, হঠাৎ সামনের ক'টা কালচেমতো গাছ দেখিয়ে বড়োজন বলে উঠলেন, 'কে বলতে পারে ওগুলো কী গাছ? আমরা ঘাড় নেড়ে দিলাম। এতরকমের গাছ, কে খবর রাখে বলুন?'

— 'তারপর?'

—'মাস্টারমশাই একগাল হেসে বললেন, এ হে হে, এত চেনা জানা, পান আর চুনের সঙ্গে যেটা খায় গো। ভাবো ভাবো, ভাবলেই বেরোবে।

ভেবে বলি, কী? জর্দা? শুনে আবার হাসি! বললেন, খয়ের, খয়ের গো। আসল নাম—কী যেন একটা, ও হ্যাঁ— 'আফেসিয়া' কী যেন। বলছি বলছি, আফেসয়া কাটেচু না কী, ওই গোছের নাম।'

—'তার ওপর আবার বলে কী জানেন?' এবার সুবীর নামে সাউন্ডের ছেলেটা মুখ খোলে, 'একটা নতুন জায়গায় এলে, রেয়ার অপরচুনিটি, যা কিছু দেখবার জানবার শিখে রাখবার, শিখে রাখবে না? বলে এক-একটা গাছের দিকে তাকায় বুড়ো আর এক-একটা নাম কপচাতে থাকে। মহা ঝামেলা! খাওয়া প্রায় মাথায় ওঠবার জো। শেষে আমার হাতের টেপ রেকর্ডারটা দেখে কী ফূর্তি! বলে, ঠিক আছে, ওটা চালু করে দিয়ে তোমরা খেতে বোসো। সামান্য যে দু-একটা জানি বলে দিই এই ফাঁকে।'

—'রেকর্ড করলে?' হিরণ কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

— 'নইলে আর উপায় কী? চিনেজোঁকের ঠাকুদ্দা একেবারে! এই শুনুন—'

ছোট্ট রেকর্ডারটাকে এতক্ষণ লক্ষ করেনি হিরণ। সুবীর নব্ টিপতেই বেজে ওঠে সেই চেনা গলা, 'সব জিনিসেরই দুটো করে নাম থাকে। ডাকনাম আর ভালো নাম। যেমন ধরো আমার নাম খাঁদু, ভালো নাম কালীগতি ভট্টাচার্য, তেমনি এই গাছ-পাতা-লতা-ফুলেরও দুটো করে নাম। বাংলা আর ল্যাটিনে। ধরো, এ যে শালগাছ চাদ্দিকে, কিংবা ধরো সেগুন—এগুলোর পোষাকি নাম কী? কে বলতে পারো?'

রেকর্ডার চলছে। জবাব আসে না। তার বদলে আবার কালীগতির গলা : 'একটা হলো শেরিয়া রোবাস্টো আর অন্যটা টিকটোনা গ্র্যাণ্ডিস। এই যে ডানদিকে বহেড়া গাছটা ওর আসল নাম টার্মিনোলিয়া বেলিডিকা। ক'জন জানে, বলো? আর ওই যে লতাকাঞ্চন ঝুলছে—বাউহিনিয়া অ্যানগুইনা। ঠিক আছে, এক কাজ করো—তোমরা শুটিংয়ে লেগে যাও, আমি বরং এই ফাঁকে কটা স্পেসিমেন জোগাড় করে রাখি। ওবেলা ভালো করে বুঝিয়ে দেবোখন।' আচ্ছা খ্যাঁচাকলে পড়া গেছে। হ্যা-হ্যা-হ্যা—

এমন হয়ে দরজার বাইরে থেকে একটা আওয়াজ— 'মে উই কাম ইন?'

সন্ধ্যে নেমে এসেছে। বারান্দার লাইট এখনও কেউ জ্বালায়নি। সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকায় গলা শুনে।

—'আসুন।' হিরণ গলা তুলে বলে ওঠে।

পর্দা ঠেলে প্রথমে ঢোকে একগাদা ডালপালা, ফুলওয়ালা কিছু লতা, আর তার ওপাশে দুটি চেনামুখ—কালীগতি আর নগেন।

—'আসুন আসুন। হাতে ওগুলো কী?'

—'প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বসাচ্ছি—উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশন।' বলেই কালীগতি ছেলেদের দিকে ফিরে বলেন, 'ঝট্ করে ডেকে আনো দিকি আর সবাইকে। পাতাগুলো নেতিয়ে পড়চে ক্রমশ। যাও যাও—'

ওরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে যায়, কিন্তু আর ফিরে আসে না। কালীগতি আশায় থাকেন। দেরি দেখে হিরণকেই ফুল চেনাতে শুরু করেন।

—'চেয়ে দেখুন। সব কটাই চেনা ফুল। শিমুল, জারুল, মুচকুন্দ, কুর্চি—বাট লেট মি টেল ইউ, সাম অফ দেম আর ফরেইনার্স। ক্যান ইউ নেম দেম?'

নগেন একটা একটা করে টেবিলে রাখে। রিটায়ার্ড হেড-মাস্টারমশাইয়ের ক্লাস, চলতে থাকে— 'বম্প্যাক্স্ সিড্', 'তেরোস্পার্সাম ল্যান্সিফোলিয়াস', 'হোলার হেনা অ্যান্টিডিসেন্ট্রিয়া'... আমাশার মোক্ষম ওষুধ একেবারে', বলেই দরজার দিকে ফিরে বলেন, 'কেউ আসচে না কেন বলুন তো?'

মাস দুয়েক পরের কথা।

আউটডোর সেরে হিরণ এখন ইনডোর শুটিংয়ে ব্যস্ত। একদিন সন্ধের পর কাজ সেরে ফিরতেই গেটম্যান এগিয়ে এসে বলে, 'একটা চিঠি ছিল স্যার।'

ওপরে উঠে স্টাডিরুমের লাইট জ্বালে হিরণ। ঠিকই আন্দাজ করেছে সে। কালীগতি ভটচার্য মশাইয়েরই চিঠি।

পরমসুজনেষু,

এতদিন ইচ্ছাবশেই যোগাযোগ করি নাই। আপনার সহিত বনভ্রমণে গিয়া, বিশেষ করিয়া আপনার অল্পবয়সি সহকমীদের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, বর্তমান সমাজে আমাদের মতো মানুষেরা একমাত্র হাসির খোরাক ছাড়া আর কিছুই নহে।

মানিয়া লইলাম, আমি উপহাসের পাত্র। কিন্তু খোলামনে বলুন তো, জ্ঞান কি কখনও হাসির খোরাক অথবা উপহাসের বস্তু হইতে পারে? আপনার সুচিন্তিত মতামতের অপেক্ষায় রহিলাম।

একটা সুখবর দেই। বনবিভাগের যে উচ্চপদস্থ অফিসার মহোদয়ের সহিত সংপং বাংলোর সম্মুখের প্রাঙ্গণে আলাপ হইয়াছিল, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পক্ষকাল আগে আমাকে অতি দুর্মূল্য কিছু বহি পাঠাইয়াছেন। সবই জঙ্গল ও পশুপাখি সংক্রান্ত। চিরকুটে লিখিয়াছেন, 'উইথ রিগার্ডস'।

আশীর্বাদক
কালীগতি ভট্টাচার্য

তারাদের কথা

স্বপ্নকমল সরকার

—কাল আসবো নি দিদিমণি, কাজ আছে...

—আসবি না মানে? যখন খুশি ডুব মারলেই হল...

ও দিকের তেমন সাড়াশব্দ না পেয়ে মন গজগজ করে ওঠে,—কাল ছোড়দি আসবে, পুচকেটাও, পুজোর শপিং করবে। কত্ত কাজ তোর, ঝাড়পোঁছ, কাচাকুচি, এক্সট্রা বাসন...

—কাল আমাদের মেডাম আসবে যে... তারার গলাটা যেন বিরক্তিতে ধরে আসে।

মেডাম, মানে সুদে-আসলে লোন উসুল করতে আসা মাইক্রো ফিন্যান্সের সেই এজেন্ট মহিলা। মণিমালা হিসেব করে দেখেছে মাসে ছাব্বিশ পার্সেন্টি হারে সুদ নেয় ওরা। গতবার শীতে স্বামীর অসুখের জন্যে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল তারা। বস্তির সবাই দায়ে পড়ে ওই মহিলার কাছেই টাকা ধার করে আর প্রায় গলায় গামছা দিয়ে সুদ আদায়ে আসে ওই 'মেডাম', মাসে একবার। আসল দিতে না পারলেও সুদটুকু দিতেই হবে। যা খাণ্ডারনি ওই ম্যাডাম, সবাই ভয় পায় তাকে। তারার জন্যে তার বরের ব্যাংক থেকে লোনের একটা ব্যবস্থা করতে গিয়ে পারে নি মণিমালা। সহায়ক জামিন জোটেনি।

—এই তোর এক বাহানা হয়েছে বাপু, আজ তার অসুখ, কাল আধার কার্ড করতে হবে, পরশু কেরোসিন তুলতে যাব..., আর পারি না...

তারার বর রোবো আগে শহরে রিক্সা চালাতো, এখন টোটো এসে যাওয়ায় আর তেমন ভাড়া পায় না। ঘরে শুয়ে বসে কাটায়। অনেকদিনের লিভারের অসুখ। মাঝেমধ্যে পেটে যন্ত্রণা ওঠে, কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করে... ছেলেটো বেলা অব্দি স্কুলে থাকে, মিড ডে মিলের খাবার খেয়ে তারপরে ফেরে। বাড়িতে বুড়ি শাশুড়ি ছাড়া রোবোকে দেখবার তখন কেউ থাকে না। বুড়ি তো নিজেই ঘাটের মড়া!

শুকতারার বিয়ে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, তাও প্রায় এগার বছর হল। তারা-রোবোর বিয়ের একটা ছবি দেখেছিল মন। রোবো নাকি নাইন পাশ, প্রাইভেট কোম্পানিতে পিওন ছিল একসময়। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মদ খেতে ধরেই কামাই করে করে চাকরিটা খোয়ায়। তারপর রিক্সা, এখন তো মদেই খাচ্ছে ওকে।

সুভাষগ্রামের অভেদানন্দ বস্তি থেকে ভোর চারটে বিয়াল্লিশের যে লোকাল ট্রেনে দলবেঁধে বালিগঞ্জে এসে নামে তারারা, মহানগরে তার নাম 'ঝি স্পেশাল'। তখনও ভালো করে দিনের আলো ফোটে না। দু-বাড়ির কাজ সেরে যখন মনদের কমপ্লেক্সের চারতলার দরজায় বেল বাজায় তারা, ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। তারাকে দেখে সাতসকালে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যায়।

এমনিতে রোগাভোগা মেয়েটা খুবই কাজের। শরীর পাত করে খাটতেও পারে,

কথা বলে কম। যখন দু-একটা বলে তখন সে সব কথা বাণীর মত শোনায়। সেদিন গতবারের বিবাহবার্ষিকীতে ননদের দেওয়া সিফন শাড়িটা সঙ্গের ম্যাচিং ব্লাউজের সঙ্গে পুজোর কাপড় হিসেবে দিতে গেলে কেমন একটা হাফটোনে তারা বলেছিল, ‘‘না গো দিদিমণি, ছেলেটার প্যান্ট-জামা হয় নাই, শাশুড়ির একটা কাপড়ও। আমার কথা ছেড়ে দাও। ওদের আগে কিনতে হবে, ...আর তুমি তো নিজেই সিন্থেটিক পরতে বারণ করো... অত দামি শাড়ি নিয়ে কী করবো, কবে পরবো? পাঁচ বাড়িতে কাজ... আমাদের আবার পুজো!’’

শাড়িটা বিদেয় করে তারাকে দেওয়ার টাকায় ম্যানিকিওর করাবার সাধ পূর্ণ হয় না মণিমালার।

—টাকাই যে আমাদের ভগবান গো, দিদি!

শুকতারা বলে ওঠে।

গালটা চিনচিন করে ওঠে মনের। যেন এইমাত্র সপাটে একটা চড় কসিয়েছে তার গালে। নীরবে হজম করে নিতে হয় তাকে। দামি জিনিসের মর্ম বোঝাতে যাওয়া তার নিজেরই ভুল। কিছু বলা যাবে না, যদি হুট করে কাজ ছেড়ে দেয়! অনেক ইকুয়েশন রয়েছে তার পুজো ভ্যাকেশন নিয়ে।

এবার পুজোর ছুটিতে ব্যাঙ্কক যাওয়াটা বানচাল হয়েছে বলে মনটা এমনিতেই খিঁচড়ে আছে তার। মান ভাঙাতে অলীক তবু এবার পুজোর বোনাস পেয়ে উনিশ হাজারি জামদানিটা গিফট করেছে, বিবাহবার্ষিকীতে ব্রেসলেটও প্রমিসড্। ষষ্ঠী আর সপ্তমীর দু-দিন ‘সোনার তরী’ রিসর্টে রূপনারায়ণ...কাশফুল, ঢ্যাং-কুড়া-কুড়! পালতোলা মেঘের নৌকায় শুধু ভেসে যাওয়া। অষ্টমীতে প্যাণ্ডেল হপিং, নবমীর সন্ধেয় ‘শারদ-সুন্দরী’-র ‘সেরা বৌমা’-য় রাম্পে ঢেউ তোলা। ভাবলেই আনন্দে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মনের।

কোনো কৃতজ্ঞতা জানে না এইসব কাজের মেয়েরা। এই তো গত সপ্তাহে এক মাসের মাইনে আর পুজোর বোনাস মিলিয়ে কড়কড়ে দুটো পাঁচশোর নোট দিল তারাকে। পুজোর পরে ঘর ভরে যাবে গেস্টে, আর সেসময় যদি তারাটা ডুব দেয়। এইসব ভাবছিল মণিমালা আর তারা উবু হয়ে একমনে ড্রয়িংরুমের মার্বেলের মেঝে মুছছিল। এরপর বাসন ধোবে, জড়ো করা বেডকভারটা কেচে ছাদে মেলে দিয়ে আসবে। ওর এখন পরপর অনেক কাজ।

একটু ব্যাকফুটে গিয়ে মন বললো, —তোর বর কেমন আছে রে তারা?

—আছে অই এক রকম।

কপালের সিঁদুরটা অসাবধানে ধেবড়ে গেছে তারার। বলে—পেটের আরেকটা ফটো তুলতে হবে, অই যে বায়োপসি না কি বলে যেন, তাও...। হাসপাতালে হয় না দিদিমণি?

তারা জানে মনের ভাই কাঞ্চন হাসপাতালের বড় ডাক্তার। বেশ কয়েকটা নামকরা নার্সিংহোমেও যোগ আছে তার। বিনাপয়সায় না হলেও অন্তত অনেক কমে টেস্টগুলো করে দিতে পারে সে। কিন্তু ওরা তো দলবেঁধে মরিশাস যাচ্ছে পুজোর আগেই। কোনো এক ওষুধ কোম্পানি স্পনসরার। মন বলল,—পুজোর পরেই না হয় করিয়ে নিস্, কাঞ্চনকে বলে দেব।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে তারা বলল— তার আগেই বোধহয় লোকটা সগগে গিয়ে আমাকে শান্তি দেবে, শরীলের যা দশা...

মন একটা বেগুনি নোট বাড়িয়ে দেয় তারার দিকে। তারা অবাক চোখে মণিমালার দিকে তাকিয়ে থাকে। নেবে কী করে, কেন না ততক্ষণে সে সকালের এঁটো বাসনগুলোয় হাত লাগিয়েছে। সিঙ্কে জল পড়ার শব্দে অস্পষ্ট হলেও মন শুনতে পায় তারার স্বগতোক্তি...

—মা দুগ্গা কেন যে এতদিন ধরে এসে বসে থাকে বাপের বাড়িতে!

—কেন, তাতে তোর বাড়া ভাতে ছাই পড়ল নাকি?

—না গো বৌদিমণি, চারদিকের এত আলো আর মাইকের আওয়াজে সুকুর বাবা ঘুমোতে পারে না, সারা রাত ছটফট করে, ডি জে বাজিয়ে পাড়ার ছোঁড়াগুলো মদ খেয়ে এমন হুল্লোড় করে, কিছু বলতে গেলে তেড়ে মারতে আসে... পার্টি করে যে সব...

—তা, পুজোর কটা দিন তো ওরা আনন্দ ফুর্তি করবেই, তোদের একটু মেনে নিতে হবে!

—কত মানবো বলতো, জোর করে দু-শো টাকা চাঁদা নিল এবার, তারপর দিনরাত কানের পোকা মেরে লারেলাপ্পা, আওয়াজে ঘরের টালি পর্যন্ত কেঁপে ওঠে... তাতেও কি নিস্তার আছে... ফিস্টি-ঝগড়া-মারামারি, মদের বোতল ভাঙা... সুকুমারটা বড় হচ্ছে যে—

একটানা কথাগুলো বলে এবার তারা একটু বিরতি নেয়, তারপর ফের মনের চোখে চোখ রেখে সামান্য মিহি গলায় বলতে থাকে, —পুজোফুজো ওসব আমাদের নয় দিদিমণি, ঠাকুরকে কতবার কত কিছু চেয়ে দেকলাম তো, কিচ্ছুটি দ্যায় না। বিপিএল না, বুড়ির বেধবা ভাতা... কিছুই হবার নয় গো... পুজোর বোনাস কটাও উড়ে যাবে ওষুদের আর মুদি দোকানির ধার মেটাতে...

—কেমন চারটে দিন সবেতন ছুটি পাস, সেটা তো বলছিস না? মরিয়া মণিমালা বলে।

—সবই তো বন্ধ থাকে গো, আপিস-কাছারি-পঞ্চায়েত, ডাক্তারবাবুকেও পাই না, কী লাভ আমার?

তারার গলায় ক্ষোভ উপচে পড়ে। —ইস্কুল বন্ধ, মিড-ডে মিল, কাজের বাড়ির আমার দুপুরের ভাত বন্ধ...

মন কিছু বলার আগেই তারা বিড়বিড় করে বলতেই থাকে—তাছাড়া পুজোয় কত খরচ বলো তো? ছেলেটাকে, ভাই দুটোকে, শ্বশুরবাড়ির ও তরফে জনে জনে—দিতে-থুতে হয়। সুকুর বাবাকে ডাক্তার দেখাতেই তো গাদাখানেক খরচা, তারপর আবার সামনেই হিম পড়বে...লেপ-কেঁথা বাগাতে হবে। আমাদের বস্তিতে যে শীত খানিক আগে আসে গো দিদিমণি, বিদেয় নেয়ও দেরিতে!

অনেকক্ষণ ধরে থাকা নোটখানা কখন যে শীতের শুকনো পাতার মত খসে পড়ে মনের আঙুলের ফাঁক গলে । ফ্যানের হাওয়ায় একসময় তা ঘরময় উড়তে থাকে। তারপর কখন যে ডানা মেলে খোলা ব্যালকনি দিয়ে সুখপাখি হয়ে পাড়ি দেয় শরতের নীল আকাশে, কৈলাস থেকে ভেসে আসা মেঘেদের দেশে।

বন্ধন

কাকলি ঘোষ

খাবারের টেবিলে বসে থেকে থেকে চোখটা বুজে এসেছিল সুমিতার। কলিং বেলের আওয়াজে ধরফড় করে উঠে পড়ে। ঘড়ির দিকে তাকায়, আড়াইটা। রাত আড়াইটা বেজে গেল বসে থেকে থেকে! এতক্ষণে বুকুনরা ফিরল! টলমলে পায়ে দরজাটা খোলে সুমিতা। দরজা খুলতেই চড়া মদের গন্ধে নাক ঝলসে যায় সুমিতার। বুকুন কাঁপা পায়ে ঘরে ঢোকে। সুমিতা লক্ষ করে বউমারও পা টলছে।

—তোরা এত রাত করলি পার্টি থেকে ফিরতে? রাত আড়াইটা বেজে গেল। আমি দরজা খুলব বলে বসে আছি।

—কে তোমাকে বসে থাকতে বলেছে? ঘুমিয়ে পড়লেই পার। বুকুনের গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ে।

—সে কী, এত রাতে তোরা বাড়ির বাইরে আর আমরা ঘুমিয়ে পড়ব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এসব আদিখ্যেতা আমার একদম ভালো লাগে না। রাবিশ। ঝিমলি বিরক্তি-মাখা গলায় বলে ঘরে চলে যায়। বুকুনও ওর পিছু পিছু ঘরে ঢোকে।

সুমিতা খাবারগুলো ফ্রিজে তুলে এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ে। ওদের যে পার্টি আছে সে কথা জানানোর প্রয়োজনও ওরা মনে করে না। উনি চলে গেছেন আজ দশ বছর হলো। তখন বুকুন সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। তখনও চাকরি পায়নি। এই ছেলেকে তারা কত কষ্ট করে পড়িয়েছে। সুবিমল কোনোদিনই বাধা-ধরা কোনো কাজ করেননি। কখনও বইয়ের দোকানে, কখনো ছাপাখানায় প্রুফ দেখার কাজ, কখনো কোনো পত্রিকার অফিসে কাজ করেছেন। কত সামান্য টাকায় সুমিতা সংসার চালিয়েছে। ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছে। সেই ছেলে এখন বড় হয়েছে, নামি কোম্পানিতে চাকরি করছে। ছেলের বউও একই কোম্পানিতে চাকুরে। বাড়িটা ওরা ভেঙেচুরে আবার নতুন করে সারাবে। সুবিমলের ছিল বই কেনার শখ। ওদের বসার ঘরটার দেওয়াল জুড়ে বইয়ের আলমারি। নতুন বই কিনতে পারত না। কলেজ স্ট্রিট থেকে পুরনো বই কিনে আনত। ওই বইগুলো বুকুনদের খুব বিরক্তির কারণ। সেদিন তো ঝিমলি বলেই ফেলল—মামণি, আপনার ওই আবর্জনাগুলো সরান তো। আমরা নতুন করে ড্রয়িং রুমটা সাজাবো। আমাদের দুজনেরই কলিগরা, গেস্টরা আসে। ওই ট্র্যাশ বইগুলো দেখতে এত বাজে লাগে। হরিব্যল।

বুকুনও যোগ দেয়— দেখ মা, বাবা তো চলে গেছেন। ওই বইগুলো আঁকড়ে ধরে তুমি কী করবে? ওইগুলো বরং কেজি দরে বেচে দাও।

সুমিতার চোখে জল এসে গেছিল। কোনো রকমে বলে—তোর বাবার অত প্রিয় বইগুলো কত কষ্ট করে কেনা। উনি না খেয়ে বই কিনতেন আর ওগুলো তুই বেচে দিতে বলছিস?

—হ্যাঁ মা। ওগুলো আর চলে না।

সুমিতা কিছু বলেনি। পায়ে পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

সুমিতা ভাবে কতদিন এভাবে চলবে? সে তো ওদের কাছে বোঝা। সে আর তার স্বামী আজ বাতিল হওয়া মানুষ। তিনি মরে বেঁচেছেন। তাকে এখন কত সহ্য করতে হবে কে জানে? রাত শেষ হয়ে আসে। দু'চোখ বুজে আসে ঘুমে। কখন আটটা বেজে গেছে। সুমিতা ঘুমিয়ে পড়েছে। বেল বেজে ওঠে। ধড়ফড় করে উঠে বসে সুমিতা। পারুল এসে গেছে। ইস

কত দেরি হয়ে গেল। সুমিতা দরজা খুলে দেয়।

—কী গো দিদা, ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

—হ্যাঁ রে। তা তোরও তো একটু দেরি হয়েছে।

—হ্যাঁ গো, ও বাড়ির বউদি বাপের বাড়ি যাবে তাই আগে যেতে বলেছিল।

—যা যা বাসনগুলো তুলে ফেল। আমি কাপড় ছেড়ে এখুনি আসছি। জলখাবার করতে হবে। ওরা তো আবার অফিস যাবে।

কলঘর থেকে বুকুনের চিৎকার শোনে— মা, এত দেরি। কখন ব্রেকফাস্ট করবে? ন'টার মধ্যে না বেরোতে পারলে হবে?

কলঘর থেকে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে আসে সুমিতা। টোস্টারে ব্রেড দিয়ে দেয়। ওমলেটের জন্য ডিম ফাটায়। ঝিমলি রেডি হয়ে খাবার টেবিলে আসে।

—ওঃ ডিসগাস্টিং। রোজ রোজ ব্রেকফাস্ট এত লেট করে সার্ভ করে। বলেছি না তোমার মায়ের দ্বারা হবে না। একটা লোক রাখ। তা উনি তো তাও রাখতে দেবেন না।

সুমিতা দ্রুত হাতে জলখাবার বানিয়ে টেবিলে দেয়। ওদের বলে— বুকুন আজ আর দুপুরের খাবার দিতে পারলাম না। তোরা ক্যান্টিনে খেয়ে নিস।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুকুন জুতোর ফিতে বাঁধে।

—হরিব্যল। বাড়িতে সারাদিন বসে আছেন অথচ একটা কাজও ঠিক মতো করতে পারেন না। অর্চি গাড়ি বার কর।

ওরা চলে যায়, দুপুরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘরে। পারুল বলে, বৌদিমণির কী কথার ছিরি। কাজের লোকের সঙ্গেও কেউ এভাবে কথা বলে না। সুমিতার চোখে জল এসে যায়। জল মুছে চায়ের জল চাপায়। পারুল চলে গেলে আলমারিটা খোলে। ওর খবরের কাগজের কাটিং রাখার শখ। দুপুরটা এভাবেই কাটায়। কোনোটা রান্না শেখার কাগজ, কোনটা সেলাই শেখার, তেমনি একটা কাগজ কাটিং-এর পিছনে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাকে সঙ্গ দিতে হবে। চোখে দেখতে পান না। তাকে দেখাশোনা করার কাজ। থাকা খাওয়া, মাইনে পাঁচহাজার। নিচে ঠিকানা লেখা। ফোন নম্বরও দেওয়া আছে। সুমিতা ফোন নম্বরটা নিয়ে ফোন করে। দুবার ফোনটা বেজে যায়। তারপর এক ভদ্রমহিলা ফোনটা তোলেন—

— হ্যালো...

সুমিতা আমতা আমতা করে বলে—পরশুদিনের কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপনটা দেখে ফোন করছি। আমি আপনাদের কাজটা নিতে ইচ্ছুক।

—আপনি কোনো সেন্টারের লোক? তাহলে রাখব না।

—না না। আমি মানে দত্তবাগানে থাকি। এখানে অর্চিষ্মান সেনের বাড়িতে কাজ করি। কিন্তু এখানে আমার ঠিক ভালো লাগছে না। মানাতে পারছি না। তাই ভাবলাম আপনাদের কাজটা যদি পাওয়া যায়।

—ঠিক আছে, আপনি আজ পাঁচটার পর আসতে পারবেন? আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। আর হ্যাঁ, আপনার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড নিয়ে আসবেন। আমরা আপনাদের লোকাল থানায় খবর নিয়ে নেব।

সুমিতা ব্যাগ গুছিয়ে নেয়। পাঁচটা শাড়ি, সায়া-ব্লাউজ একটা ব্যাগে ভরে নেয়। দেওয়ালে বাঁধানো সুবিমলের ছবিটা নিতে ভোলে না। বসার ঘরে বইগুলোর দিকে একবার করুণ চোখ বুলিয়ে নেয়। ভাবে রবীন্দ্র রচনাবলীটা নিয়ে যাবে। তারপর ভাবে, না, থাক। নিলে সব বইই নিতে হবে। তা যখন সম্ভব না, থাক পড়ে। তিনটে পনেরো। অতটা যেতে হবে। হ্যাঁ। একটা কাজ বাকি আছে, বুকুনের দেওয়া পুজোর শাড়িটা আর চাকরি পাওয়ার পর দেওয়া আংটিটা টেবিলের ওপর খুলে রাখে। দ্রুত হাতে লেখে—'বুকুন আমি চললাম, আমাকে খোঁজার চেষ্টা করিস না। তোদের সব রইল। তোরা ভালো থাকিস। দরজায় তালা দিয়ে পাশের বাড়ির বৌমার কাছে চাবিটা রাখতে যায়।

—ও মা— মাসিমা কোথায় যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ মা, আমার বোনের খুব শরীর খারাপ। ফোন এল। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি। এই চাবিটা রাখ। বুকুনরা এলে দিয়ে দিও। চলি।

চোখের জল মুছে বাসস্টান্ডের দিকে পা বাড়ায় সুমিতা। পেছনে ফেলে আসে ক্লান্ত প্রৌঢ়ত্ব, ধূসর মাতৃত্ব আর নাড়ির বন্ধন ছেঁড়ার যন্ত্রণা।

Happy Pooja Greetings From

Real Kajora Colliery Employees Co-operative Credit Society Ltd.

Reg. No. 140 of 19-06-87

At Nabakajora Colliery, P.O. Kajora Gram, Dist. Paschim Bardhaman

Sunil Kora
Secretary

Rajendra Harizan
Chairman

Sl. No. 138

বিসর্জন

গীষ্পতি চক্রবর্তী

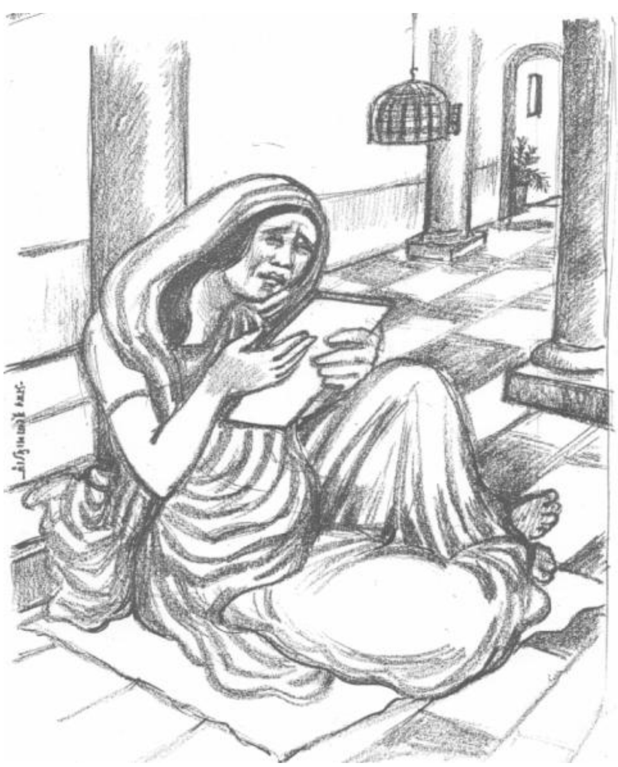

কলকাতার ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজোর খুব নামডাক। বহু প্রাচীন পুজো। উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবার ঘোষালরা। ওই অঞ্চলে ঘোষালবাড়ি সবাই একডাকে চেনে। বহু পুরানো বাড়ি। রাজবাড়ির ধাঁচে গড়া। সামনে বিরাট কাঠের দরজা। লোহার পাত, গোলমাথা লোহার পেরেকের মতো পোঁতা দরজার সারা শরীরে। সবুজ ভারি দরজা। রাস্তা থেকে দুধাপ উঠে দরজার গোড়ায় পৌঁছতে হয়। দুজন লোক দুদিক থেকে টেনে খুললে, তবে দরজা খোলা যায়। দরজা খুললেই চোখে পড়ে সামনের বিরাট চত্বর। সোজা তাকালে চোখে পড়ে ঠাকুরের বেদী। চাতালের দুপাশে টানা বারান্দা, তারপর সারি সারি ঘর। চারিদিকে তাকালে পুরানো কড়ি-বরগার বারন্দা, পায়রার বাসাসমেত চোখে পড়ে। চারপাশের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব এখানে যেন থমকে গেছে। সময় যেন থেমে আছে এখানে। এ বাড়িতে এখনও জোড়াতাড়া দিয়ে একান্নবর্তী পরিবারের কাঠামোটা টিকিয়ে রেখেছেন বটকৃষ্ণ ঘোষাল। এবাড়ির বড়কর্তা উনি। বয়স সত্তর-পঁচাত্তরের মধ্যে হবে। শক্ত, সুঠাম কাঠামো শরীরের। ঘোষাল বাড়ির পুরুষেরা একসময় মুগুর ভাঁজতো। হিন্দুস্তানি পালোয়ান তালিম দিত ছোট ছেলে থেকে বুড়ো সকলকে। একসময়ে বাড়ির একদিকে পালোয়ানদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। ছিল ফটক পাহারা দেওয়ার ইয়া গোঁফসমেত হিন্দুস্তানি দারোয়ান। কালের ঢেউ সেসব ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে গেছে। বটকৃষ্ণ ঘোষালের দুই ছেলে, এক মেয়ে। পুজোয় মেয়ে আসে, বাপের বাড়িতে। দুই ছেলে তাদের পরিবার নিয়ে থাকে এই বাড়িতেই। এতবড় বাড়ির যে-কোনো প্রান্তে অনায়াসে হাত-পা ছড়িয়ে থাকার জায়গা হতে পারে অনেকের। দুই ছেলে তাদের সংসার নিয়ে আলাদা থাকলেও পুজোর সময় সবাই একান্নবর্তী। আরও অনেক আত্মীয় বন্ধু পুজোয় আসে ঘোষাল বাড়িতে। বটকৃষ্ণ ঘোষাল স্ত্রীকে বলে গর্বভরে, 'দেখেছো গিন্নি, এখনও টিকিয়ে রেখেছি আমাদের পরিবারের ঐতিহ্য; দুর্গাপুজোর সময় আমার মনে হয়, পরিবারটা লতায়-পাতায় যেদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাক, শেকড় আছে আমাদের পুরানো ঘোষাল বাড়ির গভীরে।'

সরমার আনন্দ আর ধরে না। কপালে যে এত সুখ ছিল, কোনোদিন কল্পনাও করেনি সে। দুঃখ শুধু সেই মানুষটার জন্য, যে আজ থাকলে কথায় কথায় বাড়ি মাথায় করত, আনন্দে ঘর-বার করত হাজারবার। যে মানুষটার ছবির কাছে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে প্রণাম করে সে। মনে মনে বলে, 'যেখানেই থাকো, দেখে সুখী হও, তোমার ছেলে সত্যি করে মানুষ হয়েছে।' সুমন তাড়া লাগায়, 'চা করো মা, আজ লুচি দিয়ে জলখাবার খাবো।' সরমা ছেলেকে আড়াল করে চোখ মুছে বলে, 'হ্যাঁ বাবা, করছি সব; তুই সেই ছোট্টটি আছিস এখনও। ক্ষিদে পেলে তর সয় না। হ্যাঁরে তোর মেমসাহেব বৌ এত তাড়া সহ্য করে?' 'মেমসাহেব বলে কি আমি তোয়াজ করব? আমি ওর পেছনে ছুটে বেড়াইনি মা। ওই বরং...।' সুমন চুপ করে। 'থাক, আমি দেখতে গেছি? বিদেশে বসে কী করেছিস কে জানে? ভাবিস না, তোর সব কথা আমি বিশ্বাস করি'—কপট রাগ দেখায় সরমা। এক বছর হল বিয়ে হয়েছে সুমনের। মেমসাহেব বৌকে দেশে আনা হয়ে ওঠেনি।

সরমার বাড়ি বলতে এই ফ্ল্যাট। তিনকামরার বড়ো ফ্ল্যাটটা সুমনের বাবা কিনেছিল। দক্ষিণ কলকাতার এক প্রান্তে ঝকঝকে ফ্ল্যাট। দুটো কাজের মেয়ে নিয়ে সরমা থাকে একা। ছেলে বিদেশে চাকরি করে। আমেরিকার কোনো এক জায়গায় সুমন থাকে। কলোরাডো জায়গাটা কোথায়, তা বুঝে উঠতে পারে না সরমা। শুধু বোঝে, বিরাট দেশ আমেরিকার কোনো এক প্রান্তে তার ছেলে সুখে আছে মেমসাহেব বৌকে নিয়ে। প্রতিদিন গাড়ি চালিয়ে সে অফিস যায়। এই ব্যাপারটা তার ভালো লাগে না। ভয় ভয় করে। শুনেছে, সেই দেশে বড়ো বড়ো রাস্তায় গাড়ি যায় ঝড়ের গতিতে। প্রতিদিন ওভাবে যাওয়া-আসা তার ভালো লাগে না। যদি কিছু হয়? ভাবলেই বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পেটাতে থাকে। কেমন বৌ তার ছেলের? সে কিছু বলে না? কোন প্রাণে রোজ স্বামীকে ছেড়ে দেয় ওইসব রাক্ষুসে রাস্তায়? দুহাত তুলে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলে, 'মা, রক্ষা করো তুমি। তুমি ছাড়া আমার কথা শুনবে কে মা?' সরমা বোঝে না এত তাড়া কিসের ওই দেশের মানুষগুলোর? ওই দেশে কেউ রয়ে সয়ে কিছু করে না? সময় কি পালিয়ে যাচ্ছে? ছেলে দুপুরের খাওয়াটা খায় বাইরে। গোটা দেশটা নাকি দুপুরে ঘন্টাখানেক

রেস্টুরেন্টে খেয়ে কাটায়। সব তার ছেলের মুখে শোনা। মেমসাহেব বৌ-এর ছবি সরমা দেখেছে। সুন্দরী, খুব সুন্দরী। শুধু চুলটা শনের মতো। ওটা সরমার মোটেই পছন্দ নয়। কথা হয়েছে একবার, ছেলের মাধ্যমে। সরমা গুছিয়ে কিছু বলতে পারেনি। শুধু আর্তি জানিয়েছে, একবার এসো মা। ওই একবার। তারপর বারবার বললেও কথা বলবার সময় হয়নি সুমনের। দিন-রাতের কীসব বিটকেল হিসাবে, ওদের রাতের সঙ্গে আমাদের দিনের, বা ওদের দিনের সঙ্গে, আমাদের রাতের হিসাব মিলিয়ে কথা বলতে হবে। সেসব ঝক্কি সামলাতে রাজি নয় ছেলে। বারবার খুঁচিয়েও ছেলের পেট থেকে কথা বার করতে পারেনি সরমা। কোথায় মেয়ের বাড়ি, বাড়িতে কে আছে, এসব প্রশ্ন শুনলেই সুমন খালি বলে, 'গিয়ে দেখবে সব।' আসলে এখন কাজের তো শেষ নেই। ব্যাঙ্ক, অফিস, নানা জায়গায় নানা সই-সাবুদ, উকিল-কোর্ট এসবের ধাক্কায় ছেলেটা জেরবার হয়ে যাচ্ছে। পুজোর কটাদিনের জন্য আসা। মহালয়ের দিনসাতেক আগে থেকে আছে সে। শুধু কাজ আর কাজ। খাটতেও পারে ছেলেটা। মায়া হয় সরমার। মনে পড়ে সুমনের ছেলেবেলার কথা। কত বড় বয়স অবধি ঝড়- বৃষ্টি, বাজের শব্দে ভয় পেয়ে সরমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতো; সরমার কোলে মুখ গুঁজে, চুপটি করে শুয়ে থাকতো। কখন ঘুমিয়ে পড়ত মায়ের হাতের স্নেহের চাপড়ে। বড্ড আদুরে ছিল ছেলেটা। এখন বিদেশ-বিভুঁইয়ে কীভাবে যে আছে কে জানে? হুট করে জানালো, বিয়ে করেছে। কেমন বিয়ে? কোনো বলা নেই, কওয়া নেই, জানালো বিয়ে হয়ে গেছে। এসব ব্যাপার-স্যাপার মাথায় ঢোকে না সরমার। ওদেশে বিয়ে না করেও নাকি একসাথে থাকে ছেলে-মেয়েরা। ভাবলেই গা গুলিয়ে ওঠে সরমার। মা-গো, লজ্জা-শরমের বালাই নেই? বলছে তো বিয়ে করা বৌ। গিয়ে কী দেখবো কে জানে? ভাবতেই বুকের ভেতর একরাশ ভয় গুড়মুড়িয়ে ওঠে। গা ঝেড়ে নিজেকে বোঝায়, আমার সুমন ওপথে যাবে না। কোন্ বাপের ছেলে, দেখতে হবে তো? বংশ বলে তো একটা কথা আছে। কত মানুষের উপকার করে গেছে লোকটা। কত মানুষ যে কত ঋণে বাঁধা ছিল ওর কাছে, ও চলে যাবার পর জেনেছে সরমা। কতজন এসে বলেছে, পড়ার খরচ, মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসার খরচ দিয়েছে ওই মানুষটা। জানতে দেয়নি কাউকে। ও চলে যাবার পর একটু একটু করে অনেকটা জেনেছে সরমা। আরও কত কী হয়তো আছে। তা জানা যাবে না কোনো দিন।

বটকৃষ্ণ ঘোষাল ঠাকুরের মূর্তির খড় বাঁধার দিন থেকে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায় মণ্ডপে। মাটি দেওয়া, রঙ দেওয়া, সাজ পরানো, অস্ত্র দেওয়া, দেবীর চোখ আঁকার প্রতিটা মুহূর্ত সে যেন শরীরের সমস্ত রোমকূপ দিয়ে অনুভব করতে চায়। শিশুর মতো হয়ে যায় যেন মানুষটা। বাড়ির সবাই জানে, এ সময়ে বটকৃষ্ণ মা-মা করে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় বাড়ির এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। এ সময়ে তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না। সে যেন তখন অন্য গ্রহের মানুষ। সবাই জানে, মানুষটা আবার এই মাটিতে ফিরবে দশমীর পর। এখন সে শুধু মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে একটু একটু করে ঠাকুরের মূর্তি তৈরি অনুভব করবে। এক সময়ে পশু বলির চল ছিল এ বাড়িতে। বটকৃষ্ণ বন্ধ করেছে সে রীতি। সে নাকি স্বপ্নে মায়ের আদেশ পেয়েছে, পশু বলি বন্ধ করার। শত্রুরা বলে ঘোষালদের এসব কারসাজি। স্বপ্ন-টপ্ন স্রেফ গুল। আসলে পশুবলি নিয়ে চারিদিকে নানা কথা উঠেছে। বিতর্কের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এ নাকি এক তৈরি গল্প। সে যাই হোক, বলি নিষেধ এ বাড়িতে। গোঁড়া ধর্মের ধ্বজাধারীরা বলে, ঘোষালদের অধঃপতন হয়েছে। মা আসলে ঘোষালদের পুজোয় খুশি নয়। ঘোষালদের পুজো নাকি পুজোই নয়। এত জায়গায় বলি চলছে। ঘোষালদের বেলায় মা স্বপ্ন দিলেন! যতসব গাঁজাখুড়ি। এ অনাচারের শাস্তি পাবে ব্যাটারা। বাড়ির জুলুস এখনই কেমন চটতে লেগেছে। উৎখাত হবে অনাচারীরা। ওই বাড়ি মিশে যাবে মাটির সঙ্গে। চিহ্ন থাকবে না ঘোষালদের। ওখানে হবে সাত ভূতের কারবার। যেমন হচ্ছে কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়িগুলোতে। প্রোমোটারের হাত দিয়ে ধ্বংস হবে এই সাম্রাজ্য। এসব কথা বটকৃষ্ণর কানে গেছে। তবে ওসব গুঞ্জনে কান দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। দু-একবার কথাগুলো কানে যাবার পর অবজ্ঞাভরে বলেছিল— 'শকুনের শাপে গরু মরে নাকি?' সে যাই বলুক, ওর ছেলেরা অনুভব করে পরিপার্শ্বের চাপ। প্রোমোটারদের হাত লম্বা। চারিদিকে প্রেমোটাররাজ নিয়ে লেখালেখি, কথা চালাচালি যতই হোক, ওদের গ্রাস থেকে মাঠ, পুকুর, ডোবা, পুরানো বাড়িঘর, রাস্তার ধার, খালের পাড়, বাঁচায় কার সাধ্যি! নিয়মকানুন ওদের হাতের মুঠোয়। রাজনৈতিক দল, পাড়ার ক্লাব সব ওদের মুঠোয়। চারদিকে পরিবর্তনগুলো দেখতে দেখতে বটকৃষ্ণর মনে হয়, টাকার এত জোর! বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। সে ভাবতেই পারে না তাদের দালান, মণ্ডপ, বাড়িঘর বুলডোজারের ধাক্কায় মিশে যাচ্ছে মাটিতে। ওসব দুর্ভোগ যদি ঘোষালবাড়ির কপালে লেখা থাকে, তার আগে মা যেন তাকে টেনে নেয় কোলে। দুহাত কপালে তুলে মা-র কাছে সবার আড়ালে আর্জি জানায় দাপুটে গৃহকর্তা বটকৃষ্ণ।

আজ সারাদিন ব্যস্ত সরমা। শ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। নানা জিনিস গুছিয়ে রাখছে। বড় বাক্সটা ভরছে হাজার কাজ-অকাজের জিনিসে। কাজের মেয়ে দু-জন নীরবে চোখ মুছছে। তাদের মা ছেলের সঙ্গে চলে যাবে দেশ ছেড়ে চিরকালের জন্য। আর কোনোদিন দেখা হবে না। বিক্রি হয়ে গেছে ফ্ল্যাট। মায়ের মতো মানুষ হয় না। মেয়ে দু-জন নিজেদের মধ্যে কথা বলে চোখ মুছতে মুছতে। সরমাকে বলে, 'ভালো থেকো মা। ছেলের সঙ্গে যাচ্ছো, সে তো বড় আনন্দের কথা। মেয়ে দুটিকে ভুলো না মা। এখন তো কথা বলা যায় সব জায়গা থেকে। মাঝে মাঝে ফোনে...'। সরমা জড়িয়ে ধরে দু-জনকে। তোদের ভুলতে পারি! আমার মেয়ে না তোরা। বলবার অনেক কথা। তবু বলা হয় না কিছু। বুকের ভেতরের কথাগুলো ভেতরেই থেকে যায়। সবকিছু মুখ ফুটে বলা হয় না। দু-দণ্ডের নীরবতা যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে হাজার কথার চেয়ে। চোখ মুছে সরমা বলে, 'নে সকাল থেকে খাটছিস অনেক, দুটি খেয়ে নে।'

ইতিমধ্যে সুমন ফিরে আসে। আর কদিন পর ফেরা। তাড়া লাগায় মাকে। বলে সব নিতে হবে না। ওখানে সব পাওয়া যায়। টুকিটাকি জিনিস নিলেই চলবে। ওদেশে পৌঁছে সব হয়ে যাবে। সাত-পাঁচ আরও অনেক কথা বলে সুমন। সরমার কানে কথাগুলো গেলেও, ওর মন পড়ে আছে অন্য খানে। সুমনের বাবার ছবিটা কোলের কাছে নিয়ে আঁচল দিয়ে ভালো করে মোছে। মনে হয়, শুধু ওর দিকেই তাকিয়ে আছে মানুষটা। মনে হয়, কী যেন বলতে চাইছে ছবিটা। মনে মনে হাসে সরমা; দুর্বলতা, আর কি! ছবিটা যত্ন করে বাক্সের ভেতর রাখে। তখনও মনে হয় ছবিটা যেন কথা বলতে চাইছে। ধুস্ এখন এসব করলে চলবে। ফিসফিস করে ছবির দিকে তাকিয়ে বলে— 'খুব যত্নে রাখবো তোমাকে ওদেশে। দেখে নিও।'

পুজোর কটা দিন ঘোষাল বাড়িতে আনন্দের বান ডাকে। হৈ চৈ, খাওয়া দাওয়া,

সন্ধ্যায় নানা অনুষ্ঠান জমজমাট করে রাখে গোটা চত্বরটা। হাজারো লোকের আনাগোনা তখন ও বাড়িতে। গানের অনুষ্ঠান, নাটক, এসবের আসর মাতিয়ে রাখে রাত্রি। এপাড়া, ও- পাড়ার বহু মানুষ দেখতে আসে অনুষ্ঠান। বুক ভরে যায় বটকৃষ্ণর। আছে, এখনও সব আছে। মরা গাঙে যেন বান ডাকে পুজোর কটা দিন এবাড়িতে। চারিদিকের নানা ভাঙনের কু-ডাক যেন ছুঁতে পারে না ঘোষালবাড়িকে এ-কটা দিন। দশমীর সকালে ছবিটা পাল্টে যায়। সবাই কেমন মনমরা হয়ে ঘোরে। বাড়ির ভেতরটা যেন থমথম করে। আত্মীয় বন্ধুরা এক বিষাদের ছায়ায় যেন কথার খেই হারিয়ে চুপ মেরে যায়। এই দিন বটকৃষ্ণ অন্য মানুষ। কাঁদতে থাকে মাঝে মাঝে। কারোর সঙ্গে কথা নেই তার এদিন। ছেলে-বৌরা বলে, 'বাবা ছুটি নিয়ে নিন। শরীরটা তো বেনিয়ম মানবে না বাবা।' কেমন উদাস দৃষ্টিতে তাকায় বটকৃষ্ণ 'বলছো মা'। ছোট ছেলের মতো, বাধ্য ছেলের মতো একটু প্রসাদ মুখে দেয়। তারপর ছোট ছেলের মতো মুখ ফিরিয়ে থালাটা সরিয়ে রাখে। সবাই বোঝে, আর বলে লাভ নেই।

বিসর্জনের সব ব্যাপারটা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছায় গঙ্গার ঘাটে পৌঁছানোর পর। 'মা, মাগো' বলে অঝোরে কেঁদে চলে বটকৃষ্ণ— 'আবার আসিস মা। ছেলেকে ভুলিস না। মা, মারে, এই হতভাগাকে মনে রাখিস মা।' মূর্তি জলে তালিয়ে যাবার পর এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে বটকৃষ্ণ। কাছে যে থাকে, তার দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো বলে ওঠে, 'কৈলাসে চলে গেল মা।' সবাই ধরাধরি করে গাড়িতে তোলে বটকৃষ্ণকে। চোখ বুজে গা এলিয়ে গাড়িতে পড়ে থাকে সে।

আজ বিজয়া দশমী, পুজো শেষ। সারা শহরটা যেন কেমন ঝিমিয়ে আছে সকাল থেকে। আজ সরমা ছেলের সঙ্গে যাবে বহুদূর দেশে। মাঝে মাঝে কেমন ভয় ভয় করছে ওর। কি জানি কী হবে! মানাতে পারবো তো ওদেশের সবকিছুর সঙ্গে। মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে। পাশের ফ্ল্যাট, ওপর, নীচের এতদিনের সঙ্গীরা আসছে দেখা করতে। সবাই বিদায় জানাচ্ছে। সবাই বলছে, 'ভালো থাকবেন ওখানে। ফোনে কথা হবে মাঝে মধ্যে, কখনও ইচ্ছে হলে আসবেন। উঠবেন আমাদের বাসায়। এ বাসা আপনার।' দূরে চলে গেলে কেমন আপন হয়ে ওঠে সবাই, কোনোদিন এত আপন মনে হয়নি ওদের। আজ সব ছেড়ে শিকড়টা উপড়ে ফেলার মুহূর্তে সরমার মনে হয়, কতো ভালোবাসার, কতো আপনার এরা সবাই। কেন যাচ্ছি এদের ছেড়ে? কী সুখ আছে ওদেশে? ভাবে সরমা। সবাই বলে, ছেলের চোখে চোখে থাকবেন। কী সুখ। আনমনে সরমা ভাবে, কী জানি, সুখ কিসে?

সুমন মাঝে মাঝে তাড়া লাগায়। 'কী বসে বসে ভাবছো সারাদিন! এত কাঁদছো কেন? এখন পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে মা। দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়।'

এয়ারপোর্টে পৌঁছে চমকে যায় সরমা, কী বিরাট ব্যাপার। হকচকিয়ে যায়। ঝাঁ-চকচকে বিশাল ইমারতের সামনে কেমন জড়োসড়ো হয়ে যায় সে। মাকে একপ্রান্তে বসিয়ে সুমন বলে, 'একটু এখানে বসো মা। আমি আসছি।' বসে অপেক্ষা করে সরমা। ঘন্টাখানেক বসে থাকার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেকে খাঁজে সে। বড় সুটকেসটার গায়ে হাত বুলোয় বোকার মতো। সিকিউরিটির লোকেরা এসে ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছে সরমার কাছে। জানতে চায়, কোথায় যাবেন? সরমা জানায়, তার গন্তব্য আমেরিকা। শুনে ওরা বলাবলি করে, তাহলে বোম্বের প্লেন ধরবে নিশ্চয়। ওখান থেকে বিশ্বের নানা প্রান্তে উড়ে যায় সবাই। ইতিমধ্যে ঘন্টা তিনেক পার হয়ে গেছে। সুমনের দেখা নেই। অস্থির হয়ে সরমা জানতে চায় সিকিউরিটির লোকেদের কাছে, 'ছেলেকে খুঁজবো কোথায়?' ওরা ভেতর থেকে খোঁজ নিয়ে আসে। বলে, 'সুমন রায় নামের এক যাত্রী বোম্বের ফ্লাইট ধরে চলে গেছে।' মুহূর্তে চারিদিকটা কেমন অন্যরকম হয়ে যায় সরমার কাছে। শূন্য মনে চারিদিকটা দেখতে থাকে ও। ভিড় জমে গেছে ওর চারিদিকে। লজ্জায়, ঘেন্নায় কাঁদতে থাকে সরমা। মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারে না সে। শুধু মনে হয়, সব, সব বিক্রি করে জীবনের যা কিছু সঞ্চয় তুলে দিলাম দশটা মাস যাকে, অনেক স্বপ্ন দিয়ে গড়েছিলাম এই শরীরে, তার হাতে! কে সে? সম্বিত ফেরে 'মা' ডাকে। 'হইসে কি মা? পোলায় ফেলায়া গেছে? অহন যাবেন কোথায়?' 'জানিনা বাবা'—অস্ফুটে, নিজের অজান্তে যেন বলে বসে সরমা। 'জিগাই আপনারে, কেউ আছে বা এহানে?' সরমা শুধু তাকিয়ে থাকে। ভাবে, কোন লজ্জায় ফিরব ও ওই ফ্ল্যাটে? তাছাড়া ওটাতো এখন ওর নয়। পাশের যারা বলেছিল, আসবেন, এখন হয়তো তারাই মুখ টিপে হাসবে। পারবো না ওদের কাছে হাত পাততে। সবশেষে মা গঙ্গা তো আছেন। একটু কোল দেবে না হতভাগী মেয়েকে? লোকটা হঠাৎ বলে ওঠে, 'চলেন মা আমার ওহানে। গরিবের ঘর। পরে ভাইববেন পরের কথা। অহন ওঠেন আমার রথে।' অটোতে বাক্সটা তোলে। সরমার হাত ধরে তোলে অটোতে। যন্ত্রচালিতের মতো সিটের ওপর গা এলিয়ে বসে সে। চারিপাশে শহরটা সরে সরে যাচ্ছে ওর চোখের সামনে থেকে। কিছুই যেন দেখছে না সরমা, চোখ বুজল সে। চোখের সামনে শুধু সুমনের বাবার ছবি। কী যেন বলতে চেয়েছিল ছবিটা?

কখন পৌঁছে গেছে ছোট্ট টালির একটা বাড়ির সামনে। ছোট ছোট টালির বাড়ি। মাটির রাস্তা। গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে বাড়িগুলো। চোখে পড়ে তুলসীমঞ্চ, লেবু গাছ, আরও কত ছোট বড় গাছের সমাহার। অবাক চোখে তাকায় সরমা। এই কলকাতার বিলাসবহুল বহুতলের পায়ের কাছে, শহরের পেটের ভেতর এমন জায়গা আছে? সরমাকে দেখতে লোক জড়ো হয়েছে চারিদিকে। বাচ্চাগুলো যেন মজার জিনিস দেখছে। অস্বস্তি হয় সরমার। লোকটার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি এতক্ষণ। আসলে মাথাটা যেন কাজ করছে না তার। জিজ্ঞাসা করে সসঙ্কোচে, 'বাবা তোমার নামটা জানা হল না।' 'আমারে হক্কলে ডাকে মৌধা। আপনে মধু ডাকবেন।' ইতিমধ্যে মধুর বৌ এসে মিষ্টি হেসে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায় সরমাকে। বসায় চৌকিতে। ঘরে একটা চৌকি, দুটো বেতের মোড়া, ছোট একটা টেবিলের ওপর টিভি সেট। ঘরের দেওয়ালে তাকে নানা দেবদেবীর মূর্তি। মধুর বৌ নিজে থেকেই বলে— 'লক্ষ্মী বইলবেন আমারে। অহন কাপড় ছাইড়া নেন।' চুপ করে বসে থাকে সরমা। লক্ষ্মী বলে, 'একটু চা আনি?' শুধু তাকায় সরমা, হ্যাঁ, না কিছু বলতে পারে না। একটা বছর ছ-সাতের নোংরা ফ্রক পরা মেয়ে উঁকি ঝুঁকি মারে ঘরের বাইরে থেকে। সরমা ইশারায় ডাকে। 'কী নাম তোমার?' 'আমার নাম দুগ্গা' বলে, গড়গড় করে বলতে থাকে, 'বাবা বইলছে, তুমি আমাগো ঠাম্মা হও। তুমি না হি খুঁজছিলা আমাগো বাসা? বাবা তোমারে পাইসে, রাস্তার ধারে, ঠারায় ছিলা তুমি? জানো আমার একখান পুতুল হারাইসে!'

কাছে টেনে নেয় মেয়েটাকে সরমা। টলমলে স্বচ্ছ দুটো চোখ মেয়েটার। কী এক মায়ার ভরা দুটো চোখ। বুকের কাছে চেপে ধরে মেয়েটাকে সরমা। ওর দুচোখ থেকে অঝোর ধারায় জল পড়ে। দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে মেয়েটার কপালে। মুখ তুলে তাকায় সে, বলে, 'তোমার কি পুতুল হারাইসে, ঠাম্মা?'

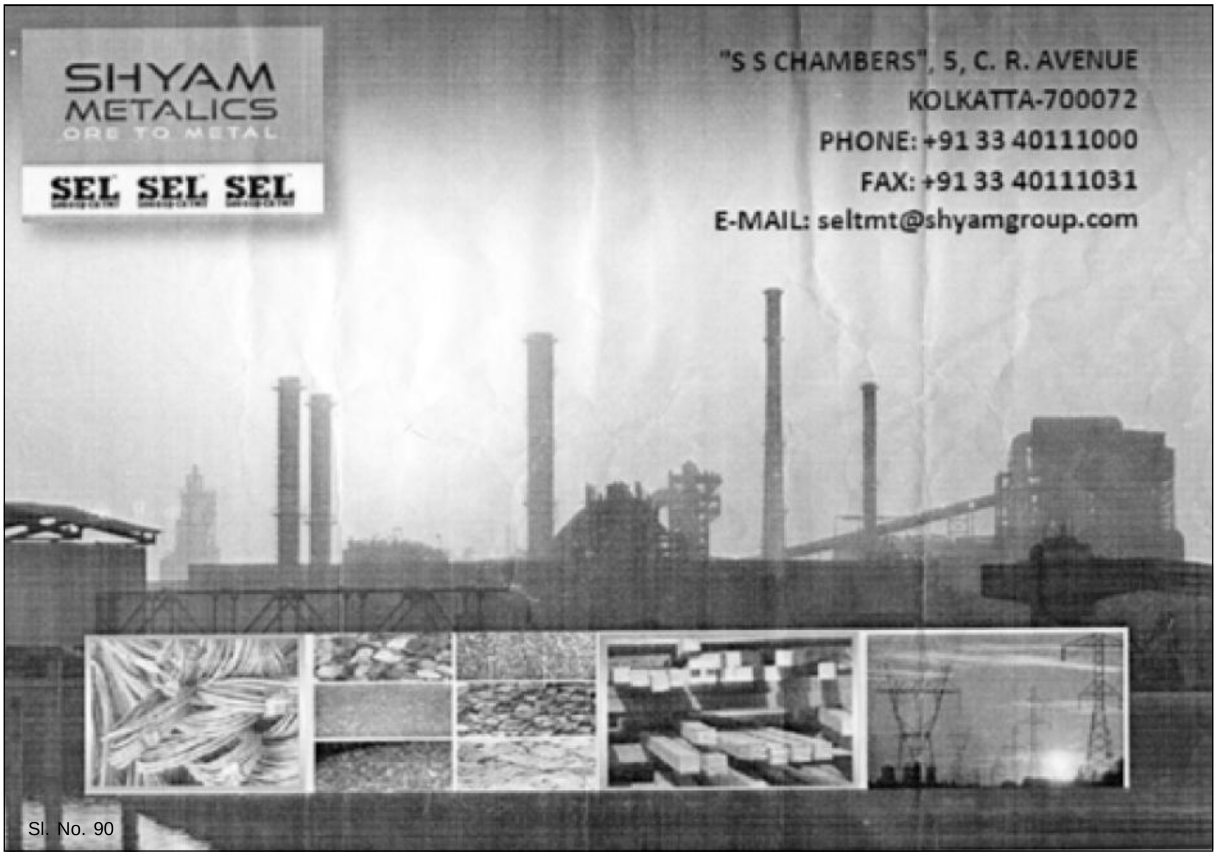

With best compliments of

FRIENDS DECORATORS & CATERER

Kunustoria More, P.O. Toposi, Dist. Paschim Bardhaman

Ph : 9932367879, 8116167478, 9832207447

Sl. No. 92

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কুলটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ৪৭, কে.টি., স্থাপিত : ১৭-০৮-১৯৬১

নিজস্ব সমবায় হিমঘর

আমাদের পরিষেবা : সেভিংস RD, TD ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, বন্ধকী ঋণ ব্যবস্থা (N.S.C. ও K.V.P. পিতল, কাঁসা জমা দিয়া)

Sl. No. 141

শতাব্দীর বিশ্রুত এক সূর্যগ্রহণ

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

ভারতের যে-কোনো বড়ো শহরে, দিনেরবেলায় যদি দেখেন যে রাস্তা ফাঁকা, তবে তার একটা কারণ হতে পারে যে সেই সময় সূর্যগ্রহণ চলছে বা তার কিছু পরে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে। অন্য দিকে, ১৯১৯ সালের ২৯ মে একটি সূর্যগ্রহণ দেখতে দুটি বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দল তাদের টেলিস্কোপ ফোকাস করে অপেক্ষা করতে লাগল। তারা তাদের ক্যাম্প বসিয়েছিল ব্রাজিলের সোব্রালে ও পশ্চিম আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রিনসিপে। দুটি দলই এসেছিল একই গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে। ওই পরীক্ষালব্ধ রিডিং দিয়ে, তাঁদের নিজ দেশে, ইংল্যান্ডে ফিরতে একমাস কেটে গেল। এই রিডিংগুলির নিখুঁত পর্যালোচনা করে তার ব্যাখ্যা দিতে লাগল আরও চার মাস। অবশেষে, সবদিক থেকে বিচার করে, সন্তুষ্ট হয়ে ৬ নভেম্বর, ১৯১৯ ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁরা তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

শুনে সভার সকলে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন! নিউটনের সিদ্ধান্তই তাহলে শেষ কথা নয়! এমনকি মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেও! রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি, নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী, ইলেকট্রনের আবিষ্কর্তা জে.জে. টমসন মন্তব্য করলেন, ‘‘নিউটন-উত্তর যুগে, মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে এটিই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার!’’

পরদিনই, ৭ নভেম্বর, ১৯১৯ (রুশ বিপ্লবের দুই বর্ষপূর্তিও পালিত হচ্ছে) লন্ডনের ‘টাইম্‌স’ পত্রিকায় হেডলাইন বেরল—‘‘বিজ্ঞানে বিপ্লব : ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে নতুন থিওরি : নিউটনের মতবাদের পতন।’’ অনুবাদটা ঠিক আক্ষরিক হয়নি। মূল হেডলাইনট ছিল—‘Revolution in Science: New Theory of the Universe: Newtonian Ideas Overtuned.’ : এই ‘Overtuned’ শব্দটির যথাযথ তর্জমা হয় ‘কুপোকাৎ’ কিন্তু কথাটা একটু আটপৌরে বলে আর ব্যবহার করলাম না। তবে সত্যিই, ‘বদলে গেল মতটা’।

আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমসের হেডলাইন ছিল, আরও চাঞ্চল্যকর। তাঁরা লিখলেন, ‘‘স্বর্গের (Heavens বলতে অবশ্য আকাশই, তবে চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে ওই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তাই স্বর্গই ব্যবহার করলাম) সব আলোকরশ্মির পথই বাঁকা : আইনস্টাইনের থিওরির জয়।’’ (Light all askew in the heavens: Einstein’s Theory Triumphs) তারপরই লেখা হল, সাবটাইটেল হিসেবে, ‘গ্রহণ-লব্ধ ফলাফলে বিজ্ঞানী সমাজে প্রবল চাঞ্চল্যকর উত্তেজনা’, ‘আইনস্টাইনের থিওরির জয়’, ‘নক্ষত্রের আনুমানিক অবস্থান তাদের প্রকৃত অবস্থা নয় বা গাণিতিক হিসাব অনুসারেও নয়, কিন্তু দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।’

বিশ্বর দরবারে ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রবেশ তখনও হয়নি। কিন্তু এই মৌলিক আবিষ্কারের মূল্য বুঝতে তাঁদের কোনো দ্বিধা ছিল না। ড. মেঘনাদ সাহাকে উদ্ধৃত করে, ১৩ নভেম্বর ১৯১৯, কলকাতার প্রসিদ্ধ ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র ‘দ্য স্টেটসম্যান’ লিখল, ‘‘বিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন : সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফলে যুগ-যুগান্তের স্বীকৃত মতের পরাভব’ (A scientific sensation: Certainty of Ages Overthrown by Recent Experiments)। তারপরই লেখা হল : ‘‘গতকাল রয়টার প্রেরিত টেলিগ্রামে ঘোষিত খবর যে অধ্যাপক আইনস্টাইনের স্থান-কালের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরীক্ষাগত প্রমাণ, পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় পাওয়া গেছে। তা অতি আনন্দের সঙ্গে বিজ্ঞানী সমাজে সমাদৃত হবে।...’’ সমাদৃত হবারই কথা। চিন্তার জগতে, স্থান-কাল-বস্তুর বিষয়ে এক মৌলিক ও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে গেল।

আইনস্টাইন তাঁর সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্বে যা উপস্থাপন করলেন, তা সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে বোঝা সহজ নয়। তবে, তা যদি না-ই বা হয়, তাতে বাধা কী? প্রকৃতি তো আমাদের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে গঠিত হয়নি, আর শুধু পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বোঝার বিষয় তো নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পদার্থবিজ্ঞানে যে সংকট তৈরি হয়েছিল, তা থেকে মুক্তির খোঁজে পথ দেখিয়েছিল, প্রথমে প্ল্যাংকের কোয়ান্টামবাদ ও তার পাঁচ বছর পর, ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আবিষ্কৃত বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Special Theory of Relativity)। এরই দ্বারা আইনস্টাইন বলবিদ্যা ও বিদ্যুৎ-চৌম্বকত্বকে একই সূত্রে গ্রথিত করেন। তার মূল বিষয়টি হল এই—ধরা যাক, দুই অবলোকনকারীর মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ হল v, ও তা সবসময়ই অপরিবর্তিত। সেক্ষেত্রে, বিশেষ আপেক্ষিকতার সূত্র অনুসারে : (১) যে-কোনো প্রক্রিয়া, দুই অবলোকনকারীর কাছে হবে অভিন্ন ও (২) বস্তুহীন শূন্যতায়, আলোকের গতিবেগ c = 300,000 km/sec হল এক অভিন্ন ধ্রুবক যা অবলোকনকারীর গতির ওপর নির্ভর করে না।

এইটি করতে গিয়ে আইনস্টাইন স্থান (length ‘l’) ও কাল (time ‘t’)-কে একই সঙ্গে বেঁধে দিলেন এক জ্যামিতিক সূত্রের মাধ্যমে। এর থেকেই বেরিয়ে এল যে স্থান, কাল ও ভর অভিন্ন ধ্রুবক নয়, যা গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতার স্তম্ভ। তারা হল আপেক্ষিক। যদি দুই অবলোকনকারীর মধ্যে আপেক্ষিক বেগ হয় ‘v’ ও তারা যদি কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় স্থান, কাল ও ভরের নির্ণয় করে, তারা যে অভিন্ন সংখ্যা পাবে তা নয়। ধরা যাক, এক অবলোকনকারীর নাম হল A ও অপরের নাম হল A' এবং B ও C নামের দুই ব্যক্তিকে বলা হল—A, B ও C তোমরা নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক। প্রথমে B গুলির আওয়াজ করবে ও তার t সেকেন্ড বাদে C-ও একটি গুলির আওয়াজ করবে। এইখানে A ও

B, B ও C, C ও A-র মধ্যে আপেক্ষিক বেগ হল 'O' কিন্তু A' ও ও A, A' ও C-র মধ্যে বেগ হল *v*। এখন A যদি মেপে দেখে যে B ও C-এর মধ্যে দূরত্ব হল '*l*' ও দুইটি বন্দুকের আওয়াজের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হল '*t*', সেই হিসাব কিন্তু A'-এর নির্ণীত ফলের সঙ্গে মিলবে না। এই বিশেষ আপেক্ষিকতা অনুসারে, A'-র নির্ণীত ফল হবে—

$$e' = e\sqrt{1-v^2/c^2}$$

$$t' = t/\sqrt{1-v^2/c^2}$$

ঠিক তেমনি, ধরা যাক কোনো এক বস্তু যা A-র হিসেব অনুসারে হল গতিহীন; সেই বস্তুটির ভর, A-র নির্ণীত হিসাব অনুসারে যদি হয় m_0, তা হলে A'-এর হিসাব অনুসারে হবে,

$$m = m_0\sqrt{1-v^2/c^2}$$

এর থেকেই কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়—(১) কোনো ভরযুক্ত বস্তুর বেগ, আলোর বেগেরে চেয়ে বেশি হতে পারে না, (২) কোনো বস্তুর মান হল $E = mc^2$ যেখানে *m*-এর সমীকরণ উপরে দেওয়া আছে।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের পেপারে উপরোক্ত যুগান্তকারী সিদ্ধান্তগুলি আমরা পাই, কিন্তু ১৯১০ সাল অবধি এই পেপার বা তাঁর সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান জগতে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশেষে, তেজস্ক্রিয়তা থেকে আরব্ধ নানান পরীক্ষামূলক গবেষণা থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির নানানভাবে সমর্থন আসতে থাকে। আইনস্টাইন ক্রমশ খ্যাতিলাভ করতে থাকলেন।

এই সাফল্য সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন কিন্তু আইনস্টাইনকে পীড়িত করে চলছিল। আগের উদাহরণে দেখছি যে A ও A'-এর মধ্যে আপেক্ষিক বেগ সর্বদাই হল *v* (uniform velocity) যা হল অপরিবর্তিত। অর্থাৎ তারা হল পরস্পরের চোখে ত্বরণহীন অবলোকনকারী (unaccelerated observer)। কিন্তু, সেটা যদি না হয়? অর্থাৎ, দুই অবলোকনকারীর A ও A' মধ্যে গতি যদি ত্বরণশীল (accelerated) হয়, সেক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা সূত্র কী হবে?

এই প্রশ্নগুলি এমনই মৌলিক যে বিজ্ঞান জগৎকে একদিন তার মুখোমুখি হতেই হতো। কিন্তু বিজ্ঞান জগতে এই প্রশ্নের আভাস আসার আগেই, আইনস্টাইন এর উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টায় মেতে উঠলেন। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা, এখানেই তিনি অনন্য।

কোন দিকে এগোব? তার দিক নির্ণয় কীভাবে তিনি করলেন, তা বলা মুশকিল। তেমন পরীক্ষাগত তথ্যও তাঁর বা অন্য কোরো হাতে ছিল না। এক্ষেত্রে যা হয়, সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় মনোগত চিন্তার ওপর। এই সংগ্রামের মধ্যেই উদ্ভূত হয় সূক্ষ্মতা, পাওয়া যায় আলোর উৎস। তৈরি হয় নতুন তত্ত্ব বা থিওরি। কিন্তু এই থিওরিকেও যেতে হবে নানান পরীক্ষার ভেতর দিয়ে। প্রমাণিত হলে, তবেই সে বিজ্ঞান জগতে স্থান পাবে, আর 'তা' না হলে সে পরিত্যক্ত হবে। এখানেই অনেকেই মনে করেন, আইনস্টাইন ছিলেন চিন্তাবিদ। চিন্তাবিদ অবশ্যই, কিন্তু শুধুমাত্র চিন্তাবিদ তিনি ছিলেন না। তাঁর সিদ্ধান্তগুলির পরীক্ষাগত প্রমাণ লাভের বেলায়ও তিনি ছিলেন অতি সচেতন ও যত্নশীল। পরীক্ষাগত ফলাফলের ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন বিশেষভাবে পারঙ্গম। সেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও তাঁর নজর এড়াত না। ঠিক তেমনই কোন্ তত্ত্বের পরীক্ষাগত প্রমাণ পেতে কী কী ধরনের পরীক্ষা প্রয়োজন, তাও তিনি গভীরভাবে বুঝতেন, সেখানেও পরম সূক্ষ্মতার দাবি তিনি করতেন।

সম্ভবত পথের নির্দেশ এসেছিল তাঁরই 'বিশেষ আপেক্ষিকতা' থেকেই। ১৯০৮ সালে, বিখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ হেরমান মিন্‌কাউস্কি দেখালেন যে একটি চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্র যার চারটি স্থানাঙ্ক হল (x_1= x, x_2= y, x_3= z, x_4= ict, যেখানে $i = \sqrt{-1}$) যদি চিন্তা করি, তাহলে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা বোঝা সম্ভব ও সহজ হয়। মনে রাখতে হবে এই চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্রের কোনো প্রাকৃতিক অস্তিত্ব নেই। এটি একটি গাণিতিক চিত্র, কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্বে এটি হয়ে দাঁড়াল অপরিহার্য। (চিত্র নং ১)

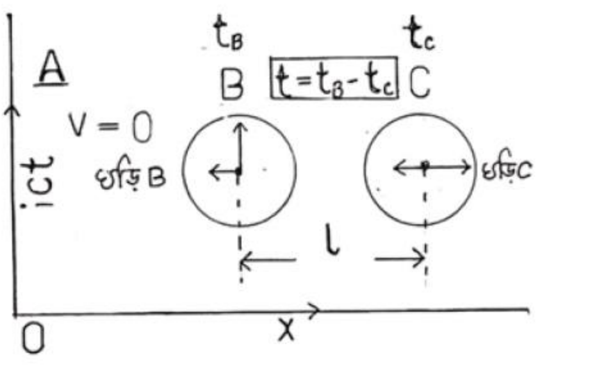

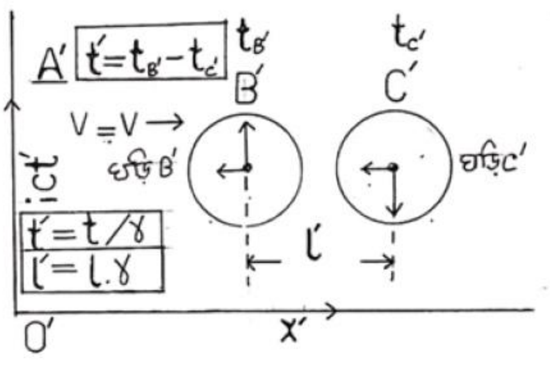

চিত্র ১ : পরিস্থিতির বর্ণনা A ও A' হল দুই অবজারভার, দুজনের মধ্যে অপরিবর্তনশীল বেগ '*v*' হল যা কিনা x-axis এর দিকে নির্দেশিত। B যখন বন্দুক ছুঁড়ল তখন দুজনেই ঘড়ি মিলিয়ে নিল, দু-জনের ঘড়িতেই বেজেছে ৯টা। সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঘড়ি B ও B'-এ। এবার A-র ঘড়ি অনুসারে (ঘড়ি C) C বন্দুক ছুঁড়ল ০৯:১৫:০০তে, A' এর ঘড়িতে (ঘড়ি C') তখন বেজেছে ০৯:৩০.০০। এক্ষেত্রে, A-র মাপা সময়ের ব্যবধান হল $t=t_B-t_C$= ১৫ মিনিট। আর A'-এর মাপা সময়ের ব্যবধান হল $t'=t_{B'}-t_{C'}$ =। $t = \frac{t}{¥}$ যেখানে $¥ = \sqrt{1-v^2/c^2}$ । B ও C মধ্যের দূরত্ব, A মাপবে, BC=*l* কিন্তু A' মাপবে, B'C'=*l*'=*l*.¥ । এক্ষেত্রে *t*=15, *t*'=30 ৩০ মিনিট, অতএব $¥ = \frac{1}{2}$, ও $v^2/c^2 = \frac{3}{4}$ ও *l*'=*l*/2।

এই বিশেষ গাণিতিক চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে মিনকাউস্কি বললেন, ‘‘স্থান ও কালের যে চিত্র আমি রাখব, তার উদ্ভব কিন্তু হয়েছে হাতে-কলমে পরীক্ষামূলক গবেষণা থেকে, এখানেই হল তার সাফল্যের শক্তি। বিষয়টি অভিনব। এখন থেকে, স্থান ও কাল তাদের নিজস্ব ছায়ায় বিলীন হয়ে যাবে এবং এই দুই-এর সমন্বয়ের মধ্যেই আমরা তাদের আলাদা করে দেখতে পাব।’’

মিনকাউস্কির কথা ঠিক। ত্বরণহীন অবলোকনকারীদের ক্ষেত্রে, এর যথার্থতা মেনে নিয়ে, আইনস্টাইন প্রশ্ন করলেন, ‘‘ত্বরণশীল অবলোকনকারীর (accelerated observers বা non-inertial observers) ক্ষেত্রে কী হবে? আর মাধ্যাকর্ষণকেই বা এর মধ্যে আনব কীভাবে?’’ আর তার সঙ্গে প্রশ্ন হল, ‘‘সেক্ষেত্রে, আপেক্ষিকতার মূল সূত্র কী হবে?’’

এই সংগ্রাম হয়ে দাঁড়াল অজ্ঞানতার মুখোমুখি হয়ে এক তুমুল সংগ্রাম। এবং আইনস্টাইনের একক সংগ্রাম!

তার আগে Eotvos ও Zeeman-এর কিছু পরীক্ষামূলক গবেষণা ছিল বটে, তবে তার দ্বারা আইনস্টাইন কতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা বলা মুশকিল। সম্ভবত তার প্রয়োজনও ছিল না।

আইনস্টাইন বুঝলেন যে non-inertial পরিস্থিতিতে, মিনকাওস্কির পদ্ধতি চলবে না, কারণ সার্বিক আপেক্ষিকতার মূল প্রস্তাবনা যা আইনস্টাইন রাখলেন, তা হল, ‘‘যে-কোনো প্রক্রিয়াই, অবলোকনকারী নির্বিশেষে হল অভিন্ন।’’ একে বলা হয় ‘Equivalence Principle’। এই Equivalence Principle কিন্তু মিনকাউস্কির জ্যামিতিক পদ্ধতিতে রক্ষিত হয় না। তা হলে সমাধান কোথায় হবে?

এখানে আইনস্টাইন আবার নিয়ে এলেন তাঁর অনন্য স্বকীয়তা। তিনি বললেন : মিনকাউস্কি কৃত স্থান কাল ক্ষেত্র, ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অনুসরণ করে। এখানে স্থানাঙ্ক নির্ধারণের চারটি অক্ষপথ চলে সরলরেখায়। ত্বরণহীন অবলোকনকারীর ক্ষেত্রে তা প্রয়োজনীয় ও সম্পূর্ণ। কিন্তু ত্বরণশীল অবলোকনকারীর ক্ষেত্রে এই অক্ষপথ যাবে বেঁকে। এই অক্ষপথের বক্রতাও নির্ভর করবে এই ত্বরণশীলতার ওপর। কোনো ভরযুক্ত বস্তুর উপস্থিতিতে, মাধ্যাকর্ষণের ফলে এই অক্ষপথের বক্রতা নির্ধারিত হবে। যে-কোনো প্রক্রিয়াকে, অবলোকনকারী নির্বিশেষে অভিন্ন আকার দিতে হলে, এই বক্রতাযুক্ত স্থান-কালের অক্ষরেখায় তাকে হিসাব করতে হবে। এবং সেই হিসাবের সমীকরণ আইনস্টাইন দিলেন।

প্রস্তাবটি অতি দীর্ঘ কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। অবস্থা ত্বরণহীন হলে, বা মাধ্যাকর্ষণের অনুপস্থিতিতে, এই চতুর্মাত্রিক স্থলের অক্ষপথের বক্রতা হবে শূন্য, অর্থাৎ আমরা আবার ফিরে যাব, সেই মিনকাউস্কির জগতে।

ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম। আমরা গ্রাফপেপারে যখন অক্ষপথ আঁকি, x ও y-এর অক্ষপথ যায় সরলরেখায় ও পরস্পরের মধ্যে সৃষ্ট কোণ হল একটি সমকোণ। এবার গ্রাফপেপারে যে-কোনো দুটি বিন্দু যথা P, Q—তাদের দূরত্ব মেপে নিন। এবার সেই গ্রাফ পেপারটিকে সেঁটে দিন একটি গ্লোবের ওপর বা একটি বলের ওপর। গ্লোবের পৃষ্ঠদেশ সমতল নয়, তাই দেখবেন যে গ্রাফ পেপারের লাইনগুলিও যেন বেঁকে যাচ্ছে। এবার গ্লোবের ওপর এই দুই বিন্দু P ও Q-এর অবস্থান দেখুন। তাদের মধ্যে দূরত্বের হিসাব কীভাবে করব? একটি সরলরেখা টেনে কি? যা সমতল ক্ষেত্রে সঠিক হিসাবই দেবে। কিন্তু ওই গ্রাফ পেপার, গ্লোবের ওপর সাঁটা অবস্থায়, সেখানে তো অসংখ্য লাইন যোগ করা সম্ভব? কোনটা ঠিক? (চিত্র নং ২)

উত্তরটা হল, এক্ষেত্রে সমতল গ্রাফপেপারে আঁকা (x, y) অক্ষাংক ব্যবহার করলে চলবে না, কারণ এর অক্ষগুলিই তো বেঁকে

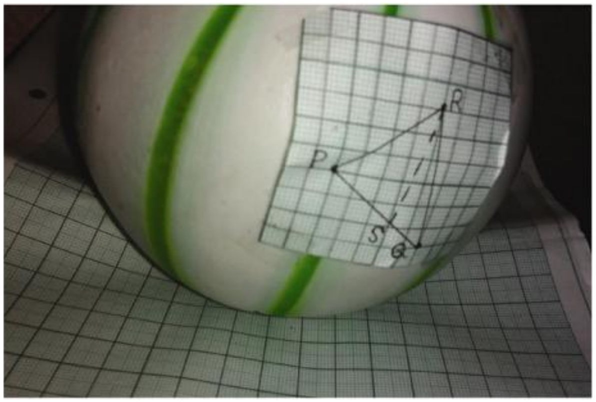

চিত্র ২ : গ্লোবের ওপর আঁকা অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা কি সরলরেখা হয়? বলটির ওপর আঁকা ডোরা দাগগুলি বলটির উপরের মেরু থেকে নিচের মেরু অবধি গেছে যে লাইন ধরে, সেটিই হল এই গোলকের পৃষ্ঠদেশে এই দুই মেরুর মধ্যে সবচেয়ে কম দৈর্ঘ্যের লাইন, একে বলে geodesic। এটি কিন্তু সরলরেখা নয়। কারণ জ্যামিতি আর Euclidean নয় হয়ে গেছে Riemannian। এই জ্যামিতিক চিত্র আইনস্টাইনকে বিশেষভাবে ব্যবহার করতে হয়েছিল। এবার একটি সমতল গ্রাফপেপারকে বলটির ওপর সেঁটে দিন। দেখবেন গ্রাফপেপার যেন কুঁচকে না থাকে বা গ্রাফপেপারে ভাঁজ যেন না পড়ে। অক্ষরেখাগুলি এবার আর সরলরেখায় চলে কি? P, Q, R এর দূরত্ব এবার কত? নিচের গ্রাফপেপারটি রেখেছি একটি স্পঞ্জের উপর ও তার উপর রেখেছি বালিভরা একটি বল। দেখুন, এই বালিভরা বলের ওজনের দরুণ নিচের গ্রাফপেপারের রেখাগুলি বেঁকে গেছে। তেমনই, (এটি একটি উদাহরণ মাত্র) ভরযুক্ত বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের দরুণ স্থান-কালের অক্ষরেখাও বেঁকে যায়; সমতল গ্রাফপেপার দিয়ে স্থান-কালের অবস্থান আর নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। ওই স্থান-কাল রেখার জটিলতা এই সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, এবং আমাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।

গেছে। এ-ক্ষেত্রে হিসাবের সূত্র হতে হবে অন্য, যার জন্য গ্লোবের ওপর টানা হয় অক্ষাংক (latitude) ও দ্রাঘিমা (longitude)। এরা কিন্তু সরলরেখা নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে সব হিসাবই করতে হবে এদের ব্যবহার করে। ইউক্লিডীও জ্যামিতির সরলতা আর এখানে থাকবে না, রিমানিয় জ্যামিতির জটিলতা এখানে আনতেই হবে।

কিন্তু বাধা অবশ্যই ছিল। তা হল গাণিতিক পদ্ধতি, যা ছিল ১৯১২ সাল পর্যন্ত আইনস্টাইনের অজানা। তিনি গাউসের (Carl Friedrich Gauss) অসমতল ক্ষেত্রের গাণিতিক গবেষণার কথা জানতেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু ও এককালের সহপাঠী মারসেল গ্রোসমানকে তাঁর সমস্যার কথা জানালেন ও সাহায্য চাইলেন। গ্রোসমান নিজে ছিলেন গণিতজ্ঞ, পরদিনই এসে তিনি আইনস্টাইনকে রিমান (Berhard Riemann) ও রিচি (Grigorio Ricci)-র গবেষণা বিষয়ে জানালেন। অসম্ভব ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁদের গবেষণাপত্রগুলি পড়ে আইনস্টাইন বিষয়গুলি আয়ত্ত করলেন।

এইভাবেই তাঁর সামনে এক নতুন জগৎ খুলে গেল। Equivalence Principle-কে পালন করতে হবে কীভাবে এই অসমতল ও বক্রতা-যুক্ত চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের জগতে, সমীকরণগুলি কী-ই বা রূপ নেবে, তার নির্দেশ তিনি দিলেন।

এর থেকেই বেরিয়ে এলো চারটি সিদ্ধান্ত—

১. মাধ্যাকর্ষণের দরুণ, গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তের আকারে হয় না। তাদের কক্ষপথ হল কেপলার-বর্ণিত উপবৃত্তাকার আকারের চেয়ে জটিল (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

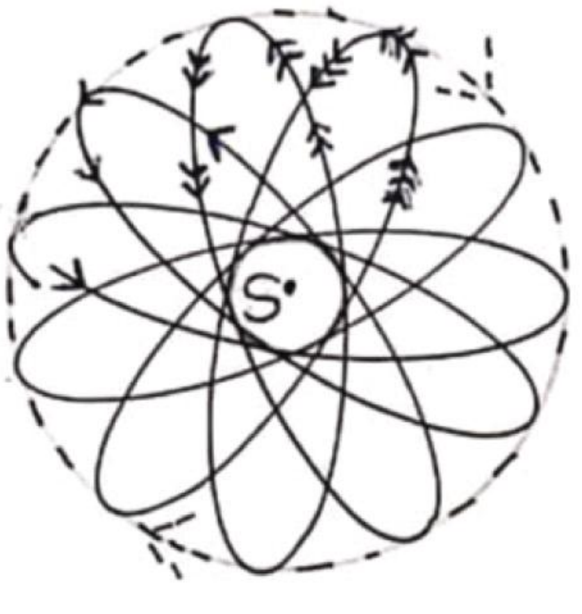

চিত্র ৩ : কেপ্লার ও নিউটনের সূত্র অনুসারে বুধগ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হবার কথা, কিন্তু আসলে তা দেখা যায় না। তার কক্ষপথের নকশা হল অনেকটা উপরের ছবির মতো। প্রতি প্রদক্ষিণের পর, উপবৃত্তের দিক পরিবর্তন হয়ে চলে, যার ব্যাখ্যা আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা থেকে পাওয়া যায়। উপরের ছবিটি একটি নমুনা মাত্র। ফুটপাথ থেকে কেনা স্পাইরোগ্রাফ-এর সাহায্যে আঁকা। আপনারাও চেষ্টা করুন। জ্যামিতির অনেক বিস্ময়ের খোঁজ পাবেন। উপবৃত্তগুলির দিক পরিবর্তন হয় ভগ্নরেখায় আঁকা বৃত্ত ও ভাঙা তির চিহ্ন বরাবর। সূর্যর অবস্থান হল S ও তিনটি উপবৃত্তের গতিপথ →, →→, →→→ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের অনুসরণ করে অন্যগুলির পথরেখা নির্ণয় করুন, আনন্দ পাবেন, আশা করি।

২. মাধ্যাকর্ষণের দরুণ, আলোকরেখার পথ পরিবর্তিত হয় ও যেদিকে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র বেশি, সেই দিকেই সে বেঁকে যায়।

৩. কোনো অণু বা পরমাণু থেকে নির্গত আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাধ্যাকর্ষণের উপস্থিতিতে দীর্ঘায়িত হবে ও তা লালের দিকে সরে যাবে। একে বলে Gravitational Red Shift (মহাকর্ষজনিত লোহিত্ব)।

৪. ভরযুক্ত বস্তুর ত্বরণশীল গতি (accelerated motion of massive object) স্থান কাল অক্ষের কম্পন সৃষ্টি করবে ও সেই কম্পন আলোর বেগে প্রবাহিত হবে। একে বলা হয় Gravitational Waves।

দুটি কথা এখানে বলতে হয়। অনেকে মনে করেন যে আইনস্টাইন ছিলেন গণিতজ্ঞ ও গণিতের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। সেটা ঠিক নয়। নিউটনের মতো গণিতে কোনো মৌলিক অবদান আইনস্টাইন রেখে যাননি। তিনি ছিলেন মূলত ও সর্বতোভাবে পদার্থবিদ। এই পদার্থবিজ্ঞান বুঝতে তিনি গণিতকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করে ব্যবহার করেছেন। নিউটন ছিলেন ক্যালকুলাস-এর অন্যতম আবিষ্কর্তা। আইনস্টাইনের বেলায়, সেইরকম কিছু বলা যায় না। এক্সপেরিমেন্টেও নিউটনের ছিল বিরাট প্রতিভা।

অপরদিকে, পরীক্ষাগতভাবে প্রমাণের খুঁটিনাটির প্রতি ছিল আইনস্টাইনের নিখুঁত ও সজাগ দৃষ্টি। ১৯১২-১৯১৫ সাল অবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি দাঁড় করালেন এই সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। কিন্তু তার পরীক্ষাগত প্রমাণ কোথায়? কীভাবেই বা তা আসবে?

তাঁর ১-নং সিদ্ধান্তের প্রমাণ খুঁজতে বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। সেই প্রমাণটা আসে কক্ষপথের (Orbit) বিশ্লেষণে।

বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথের হিসাব বহু শতাব্দী থেকেই আমরা জানি। কেপ্লার-পরবর্তীকালে আমরা বুঝলাম যে প্রতি গ্রহই সূর্যকে উপবৃত্ত আকারের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে চলেছে এবং এর প্রকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হল নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে। সৌরমণ্ডলের গ্রহসমূহের মধ্য বুধই হল সূর্যের সবচেয়ে কাছে ও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব এরই উপর সবচেয়ে বেশি। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বুধ সময় নেয় ৮৮ দিন। অর্থাৎ এক শতাব্দীতে (৩৬৫২৬ দিনে) সে প্রদক্ষিণ করবে ৪১৫ বার।

প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী পাওয়া হিসাব থেকে দেখা গেল যে বুধের কক্ষপথ, কেপ্লারের প্রথম সূত্র অনুসৃত উপবৃত্ত আকারে ঠিক চলে না। বরং এই উপবৃত্ত, বুধের এক প্রদক্ষিণের পর ঠিক তার আগের জায়গায় ফিরে আসে না। তার পরাক্ষ (major axis) ও উপাক্ষ (minor axis) তার পূর্বেকার অবস্থান থেকে, প্রতি শতাব্দীতে ৫৬০০" অর্থাৎ প্রায় ১.৫ ডিগ্রি ঘুরে যায়, (৩নং নম্বর চিত্র)। কিন্তু এই সৌরমণ্ডলে বুধ তো একা নয়, সূর্য ছাড়া অন্য গ্রহেরও প্রভাব তার ওপর ওই মাধ্যাকর্ষণের মাধ্যমেই পড়ে। অন্য সব গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের হিসাব নিলে এর ৫৫৫৭"-এর হিসাব মেলে। তাহলে বাকি ৪৩" (০.১১৯ ডিগ্রি)-র হিসাব কোথায় পাব? অনেকেই বললেন যে, অজানা ও অদৃষ্ট কোনো গ্রহের প্রভাবেই এই ৪৩"-এর গরমিল। বিশ্বাস করতে কোনো দ্বিধা ছিল না। এইভাবেই তো, ইউরেনাসের কক্ষপথের হিসাবের গরমিল থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে, নেপচুন আবিষ্কার হয়েছিল, করেছিলেন লেভেরিয়ার (Urbain Le Verrier)।

এই ধরনের বিতর্ক যখন চলছিল, আইনস্টাইন তাঁর আবিষ্কৃত সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে বুধ গ্রহের কক্ষপথের বিশ্লেষণ করলেন। অবশেষে লিখলেন, ১৯১৬ সালের এক বিখ্যাত পেপারে : ‘‘বর্তমান হিসাব অনুসারে, বুধের কক্ষপথের মুখ প্রতি শতাব্দীতে ৪৩" ঘুরে যাবার কথা, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যা আমাদের অবসারভেশনের সঙ্গে মিলে যায় (লেভেরিয়ার); প্রসঙ্গত, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই গ্রহের কক্ষপথের এই অবশিষ্ট পরিক্রমণ অন্যান্য গ্রহসমূহের প্রভাব বিচার করার পরও পেয়েছেন, তা উপরোক্ত অব্যাখ্যাত সংখ্যাটির কথা মনে করিয়ে দেয়।’’

এর থেকেই বোঝা যায়, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক ফলাফলের প্রতি কতটা সজাগ ছিলেন আইনস্টাইন।

সিদ্ধান্ত ২ ও ৩ ও তার প্রমাণ : মাধ্যাকর্ষণের কারণে আলোকরশ্মির পথ পরিবর্তন; এডিংটনের প্রবেশ

একটি প্রমাণ তো এল। একে প্রমাণ বলব, না এক অবিশ্লেষিত রহস্যের ব্যাখ্যা? কিন্তু তাতে বিজ্ঞানীসমাজের আশ মেটার নয়; বিজ্ঞানের দাবি বেড়েই চলে, তারা কখনোই সন্তুষ্ট নয়। দাবি উঠল, কোনো এক অভিনব অজানা প্রক্রিয়ার পথনির্দেশ ও পরীক্ষার আধারে তাকে শক্তভাবে স্থাপন করতে হবে। এখানেই আসে ২৯ মে, ১৯১৯ সালে, পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়কার এক আবিষ্কার।

দাবি উঠলেই হবে না, সেই পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নিখুঁত ভাবে পরিকল্পনা ও সম্পন্ন করার সম্ভাবনা বিচার করা প্রয়োজন।

এই বিচার করেছিলেন ইংল্যান্ডের এক বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন। ১৯১৬ সালে এডিংটন, রয়াল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন। সেই সুবাদে আইনস্টাইনের গবেষণাপত্রগুলি তাঁর হাতে আসে। সেগুলি

পাঠিয়েছিলেন উইলেম দ্য সিট্টার নামে এক ডাচ্ (ওলন্দাজ) বিজ্ঞানী। এডিংটন সেই সময় রয়্যাল অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন বলেই বোধ হয় পেয়েছিলেন এবং এক ডাচ্ বিজ্ঞানীর মারফৎ। তার কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) তখন চলছে, ইংল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে সব যোগাযোগ, এমনকি ডাক যোগাযোগও তখন বন্ধ। দুই দেশেই তখন প্রবল উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় বিজ্ঞানীসমাজও আক্রান্ত। ইংল্যান্ডের একদল বুদ্ধিজীবী বলতে লাগলেন যে জার্মানরা সূক্ষ্ম নান্দনিক বিষয়ে চিন্তায় অসমর্থ। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্রিকা 'নেচার' (Nature)-ও বলে বসল যে জার্মান বিজ্ঞানও নিকৃষ্ট মানের।

উগ্র জাতীয়তাবাদ পরম উল্লাসের মধ্যেও আইনস্টাইন অবিচল ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি প্রাগ থেকে এসে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ও জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁর পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত ও যুদ্ধের দামামা তাঁকে মানসিক দিক থেকেও বিদ্ধস্ত করে তুলেছিল। যুদ্ধের সমর্থনে জার্মান জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র হিসেবে ৯৩ জন জার্মান বিজ্ঞানী একটি দস্তাবেজ স্বাক্ষর করেন। আইনস্টাইন সহ চারজন বিজ্ঞানী যুদ্ধবিরোধী এক পাল্টা দলিলে স্বাক্ষর করেন। এই কারণে জার্মানিতে আইনস্টাইনকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। তাই তাঁর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও জর্মনিতে উপেক্ষা পেল। আইনস্টাইন তখন শারীরিক ও মানসিকভাবে খুবই অসুস্থ।

এমনিভাবে ইংল্যান্ডেও উপেক্ষিত হলেন এডিংটন। কোয়েকার (Quaker) পরিবারে তাঁর জন্ম ও যুদ্ধবিরোধী কোয়েকার আদর্শে বিশ্বাসী আর্থার এডিংটন যুদ্ধে যেতে অসম্মত হলেন, যেখানে কিনা বহু ব্রিটিশ বিজ্ঞানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়তে গেলেন এবং অনেকে প্রাণও হারালেন। এদিকে, ১৯১৬ সালে দ্য সিটারের পাঠানো পেপারগুলি পড়ে এডিংটন আইনস্টাইনের থিওরির গুরুত্ব বুঝলেন। গণিতে এডিংটনেরও ছিল অসামান্য দক্ষতা। তিনি তখন গেলেন ইংল্যান্ডের প্রধান অ্যাস্ট্রোনমার ফ্রাংক ওয়াটসন ডাইসনের কাছে এবং আইনস্টাইনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি যাচাই করার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক অভিযান সংগঠিত করার প্রস্তাব দিলেন। এদিকে ১৯১৭ সালে মিলিটারি সার্ভিস বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এবারও এডিংটন, নীতিগত কারণে অসম্মত হলেন। সরকার এবার তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করল। সেই শুনানি চলল ১৯১৮-র আগস্ট মাস অবধি। সেখানে এডিংটনকে সমর্থন করলেন যিনি, তিনি হলেন সেই Astronomer Royal ফ্রাংক ডাইসন। ডাইসন বললেন যে এডিংটন-প্রস্তাবিত ২৯শে মে ১৯১৯-এর পূর্ণ সূর্য গ্রহণের অভিযান হল রাষ্ট্রীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ। সেই সুবাদে এডিংটনকে এক বছরের ছুটি মঞ্জুর করা হল। তবে এরপর তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেই হবে, অবশ্য যুদ্ধে লড়তে নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্রিটিশ রেডক্রসের অ্যাম্বুলেন্স বিভাগে তাঁকে যোগ দিতে হবে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তনের দরুণ তাও তাঁকে করতে হল না। ১৯১৮ সালের ২১ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। কথায় বলে, 'সব ভালো যার শেষ ভালো'। কিন্তু যুদ্ধের দরুণ ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করবে কে!

অতএব, এই অভিযানের জন্য এডিংটন ও ডাইসন পেলেন মাত্র ৬ মাস। এখন দেখা যাক কী-ই বা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য ও তাকে সফল করতে অত ব্যয় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ অভিযানেরই বা কী দরকার? আর, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ছাড়া কি এই পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না?

এবার আইনস্টাইনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ভালো করে বোঝা যাক। ধরা যাক, M ভরযুক্ত কোনো বস্তুর পিঠ ঘেঁসে কোনো আলোকরশ্মি SS_1 লাইন বরাবর চলেছে, সেখানে এই বস্তুর কেন্দ্র থেকে আলোক

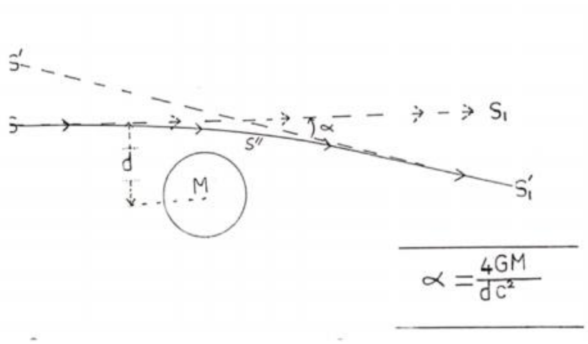

চিত্র ৪ : মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে, আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন। SS_1 হল আলোকরশ্মির মূল পথ। $SS''S_1'$ হল M ভরযুক্ত বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে, ওই আলোকরশ্মির পরিবর্তিত পথ। আলোকরশ্মি SS_1 যদি S থেকে নির্গত হয়ে থাকে, তবে আলোকরশ্মির পথ পরিবর্তনের দরুন ওই নক্ষত্র S এর অবস্থান, আমাদের চোখে মনে হবে, S' । আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে আসেন আর্থার এডিংটন ও তাঁর সহযোগীরা।

রশ্মি SS_1 এর পথের সর্বকনিষ্ঠ দূরত্ব হল 'd'। আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা অনুসারে, এই SS_1 আলোকরশ্মি, M-এর মাধ্যাকর্ষণের ফলে S_1'-এর দিকে বেঁকে যাবে, যেখানে SS_1 ও $S'S_1'$ লাইন দুটির মধ্যে সৃষ্ট কোণের মান হবে—

$$\alpha=4GM/dc^2$$

যেখানে G হল মাধ্যাকর্ষণ ধ্রুবক।

এর থেকে বোঝা যায়, S যদি কোনো নক্ষত্রের অবস্থান হয় ও SS_1 হয় সেই নক্ষত্র থেকে নির্গত কোনো আলোকরশ্মির পথ, সে ক্ষেত্রে সেই আলোকরশ্মি α কোণে বেঁকে যাবে ও আমরা তারাটির অবস্থান দেখব S'। এই M বস্তুটি যদি হয় সূর্য, তবে, আমরা পাব $\alpha=1.76''$ ($1''=1/3600$ ডিগ্রি), যদি মনে করি যে SS_1-এর গতিপথ হল সূর্যের পিঠ ঘেঁষে।

এই ধরনের পরীক্ষার অসুবিধাটা সহজেই বোঝা যায়। দিনের বেলা সূর্যের পাশে তো আর আমরা তারা দেখতে পাই না। তাহলে দেখতে হবে পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময়। এডিংটন ও ডাইসন দেখলেন যে ২৯ মে ১৯১৯-এর পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় দিনের বেলা, Hyades নক্ষত্রপুঞ্জকে সূর্যের পিছনে, সামান্য মাত্র উপরে দেখা যাবে। কিন্তু মাত্র তিন মাসে কতটুকুই বা প্রস্তুতি সম্ভব! টাকাকড়ি ও যন্ত্রপাতি ধারধোর করে তাঁরা ১৯১৯-এর মার্চ মাসে রওনা হলেন। কেউ গেলেন প্রিনসিপে ও কেউ গেলেন সোব্রালে। কিছু বৈজ্ঞানিক সংস্থা কিছু টাকা পয়সা অবশ্য দিয়েছিলেন।

এডিংটন প্রিনসিপে মে ১৯১৯-এর মাঝামাঝি নাগাদ পৌঁছে যন্ত্রপাতি বসিয়ে ফেললেন। সেই জনমানবহীন পাণ্ডববর্জিত দ্বীপে, তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন সেখানকার "বানর সেনার উপদ্রবে", যন্ত্রগুলিকে তাদের হাত থেকে বাঁচানোই একটি বড়ো কাজ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আরও একটি হতাশা অপেক্ষা করছিল। ২৯ তারিখ সকালে দেখা গেল, কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। অবশেষে বেলা সাড়ে এগারোটায় বৃষ্টি থামল ও সূর্য দেখা গেল। বেলা দুটোর সময় গ্রহণ শুরু হল, যখন শুরু হল যন্ত্রচালিতের মতো পটাপট ফটো তোলা, প্লেট বদল, আবার ছবি তোলা। ওই সময় Hyades নক্ষত্রপুঞ্জও মেঘে ঢাকা ছিল কিনা সেটা দেখার সময় কারো ছিল না।

এই অভিযান থেকে তোলা ফটোগ্রাফের প্লেট থেকে S'-এর অবস্থান জানা গেল, কিন্তু তারাটির প্রকৃত অবস্থান (S) জানব কী করে? সেটা দেখতে আরও অন্য স্টার ক্যাটালগ থেকে Hyades

নক্ষত্রপুঞ্জের গতিপ্রকৃতি মেপে, নানান হিসাব করে Hyades এর প্রকৃত অবস্থান, (S) ওইদিন কোথায় ছিল, সেটাও জানা গেল। তার থেকে এবার হিসাব করা হল যে প্রকৃত অবস্থান থেকে সে কতটা সরে গেছে। তার থেকে বোঝা গেল যে, α-র মান হল ১.৭৬", যা সার্বিক আপেক্ষিকতা থেকে পাওয়া যায়! একেবারে নির্ভুল!

প্রশ্ন হল, এই একই ফল, অন্য প্রক্রিয়ায় কি পাওয়া যাবে? নিউটনের প্রস্তাব অনুসারে আলোকরশ্মিকে যদি কণিকা হিসাবে দেখি ও তার সঙ্গে যদি তার ভর যুক্ত করি (একে বলে thought experiment) তাহলে আমরা α-র যে মান পাব, তা হলো ০.৮৮" যা হল আইনস্টাইনের পাওয়া α-র মানের ঠিক অর্ধেক। প্রসঙ্গত, ১৯১১ সালে, যখন কিনা সার্বিক আপেক্ষিকতার পথে আইনস্টাইন তখনও এগোন নি, আইনস্টাইনও ওই একই মান পেয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে, তাঁর নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি সংশোধন করে পেলেন, α = ১.৭৬"। জয় হল আইনস্টাইনের মতবাদেরই।

অতএব, এডিংটনের পরীক্ষালব্ধ ফল α = ১.৭৬", আইনস্টাইনের বৈপ্লবাত্মক মতবাদকেই দ্ব্যর্থহীন ভাবে সমর্থন জানাল।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের গাণিতিক গঠন অত্যন্ত জটিল, তাই খুব কম লোকেই বুঝেছিলেন। একবার এডিংটনকে প্রশ্ন করা হয়, "অধ্যাপক এডিংটন, শোনা যায়, আইনস্টাইনের তত্ত্ব নাকি পৃথিবীতে মাত্র তিন জন লোকেই বোঝেন।" এডিংটন উত্তর দিয়েছিলেন, "তিন জন! তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?" (অবশ্যই, পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবা!)। সম্ভবত, এডিংটন জানতেন না যে, কলকাতা শহরেই তিনজন প্রতিভাসম্পন্ন যুবক আইনস্টাইনের গবেষণাপত্রগুলি পড়ে অনুধাবন করেছিলেন; তাঁদের বয়স ছিল ত্রিশের নিচে। তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। এবং তাঁরা আইনস্টাইনের গবেষণাপত্রগুলি মূল জার্মন ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছাপায়। এগুলিই হল, আইনস্টাইনের গবেষণাপত্রের প্রথম অনুবাদ, তা যে-কোনো ভাষায়ই হোক। অতএব এডিংটনের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মেঘনাদ সাহার যে মন্তব্য 'দ্য স্টেটসম্যান' ছেপেছিল, তা এক মনোজ্ঞ গবেষকের মতামত। ১৯২০-র পর থেকে ভারতের নানান জায়গায় সার্বিক আপেক্ষিকতার বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। প্রথমে কলকাতায় ও তারপর ক্রমশ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, গুজরাত বিদ্যাপীঠে, ব্যাঙ্গালোরে ও পুণায়।

আইনস্টাইনের গবেষণাপত্রের প্রথম অনুবাদ, তা যে-কোনো ভাষায়ই হোক। অতএব এডিংটনের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মেঘনাদ সাহার যে মন্তব্য 'দ্য স্টেটসম্যান' ছেপেছিল, তা এক মনোজ্ঞ গবেষকের মতামত। ১৯২০-র পর থেকে ভারতের নানান জায়গায় সার্বিক আপেক্ষিকতার বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। প্রথমে কলকাতায় ও তারপর ক্রমশ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, গুজরাত বিদ্যাপীঠে, ব্যাঙ্গালোরে ও পুণায়।

হিন্দিতে বলা হয়, 'জো জিতা, ওয়ো হি সিকন্দর।' পরাজয়ে কোনো গৌরব নেই। এমনি ঘটেছিল জার্মন ও মার্কিন এক যৌথ অভিযানের বেলায়। ১৯১৪ সালের ২১ আগস্ট এক পূর্ণ সূর্য গ্রহণ দেখতে তাঁরা ক্রিমিয়ায় পৌঁছলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই বছরের জুলাই মাসে শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধ যে একদিন ছড়িয়ে পড়বে, সে আশঙ্কা তাঁরা করেননি। অবশেষে তাঁরা রুশ সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে বন্দি হলেন। পরীক্ষা করা তাঁদের আর হল না। অবশ্য তখনও অবধি আইনস্টাইনের ১৯১৬ সালে প্রকাশিত সংশোধিত পেপারটি বেরোয়নি, ১৯১১-১২ সালের পেপারের হিসাবে যাচাই করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সেটাও হল না।

এই হল গোড়ার কথা। এক অত্যাশ্চর্য ঘটনাপ্রবাহের এই ছিল গোড়ার ধাপ। তারপর সে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলেছে মহাজগতের নানান রহস্য উদ্ঘাটনের পথে। এরই থেকে উঠে আসে 'গ্র্যাভিটেশনাল লেনসিং'-এর বিষয়, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ যদি আলোক রশ্মিকে বেঁকিয়ে দিতে পারে, তবে লেনসের মতো ফোকাস করতেও পারে কি? এই বিষয়ে আইনস্টাইনও কিছুটা ভেবেছিলেন, তবে প্রামাণ্য তাত্ত্বিক চিত্র আনেন রুশ বিজ্ঞানী ওরেস্ট খভল্সন ১৯২৪ সালে।

ত্রিশের দশকে এই বিষয়টি নিয়ে আরো কিছুটা চর্চা হল বটে কিন্তু তারপর চাপা পড়ে গেল। কারণ অবজারভেশনের মাধ্যমে পরীক্ষাগত প্রমাণ পাবার কোনো সুযোগই ছিল না। ১৯৮০ সালের পরই সেই সম্ভাবনা দ্রুত সমুজ্জ্বল হতে থাকে। কারণ ততদিনে CCD (Charge Coupled Device) আবিষ্কার হয়েছে, যা আমরা আজকাল মোবাইল স্মার্টফোনের ক্যামেরায় ব্যবহার করে থাকি ও যা আজ আমাদের সবার হাতে হাতে ঘুরছে। এল আধুনিক কম্পিউটার ও এক বর্ধিত বিজ্ঞানী সমাজ। এইসব কাজ একা এডিংটনের পক্ষে, শুধুমাত্র ১১০০ পাউন্ড আর্থিক সাহায্য ও জনাকয় সহকর্মীর পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য ও অনুদান।

এই গ্রাফিটেনশনাল লেনসিং থেকে উদ্ভব হয়েছে মাইক্রোলেনসিং, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লেনসিং-এর সাহায্যে আমাদের পৃথিবী থেকে ২২,০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নানা নক্ষত্রের আবর্তে প্রদক্ষিণরত গ্রহের আবিষ্কার হয়েছে। অদের সংখ্যা হল আজ ৪০০০-এর বেশি। এই মাইক্রোলেনসিং ছাড়া তাদের আবিষ্কার সম্ভব হত না। এদের বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেটস (Exoplanet)।

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, "এ তো সব বড় ব্যাপার। এতে আমার আপনার কী লাভ হয়েছে?" আজ থেকে বিশ বছর আগে প্রশ্নটা করলে উত্তর দিতে পারতাম না। কিন্তু আজ একটি সহজ উদাহরণ দিতে পারব। মনে করুন, কোনো একদিন দেখলেন ঘরে ডাল-মশলা আনাজ নেই আর সেই সঙ্গে শরীরটাও ম্যাজ-ম্যাজ করছে। আপনি আপনার মোবাইল খুলে Swiggy-কে অর্ডার ও ঠিকানা দিন। সে GPS ব্যবহার করে ঠিক পৌঁছে যাবে আপনার বাড়ির দোরগোড়ায়। এই GPS ব্যবহৃত হয় কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নির্গত সিগন্যালের 'যাত্রা-সময়ের' (Time of flight) হিসাব। কিন্তু এই উপগ্রহ তো স্থির নয়, তারা পৃথিবী থেকে প্রায় ২০, ০০০ কিলোমিটার ওপরে ঘুরছে। পৃথিবীকে তারা তাদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে, মোটামুটি বেগ হল গড় হিসাবে ৫.৫ কিমি/সেকেন্ড। অতএব, পৃথিবীর হিসাবে তারা স্থির নয়, ঘুরছেও বিভিন্ন কক্ষপথে, তাদের বেগ গড়পড়তা ৫.৫ কিমি/সেকেন্ড হলেও, সবার সমান নয়। তারা সবাই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, সরল রেখায় যাচ্ছে না। অতএব, তাদের গতিও ত্বরণগতি নয়। সেই সঙ্গে তারা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, যেখানে পৃথিবীর ভরের দরুণ অভিকর্ষের মান হল ০.৬ মিটার/সেকেন্ড)।[২] আর ভূপৃষ্ঠে আমরা পাই অভিকর্ষ = ৯.৮ মিটার/

(সেকেন্ড)।[২] অতএব এখানে রয়েছে ত্বরণশীল গতি ও মাধ্যাকর্ষণের সমষ্টিগত প্রভাব। এদের চিন্তা বাদ দিয়ে হিসাব করলে ভুলের মাশুল বাড়তেই থাকবে। মনে করুন, আজ এক্ষুণি আমাদের ঘড়ি ও গজকাঠি কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে নিলাম ওই কৃত্রিম উপগ্রহের ঘড়ি ও গজকাঠির সঙ্গে। কিন্তু তাদের স্থান-কালের অক্ষরেখা (Space-time axis) তো আমাদের থেকে আলাদা ও যত সময় বাড়বে, পার্থক্যটাও যোগ হতে থাকবে। হিসাবটা শোধরাতে হবে ওই সার্বিক আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সঙ্গে মিল রেখে, পলকে পলকে। এটা যদি না করা হয়, তবে একটি দিন বাদে, দূরত্বের হিসাবে গরমিল হয়ে দাঁড়াবে দশ কিলোমিটারের মতো। তা হলে ফলটা কী হলে : GPS দেখে বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা কিনতে বেরোলেন বর্ধমানের পথে, আর গিয়ে পৌঁছলেন শক্তিগড়। সেখানে পেটভরে ল্যাংচা খেয়ে, মিষ্টিমুখ করে GPS ধরে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলেন, আপনি পৌঁছে গেছেন বর্ধমানের ৬২ নং বি সি রোডে, নতুন চিঠির দপ্তরে।

সার্বিক আপেক্ষিকতার অন্য সিদ্ধান্তগুলির প্রমাণ

১ ও ২নং সিদ্ধান্ত-দুটির প্রমাণের সন্ধানে উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি বিভিন্ন সময়ে বারবার করা হয়েছে এবং এর ব্যতিক্রম পাওয়া যায়নি। বর্ণালির এই মাধ্যাকর্ষণ-জনিত লোহিতত্ব (Gravitional shift of special line)-র খোঁজ সেই ১৯২০-র দশক থেকেই চলছে ও নির্ভুলভাবে পাওয়া যায় ১৯৫০-এর দশকে, শ্বেত বামন (White Dwarf) নক্ষত্রে। এই জাতীয় নক্ষত্রের পৃষ্ঠভূমিতে (তাদের ভর হল সূর্যের ভরের সমান = mass of the Sun = ১.৯১x১০^{৩৩} kgms, তাদের ব্যাসার্ধ ৭০০০ km) অভিকর্ষের মান হল ১০.৬ মিটার/সেকেন্ড^{২} যা হল পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রায় ১,০০,০০০ গুণ বেশি। এই লোহিতত্ব মাপার পদ্ধতি আজ আরও সূক্ষ্ম ও নির্ভুল হয়েছে। এরই মাধ্যমে, নক্ষত্রের, বিশেষ করে শ্বেত বামন ও নিউট্রন-নক্ষত্রের (neutron star, এদের অভিকর্ষ পৃথিবীর চেয়ে ১০^{১১} গুণ বেশি) ভর মাপা হয়ে থাকে। আরও বিস্ময়ের কথা, এই প্রক্রিয়াটি পৃথিবীর মতো দুর্বল অভিকর্ষের মধ্যেও পাওয়া গেছে। সেটা আবিষ্কার করেন, ১৯৬০-এর দশকে রেবকা, পাউন্ড ও স্নাইডার। তবে তার জন্য এতকাল অপেক্ষা করতে হল কেন? কারণ 'মসবাউয়ার এফেক্ট' নামে এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার ওই দশকেই তার 'প্রাপ্তবয়স্কতা' (maturity) লাভ করে। এই পদ্ধতি ছাড়া, এই পরীক্ষা ছিল অসম্ভব। বিজ্ঞানী সমাজ অপেক্ষা করে কিন্তু থেমে থাকে না। এমনি তাদের মানসিক ব্যুৎপত্তিও।

মাধ্যাকর্ষণীয় তরঙ্গের (gravitational waves) প্রমাণ পেতে আমাদের লাগে একশো বছর। আইনস্টাইনের গবেষণাপত্র বেরোয় ১৯১৫ সালে, আর এর প্রমাণ পেলাম ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালে, LIGO Experiment-এ। প্রায় ২০ বছর ধরে প্রায় ১০০ বিজ্ঞানীর একাগ্র অধ্যবসায়ের পর দুটি ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষের থেকে নিঃসৃত এই মাধ্যাকর্ষণের তরঙ্গের সিগনাল এই LIGO ধরতে পারে। আমাদের পৃথিবী থেকে এই ব্ল্যাকহোল (Black hole)-এর দূরত্ব হল ১৩০ কোটি আলোকবর্ষ। এরই প্রায় সাড়ে তিন বছর বাদে, ১০ এপ্রিল ২০১৯, ব্ল্যাকহোলের ছবি আমরা পাই। ব্ল্যাকহোল থেকে আলো বেরোতে পারে না, কিন্তু ব্ল্যাকহোলের প্রবল মাধ্যাকর্ষণের দরুণ তার পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ প্রবল গতিতে ছুটে বেড়াবে। সেই বস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মির ছবি তোলা হয়েছে, রেডিওতরঙ্গ মারফৎ তাই আমরা দেখতে পাই মাঝখানে এক কৃষ্ণগহ্বর ও চারপাশে আলোর ফুলকি। এই ব্ল্যাকহোলটির অবস্থান হল আমাদের পৃথিবী থেকে ৫.৫ আলোকবর্ষ দূরে।

আপাতত এখানেই থাক। প্রতিটি বিষয়ই বহু অধ্যায়যুক্ত গ্রন্থের দাবি রাখে। আপনাদের মধ্যেই হয়তো কেউ সেই দাবি মেটাতে এগিয়ে আসবেন।

তাই তো বিশ্বপরিচয়ের রচয়িতা (বিজ্ঞান রচনায় তিনি কাব্যের ছোঁয়া লাগিয়েছিলেন) বলেছেন, আজ থেকে আশি বছর আগে, ''শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ অত্যাবশ্যক... তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করবার যথাযোগ্য বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না।" তাই বিজ্ঞানের পথ অতি বন্ধুর, তার বেগময় অগ্রগতি অনেক সময় থেমে যায় তার নিজস্ব দাবিতে, টেকনোলজির অপ্রাচুর্যে ও তার আত্মপরীক্ষায়। এই সব বুঝতে গেলে বিশ্ব ইতিহাস থেকে বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। কোনে কোনো যুগে বিজ্ঞানেও এসে জমে সংকটের ঘনঘটা। গত শতাব্দীর গোড়ায় তাই হয়েছিল। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায়, ''বলতে গেলে এটা হল বিজ্ঞানের আত্মপরীক্ষার যুগ... যে-সমস্ত জিনিসকে বিশেষ করে বিচার না করেই ধরে নেওয়া হয়েছিল এখন বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছেন সেগুলির সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করতে।" এই বোঝাপড়া হল এক নিরন্তর প্রচেষ্টা। আচার্যের ভাষায়, ''ব্যবধান, গতি ও সময়ের পরিমাণ—এই মাপজোখের উপরেই গতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত; আমরা যখন সেগুলিকে মাপজোখ করি তখন কী কী প্রচ্ছন্ন জিনিসকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই তারও অনুসন্ধান চলছে।" ('বিজ্ঞানের সংকট', সত্যেন্দ্রনাথ বসু, *পরিচয়*, শ্রাবণ, ১৩৩৮)।

এই বোঝাপড়া অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এসে গেল স্থান-কাল-পাত্র-ভরের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের প্রশ্ন। আর বিজ্ঞানী সমাজও নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে—

''মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব, যা আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ওপর আধারিত, তাকে বলা হয় সার্বিক আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। এর ভিত্তি স্থাপন করেন আইনস্টাইন (ও পরে ১৯১৫ সালে তিনিই একে রচনা করেন), এবং পদার্থবিজ্ঞানে যাবতীয় তত্ত্বের সঙ্গে বিচার করলে, সৌন্দর্যের দিক থেকে এই তত্ত্বই সর্বোৎকৃষ্ট নান্দনিকতার দাবি রাখে। আরও উল্লেখযোগ্য, এই তত্ত্ব রচনায় আইনস্টাইন সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্তগত চিন্তা (deductive manner)-এর সাহায্যে একে গড়ে তোলেন, যার সমর্থন পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের থেকে পাওয়া যায়।" (L.D. Landau and F.M. Lifshitz, *The Classical Theory of Fields*)।

এই বোঝাপড়ার পথে অনেকটাই আমরা এগিয়েছি, কিন্তু পথের কোনো শেষ নেই। এখানে না আছে মহানির্বাণ বা না আছে মহাপ্রস্থান।

লেখক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাসট্রোফিজিক্স, ব্যাঙ্গালুরুর অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী এবং অল ইন্ডিয়া পিপল্‌স্ সায়েন্স নেটওয়ার্ক-এর সভাপতি

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০১

Sl. No. 5

দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলিভ ও তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের সার্ধশতবর্ষ

ড. অরবিন্দ দাশ

আন্তর্জাতিক পর্যায়সারণী বর্ষ

আমাদের চোখের সামনে যা কিছু দেখি তা কোনো-না-কোনো রাসায়নিক পদার্থ, যেগুলি আবার এক বা একাধিক মৌল পদার্থ দিয়ে গঠিত। মৌলের সংখ্যা কিন্তু সীমিত; এখনো পর্যন্ত ১১৮টি। দেড়শো বছর আগে এই মৌলের সংখ্যা ছিল ৬৩। এই মৌলগুলিকে কত সুসম্বদ্ধভাবে অনুশীলন করা যায় সে-ব্যাপারে যিনি অগ্রগণ্য তিনি হলেন দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলিভ।

রাসায়নিক মৌলের পর্যায়সারণী বিজ্ঞানের অতি কার্যকর এবং বিস্ময়কর তথ্যপঞ্জি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার যেখানেই রসায়নশাস্ত্রের চর্চা হয় সেখানকার দেওয়ালে পর্যায় সারণীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। বস্তুত, বিজ্ঞানের অন্য কোনো শাখায় ঠিক এ-রকম কিছু আর নেই। গত দেড়শো বছর ধরে রসায়নশাস্ত্রের অনন্য এই সারণী আশ্চর্য তথ্যভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ২০১৯-কে আন্তর্জাতিক পর্যায়সারণী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসংঘ, যাতে পৃথিবীজুড়ে জনসাধারণের মধ্যে রাসায়নিক মৌলসমূহ, তাদের ধর্ম ও ব্যবহার, তাদের যৌগ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আগ্রহ জন্মে এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন ২০৩০-এর লক্ষ্যে শক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়সারণী উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আর তার স্রষ্টার কর্মসাধনা এক সংগ্রামী বিজ্ঞানীর অক্লান্ত জীবনগাথা।

ছেলেবেলা, দারিদ্র্য, মা

সাইবেরিয়ার ভেরখনি অ্যারেমজয়ানি নামে এক ছোটো গ্রামে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ দিমিত্রি জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ইভান পাভলোভিচ মেন্ডেলিভ ও মায়ের নাম দিমিত্রিয়েভা মেন্ডেলিভ। ১৬ (মতান্তরে ১৭) ভাইবোনের মধ্যে দিমিত্রি সর্বকনিষ্ঠ। দিমিত্রি যখন ছোটো, তার পিতা দৃষ্টিশক্তি এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকতার কাজ হারান। স্বভাবতই দিমিত্রির জীবনে মায়ের প্রভাব খুব বেশি। মায়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন মঙ্গোলীয়, তাতার কিংবা এশীয় বংশোদ্ভূত। দিমিত্রির জন্ম যদিও গোঁড়া খ্রিস্টীয় রীতিতে বিশ্বাসী পরিবারে, তাঁর মা উৎসাহ দিয়েছেন সন্তান যাতে বড়ো হয়ে বৌদ্ধিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। বাবা দৃষ্টিহীন হওয়ার পর তার মা বাধ্য হন তাঁদের পারিবারিক পরিত্যক্ত কাচের কারখানা চালু করতে ও সেইসঙ্গে সংসারটাকে কোনোভাবে টেনে নিয়ে যেতে। দিমিত্রি যখন ১৩, তার বাবা মারা যান এবং কিছুদিনের মধ্যে মায়ের কাচের কারখানাটি ভস্মীভূত হয়।

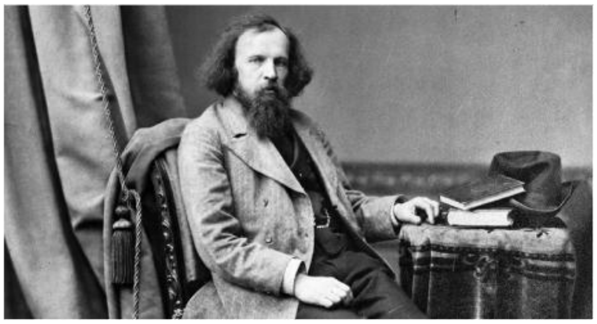

ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য মা তাঁর ছোটো মেয়ে মারিয়া ও দিমিত্রিকে সঙ্গে নিয়ে সাইবেরিয়া ছেড়ে মস্কো চলে আসেন, কিন্তু মস্কোতে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো সম্ভব হয়নি। তখন মা দিমিত্রিকে সেন্ট পিটার্সবার্গ মেইন পেডাগগিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি করান—এখানে দিমিত্রির বাবাও পড়াশুনা করেন। কিন্তু এরই অল্পকালের মধ্যে ক্ষয়রোগের কারণে প্রথমে দিদি ও পরে মা মারা যান। মায়ের ত্যাগ, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই এবং মায়ের উক্তি দিমিত্রির জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। মৃত্যুপথযাত্রী মা বলেন—বিভ্রান্তি থেকে নিরস্ত হয়ো, কর্মে নিবদ্ধ হয়ো—কথায় নয়। ধৈর্যসহকারে বৌদ্ধিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যকে খুঁজে বের করো। পুত্রের প্রতি মায়ের আরও উপদেশ—দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া প্রায়শই প্রতারণা করে। শিক্ষিত হতে হবে বিজ্ঞানের সাহায্যে, হিংসাশূন্যভাবে। ভালোবাসা ও মানসিক দৃঢ়তা দ্বারা সবরকম কুসংস্কার, অসত্য ও ভ্রান্তি দূর করা সম্ভব। সত্য নিরাপত্তা দেয়, আনে উন্নয়নের স্বাধীনতা এবং অভ্যন্তরীণ আনন্দ। দিমিত্রি মায়ের কথা সারা জীবন পবিত্র হৃদয়ে মান্য করেছেন। পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁর লেখা বইয়ে মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে লেখেন—এই অনুসন্ধান একজন মাকে তার কনিষ্ঠ সন্তান কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হল। একটা কারখানা চালিয়ে মা তাঁর আয়ের দ্বারা সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রশিক্ষিত করেন, ভালোবাসা দ্বারা সংশোধন করেন এবং বিজ্ঞানের সাধনায় নিবেদিত করার জন্য সাইবেরিয়া ছেড়ে মস্কো আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন শেষ সম্বল আর শক্তি। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দিমিত্রির জীবনে বড়ো কিছু করার ঝোঁক আরো বেড়ে যায়।

উচ্চশিক্ষা, কর্মজীবন, মতাদর্শ

১৮৫০-এর শরৎকালে দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলিভ সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৮৫৫ সালে প্রথম স্থান নিয়ে স্নাতক হন। কিন্তু এই সময় তাঁর শরীরে ক্ষয়রোগ ধরা পড়ে, ডাক্তাররা নিদান দেয় তাঁর আয়ু আর দু-বছর। সুস্থ হবার জন্য তাঁকে ব্ল্যাক সী-র ধারে সৈকতাবাসে যেতে হয়। সেই সময় রাশিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন আলেকজ়ান্ডার-২ (১৮৫৫-১৮৮০) এবং সমাজের সাধারণ মানুষের দুর্দশা ছিল চরমে। মেন্ডেলিভ খুবই বিচলিত বোধ করেন এবং ভাবতে থাকেন বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা কীভাবে সমাজের উন্নতি সম্ভব। ১৮৫৭ সালে তিনি সুস্থ হয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন।

এরপর ১৮৫৯-৬১ এই সময়ের জন্য মেন্ডেলিভ জার্মানির হাইডেলবার্গে গবেষণা করার জন্য বৃত্তি পান। সেখানে তিনি বিজ্ঞানী বুনসেনের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানে স্পেকট্রোস্কোপির ওপর গবেষণা করেন। ১৯৬০ সালে মেন্ডেলিভ যখন প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন সেখানে রসায়নের গবেষণার উপরেই বেশি সময় ধরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং মেন্ডেলিভও বিশেষ আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে মেন্ডেলিভের পর্যায়সারণী গঠন করার সময় মৌলের সঠিক পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জার্মানির গবেষণা শেষে ১৮৬১-তে মেন্ডেলিভ যখন সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন তখন তিনি ভাবতে থাকেন রাশিয়াকে যদি বিজ্ঞানে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তবে দেশের পড়াশুনা ও গবেষণার মান উন্নত করতে হবে। তাই তিনি ঠিক করেন গবেষণার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক রচনা করবেন। যে চিন্তা সেই কাজ। মাত্র ৬১ দিনে জৈব রসায়নের ওপর একখানা উন্নত মানের ৫০০ পৃষ্ঠার বই লিখে মেন্ডেলিভ বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হন। এই বই রচনা করে তিনি যে শুধু 'দোমিনভ পুরস্কার' পেলেন তাই নয়, মাত্র ২৭ বছর বয়সে তিনি রাশিয়ান কেমিক্যাল এডুকেশন-এ বিশিষ্ট জনের মধ্যে প্রথম সারিতে চলে আসেন।

১৮৬৪ ও ১৮৬৫ সালে মেন্ডেলিভ যথাক্রমে সেন্ট পিটার্সবার্গ টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ও সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হন। ১৯৬৫-তে তিনি ডক্টর অব সায়েন্স হন। মাত্র ছ-বছরে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রয়াসন গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত করেন। মেন্ডেলিভ রসায়নের তত্ত্বের ওপর যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, সেটি ১৮৬৯-এ প্রকাশিত হয়। এই বছরই তিনি পর্যায়সারণীও আবিষ্কার করেন। মেন্ডেলিভ-রচিত 'দ্য প্রিন্সিপ্‌ল অব কেমিস্ট্রি' বইটির মান এতটাই উন্নত ছিল যে তা ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। মেন্ডেলিভ ছিলেন প্রথমত একজন শিক্ষক যিনি তাঁর অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিবেদিত; দ্বিতীয়ত, তাঁর দেশ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। প্রথমটির জন্য পুস্তক প্রণয়ন ও পর্যায়সারণী গঠন করেছেন। আর দ্বিতীয়টির জন্য রাসায়নিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন, রাশিয়ার শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ, আবহাওয়া ও মাত্রাবিজ্ঞানকে উন্নত করেছেন।

পাঠদানে তিনি সত্যসত্যই আনন্দ পেতেন, আর পড়ুয়ারাও তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে উপভোগ করত। তাই তিনি বলেন—আমার কাছে পড়ানোটা একটা রহস্যোদ্ঘাটনের মতো, একটা অপূর্ব অনুভূতি, আর বোধশক্তির উদ্দীপক যা নিজের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে গভীর চিহ্ন রেখেছে। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে খুবই ভালোবাসত; তিনি কোথাও গেলে তারা দলে দলে জমায়েত হতো তাঁর কথা শুনবে বলে। মেন্ডেলিভের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া কেবলমাত্র ক্লাসরুমেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি যখন

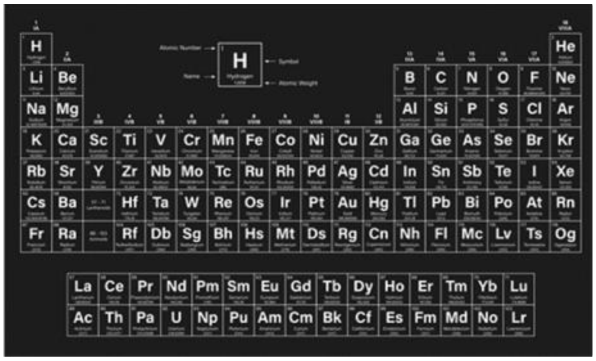

রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণির কামরায় ভ্রমণ করতেন তখন মুজ়িকদের (কৃষকদের) সঙ্গে চা খেতেন এবং কৃষিবিষয়ে তাঁর গবেষণার কথা আলোচনা করতেন। মুজ়িকরা তাঁকে দেখলে জড়ো হতো তাঁর সান্নিধ্য আর অভিজ্ঞতার কথা শুনবে বলে।

মেন্ডেলিভের কাছে বিজ্ঞান ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু রাশিয়ার ওই অশান্ত সময় (আলেকজ়ান্ডার-২ ও ৩ : ১৮৫৫-৯৪) বিজ্ঞানের আঙিনায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। দৃঢ়ভাবে মেন্ডেলিভ সামাজিক উৎপীড়ন ও অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর বয়স যত বেড়েছে, দেশ ও মানুষের মাঝে খ্যাতি তত বেড়েছে, আন্তর্জাতিক সম্মানও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাঁর মতাদর্শের কারণে একসময় তিনি রাজরোষে পড়েন এবং অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেন্ডেলিভের বিদায়ী বক্তৃতাকালে সরকার পুলিশ পাঠায়, পাছে ছাত্রদের মধ্যে কোনো বিদ্রোহ হয়।

স্বপ্ন, সারণী ও পাণিনি

মেন্ডেলিভ বিশ্বাস করতেন রসায়নশাস্ত্রের মূল নীতিগুলি বিভিন্ন মৌলের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অধ্যাপনা, গবেষণা, পুস্তক প্রণয়ন এতসব কিছুর সাথেই তিনি ভেবে চলেন কীভাবে মৌলগুলিকে ঠিকঠাক বিন্যস্ত করা যায়। তিনি যখন উচ্চশিক্ষা লাভ করেন তখন থেকেই অনুভব করেন রাসায়নিক মৌলগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে অধিগত করা খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার; কিন্তু একটা ধারণা গড়ে তোলেন যার দ্বারা তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের অপেক্ষাকৃত সহজভাবে মৌল রসায়নের পাঠদান করতে পারেন। ১৮৬৯ সালে জানা ৬৫টি মৌলের নাম, পারমাণবিক গুরুত্ব ও প্রধান প্রধান ধর্ম পৃথক পৃথক কার্ডে লিখে রাখেন। একসময় কার্ডগুলো তাসের মতো সাজাতে গিয়ে দেখেন পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌলগুলির আচরণ পুনরাবৃত্ত হয়। তিনি বুঝতে পারেন তিনি এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হচ্ছেন। একদিন তিনি তাঁর প্রিয় কার্ডগুলি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্নভাবে সাজাতে সাজাতে একসময় তাঁর পড়ার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। যখন তিনি জেগে ওঠেন তিনি অনুভব করলেন তাঁর অবচেতন মন তাঁর কাজ সেরে রেখেছে। পরে তিনি লেখেন—স্বপ্নে আমি একটি সারণী দেখি যাতে সব মৌলগুলি বিন্যস্ত আছে। জেগেই আমি সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো কাগজে তা লিখে ফেলি। মাত্র দু-সপ্তাহ পর ১৮৬৯ সালের ৬ মার্চ মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক রাশিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটিতে পেশ করা হয়। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপনার আটটি অংশ ছিল।

এর আগে লোথার মেয়র, জন নিউল্যান্ডস প্রমুখ বিজ্ঞানী এই ধরনের সারণীর কাছাকাছি এলেও সাফল্য পাননি। তাঁদের তুলনায়

মেন্ডেলিভ যে যে কারণে এগিয়ে ছিলেন সেগুলি হল—আগের জানা মৌলের অনেকগুলিই পারমাণবিক গুরুত্ব সংশোধন করা, আর আগামী দিনে যেসব মৌল আবিষ্কৃত হবে সারণীতে সেগুলির স্থান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা।

পর্যায় সারণী আবিষ্কারের ফলে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলে বিশাল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। কিন্তু আটটি মৌলের আবিষ্কারের সম্ভাবনার ব্যাপারে মেন্ডেলিভের ভবিষ্যদ্বাণী কেউ কেউ নস্যাৎ করে দেন। তবে সত্য সত্যই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মৌলগুলি পরপর আবিষ্কৃত হতে থাকে এবং মেন্ডেলিভের প্রত্যাশা পূরণ হতে থাকে। অনাগত মৌলগুলির নাম প্রস্তাবের ব্যাপারে মেন্ডেলিভ প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত বৈয়াকরণদের কাছে তাঁর সশ্রদ্ধ ঋণ স্বীকার করেছেন। মেন্ডেলিভের সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান বন্ধু ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতপ্রবর অটো ভন বোটলিঙ্ক (১৮১৫-১৯০৪) সে-সময় পাণিনির ওপর পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ করছিলেন। ওই সময় মেন্ডেলিভ সংস্কৃত ভাষার প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হন যে পাণিনিকে সম্মান জানানোর জন্য মৌলের আদিতে সংস্কৃত শব্দাংশ যুক্ত করেন। যে যে মৌলের ব্যাপারে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন তাতে সংস্কৃত শব্দাংশ 'একা-' ব্যবহার করেন; যেমন একাসিলিকন, একাআলুমিনিয়াম, একাবোরণ। পরবর্তীকালে যথাক্রমে এগুলির নামকরণ হয় জার্মেনিয়াম, গ্যালিয়াম, স্ক্যানডিয়াম।

ভদকা গবেষণা

পর্যায়সারণীর ওপর গবেষণা মেন্ডেলিভকে কালজয়ী করেছে। তবে তাঁর বহুমুখী গবেষণার আর দুটি দিক উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মেন্ডেলিভের উচ্চতর গবেষণা ডিগ্রির বিষয়গুলি অ্যালকোহল ও জলের মিশ্রণ সংক্রান্ত। পরবর্তীকালে ১৮৯৪ সালে মেন্ডেলিভ যখন ওজন ও পরিমাপ সংস্থার অধিকর্তা হন তখন তাঁর ওপর দায়িত্ব বর্তায় রাশিয়ান পানীয় ভদকার গুণমান নির্ধারণ করার। এ-সম্পর্কে প্রচলিত মতটি হল অদ্বিতীয় এই পানীয়ে অ্যালকোহলের মাত্রা (৪০ ভাগ) মেন্ডেলিভ নির্ধারিত। মেন্ডেলিভ তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল দ্বারা পেট্রোলিয়ামের উপাদান নির্ণয় করেন এবং তিনিই রাশিয়াতে প্রথম তেল শোধনাগার স্থাপন করতে সাহায্য করেন।

ব্যক্তিজীবন, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

মেন্ডেলিভ ১৮৬২ সালে ফিয়োজ়ভা নিকিৎসা লেসচেভাকে বিবাহ করেন। বিজ্ঞানীর কর্মময় জীবন একসময় স্ত্রীর কাছে সুখপ্রদ থাকে না এবং অভিযোগ করেন—তিনি কি তাঁকে (ফিয়োজ়ভাকে) বিয়ে করেছেন, না বিজ্ঞানকে! মেন্ডেলিভের উত্তর ছিল—তিনি উভয়কেই বিয়ে করেছেন, যদি না তা দ্বিবিবাহ হিসেবে গণ্য হয়। যদি তা হয়, তবে তিনি বিজ্ঞানকেই বিয়ে করেছেন। পরে অবশ্য জানা যায়, মেন্ডেলিভ অ্যানা ইভানোভা পোপোভা-র প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। ১৮৮১ সালে অ্যানাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং জানান পাত্রী যদি এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন তবে তিনি (মেন্ডেলিভ) আত্মহত্যা করবেন। ফিয়োজ়ভার সঙ্গে আইনত বিচ্ছেদ না হওয়া সত্ত্বেও ১৮৮২ সালে মেন্ডেলিভ অ্যানাকে বিবাহ করেন। এই সময় তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী হলেও মেন্ডেলিভ-কিয়োজ়ভা-অ্যানা এই আন্তঃসম্পর্কের রসায়ন ঘিরে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অর্থোডক্স চার্চের তীব্র রোষের মুখে তখন মেন্ডেলিভ দ্বিবিবাহ-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যা আইনত নিষিদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিষ্পত্তির ব্যাপারে দেশ জ়ারের শরণাপন্ন হয় এবং জ়ারের সেই ঐতিহাসিক উক্তি—হ্যাঁ, মেন্ডেলিভের দু-জন স্ত্রী, কিন্তু আমার তো একজন মেন্ডেলিভ! এর পরেও তাঁকে রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সভ্য হওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অ্যানা মেন্ডেলিভের চারুকলার প্রতি আগ্রহকে উজ্জীবিত করেন এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী হয়েও তিনি রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অব আর্টসের সভ্য নির্বাচিত হন।

মেন্ডেলিভের বয়স যত বাড়তে থাকে নিজের ব্যাপারে ততই উদাসীন হয়ে যান। উদাসীনতা সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। এমনই একটি তাঁর চুল নিয়ে। মেন্ডেলিভ বছরে একবারই চুলদাড়ি কাটান। জ়ারের অনুরোধেও তার অন্যথা করবেন না। কারো কারো মতে—তাঁর প্রত্যেকটি চুলই অন্য থেকে স্বতন্ত্র। ইউরোপের বিভিন্ন সংস্থা থেকে মেন্ডেলিভ সম্মানিত হয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—রয়্যাল সোসাইটি অব লন্ডন কর্তৃক ১৮৮২ সালে ডেভি মেডেল, ১৯০৫ সালে কপলে মেডেল। তিনি ১৮৯২-এ ফরেন মেম্বার অব দ্য রয়্যাল সোসাইটি ও ১৯০৫ সালে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সভ্য নির্বাচিত হন।

রসায়নের নোবেল কমিটি পর্যায়সারণী সংক্রান্ত কাজের জন্য মেন্ডেলিভকে ১৯০৬ সালের রসায়নে নোবেল পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করেন। দুঃখের বিষয়, রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত আরহেনিয়াসের তীব্র বিরোধিতায় মেন্ডেলিভ ওই সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আরহেনিয়াসের বিরোধিতার কারণ মেন্ডেলিভ আরহেনিয়াসের বিয়োজন তত্ত্বের সমালোচনা করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৭ সালেও মেন্ডেলিভের নাম আবার প্রস্তাবিত হলে একইভাবে তা বাতিল হয়ে যায়।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭। ৭২ বছর বয়সে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে মেন্ডেলিভ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিকিৎসকের প্রতি তাঁর শেষ কথা ছিল—ডক্টর, ইউ হ্যাভ সায়েন্স, আই হ্যাভ ফেইথ। বিজ্ঞানের প্রতি, পর্যায়সারণীর প্রতি অপরিসীম আস্থা ছিল বলেই গত দেড়শ বছর ধরে ক্রমবর্ধমান সারণী আজ ১৮৮টি মৌল নিয়ে হয়তো বা পূর্ণতার পথে।

মৃত্যুর পরেও মেন্ডেলিভের সম্মাননা প্রাপ্তি ঘটেছে। চাঁদের আগ্নেয়গিরি 'মেন্ডেলিভ' নামে চিহ্নিত হয়েছ। পর্যায়সারণীর ১০১-তম মৌল তাঁরই নামে 'মেন্ডেলিভায়াম'। মেন্ডেলিভাইট-সিই, মেন্ডেলিভাইট-এনডি খনিজপদার্থদুটি তাঁরই নামে নামাঙ্কিত।

মেন্ডেলিভ-পরবর্তী বিশিষ্ট রাশিয়ান বিজ্ঞানী লেভ আলেকজান্দ্রোভিচ চুগায়েভ (১৮৭৩-১৯২২) বলেন—দিমিত্রি মেন্ডেলিভ ছিলেন একজন প্রতিভাধর রসায়নবিজ্ঞানী, প্রথম শ্রেণির পদার্থবিদ, সফল গবেষক, যিনি উদ্‌গতিবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, ভূবিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, রাসায়নিক প্রযুক্তি সম্পর্কে একজন অতি অধ্যবসায়ী ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব আর অর্থনীতি বিষয়ে একজন মৌলিক চিন্তাবিদ। সন্দেহ নেই, মেন্ডেলিভের বহুমুখী প্রতিভা, অতিমানবীয় কর্মক্ষমতা, অনন্য মননশীলতা তাঁকে এক অবিস্মরণীয় বিশিষ্টতা দান করেছে।

ইতিহাস বলে 'বর্ণপরিচয়'-এর ১৫ বছর পর 'পর্যায়সারণী' আবিষ্কৃত হয়। আপামর বাঙালি যেমন বর্ণপরিচয় ও বিদ্যাসাগরের কাছে চিরঋণী, সারা বিশ্বের রসায়ন শিক্ষার্থীরা তেমন পর্যায়সারণী ও মেন্ডেলিভের কাছেও অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। এটাই হয়তো পর্যায়সারণী স্রষ্টার পরম প্রাপ্তি।

লেখক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক

With best compliments from

R.B. CONSTRUCTION & ENGINEERS

459 P, Majumdar Road, Kolkata-700078

Sl. No. 33

মহাবিশ্বের বিস্ময় কৃষ্ণগহ্বর

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেরিকার কালোরোডা প্রদেশের ছোট্ট শহর বোল্ডার। বর্তমান জনসংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি। বছর পঞ্চাশ আগে কত হবে—সিকিভাগের বেশি নয়। শহরের খ্যাতি তার বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র—কালোরোডা স্টেট ইউনিভার্সিটি। আগস্ট ১৯৬৩। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলছে। কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র এখানে যোগ দিয়েছেন। সম্মেলনের কর্মকর্তারা দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা রেখেছেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যা হয়, ডিনারের কোনো ব্যবস্থা নেই। গরুখোঁজা খুঁজে সস্তার একটা চাইনিজ হোটেল পাওয়া গেছে। চারজনের টেবিলে ছ-জন বসে ভাবছেন সস্তার নিরামিষ খাবার কী পাওয়া যায়! কী আশ্চর্য, একজন ছাত্র দেখলেন স্বচ্ছ কাচের পুশডোর ঠেলে ঢুকছেন সম্মেলনে আগত মাঝবয়সী এক খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, সঙ্গের মহিলা নিশ্চিতভাবেই তাঁর স্ত্রী। দম্পতি পাশের টেবিলে মুখোমুখি বসলেন এবং খাবারের অর্ডার দিলেন। একজন বিজ্ঞানীকে এই ধরনের হোটেলে পাওয়া আশ্চর্যের। ছাত্রদল অর্ডার দেওয়া স্থগিত রেখে মৃদুস্বরে ছদ্ম-আলোচনায় মগ্ন হলেন। আর উঁকিঝুঁকি দিয়ে লক্ষ করতে লাগলেন এই বিজ্ঞানী দম্পতি কী ধরনের খাবার অর্ডার করেন। সুবিধার হলে তাঁরাও সেই খাবার নেবেন। ভারতীয় ছাত্রদের জানা ছিল দক্ষিণ ভারতীয় এই বিজ্ঞানী নিরামিষাশী।। দুজনের খাবার বলতে একটি প্লেটে সবজি ও ফলের এক প্রস্থ স্যালাড আর হাফ পাউন্ড টক দই। সেই সময়ের বাজার দরে কুড়ি সেন্টেরও (১ ডলার = এক সেন্ট) কম। জগৎজোড়া খ্যাতি এই বিজ্ঞানীর। এমন সামান্য হোটেলে, এই সামান্য খাবার। অতি সাধারণ খাবার-দাবার, সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই বিজ্ঞানী হলেন সুব্রহ্মনিয়ন চন্দ্রশেখর। ১৯৩০ সালে তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক। সেই বছর জুলাইয়ে বিদেশযাত্রা। প্রায় মাস ছয়েক জাহাজবন্দি। জাহাজেই কঠিন গাণিতিক সমস্যার সমাধান। বিশ্ব জানলো 'চন্দ্রশেখর সীমা'। অবশ্য এই কাজের স্বীকৃতি এসেছিল বিয়াল্লিশ বছর পর, ১৯৭২-এ। ১৯৮৩ সালে এই কাজের জন্যই নোবেল পুরস্কার।

আসলে কৃষ্ণগহ্বর জানতে 'চন্দ্রশেখর সীমা' দিয়ে শুরু করলে বুঝতে সুবিধা হবে। আমাদের সূর্য একটা সাধারণ মাপের তারা। পাঁচশো কোটি বছর ধরে জ্বলতে জ্বলতে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। আরো পাঁচশো কোটি বছর পর সূর্যের জ্বালানি (হাইড্রোজেন) ফুরিয়ে গেলে ভেতরের হিলিয়াম গ্যাস ফুলে ফেঁপে গোটা সৌরজগতের আকার ধারণ করবে। সূর্যের বাইরের তাপমাত্রা ছ-হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস, কেন্দ্রে কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রসারিত এই গ্যাসকুণ্ডলীর তাপমান কমে গিয়ে তখন প্রায় তিন হাজার ডিগ্রিতে পৌঁছাবে। কামারশালার তপ্ত অগ্নিশিখার মতো লাল সূর্য তখন লোহিত দানব বা রেড জায়েন্ট, প্রায় গোটা সৌরজগতের আকার ধারণ করবে। কাছের গ্রহ বুধ বা শুক্র বাষ্পের মতো উবে যাবে। পৃথিবীর পাহাড় পর্বত, ইট, কাঠ, কংক্রিটের অহং, বাষ্প হয়ে সূর্যের অন্তরে প্রবেশ করবে। আরো প্রায় দু-কোটি বছর ধরে এই গ্যাসীয় পিণ্ড মাধ্যাকর্ষণের টানে সঙ্কুচিত হয়ে ছোটো হতে হতে মোটামুটি পৃথিবীর আকারের বস্তুপিণ্ড, সাদা হয়ে জ্বলবে। সূর্য বা সূর্যের চেয়ে ১.৪ গুণ বড় নক্ষত্রের এই পরিণতিকে বলে শ্বেতবামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ। এই যে সংখ্যা ১.৪, বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর অঙ্ক কষে বার করেছিলেন। যেমন হয় আর কি, সেই বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে, এমনকি চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাটের দশকেও এর স্বীকৃতি মেলেনি। আমরা সেই গল্পে যাবো না, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় এই সংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশ্ন হল, তারাদের ভর ১.৪ গুণ বড়ো না হয়ে দুই থেকে পাঁচগুণ বড়ো হলে কী ঘটবে। আসলে সূর্য নামক নক্ষত্রটির শেষ পরিণতি এই শ্বেতবামন। কিন্তু প্রায় পাঁচগুণ বড়ো তারাদের ভেতরের বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর আকারে পৌঁছলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভীষণ রকম বেড়ে যাবে। এতেই এই

তাপমাত্রায় পরমাণু ভেঙে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন মুক্তকচ্ছ হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এই সংকীর্ণ স্থানে ঘোরাঘুরি করার জায়গা কোথায়? ইলেকট্রন-প্রোটনের সংঘর্ষে অসংখ্যা নিউট্রন তৈরি হবে। বাড়বে মাধ্যাকর্ষণের টান। পৃথিবীর মাপের শ্বেতবামন তখন মোটামুটি বিশ কিলোমিটারের নিউট্রন স্টার। এক চামচ নিউট্রন স্টারের ভর কয়েক কোটি টন। সূর্যের চেয়ে পাঁচগুণ বড়ো তারাদের এটাই ভবিতব্য। কিন্তু দশগুণ বড়ো হলে ভেতরের মাধ্যাকর্ষণ এতই প্রবল আকার ধারণ করবে যে তারাদের ফেটে পড়া ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। একেই বলে সুপারনোভা। বিস্ফোরিত তারার ধ্বংসাবশেষ আবার কোনো অনুকূল পরিস্থিতিতে নতুন তারার জন্ম দেবে। কিন্তু যদি তারার ভর সূর্যের চেয়ে বিশ-ত্রিশগুণ বড়ো হয়, তখন কী হবে? আমাদের গল্প এমন তারাদের নিয়েই।

পৃথিবীর অভিকর্ষ টানের জন্য এমন হয়। এমন কোনো বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট বেগের বেশি বেগে ছুঁড়ে দিলে, সেটি আর ফিরে আসে না। এই বিশেষ বেগকে মুক্তিবেগ বলা হয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই বেগের মান ১১.২ কিমি প্রতি সেকেন্ড। মহাকাশে যে সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় তাদের উৎক্ষেপণ বেগ খানিকটা কম—প্রায় ৮ কিমি প্রতি সেকেন্ডে। কারণ প্রথমে কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অনেক দূরের কক্ষে পাক খাওয়ানো হয় ও পরে সেই কক্ষ থেকে পৃথিবীর বাইরে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিতান্ত প্রযুক্তিকৌশল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন তারার সংখ্যাও কম নয়। আর তারাদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হলে মাধ্যাকর্ষণের টানে সেটি ক্রমাগত ছোটো হতে শুরু করে। আগেই বলেছি, এমন অবস্থায় ফেটে পড়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু ফেটে পড়েই বা কী হবে? না হয় খানিকটা পদার্থ মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো, বাকি অংশের ভবিষ্যৎ? একটু মাপজোখের ধারণা করা যাক্। সূর্যের চেয়ে বিশ-ত্রিশগুণ বড়ো একটা তারা লোহিতদানব, শ্বেতদানব, নিউট্রন স্টার পর্ব পেরিয়ে সুপারনোভার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মোটামুটি আমাদের এই বর্ধমান শহরের আকার, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ সূর্য জমে এই আয়তন। কোথায় প্রোটন, কোথায় নিউট্রন, কোথায় ইলেকট্রন—সব জমে লাড্ডু। বিস্ফোরণ একটা হল, পাঁচটা সূর্যের মাপের বস্তু ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। বাকি যা পড়ে থাকল, তাই বা কম কী? এই বস্তুপিণ্ডের মাধ্যাকর্ষণ এতই প্রবল যে সামান্য আলোকরশ্মিও এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে অঙ্ক কষে দেখান যে অতীব ভারি কোনো নক্ষত্রের পাশ দিয়ে আলো যাবার পথে নক্ষত্রের দিকে খানিকটা বেঁকে যায়। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটোন সূর্যগ্রহণের সময় দূরাগত আলোর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন। সূর্যের চেয়ে অতিকায় বড়ো যে নক্ষত্রের অন্তিম অবস্থার কথা বলছিলাম, তেমন একটা নক্ষত্র থেকে আলো বেরিয়ে আসতে গেলে মাধ্যাকর্ষণের টানে আলোর পথ বেঁকে যেতে শুরু করবে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নক্ষত্রের সঙ্কুচিত হওয়ার সাথে সাথে মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে নক্ষত্রের নিজস্ব আলো নিজের দিকেই ফিরে আসবে। নক্ষত্র থেকে কোনো আলো বহির্বিশ্বে না আসায় আমাদের চোখে কিছুই ধরা পড়বে না। অন্ধকারের গর্তে পড়ে রইল ব্ল্যাকহোল। প্রশ্ন হল, তাহলে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব আমরা জানি কী করে? মনে রাখতে হবে আইনস্টাইনের তত্ত্বে কৃষ্ণগহ্বরের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও কৃষ্ণগহ্বরের ধারণা প্রথম প্রচার করেন আর এক জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল সোয়ার্জসিল্ড। তিনি আইনস্টাইনের তাত্ত্বিক গবেষণার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে দেখান অতিকায় নক্ষত্র সঙ্কুচিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধে পৌঁছালে তার থেকে কোনো আলো বেরিয়ে আসতে পারে না। ব্যাসার্ধের এই সীমানাই হল সোয়ার্জসিল্ড ব্যাসার্ধ। সোয়ার্জসিল্ড ব্যাসার্ধের নিচের কোনো অংশে কোনো কিছুই দৃশ্যমান নয়। তাই এই সীমার নাম 'ইভেন্ট হরাইজন' অর্থাৎ যে সীমানার ওপারে ঘটা কোনো ঘটনা আমাদের দৃশ্যের বাইরে।

প্রশ্ন হল এমন একটা অদৃশ্য কিছু যা সব বস্তুকেই অপরিসীম মাধ্যাকর্ষণে টেনে রাখতে পারলে মহাবিশ্বের এই অকৃত্রিম বস্তুপিণ্ড, গ্রহ, নক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছেনা কেন? না, এমনটা হওয়ার নয়। ধরা যাক, আমাদের এই সূর্য একটা ব্ল্যাকহোল। দূরের কথা বাদ দিলাম, সূর্যের কাছের গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী—এরা কি কেউ সূর্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে? না, আদি অকৃত্রিম গতিতে সূর্য প্রদক্ষিণ করবে। কারণ আর কিছুই না, ওই 'ইভেন্ট হরাইজেন' বা সোয়ার্জসিল্ড ব্যাসার্ধ। বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন, সূর্যের সোয়ার্জসিল্ড ব্যাসার্ধের মান মাত্র তিন কিলোমিটার। সূর্যের চেয়ে দশগুণ বড়ো একটি ব্ল্যাকহোলের এই ব্যাসার্ধ ত্রিশ কিলোমিটার। সূর্য যদি কৃষ্ণগহ্বর হতো তবে তার তিন কিলোমিটারের সীমায় পৌঁছলে সেই বস্তু সূর্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো। এর বাইরের যা কিছু স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে। 'ইভেন্ট হরাইজেন'-এর ভেতরের ব্যাপার আমাদের অজানা। এইসব বলার মানে হল, ঈশ্বরবিশ্বাসীদের দরজায় কড়া নাড়া। বিশ্বাসীরা বলবেন, কী, বলেছিলাম না, ঈশ্বর অগম্য, অদৃশ্য, অনির্বচনীয়, অদ্বৈত, আদি ও অকৃত্রিম। আমাদের বাইবেলে, কোরাণে, বেদ-উপনিষদে ঠিক এমনটি বলা আছে। প্রচলিত একটি লোকসঙ্গীত মনে পড়ছে, 'কথা কয়রে দেখা দেয়না। নড়ে চড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনম তল মেলে না।' বিজ্ঞানের আঙিনায় এসব নেহাতই অর্থহীন। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান গণিতের যুক্তিপরম্পরা মেনে এগিয়ে চলে। পৃথিবী থেকে কোনো বস্তু ছুঁড়ে দিলে মাটিতে নেমে আসে। পৃথিবীর অভিকর্ষ টানের জন্য এমন হয়। এমন কোনো বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট বেগের বেশি বেগে ছুঁড়ে দিলে, সেটি আর ফিরে আসে না। এই বিশেষ বেগকে মুক্তিবেগ বলা হয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই বেগের মান ১১.২ কিমি প্রতি সেকেন্ড। মহাকাশে যে সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় তাদের উৎক্ষেপণ বেগ খানিকটা কম—প্রায় ৮ কিমি প্রতি সেকেন্ডে। কারণ প্রথমে কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অনেক দূরের কক্ষে পাক খাওয়ানো হয় ও পরে সেই কক্ষ থেকে পৃথিবীর বাইরে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিতান্ত প্রযুক্তিকৌশল। সেই কারণেই এগুলি পৃথিবীর টান উপেক্ষা করেই মহাকাশে পাড়ি দেয়। ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন মিচেল (১৭২৪-১৭৯৩) কল্পনা করেন কোনো নক্ষত্রপৃষ্ঠে মুক্তিবেগ আলোর বেগের কাছাকাছি হলে সেই নক্ষত্রের ভর কত হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই গণিত-নির্ভর এই কল্পনায় নক্ষত্রের ভর অসীম। এই আলোচনা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু নেহাতই গাণিতিক হিসেব-নিকেশের বাইরে এই আলোচনা এগোয়নি। আইনস্টাইন, সোয়ার্জশিল্ড, চন্দ্রশেখরের কথা আগেই বলেছি। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৫৮ সালে বিজ্ঞানী ডেভিড ফিঙ্কেলস্টাইন কৃষ্ণগহ্বরের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাজির করেন।

কৃষ্ণগহ্বর গবেষণায় নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কৃত হতে থাকে।

সত্তরের দশকে রজার পেনরোজ ও স্টিফেন হকিং দেখান কৃষ্ণগহ্বর কোন শর্তে শক্তি বিকিরণ করে। আমরা জানি মহাবিশ্বের গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকার গতি প্রকৃতি নিয়ে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, অন্যদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন নিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার চর্চা। ক্ষুদ্র আর বৃহতের প্রকৃতিকে একই গাণিতিক ব্যাখ্যায় বেঁধে ফেলা বিজ্ঞানীদের স্বপ্নসাধনা। পেনরোজ-হকিং জুটি সেই অসাধ্য সাধন করেন। দুটি কৃষ্ণগহ্বর কোনো কারণে কাছাকাছি চলে এলে, একে অপরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। প্রচুর শক্তি বিনিময়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়। এরই নাম হকিং রেডিয়েশন। অতি ক্ষুদ্র মানের এই বিকিরণ পরীক্ষা করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব না হলেও আগামী দিনে শক্তির উৎস হিসেবে কৃষ্ণগহ্বরের কথা বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত। তত্ত্বগতভাবে এমন শক্তি বিকিরণ কৃষ্ণগহ্বরের সমাপ্তি ডেকে আনতে পারে, বিজ্ঞানীরা তাই এর নাম দিয়েছেন কৃষ্ণগহ্বরের বাষ্পীভবন।

প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তঃস্থলে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের কথা আজ সবার জানা। এমন একাধিক কৃষ্ণগহ্বর কাছাকাছি এলে একে অপরকে গ্রাস করে বৃহত্তর কৃষ্ণগহ্বরের সম্ভাবনাও বিজ্ঞানীদের আলোচনার বিষয়। আকারের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সাধারণ মাপের নক্ষত্রের কৃষ্ণগহ্বরের পরিণতি হলে তার নাম নাক্ষত্রিক কৃষ্ণগহ্বর। সূর্যের চেয়ে বিশগুণ ভারি এমন কৃষ্ণগহ্বর আমাদের ছায়াপথে অসংখ্য। আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকার থেকে শুরু করে কয়েক লক্ষ গুণ ভারি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বও বিজ্ঞানীদের জানা আছে। সাধারণ মাপের নক্ষত্র থেকে শুরু করে অতিকায় নক্ষত্রের পুঞ্জীভূত ঘূর্ণন মহাবিশ্বের কাঠামোয় অতি সূক্ষ্ম কম্পন সৃষ্টি করে। দ্রুতবেগে ধাবমান ট্রেন যেমন প্ল্যাটফর্মের কংক্রিটে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। মহাবিশ্বের এই কম্পনকেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বলে। দুটি কৃষ্ণগহ্বর কাছাকাছি এলে এদের সম্মিলিত ঘূর্ণনের কম্পনও মহাকর্ষ তরঙ্গ তৈরি করতে পারে। এই তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলেও কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observetory) গবেষণাগারের যন্ত্রে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। LIGO গবেষণাগারের মহাকর্ষীয় তরঙ্গের পরীক্ষা ভাবনাচিন্তার জগতে এক অভিনব দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত মহাবিশ্বের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে জানতে হলে নির্ভর করত হত দূরাগত নক্ষত্র থেকে আসা আলোকবিন্দু—গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি প্রভৃতির উপর—যার সাধারণ নাম তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ কিন্তু তড়িতচুম্বকীয় তরঙ্গ নয় LIGO গবেষণাকেন্দ্রও সেই অর্থে অন্যান্য মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র থেকে পৃথক। আমেরিকার লিভিংস্টোন ও ওয়াশিংটনে ক্যালটেকের যৌথ তত্ত্বাবধানে LIGO গবেষণাগার পরিচালিত হয়। প্রায় দু-হাজার কিলোমিটার লম্বা, ইংরাজি L-আকারের ২.৫ ফুট ব্যাসের ধাতব নল বারো ফুট চওড়া ও দশ ফুট উঁচু কংক্রিটের মধ্য বায়ুশূন্য করে রাখা হয়। এর মধ্যেই রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবস্থা। লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরে কোনো কৃষ্ণগহ্বরের স্পন্দন কিংবা কোনো নক্ষত্রের জন্মমুহূর্তের কম্পন এই যন্ত্রের সাহায্যে অনুভব করা সম্ভব। তাই অতিকায় দূরবিনকে যদি চোখের সাথে তুলনা করা যায় তবে LIGO গবেষণাকেন্দ্র কানের সঙ্গে তুলনীয়।

১০ এপ্রিল ২০১৯। অবশেষে দেখা মিলল সেই অদৃশ্য কৃষ্ণগহ্বরের। কথায় আছে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের মাধ্যমে আমরা আগেই কৃষ্ণগহ্বরের গুঞ্জন শুনেছি। এবার চাক্ষুষ দেখা। দেখালেন কেটি বাউমান—অধ্যাপিকা ক্যাথরিন লুই বাউমান। বিজ্ঞানী বাউমান কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ। ৫৫০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের একটা প্রায় অদৃশ্য বস্তু, বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই দেখো তার ছবি। কীভাবে কল্পনা করা যায়! সেও এক অভিনব পরিকল্পনা। বিশ্বের আটটি সুউচ্চ স্থানে আটটি বিশাল দূরবিন যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে তার তথ্যগুলিকে অতিকায় কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে এক সংহত দূরবিন যন্ত্র তৈরি করা EHT (Event Horizon Telescope)-এর কাজ। যেন পৃথিবী নিজেই একটা বিশাল দূরবিন। একটু সহজ করে ভাবা যাক। একজন ঘরবন্দি মানুষের কথা ধরুন। দরজা জানালা বন্ধ। বাইরের প্রকৃতিতে বিশাল এক বটগাছ তিনি দেখতে চাইছেন। ঘরের দেওয়ালে তিনি একটা ফুটো করলেন। গাছের একটা দিকের কয়েকটা ডালপালা তিনি দেখতে পেলেন। আন্দাজ করে দেওয়ালের আর এক জায়গায় একটা ফুটো করে গাছের অন্য একটি অংশ তিনি দেখলেন, এভাবে বেশ কিছু ছিদ্র বানিয়ে তিনি গাছটির সবটাই দেখতে পাবেন। এবার তিনি ভাবতে বসলেন কত কম ছিদ্র ব্যবহার করে সমগ্র গাছটি তিনি দেখতে পাবেন। কম্পিউটারের ভাষায় এই যুক্তিপরম্পরাই 'অ্যালগোরিদম'। বিজ্ঞানী বাউমান এমন 'অ্যালগোরিদম'-এর সাহায্যেই দীর্ঘ তিন বছরের তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশ্ববাসীকে এমন একটি চিত্র উপহার দিয়েছেন।

আমার গল্প ফুরোলো, বিজ্ঞানীরা কিন্তু বসে নেই। মহাবিশ্বের আরো রহস্য আবিষ্কারের নেশায় তাঁরা অঙ্ক কষেই চলেছেন।

লেখক : পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পারুলডাঙা এস.কে.ইউ.এস. লি.

Regd. No. 40, Dt. 18-06-1925

পোঃ নসরতপুর, পূর্ব বর্ধমান

গোপালচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক

হামজার সেখ
সভাপতি

Sl. No. 64

শারদ শুভেচ্ছা
BDA বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থা
BURDWAN DEVELOPMENT AUTHORITY
বর্ধমানের উন্নয়ন ও সেবায় নিয়োজিত

স্বপ্নের জলযান

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

অতিক্রম শব্দটিকে এখানে থামিয়ে
আঁধারের পাশে বসে
চুপচাপ দেখে যাই জলের বিস্তার
যে ভাষায় কথা বলে পানীয় তরল
যে ভাষায় নৌকো ভাসে শৈশবের খেলা
যে ভাষায় মেঘ ডাকে
বিদ্যুতের পাদদেশে বসে একলা কৃষক খোঁজে খেতের সবুজ

আমার নদীটি প্রিয় শুকিয়েছে খরাদেশে
রুক্ষ্ম গতরে তার অপুষ্টির দাগ
চুঁয়া কাটলে সেও তবু ঢেলে দেয় বুকের তরল।

রুখামাটি, শুখা দেশ, সাতমাস খরা
স্বপ্নে স্বপ্নে জলযান ভাসে

সাপ-অ অছি

রমেশ পুরকায়স্থ

মউসি তার রমণীয় মমতায় তুলেছে প্রাচীর :
কঁড়ে যাউচ অন্ধকারে
বড়হা বালং ডাকে : মহুয়ার ভাঁড়ে তুই দিনি না চুমুক?
কানে কানে বাংরিপোসি বলে গূঢ় কথা :
কোন্‌খানে সাপ নেই নারী?

বাইসনের মতো এক অন্ধকার অরণ্যের গভীরে তখন
হত্যা করে নীল চাঁদ; হৃদয়ের দ্রিম্-দ্রিম্ লয়ে
মহুয়ার গন্ধে ভেজা মাদলের মিঠে শব্দ তবু অরুন্তুদ
বনদুর্গা মন্দিরের পাষাণ চত্বরে; ঘোড়সওয়ার একা-একা
অশ্বক্ষুরে জ্যোৎস্নার ধূলি

করঞ্জাশাখার নীচে গুরবা সিং শুনেছিল ভাল্লুকের বাদামি গরর্
অঘ্রাণের ধানশিসে হাতির দঙ্গল নামে পুরাতন পথরেখা ধরে
পেখমের প্ররোচনা বনময়ূর ছড়িয়েছে অরণ্য-আভায়
মধু আর সেগুনের প্রাচীন বৈভব থেকে
নিঃশব্দ থাবায় চিতা নিয়ে গেছে কিছু রক্তকণা
তবু এই মৃত্যুর তোরণ দিয়ে পাথরপ্রতিম মানুষেরা
বার বার ফিরে যায় জীবনের কাছে।

আমিও আবহমান মানুষের সঙ্গে আজ প্রস্তরিত অন্ধকার ভেঙে
হেঁটে যাব মঞ্জরিত কালের অঙ্গনে
আপ-অ আছি?
মউসি তুমি বাধ্য করো উদ্বিগ্ন হৃদয়; কোন্‌খানে সাপ নেই?
জীবনের চেয়ে বড় কখনো কি মৃত্যুর সন্ত্রাস!

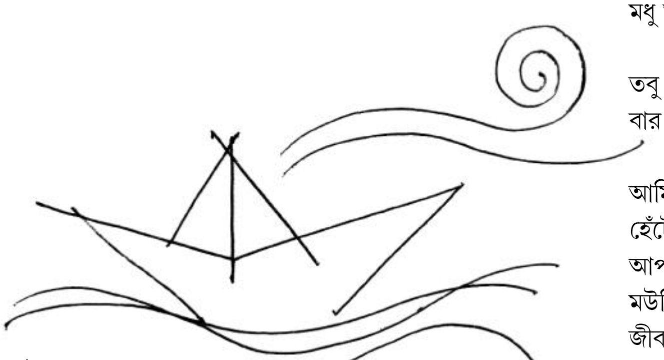

রুট

প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের কোনও নির্দিষ্ট রুট নেই :
সিল্করুটে যাত্রা শুরু করে
অনেকে ফিরে আসে তুষার-ক্ষত বয়ে;
অনেকে হারিয়ে যায় মার্কিন থানের
বোঝা মাথায়—
লংমার্চ পথে নেমে হাহাকার গোনে!

বিশুদ্ধ পথ বলে কিছু নেই :
বি.পি.এল. লাইনে যার যাত্রা শুরু
যার হাতেখড়ি স্কুলঘর ভাঙায়—
তার জন্য অপেক্ষা করে পাঁচতারার
জটিল হিমঘর—

অথচ জনপদ সাজিয়ে তুলবে বলে
যে কাটালো পথের পরিচর্যায়—
সংসার তার জন্য সাজিয়েছে
দাউ দাউ দুরন্ত বাসর...

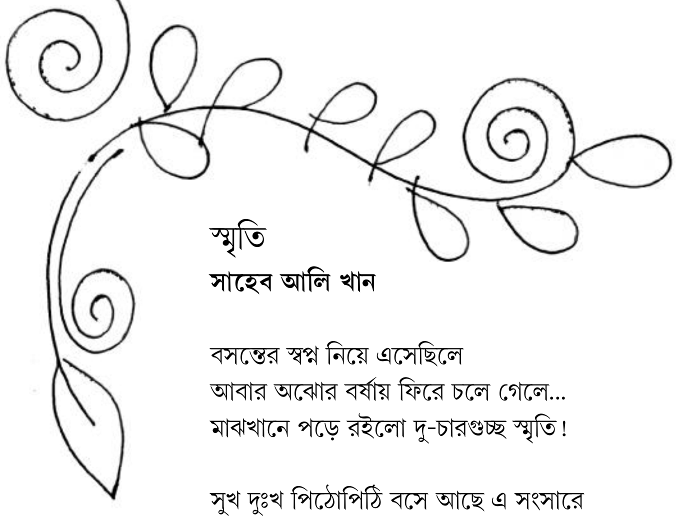

স্মৃতি

সাহেব আলি খান

বসন্তের স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলে
আবার অঝোর বর্ষায় ফিরে চলে গেলে...
মাঝখানে পড়ে রইলো দু-চারগুচ্ছ স্মৃতি!

সুখ দুঃখ পিঠোপিঠি বসে আছে এ সংসারে
শুধু ছিলে না তুমি।
একা একা দিন কাটাই
রাত্রি দিন দু-চোখের পাতায় ঘুম আসে না
শুধু মরুবুকে জলের প্রত্যাশা নিয়ে
বেদনা কুরে খায় আমার হৃদয়!

অকবিতা গুচ্ছ

মনামী ঘোষ

১.
কত যন্ত্রণা তোর প্রতি রোমকূপে
ওষুধে চেতনে ঝিম ধরা দেহ তোর
আমাদের তবু সবই সহনীয় হয়
দুচোখে পট্টি অন্ধকারের ঘোর

যা কিছু ঘটুক আমরা নির্বিকার
রক্তের ছিটে লুকোয় নিপুণ মেকআপ
শপিংমলেতে পার্কে চর্চা চলে
তারকার প্রেম কিংবা নতুন ব্রেকআপ

আমরা তবুও সচেতন নাগরিক
বিবেকের ক্ষত ঢেকে রাখি বাহানায়
টুইঙ্কলরা আসিফারা ক্ষমা কর
অমেরুদণ্ডী আমরা মৃতপ্রায়!

২.
কারা যেন হেঁটে যায় সারে সারে
অস্ত্রের ঝনঝনি শোনা যায়
পতাকায় ঢেকে যায় খোলা আকাশের মুখ
কমে আসে আলো হাওয়া
দমচাপা চারপাশ।
মিছিলের মাথা নেই, কবন্ধ তারা
পায়ের পাতারা সব পিছনে ফেরানো থাকে!
আঘাতে ভেঙেছো তুমি ঈশ্বর!
লজ্জার ভয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গুমরে মরি
যে চোখ ফুটিয়েছিলে বর্ণের পরিচয়ে
ঠুলি পরি সেই চোখে, সব সই নতমুখে
বড় অক্ষম আমি, ক্ষমারও যোগ্য নই!
আমার যে শিরদাঁড়া ভাঙা।

৩.
এরপরেও বলতে পারি আমরা মানুষ!
নৃশংস এই বর্বরতার শেষটা কোথায়?
মানবতা, শান্তি এখন রঙিন ফানুস
পুজোর নামে মানুষ কেমন অস্ত্র শানায়!

এরপরেও মুখটি বুজে থাকতে হবে
তাবরেজের কান্না কি আর বাজবে কানে!
দেশ মানে যে দেশের মানুষ, ভাববো কবে—
বুদ্ধ কৃষ্ণ খ্রিস্ট আল্লা একই মানে।

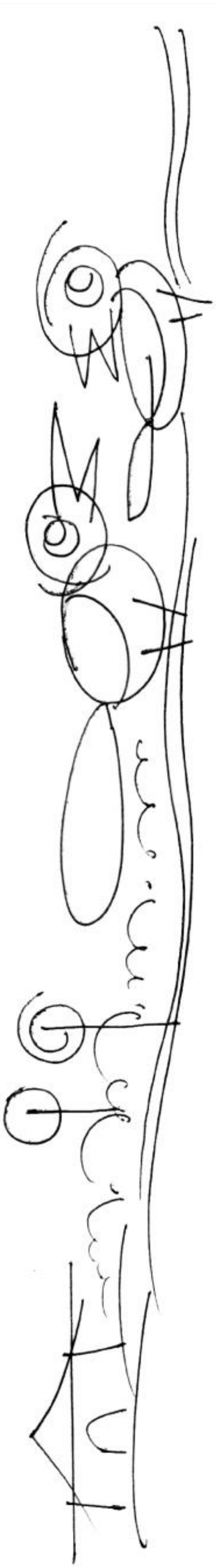

সংকেত

গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়

সংকেত তবুও কিছু ঘুরে ফিরে
আসে যায়, যায় আসে—
সংক্ষুব্ধ চেতনায় কখনো বা
গান হয় গোপন বাতাসে।

আজও পাখির কূজন
শরতের কাকভোরে
যাপনের আনন্দ আনে, ঘুমঘোরে দুচোখ
কচলে দেখি নীলাম্বরী শাড়ি পরে
গতজন্মের কোনো প্রিয়তর নারী দাঁড়িয়ে আছে
খোলা দরজায় আত্মগত সুবাস ছড়িয়ে...
তার উদাসী আঁচল উড়ে যায় দিগন্তের দিকে।

চোখের কাজলে লেখা হয় বৃষ্টিকথা
মন্ত্রমুগ্ধ কিশোরীর দৈবনির্দেশে
কাকজ্যোৎস্নায় ভিজে চলে যাই বালুতটে মোহনায়
নাগরিক গর্জন এড়িয়ে ফিরে যাই
বিপ্রতীপ অরণ্যে, পুরোনো সংকেত কিছু মেনে
বনছায়াকেই ঈশ্বর মেনে ফিরে যাই নদীর বিজনে।

এলিয়েন

সূর্য মণ্ডল

আমাদের পাড়ায় জ্যৈষ্ঠের দুপুরে একটা কোকিল ডাকে
আমি সেই ডাক শুনে সন্দিহান হই
বিরক্ত হই
তাকে মুখপোড়া মিনসে বলতে গিয়ে
দেখি
সে আগেই সারা শরীরে অন্ধকার মেখে বসে আছে

নিরুপায় আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখি
তিনি বহিরাগত আখ্যা দেন।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখি
তিনি বলেন খচ্চর প্রতিবেশী

তারপর দরবার করি রাষ্ট্রসঙ্ঘে
সেখানে মহাসচিব ঘাড় দুলিয়ে
এলিয়েন এলিয়েন বলে চেল্লান

আমি কোকিলটিকে পুনরায় মুখপোড়া মিনসে ভেবে
অন্ধকারে জ্বালিয়ে রাখি একটি ক্ষীণ শিখা...

এই বধ্যভূমি আমার দেশ নয়

পান্নালাল মল্লিক

স্বপ্ন নয়, সাধারণ পাঁচ জনের মতো কবিও দেখতে পান
তাঁর সময়টাকে...
শুধু একখানা চেয়ারের দখল নিতে গিয়ে আর কত নিরীহ
নারীপুরুষের লাশ মাড়িয়ে যেতে হবে!
খুন ধর্ষণ আর সন্ত্রাস কবলিত এদেশ বারবার কেঁপে উঠছে
অত্যাচারীর আস্ফালনে—
এই বধ্যভূমি আমার দেশ নয়।

নিরো আজ ঠাণ্ডা ঘরে আরাম কেদারায়,
সে আপন মনে কবিতা লেখে, পিয়ানোয় সুর তোলে, ছবি আঁকে—
আর জনে জনে তকমা বিলোয়,
সে মাইক হাতে কখনও অমাইক কখনও উদ্ধত
আস্ফালনে ফেটে পড়ে...
সে খুনিকে আড়াল করে নির্যাতিতকে ডোল দেয় দাদন দেয়।
কত মায়ের কোল রক্তে ভেসে গেছে, কত গৃহবধূ আজ স্বামীহারা,
সন্তানহারা... কারার অন্তরালেও রক্তের স্রোত,
এই হিংসাকে আর কতদিন অহিংসার নামাবলি পরিয়ে রাখতে হবে,—
এই বধ্যভূমি আমার দেশ নয়।

ফুল দিয়ে গন্ধ ঢাকা দেওয়ার রেওয়াজ আর কতদিন—
আর কতদিন খুন রাহাজানি আস্ফালন রক্তস্রোত!
প্রতিশ্রুতি আজ লাল ফিতের বাঁধনে শ্বাসরুদ্ধ—
এই বধ্যভূমি আমার দেশ নয়।

শামুক

রীনা মিত্র

ভয় পেতে পেতে আমরা ক্রমশ
শামুক হয়ে যাচ্ছি।
বিবেক ফেরি করে,
নিভৃত অন্ধকারে,
নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময়
কী অদ্ভুত অনুভূতি!
যা হচ্ছে হোক বাবা—
চোখ কান খোলা রেখে
মুখটা যদি বন্ধ থাকে
যার যা বিপদ আসে আসুক
আমার তাতে কী?
খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলে
আগুনে পড়বে ঘি।
তার চেয়ে বেশ ভালোই তো
নরক দেখে অভ্যস্ত
মরার আগেই মরেছি
ভয়ে শামুক হয়ে যাচ্ছি।

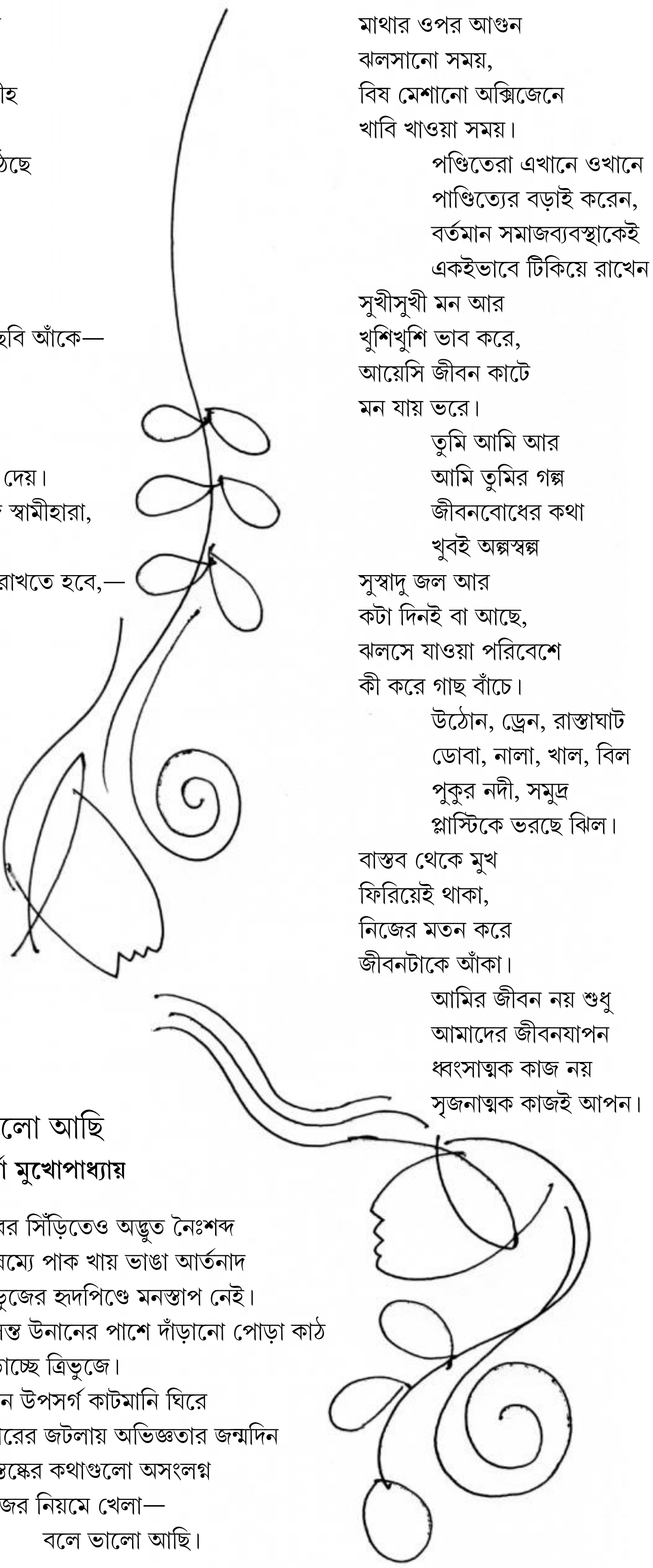

ভালো আছি

ঝর্না মুখোপাধ্যায়

ঘরের সিঁড়িতেও অদ্ভুত নৈঃশব্দ
বৈষম্যে পাক খায় ভাঙা আর্তনাদ
ত্রিভুজের হৃদপিণ্ডে মনস্তাপ নেই।
জ্বলন্ত উনানের পাশে দাঁড়ানো পোড়া কাঠ
জড়াচ্ছে ত্রিভুজে।
নতুন উপসর্গ কাটমানি ঘিরে
ভোরের জটলায় অভিজ্ঞতার জন্মদিন
মস্তিষ্কের কথাগুলো অসংলগ্ন
নিজের নিয়মে খেলা—
বলে ভালো আছি।

সময় এখন

কানাইলাল বিশ্বাস

মাথার ওপর আগুন
ঝলসানো সময়,
বিষ মেশানো অক্সিজেনে
খাবি খাওয়া সময়।
পণ্ডিতেরা এখানে ওখানে
পাণ্ডিত্যের বড়াই করেন,
বর্তমান সমাজব্যবস্থাকেই
একইভাবে টিকিয়ে রাখেন।
সুখীসুখী মন আর
খুশিখুশি ভাব করে,
আয়েসি জীবন কাটে
মন যায় ভরে।
তুমি আমি আর
আমি তুমির গল্প
জীবনবোধের কথা
খুবই অল্পস্বল্প
সুস্বাদু জল আর
কটা দিনই বা আছে,
ঝলসে যাওয়া পরিবেশে
কী করে গাছ বাঁচে।
উঠোন, ড্রেন, রাস্তাঘাট
ডোবা, নালা, খাল, বিল
পুকুর নদী, সমুদ্র
প্লাস্টিকে ভরছে ঝিল।
বাস্তব থেকে মুখ
ফিরিয়েই থাকা,
নিজের মতন করে
জীবনটাকে আঁকা।
আমির জীবন নয় শুধু
আমাদের জীবনযাপন
ধ্বংসাত্মক কাজ নয়
সৃজনাত্মক কাজই আপন।

কাঙ্ক্ষিত না হতে পারি

সুনির্মল কুণ্ডু

কাঙ্ক্ষিত না হতে পারি, তবু থাকি...
প্রবেশ-প্রস্থান নিয়ে মাথাব্যথা নেই
কারো,

খবরাখবর
কে আর রাখছে কার, সব হাঁকাহাঁকি
গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, সেই
অবান্তর শব্দাবলী আরো
তেতো লাগে যদি কোনো চেনা কণ্ঠস্বর
শোনা যায়!
চারদিকে বেশি বেশি দালাল জুটেছে যত
আখড়ায়—
কত সাধু সাধু সাজে বিচিত্র মানুষ সব মাথা অবনত
রেখেই করছে ফোঁস,
শুধু সুযোগের অপেক্ষায়
বলা হচ্ছে জনরোষ
শহর বা গাঁয়!

প্রতিদিন উদয় এবং অস্তে... মেঘ ও রৌদ্রে... ঝড় ও বাতাসে
চলছে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব,
মানুষে মানুষে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
ভেদাভেদে তৃপ্ত কেউ নিজেকে ভাবছে এক সার্বভৌম স্বাধীন নবাব :

কাঙ্ক্ষিত না হতে পারি, তবু আছি কায়ক্লেশে বহুকাল নিজের মাটিতে—
ঘর থাক না-ই থাক... মাথা উঁচু করে বাঁচি গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে
আর সব মানুষের পাশে;
যুদ্ধ তো হয়েছে ঢের সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে—
এখনও মানুষ আছে এত মৃত্যু ধ্বংসের পরেও;
কাঙ্ক্ষিত না হতে পারি বাহিরে ঘরেও
আজও আছি
মানুষের সাথে মিশে আছি।

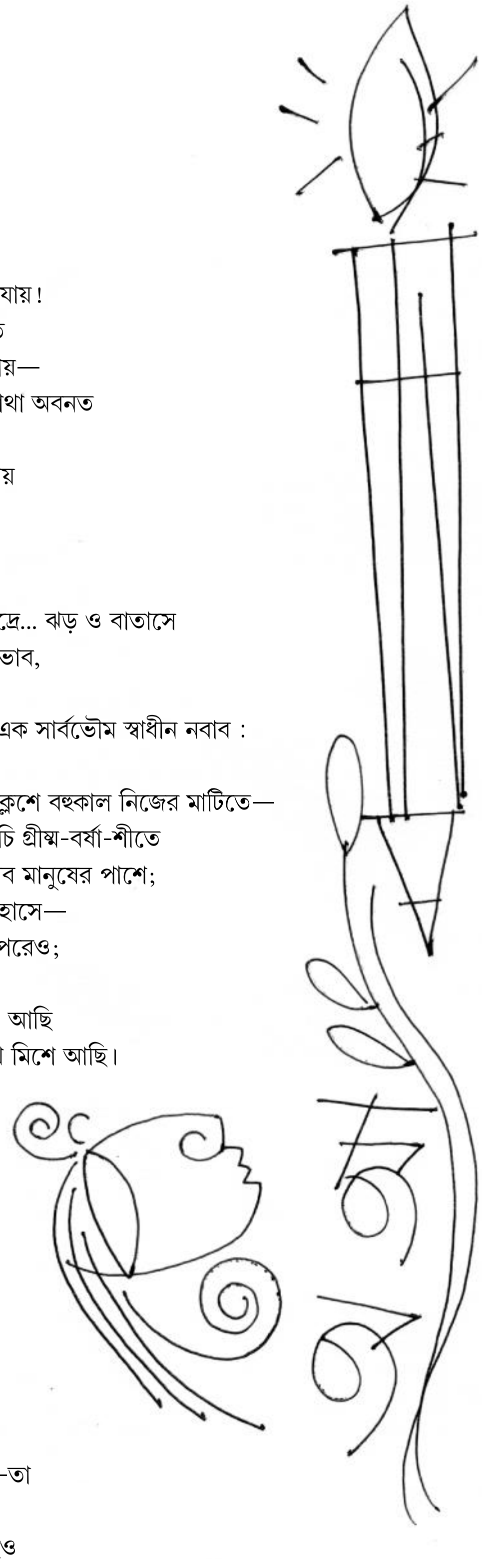

প্রসাদ

গৌতম সাহা

একবারই
মাত্র একবারই
কবি অরুণ মিত্রের সঙ্গে আমার
দেখা হয়েছিল
প্রণাম করেছিলাম বেশ মনে আছে
জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী লেখো
আমি ইতস্তত করে বলেছিলাম— ক-বি-তা

তিনি বলেছিলেন—কবিতায় দীর্ঘজীবী হও

পাঠাভ্যাস

রীতা বসু (ধর)

সুবর্ণের হাতেখড়ি হয়ে গেছে
আগামী বছরে স্কুলে যাবে,
নিয়ম মতো মার কাছে তার
পাঠাভ্যাস চলছে।

দয়াময়ী বলে চলে
অ—তে অজগর
আ—তে আম।

আধঘণ্টা পড়ার পর
দয়াময়ী বলে
এ ফর অ্যাপেল
বি ফর ব্যাট
সুবর্ণ মা-র সুরে সুর মেলায়।

তারপর আরো আধঘণ্টার পর
অ—মে অনার
আ—মে আম
ই—মে ইমলি

তোতাপাখির সুর বদলায়
চাপা দীর্ঘশ্বাস ঘর ডিঙিয়ে যায়
সামনের দিকে।
ভাষার পথপরিক্রমায়
আগামী শিশুরা
পাখিদের ভাষাগুলি
শুধু নয় আরও কিছু
বোধগম্যের বাইরে
শিক্ষাটুকু নেবে।
যেখানে মাতৃভাষা
শুধু ভাসতেই থাকবে।

হয়তো বা সিঁড়ি ভাঙা
অঙ্কের মতো
নির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে নেবে।

শিল্পের আগুনে আমরা ক'জন

শ্যামলবরণ সাহা

শব্দ ক'রো না, পেরেক ঠুকো না...
স্বপনদেশে হরিহর নিদ্রা গেছেন!...

তবু এই বসন্তে চিতাকাঠ সাজানোর মতো
আমরা ইজেল সাজাবো,
শিল্পের আগুনে পুড়ে যাওয়া আমরা ক'জন
বেশ আছি... ভোলো আছি...

ক্ষীরোদবিহোরী পেসমেকার সামলে
গগনবিহারী চিলের মতো উড়ে এলো
খোসবাগানের মাঠে,
বিভাসরঞ্জন একহাতে ছবি অন্যহাতে পারকিন্‌সন্স...
যেন অকালপৌষে কাঁপছে,
এখনো প্রভাত আসেনি বলে—
কিছু কিছু ইজেলে অন্ধকার থেকে গেছে,
মানুষের 'কিডনি' নামক ছাঁকনি নষ্ট হয়ে গেলে
পেয়ালায় আর চুঁইয়ে পড়ে না সঞ্জীবনী সুধা!
ওই দূরে বিশ্বকর্মার হাতুড়ি নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বনাথ দে,
তারও নাকি 'হৃদ্‌কমলে ধূম লেগেছে'?

যমের দুয়ারে হৃদয় প্রদর্শনী করে
লাশ ও পলাশ ডিঙিয়ে ফের এসেছি আমি,
চলো, গুহা মানুষের মতো ইজেল আগলে দাঁড়াই—
আমাদের প্রতিটি ক্যানভাসে, ইজেলে ইজেলে
জ্বলে উঠুক পৃথিবীর প্রথম আগুন!...

খেলা

সঞ্চয়িতা কুণ্ডু

বাতাবি লেবুর গাছে চড়ুইয়ের বসবাস।
সেই মধ্যরাতে কিছুই না জেনে একবার যেই নাড়িয়েছি গাছ
অমনি সমস্ত পাখি ঘুমহীন, গৃহহীন, স্বজনহারা অন্ধকারে
তাড়া খেয়ে হারিয়েছে পথ। এই ঘটনায় ততোধিক
ঔদ্ধত্যে-আনন্দে আমি দিশেহারা।
এরপর প্রায় দিনই এইভাবে রাত্রি জেগে নাড়িয়েছি গাছ।

কোনো গ্রাম, কোনো নগর, কোনো দেশকে এখন কারা
সেভাবেই নাড়ায় এক একটি গাছের মতন!

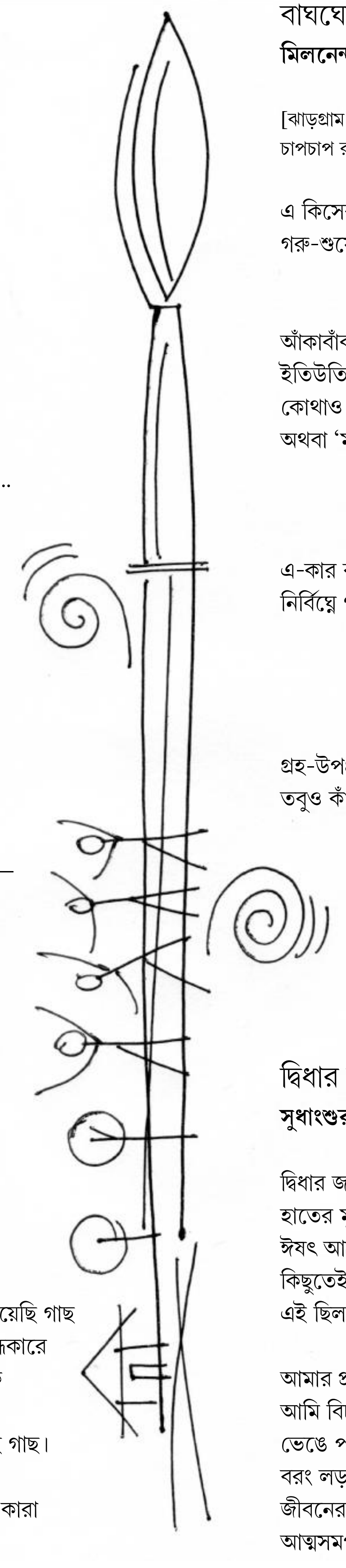

বাঘঘোরার জঙ্গলে

মিলনেন্দু জানা

[ঝাড়গ্রাম-লালগড়ের বাঘঘোরা জঙ্গলে মাঝেমধ্যে
চাপচাপ রক্তের দাগ চোখে পড়ে...]

এ কিসের দাগ? রক্ত?
গরু-শুয়োরের নাকি অন্য কিছু?
—কে দেবে জবাব!

আঁকাবাঁকা ঝোপঝাড়—
ইতিউতি অলিগলি—
কোথাও 'নির্ভয়' নেই,
অথবা 'মহান' কোনো;
শুধুই দমকা হাওয়ায় রক্তের
'চোখ' : 'আমায় মেরেছে ওরা'!

এ-কার রক্তের 'নাক'
নির্বিঘ্নে গন্ধ শুঁকে বলে : তোমরা কারা?
—মানুষ?
নাকি ভিন্ন গ্রহের জীব?
—কোত্থেকে আসবে জবাব?
—কে-ই বা দেবে তা!
গ্রহ-উপগ্রহে ইসরোর 'দিশা'।
তবুও কাঁপছে মাটি, ধর্ষিত পল্লব :
'বাঘঘোরা' জঙ্গলের নিরুত্তর প্রশ্ন
এ কিসের দাগ?
দেশময় কেনই বা হালুম?

দ্বিধার জলাশয়

সুধাংশুরঞ্জন সাহা

দ্বিধার জলাশয়ে ভাসতে ভাসতেই
হাতের মুঠোয় ধরেছি বিকেল।
ঈষৎ আলো আর ঈষৎ কুয়াশা ছাপিয়ে
কিছুতেই অন্ধকার ঘনাতে দেব না।
এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা।

আমার প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা করে অন্ধকার যদি আসেও
আমি বিচলিত হবো না।
ভেঙে পড়বো না একদম।
বরং লড়াই চালিয়ে যাবো
জীবনের শেষ দিন অব্দি।
আত্মসমর্পণ কিছুতেই নয়।

শেখ জয়নাল আবেদীনের তিনটি কবিতা

বার্তা

যেমন আছেন হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান ধার্মিক
পার্শি জৈন সহ বৌদ্ধ পৃথিবীর দেশে মহাদেশে
আলো বায়ু মাটি জলে ঘর বেঁধে আছেও নাস্তিক
হিংসা ঘৃণা হানাহানি ফিরে গেছে বারে বারে এসে।।

বৃথা

প্রতি পাঁচে যদিও হিন্দুই চার এই হিন্দুস্তানে
যদিও তৃতীয় দেশ মুসলিম সংখ্যার নিরিখে
মেতেছে নতুন করে অবাঙালি বাঙালি শ্লোগানে
বৃথাই দক্ষিণ পন্থা বিশ্বজয়ে ছোটে দিকে দিকে।।

কবে

এদেশে সাড়ে ছ-কোটি বেকার চাকরি পাবে কবে
আত্মহত্যা কবে বন্ধ হবে অন্নদাতা কৃষকের
বাতিলে বাতিল লাখ পঞ্চাশ শ্রমিক কোথা যাবে
বাড়বে বরাদ্দ কবে শিশুদের মিড-ডে মিলের।।

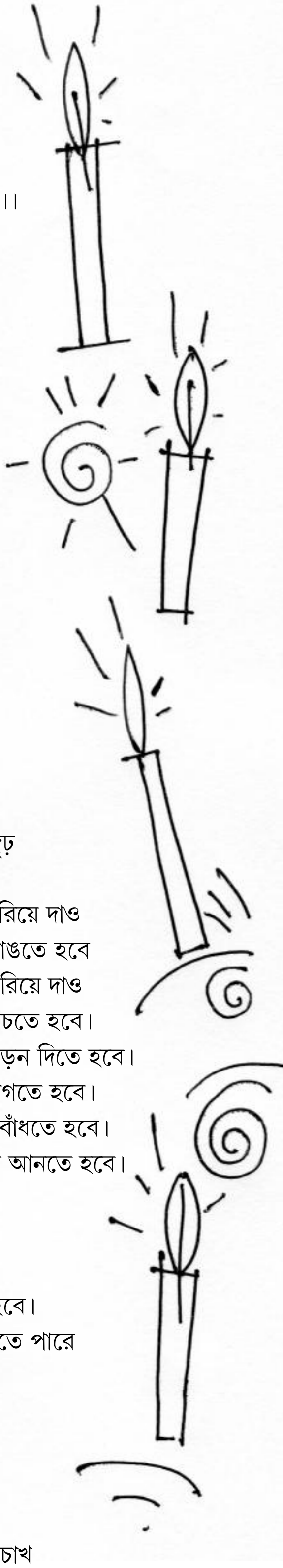

এখনও বেঁচে আছে রামপিয়ারী

সুকমল ঘোষ

তোমার পা দুটো শক্ত করো, হাতের মুঠো হোক দৃঢ়
রামপিয়ারী, তোমার এখন অনেক কিছু বাকি।
নদীর পাড়ে হাড়ের পাহাড় সরিয়ে দাও
পাঁচিল ঘেঁষে শত্রু শিবির ভাঙতে হবে
সোজা রাস্তায় খাল কেটেছে ভরিয়ে দাও
পাঁক জমেছে নদীর জলে ছাঁচতে হবে।
ধান রুইতে হবে জমিতে নিড়েন দিতে হবে।
পোকায় যেন ধান না কোটে দিনরাত্রি জাগতে হবে।
যাদের ঘর জ্বালিয়ে গেছে তাদের ঘর বাঁধতে হবে।
এখনও যারা ঘর ফেরেনি তাদের ঘরে আনতে হবে।

রামপিয়ারী
এখন তোমার অনেক কাজ।
জোট বাঁধতে হবে, জট খুলতে হবে।
চারাগাছের মাথা ছুঁয়ে বাতাস যেন লুকোচুরি খেলতে পারে
নদী যেন গান গায়
হাল যেন তার সুর ধরে
সন্ধ্যা হলেই প্রদীপ যেন জ্বলে।

রাস্তা সোজা, খানাখন্দহীন, ধানসবুজ সিঁড়ি, নদীর
ঝিরিঝিরি গান শুনতে শুনতে; ঘাড় উঁচু, সামনে চোখ
শিরদাঁড়া সোজা, টানটান শরীরে সবল পা ফেলে
হলদির এ-পাড় থেকে ও-পাড়ে এগিয়ে যায় রামপিয়ারী।

দিনরাত

মাধুরী অধিকারী

সমস্ত দিন এমনি ভাবেই কাটে
কখনো উদাস কখনো এলোমেলো
সমস্ত দিন কিসের এত ঘোর
নিদ্রাবিহীন সমস্ত রাত ভোর
সমস্ত দিন ফসল বোনার আশা
ঠোঁটের তলে লক্ষ নিযুত ভাষা
ফুটছে ফুটুক সময় তো নেই তার
খুচরোগুলো ফুরোলে মুখ ভার
মানুষগুলো কাঁদছে, বড়ো কাঁদছে
দোকান বাজার নিজের মতো ডাকছে
এলোমেলো উদাস পরিবেশ
মধ্যরাতে এলানো যার কেশ
আপাত এক শক্তপোক্ত মন
মধ্যরাতে কেমন অন্য জন!

মধ্যরাতে সে আর মানুষ নয়
কুঁকড়ে ওঠে, কিসের যেন ভয়
শরীর যে তার মনের ভিতর
সিঁধ কাটছে পায়ে পায়ে
বিশ্বজুড়ে কত শত
সদ্যোজাত যায় হারিয়ে
সবই যেন তার জঠরে
চেঁচিয়ে বলে 'চাই মা তোকে'
সমস্ত দিন যেমন কাটুক
রাত্রে সে যে একলা মেয়ে
সমস্ত দিন উথালপাথাল
সমস্ত রাত আকাশ চেয়ে।।

সাঁকো

পবিত্র কুমার ভক্তা

সাঁকো পেরিয়ে তবেই বিলপুকুরের দিগন্তে
সুদূর মাঠের নরম শিশির ভেজা ঘাসের প্রান্তে।
হাঁটতে হাঁটতে ধান, বকের দল আর দুরন্তপনা
কাদামাঠ, শালুক, শামুকের ফলা আর বাতাসের মূর্ছনা

সাঁকো পেরিয়ে মাঠে আসে পশ্চিমের লাল বল
জেনারেশন কালো পথে পাড়ি দিলে
জীর্ণতা ঢেকে ফেলে সাঁকো।

সেই সাঁকোটা না থাকলে লালবল খেলবে না
লালবলের সাথে না খেললে নিথর শীতে
শৈশব ঝিমিয়ে যাবে।

অন্ধকারের স্বরলিপি

মানিকলাল অধিকারী

আজ আর আমার কোনো আক্ষেপ নেই
তুমি শুধু সময় পেলে হাতদুটো ধরে
এই বারান্দায় একটু বসিয়ে দিয়ো।
হ্যাঁ। এই বারান্দার কোণে।
যেখানে অসংখ্য দিন রাত্রি এসে বসেছি একাএকা।
কতবার কত কত বার আমারই চোখের সামনে
পাপড়ি মেলেছে গোলাপ
টুপটাপ ঝরে পড়েছে শিউলির দল।
পূর্ণিমার রাতে চাঁদ যখন ঢলেছে দিগন্তে
দুধসাদা লক্ষ্মীপ্যাঁচা ডানা মেলে উড়ে গেছে
ওই মহাবেলের শীর্ষদেশ থেকে।
নিজেকে একটু একটু করে গড়ে
তিলোত্তমা নাগচম্পা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন।

আমি আর এসব কিছু দেখব না।
আজ আর আমার কোনো আক্ষেপ নেই।
তুমি শুধু মনে করে টেলিভিশনটাকে একটু চুপ করিয়ে রেখো।
আমি যে শব্দের সঙ্গে বারুদের পোড়া গন্ধটাও টের পাই।
টের পাই ঘুমিয়ে পড়া লাশের কান্না।
এই বারান্দার কোণে বসে অন্ধকারে
আমি সমস্ত ফুসফুস ভরে একটু বাতাস নেব।

যে অকৃপণ শিউলিরা আজো তেমনি ভাবে
ফুটে ওঠে, রঙ ঝরায়
দু-হাতে বিলোয় নিজস্ব সত্তা
আমি আজ শুধু তাদের সাথেই কথা বলব।
ও হ্যাঁ! তুমি কি ঠিক জান?
প্যারিসে শিউলিরা আর ততটা লালিত নয়
হারিয়ে গেছে কোন্ টেকনোলজির নির্মম পেষণে।

ইদানীং আমার ভুল হয় খুব।
দিনক্ষণ মাস তারিখ কেমন করে যে হারিয়ে যায়!
টের পাই যখন বিবর্ণ ক্যালেন্ডারের
ধূসর কোনো এক সংখ্যা কোনো একদিন
হঠাৎই আর্তনাদে চুরমার হয়ে যায়।
ইদানীং আমার ভুল হয় খুব।
তাই হয়ত নির্দ্বিধায় নিজেকে মানুষ বলে মনে হয়।
কিন্তু যারা ভুল করে না
একটি ট্রিগারে তুলে আনে আপন সাম্রাজ্য।
নিজস্ব রীতিনীতির অবাধ দুনিয়ায়
আছড়ে পড়ে দুর্বৃত্ত তীরন্দাজ!
তৃতীয় পাণ্ডব, তুমি কি লজ্জা পাচ্ছ?
রীঢ়ানীল! যেমন তোমার নপুংসক গাণ্ডীব
কোনো এক ভয়ংকর অঙ্গুলি হেলনে

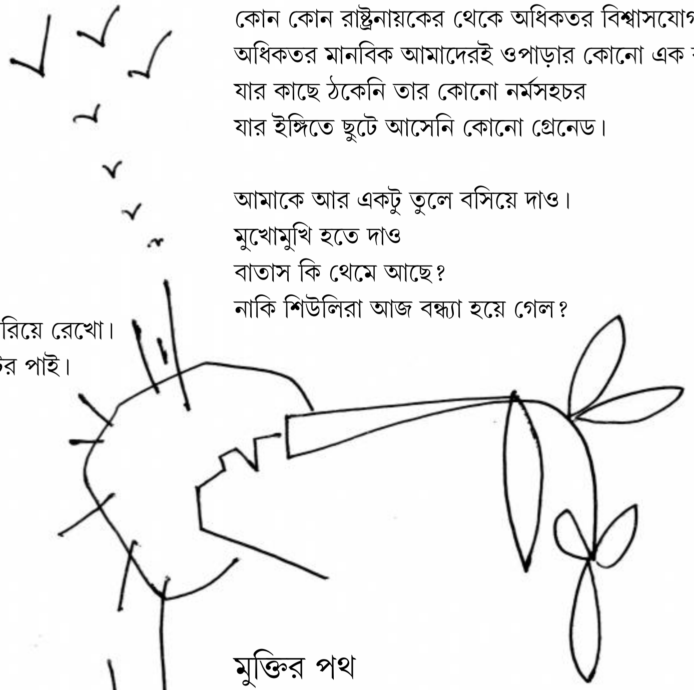

নিরস্ত্র ক্লান্ত এক জীবন কেড়ে নিয়েছিল।
কিংবা যে শিশুরা মায়েরা তাদের পরিবার পরিজনেরা
রক্তাক্ত বর্মের আড়ালে এখনো তাকিয়ে আছে নির্বাক।
গ্যালাক্সির দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে যে নক্ষত্রেরা
আর একটু পরেই হারিয়ে যাবে।
মহাপ্রস্থানের পথে চলতে চলতে
বিশুদ্ধ বোকার মতো তাদেরই জন্য তুমি কি বলতে পারবে
কোন কোন রাষ্ট্রনায়কের থেকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য
অধিকতর মানবিক আমাদেরই ওপাড়ার কোনো এক বারাঙ্গনা
যার কাছে ঠকেনি তার কোনো নর্মসহচর
যার ইঙ্গিতে ছুটে আসেনি কোনো গ্রেনেড।

আমাকে আর একটু তুলে বসিয়ে দাও।
মুখোমুখি হতে দাও
বাতাস কি থেমে আছে?
নাকি শিউলিরা আজ বন্ধ্যা হয়ে গেল?

মুক্তির পথ

বিশ্বনাথ নায়েক

লাগবে করে হাওয়া পালে,
মোর তরী ভাসবে সেই সকালে?
রাধার বন্ধন-রজ্জু টুটে,
মোর তরী ভিড়বে স্বপ্ন ঘাটে।
ফেরিঘাটে নিরাশাতে,
বসে আছি অস্থির চিত্তে,
দূষণ মেঘ সরে গেলে
মোর মানস-তরী চলবে দুলে।
কল্যাণ সুরের পুণ্য ছোঁয়ায়,
গতিহীন মন পথ খুঁজে পায়।
জোয়ার এলে হও পারাপার,
যাত্রীরা সব রও হুঁশিয়ার।
আবার বইবে যে অনুকূল বাতাস,
নতুন আলোয় ভরবে আকাশ
তোমরা আন্দোলনের জোয়ার আনো
মুক্তির পথ যে পাবেই জেনো।

বাঘের নাতির জ্বর
বিকাশ পণ্ডিত

বাঘের নাতির দারুণ জ্বর, কাঁদছে বসে হাতি;
সিংহরাজা দেখতে এলেন মাথায় মস্ত ছাতি।
দুলিয়ে স্টেথো শেয়াল এল, কাঠবিড়ালি পিছে;
সঙ্গে এল আমড়াগুড়ির মস্ত কাঁকড়াবিছে।
শিং নাড়িয়ে মহিষ এল, গোটা চারেক গাধা;
ফোকলা মুখে বললে বানর—এসে গেছেন দাদা।
ভালুক এল হেলে-দুলে ভাবলে কিছুক্ষণ;
বললে—ভায়া, তোমার নাতির ওজন কত মন?
গোটা দশেক হরিণ দিও, পারলে একটা ছাগ—
বললে শেয়াল, আনুন কিনে গোটা বিশেক ঢাক।
অবাক সবাই—বললে মুখে, সারবে এতে জ্বর?
দেখুন-দেখুন বাঘের নাতি কাঁপছে যে থরথর!
মুচকি হেসে বললে শেয়াল—হয়নি কোনো রোগ;
হিজলতলির বাদার বনে যুদ্ধে হারার শোক।
ঢাক বাজলে জ্বর ছাড়বে, জোর ফিরবে মনে;
বাঘের ঘরে ব্যস্ত সবাই, হুলস্থুল বনে।

ছোঁয়া
রীনা কুণ্ডু

সকালের রোদে রেখেছি
জামা কাপড়ের সাথে
ঘরকন্নার টুকিটাকি।
আচার, পাঁপড়, বড়ি
মিস্টারের স্যুট, অন্তর্বাস।
বিকেলের ঝড় এসে
এলোমেলো করেছে সব।
বুকে আগলাতে আগলাতে
কখন উড়েছে আঁচল
আঁচল টানতে দেখি
ধুলো গাছকে ছুঁয়েছে
এক গাছ আর এক গাছকে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে
গোধূলি বিকেলের
আবিরে মেতেছে
ধুলোমাখা ঝড় দেখে
মনকে খামচে ধরি।
তাকাতে ভয় হয়
ভাবি কিছু বাকি আছে কি।
মেঘ ঢেকে দেয় আকাশটাকে
ঝড়ের দাপটে জোর করে
বন্ধ করে দিই দরজা
কিন্তু ভিজে গেছি
তুমি জানতে চাওনি।

বলিরেখা
গৌরী সেনগুপ্ত

দাঁড়িয়েছে যক্ষরাজ
দিতেছে আদেশ
ভুলে গেছে
ফেরে নিজে জনপ্রত্যাদেশ।

সমাবেশ ভরে গেছে
ভরে গেছে প্রত্যয়ের ভাষা
বাতাসে বসন্ত আজ
মন্দায় তাবিজ-প্রত্যাশা।

হাত নেই ভাত নেই
সব কিছু মালিকানাধীন
অন্তরঙ্গ দীর্ঘ পথ
কলরব মিছিলে স্বাধীন

ঘাম যদি দাম পায়
বৃষ্টিতে মরেনা অভীপ্সা
জমে-থাকা মেঘই পারে
মেটাতে গভীর পিপাসা।

দেশনামা
তন্ময় ভট্টাচার্য

উভচর
সত্যমিথ্যা নির্ধারণে রাত্রি দ্বিপ্রহর।
বৃহন্নলা
ধর্মাধর্ম বিশ্লেষণে ছদ্মরূপ এখনও অছিলা।

অভিষেক
আর্যপতি আমি শুধু গোটা বিশ্ব তাকিয়ে
দেখুক।
শ্লথগতি
উৎপাদন ছুঁয়ে যাক ধর্মে রাখো তুমি
স্থিরমতি।

নামাবলী
ষড়রিপু ষড়যন্ত্রী ভোট তাই কিছু সৈন্য বলি।
বীরধারা
পরিত্যক্ত অন্ধকারে অব্যাখ্যাত আলোর
ফোয়ারা।

আয়োজন
ইতিহাস বিনির্মাণে ব্যাকরণ কি বা
প্রয়োজন?
যক্ষপুরী
যারা ছিল পাশে তারা রাষ্ট্রধন নিক
চুরি করি।

চাঁদহারা রাত
লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা

গতকাল পূর্ণিমায় আকাশে ছিল না চাঁদ।
নিঃসঙ্গ রাত্রি খোঁজে নক্ষত্র নির্জনে।
অগাধ শূন্যতায় মেঘ ফিরে যায় বনান্ত তলে,
মুগ্ধ মাঠ চিৎ হয়ে গোনে প্রতিটি প্রহর।

স্বপ্নালু চোখে কিশোরী মন বলে বার বার
একফালি চাঁদ হতেও পারত আমার কণ্ঠহার।
অদ্ভুত বিষণ্ণতায় নেড়ে যায় বাদুড়ের ডানা
হারায় শৃগাল মাঝে মাঝে ধূর্ত কোলাহল
একান্ত নির্জনে গৃহী আঁটে খিল বিপন্ন অনুভবে।
মনস্তাপে ডাকে প্রতিবেশী, 'অবনী বাড়ি আছো?'
সম্ভ্রমে রাত্রি হলে শেষ, জাগে নগরী
খুঁজে নেয় টাটকা আলোয়
সকল পুঁজি।

সাইবার কাফেতে
শীলা দাশ

এখন নিদ্রাহীন পৃথিবী
সাইবার কাফেতে চলছে
কোলাহল উৎসব।

এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে
চ্যাটিং-এর আনাগোনা
নোনাজলে বিকোয় পৃথিবী।

মাউসে উড়ে চলে
এক পণ্য পৃথিবী
উড়ে চলে বেচাকেনা।

সোনারুপো রুপি
উড়ে চলে যায়
যে পারে সে পারে
পারে টেনে নিতে
পৃথিবী হাতের মুঠোয়
সাইবার কাফেতে।

■ ভ্রমণ

রূপসী শীতল মরুতে

চন্দ্রাবলী সেন

আশঙ্কা নিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একবার দেখতেই হবে। বিভিন্ন লোকের উৎসাহ যেমন ছিল, উৎসাহে জল ঢেলে দেওয়াও ছিল। তবুও অটল ছিলাম, এ আমাকে পারতেই হবে। শরীরের বয়সকে প্রাধান্য দিলে চলবে না, মনের বয়সকেই চলতে হবে পথ। দিল্লি থেকে বারোশো উনচল্লিশ কিলোমিটার দূরত্ব বায়ুযানে পেরিয়ে যেতে সময় লাগল দু ঘন্টারও কম। উড়ানে হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতমালার বরফ-ঢাকা শৃঙ্গ দেখেছি দুচোখ ভোরে। ধীরে ধীরে গতিপথ যখন কমিয়ে কালো পিচের রানওয়েকে ছুঁলো, তখন প্রথম দর্শনেই প্রেম। অপূর্ব!! আমরা এলাম লেহ-র কুশক বাকুলা বিমানবন্দরে। জম্মু ও কাশ্মীরের বেশিরভাগ সময় বরফে ঢাকা অঞ্চল অন্যতম উচ্চতার মালভূমি প্রায় তিন হাজার মিটার উঁচু সমুদ্রতল থেকে। রূপসী লাদাখ ও লেহ।

অনেক নদী বয়ে গেছে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। বয়ে চলেছে দুপাশের পর্বতমালাকে সাথে নিয়ে। এদের মধ্যে ইন্দাস দীর্ঘতম নদী যার গতিপথ ৩১৮০ মিটার। ইন্দাসের অনেকগুলি উপনদী আছে সেগুলি হল চেনাব, সুলেজ, ঝিলম, জানস্কার, রবি, বিয়াস। সবকটিই সৃষ্টি হয়েছে হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতমালার হিমবাহ থেকে। যেহেতু প্রায় আটমাস বরফের চাদরে ঢাকা থাকে সব জায়গা, তাই জল খুবই কম থাকে সে সময়। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর তাপে বরফ গলতে শুরু করে এবং নদীর জলের মাত্রাও বাড়ে। এই নদীগুলিই এই অঞ্চলের প্রাণ।

লাদাখ কথাটা তিব্বতী শব্দ, লা-ডাগস অর্থাৎ গিরিপথের দেশ (land of mountain passes)। এই অঞ্চলকে আমরা শীতল মরুভূমি বলেই জানি। মরুভূমির চরিত্র অতি উচ্চতার জায়গায় তেমন বোঝা না গেলেও উপত্যকা অঞ্চলে বেশ ভালো বোঝা যায়, যেটা আমরা দেখেছিলাম নুব্রাভ্যালিতে। লাদাখকে প্রধানত দুটো ভাগে পরিচিত করা হয়। একটা হল কার্গিল আর একটা লেহ।

অতি প্রাচীনকালে আর্যদের দুটি ধারা মনস্ (উত্তর ভারতের) এবং দার্দস (গিলগিট) এই দুধরনের মানুষের আগমন হয় এই অঞ্চলে—প্রায় খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো বছর আগে। তারপর তিব্বত থেকে মঙ্গোলিয়ান নোমাড্‌সরা আসে। এই তিন ধরনের জনজাতির সংমিশ্রণে বর্তমানের লাদাখবাসীদের ধারা চলছে। এদের মধ্যে তিব্বতের প্রভাব বেশি বলে কখনো একে লিটল টিবেটও বলা হতো।

লাদাখ একটা স্বাধীন রাজ্য ছিল ৯৫০ খ্রিঃ থেকে ১৯৩৪ সাল অবধি। তারপরে হিন্দু ডোগরাবংশ এখানে রাজত্ব করে এবং পুরো কাশ্মীর, লাদাখ ও বালিটস্থানকে জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা শাসন করতো।

ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে প্রতিবেশী দুই দেশ পাকিস্তান ও চিন -এর সাথে সীমান্ত বিরোধ এবং তার উত্তেজনা লেগেই থাকতো। দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর নজরদারিও জোরদার হল। যদিও লাদাখ ব্যবসা-বাণিজ্যের চলাচলের রাস্তা হলেও তেমন বেশি মানুষ ওদিকে যেতো না প্রবল শীত ও দুর্গম পাহাড়ি রাস্তার জন্য।

বর্তমানে দুটো জেলাতে ভাগ করা হয়েছে। কার্গিল ও লেহ। কার্গিল প্রধানত মুসলমান-অধ্যুষিত এবং লেহতে বেশিরভাগই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বাস। প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গমাইল এলাকায় মাত্র ২.৭৪ লক্ষ মানুষের বাস (সেনসাস রিপোর্ট ২০১১)। এখন আরও কিছু বৃদ্ধি হয়েছে। কার্গিলে জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ছিয়াত্তর দশমিক আটসাত আর বাকিটা লেহ অঞ্চলে। লাদাখে দুটো ঋতুই বোঝা যায়। বছরের আটমাস পুরু বরফে ঢাকা থাকে, বাকি চার মাসে সূর্যের প্রখর তেজ যখন পায় তখন বরফ গলে নদীর জল আসে তখনই কত কাজ ওদের। মূলত কৃষিকাজ ও পশুপালন এ নিয়েই এদের কর্মকাণ্ড। পর্বতাঞ্চলে শুধুই পাথর, কোনো গাছ নেই। দুটো পাহাড়ের মাঝে যেখানে জল জমে বা নীচের উপত্যকাতেই চাষাবাদ ও গাছ দেখা যায়। চাষ বলতে মূলত বার্লির চাষ, বিভিন্ন ধরনের গম, মটরশুঁটি, টুরনিপের চাষ। ফল হয় খুব যেমন অ্যাপ্রিকট, ওয়ালনাট। দশ-এগারো হাজার ফুট উচ্চতায় এগুলো হয়। এর থেকে বেশি উঁচু জায়গায় চাষ করা যায় না। সেখানকার মানুষ পশুপালনের ওপরই নির্ভরশীল। প্রতি পরিবার গড়পরতা পাঁচ একর জমির পরিমাপে চাষবাস করে। খুব বেশি হলে তা দশ একর অবধি হতে পারে। ওখানে বেশি জমি দখল করে রাখার কোনো প্রথা নেই। জমির পরিমাপও সেভাবেই ওরা বোঝে। একদিনে-দুদিনে যে পরিমাণ জমি চাষ করা সম্ভব সেই ভাবে জমিও নির্দিষ্ট করা হয়।

পশুপালন এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে। পশুদের মধ্যে ইয়াক, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, গরু এবং গরু ও ইয়াকের সংমিশ্রণে জো (dzo)—এগুলির প্রতিপালনের মধ্যেই এরা অর্থ উপার্জন করে। পরিবহণ, চাষ করানো, উল ও দুধ—এগুলোই হল পণ্য। অনেক বড় বড় চারণভূমি বা ফু-তে এগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ১৫,০০০ থেকে ১৮,০০০ ফুট উচ্চতায় এরা বিচরণ করে। আমরা দেখেছি অনেক ইয়াক, ছাগল, ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। জো একটি সংকর প্রাণী (ইয়াক ও গরুর সংকর) যার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এরা কম দুধ দিলেও এদের বিস্তৃতি সর্বত্র। গৃহস্থঘরে, যারা খুবই ছোট ঘরে থাকে, তাদের কাছেও জো থাকে, খানিকটা আমাদের গ্রাম বাংলার শীর্ণকায় গরুদের মতো (আকারে একটু ছোট), যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়।

এখানে হিংস্র প্রাণীও আছে—চিতা ও বরফের ভালুক। আমরা অবশ্যি তার দেখা পাইনি। শেয়াল দেখেছি, আর দেখেছি মারমেট বলে আর এক স্তন্যপায়ী জীব। পাখি খুব বেশি না, সবই ছোট পাখি। অধিবাসীরা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ইয়াক ও জো-র গোবর জোগাড় করে জ্বালানীর জন্য। দুধ থেকে মাখন চিজ তৈরি করে রাখে। চাষ-আবাদের ফসলকে সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে প্রচলিত ধারা অনুসারে।

ফেব্রুয়ারি থেকে জুন চাষের শুরু। উষ্ণতার উপর নির্ভর করে কখন শুরু হবে। সূর্যের আলো উজ্জ্বল হলেই এই উপত্যকা জেগে ওঠে। ধান রোয়া এক সুন্দর ছন্দে চলে। শুধু ধান কেন, আমরা দেখলাম পরিবারের সকলে মিলে প্রথমে মাটির আগাছা পরিষ্কার করছে। জমি পরিষ্কার হলে পেঁয়াজ, গাজর বা যে-কোন শস্যের চারা লাইন দিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে।

এরা গ্রামের পূর্বদিকে পাথর জমা করে চূড়ার মতো। তার ছায়া দেখে চাষের সময়সূচি নির্ধারিত করে। চাষ শুরু করার আগে এরা কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথাকে অনুসরণ করে। সারাদিন কিছু বৌদ্ধসন্ন্যাসী মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং পরিবারের কেউ কোনো মাংস বা স্থানীয় বার্লি বিয়ার (পানীয়) খায় না। গাছের তলায় মাটি দিয়ে ইট তৈরি করে, স্তূপ তৈরি করে সেখানে দুধ দেওয়া হয়। সূর্য অস্ত গেলে অন্যান্য উপাচারকে ঝরণা বা নদীতে ফেলে দেয়। চাষের কাজে এরা গাধার পিঠে চাপিয়ে গোবর-সারকে বিভিন্ন খেতে নিয়ে যায়। মহিলারা ছড়িয়ে দেয় জমিতে, তারপর পুরুষরা দুটো জোকে দিয়ে লাঙল দেওয়ায়। এইভাবেই চলে ওদের জীবন। চাষের জন্য শুধু জলের যোগান দিলেই চলে। কোনো অঞ্চলে কখন জল দেবে তা ঠিক করে গ্রামের প্রতিনিধি—যাকে বলা হয় চুরপন। সে জল-সেচকে পাথর দিয়ে আটকে বিভিন্ন ভাগে জলকে প্রবাহিত করায়। এইভাবেই চাষের ফসল তোলার সময়ও এরা একত্রিত হয়ে গান গেয়ে কাস্তে নিয়ে ফসল কাটে। সন্ধ্যাবেলা সকলে মিলে নাচ গান ও চাংগ পান করে উপভোগ করে। ফসল কাটার উৎসবকে এরা বলে কানগসল।

যে কোনো সামাজিক উৎসবে নারী পুরুষ সকলেই উপস্থিত হয়। মহিলা ও পুরুষদের আলাদা ভাবে আপ্যায়ন করা হয় তাদের নির্দিষ্ট জায়গায়। নীচু টেবিলে ড্রাগন ও পদ্মর কাঠের কাজ। দেওয়ালগুলি নানাভাবে চিত্রিত।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার বারবারই মনে হয়েছিল যে কী করে এরা জীবন কাটাচ্ছে এইরকম প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে। এদের থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল এরা প্রকৃতিকে ভালোবেসে আনন্দের সাথে দিনযাপন করে। আমার মনে হয় এরা অল্প থেকেই অনেক সুখের সন্ধান পেয়ে সুখী জীবনকে পরিচালিত করে। ভীষণভাবে পরিতৃপ্ত লাদাখের সাধারণ মানুষ। বাস্তবে বেশিরভাগ গাছ, ঝোপঝাড় ও ছোটগাছ সবই বন্য প্রজাতির স্বাভাবিক নিয়মেই মাটিতে জন্মায়। ছোট গাছ ও ঘাসগুলিকে এরা পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহার করে। বারসে ব্যবহার হয় জ্বালানীর জন্য। ইয়াগঘাস পশুদের খাদ্য আবার কাঁটাওয়ালা সারমাংগ বাড়িতে বেড়ার কাজে ব্যবহার করে। এছাড়াও অনেক ঘাস বা আগাছা বলি যেগুলোকে তার মধ্যে ওষধীগুণ থাকায় সেগুলোর ব্যবহার আছে। আর বেশ কিছু আছে সুগন্ধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে। গ্রামে এখনও বাস্তুতন্ত্রের খেয়াল রেখেই স্থানীয় মানুষ তাদের চাষআবাদ বা অন্য কাজ করে।

এরা ভেড়ার লোম, ইয়াকের লোম দিয়ে সুতো বানিয়ে (উল) গরম পোষাক তৈরি করে। ছাগল-ভেড়াকে নেকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এদের সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। তারই মধ্যে নেকড়ের খপ্পরে প্রাণ যায় বহু পোষ্য প্রাণীর। একবিংশ শতাব্দীর প্রগতি এদের স্পর্শ করেছে আংশিকভাবে। লেহ শহরে ইটের বহুতল বাড়ি, প্রায় হাজার দুয়েক হোটেল, নানাধরনের শৌখিন ও প্রয়োজনীয় জিনিসের বাজার। স্কুল, কলেজ, অফিস এবং থাকার আধুনিক জীবনযাত্রা দেখা যায়। মহিলারাও পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন অফিস ও স্কুলে তাঁরা কাজ করেন বিভিন্ন পেশায়। লেহ শহরে আমরা অনেককিছু দেখেছি। গাড়ির শোরুম, ছোটখাটো কারখানা, লরিয়াল মেক্‌আপ সেন্টার, হাসপাতাল, বই-এর দোকান, জামাকাপড় ও ওষুধের দোকানও ভালোই আছে। কিন্তু যা দেখিনি তা হল পান/বিড়ি/সিগারেটের দোকান, সিনেমা-হল, আর পাইনি কোনো সংবাদপত্র। ওখানে সংবাদপত্র মেলে শ্রীনগর থেকে।

আমাদের অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে মনে হচ্ছিল প্রাণভরে দেখে নিই প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য। লাদাখবাসীর জীবনযাপনে প্রকৃতিকে রক্ষা করার এক মানসিক যোগাযোগ আছে। অন্তর থেকে তারা অনুধাবন করে যে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা কত জরুরি। বাড়ি বানায় মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি করে না—মাটি দিয়ে তৈরি করে মারকানা বা বাটারমাড, রোদে শুকিয়ে তাতে চুন দিয়ে রঙ করে নেয়। বড় বড় হোটেলগুলি ছাড়া বেশিরভাগ বাড়ির ছাদের বিম হয় পপলার গাছের গুঁড়ি দিয়ে। তার ওপর উইলো গাছের ডালকে সাজিয়ে তৈরি করে ছাদের কাঠামো। তারপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। সুন্দর করে কারুকার্য করা প্রতিটি দরজা জানালা ও রেলিং-এ। এদের উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের প্রচলিত ধারার মতোই ওখানেও বেশিরভাগ বাড়ির পূর্বদিকে প্রধান প্রবেশপথ। যেহেতু এখানে বৃষ্টিপাত হয় না, যেটা হয় তা হল বরফপাত। এমনভাবে বাড়িগুলি তৈরি যাতে প্রবেশপথটা খোলা থাকতে পারে। অনেক উঁচুতে গ্রামের সংখ্যা খুবই কম—তারা যে কীভাবে থাকে ভাবলেই বিস্ময়! চাষের কাজে এরা কোনো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে না, শুধুমাত্র কতগুলি বড় ঝর্ণার কাছে 'জলমিল' তৈরি করেছে। চাষের জল প্রয়োজন মতো ব্যবহারের জন্য এরা পাথর দিয়ে জলের ধারাকে আটকে দিয়ে এক জমি থেকে অন্য জমিতে সেচের ব্যবহার করে। যে ঝর্ণার জল পানীয় জল হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে কাপড়কাচা বা অন্য কোনো গৃহস্থালীর কাজ করে না। এখন বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বি আর ও) রাস্তা তৈরির পাশে পাশে ইট/পাথর দিয়ে জল নামার রাস্তা করে দিচ্ছে, সেই জল জমা করে সেখান থেকে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এত শীতেও কোথাও রুমহিটারের ব্যবহার করে না। এরা খুব সচেতন, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে বলে বৈদ্যুতিন যন্ত্রের ব্যবহার খুব সীমিত। সব হোটেলেই নির্দিষ্ট সময় ছাড়া গরম জল পাওয়া যায় না। লেহ শহর ছাড়া আমরা পুব্রাতে যে নেচার ক্যাম্পের তাঁবুতে ছিলাম বা প্যানগংগ লেকের ধারে যেখানে ইট দিয়ে তৈরি বাসস্থানে (হোটেলে) ছিলাম, সেখানেও রাত্রি ১০/১১টার পরে কোনো বৈদ্যুতিক আলো থাকে

না। প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ, তবুও পর্যটকরা পরিবেশ দূষণ করে প্লাস্টিকের ব্যবহারে।

আমাদের লেহ-তে পুরো চব্বিশ ঘন্টা হোটেলে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিল, আবহাওয়ার সাথে অভ্যস্ত হবার জন্য। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু কিছুক্ষণ থাকার পরেই বুঝলাম হাঁটাচলা, বিশেষ করে সিঁড়িতে ওঠা-নামা করলে একটু হাপ ধরছে। তাই হোটেলের নির্দেশ মতোই ছিলাম। প্রচুর জল খেতে হয়, তা না হলে শরীরটা ঠিক থাকে না। লেহ-র স্থানীয় দ্রষ্টব্যস্থান, বাজার-হাট, শহর দেখে পরের দিন যাত্রা করলাম সাম ভ্যালির পথে একশো পঁচিশ কিমি পথ। মনাস্ট্রি, অ্যাপ্রিকটের বাগিচা, পাথর সাহিব গুরুদ্বার পেরিয়ে পথে পেলাম এক আশ্চর্য পাহাড়কে, যার নাম 'ম্যাগনেটিক হিল'। আমাদের সারথী হুসেন গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে বললো 'জি দেখিয়ে ক্যায়সে চাক্কা ঘুর রহে হ্যায়'। লাদাখী-টোনে ভালোই হিন্দি বলে। সত্যি তাই, আরও অনেক গাড়ি এভাবেই মজা উপভোগ করছিল। কিছু উৎসাহী লোক, পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে, রাস্তার উপর শুয়ে পরখ করছিল তাদের উপরও চুম্বকের শক্তি কার্যকরী কিনা। প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদের মধ্যে 'ম্যাগনেটিক হিল' অন্যতম একটি।

মন ভোলানো পাহাড়ি রাস্তা, গাছপালা না থাকুক পাথরের যে কত বৈচিত্র্য না দেখলে বিশ্বাস হতো না। ইন্দাসকে পাশে নিয়ে আমরা দেখলাম ইন্দাসের সাথে জানস্কার নদীর সঙ্গম। স্বচ্ছ জলের থেকে একটু ঘোলাটে জলের ধারা মিলেছে।

আমরা চলেছি আলচি মনাস্ট্রির দিকে। এগারো শতকের এই প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরটির অবস্থান ও কাঠের কারুকার্য ও চিত্রশিল্প আমাদের মুগ্ধ করেছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাইরের যেসব ছবি (পেইন্টিং) আছে তা বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে যাবার পথে। আমাদের অজন্তা-র চিত্রগুহার কথা মনে পড়ে গেল। এখানে গুহা না, তবে পাথর কেটেই মনাস্ট্রি, তাতে কাঠের কারুকাজ—এক কথায় অপূর্ব। এর দূরত্ব লেহ থেকে ৬৫ কিমি। রিংচেন জানগপো ১০২০—১০৩৫ সাল অবধি এই মনাস্ট্রির সূচনা করেন। কাশ্মীর ও তিব্বত থেকে শিল্পীদের দিয়ে কাঠের কাজ ও চিত্রকলা দেওয়ালের গায়ে আছে, তাতে বুদ্ধদেবের জীবন-ইতিহাসের বিভিন্ন দিক বিবৃত আছে। পাহাড়ের ঢালে অনেকটা পথ যেতে ভালোই লাগছিল, দুপাশে পশরা সাজিয়ে বসে আছে দোকানিরা। তিব্বতের ধারায় অলঙ্কার ইত্যাদি নজর কাড়ে—এতই সুন্দর। আলচি দেখে আমরা গেলাম নুব্রা ভ্যালিতে। এখানে শীতল মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সারক নদীর উপত্যকা, বালি ও নুড়িপাথরের বিস্তীর্ণ এলাকা। এরই মাঝে বালির স্তূপ। দু-কুঁজ উট, মঙ্গোলিয়া থেকে আনা, সরাসরি দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন সাজপোষাকে। তাদের চালকরাও অপেক্ষা করে সওয়ারির আশায়। প্রচুর পর্যটকের ভিড়। খোঁজ নিয়ে জানলাম এক-একটি উটের দাম দেড় লক্ষ টাকা। অবস্থাপন্নরা উটের মালিক। যারা ঘোরাতে নিয়ে যায় পিঠে চাপিয়ে অবশ্যই কর্মচারী এবং খুবই সাধারণ বেতন পায়। সব তথ্যই হোটেলের কর্মচারী ও আমাদের ড্রাইভারের থেকে সংগ্রহ করা।

নুব্রা ভ্যালি রূপের ডালি সাজিয়ে বসে আছে। কতরকমের নাম-না-জানা ফুল গাছ, ছোট ছোট পাখিদের কিচির মিচির, আবার তাঁবুর পেছনে তাকালেই দেখা যায় পর্বতমালা সাদা বরফে ঢাকা, তারপরের স্তরে কম বরফ। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের প্রখর তাপে বরফ গলতে শুরু করেছে। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান মোট চোদ্দটা তাঁবু—চমৎকার করে সাজানো। আধুনিক বাথরুম। ওখানকার বাগানে অনেকরকম সবজি হচ্ছে, এমনকি আলুও। সেই সবই আমাদের রান্না করে দিয়েছে। সুস্বাদু রান্না ও আন্তরিক ব্যবহার অভিভূত করে প্রায় সব পর্যটকদেরই। লেহ লাদাখ, অতি আধুনিকতায় যারা জীবন কাটায় তাদের জন্য নয়। প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে তার নিজস্বতা নিয়েই।

এবার আমাদের গন্তব্যস্থান তুরতুক গ্রাম ও থাংগ গ্রাম—একেবারে উত্তরপ্রান্তে ভারতের শেষ গ্রাম। তুরতুক গ্রাম লাদাখের উত্তরপূর্ব দিকে হিমালয় ও কারাকোরামের মাঝে সারক নদীর ধারে। একটি কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে গ্রামে ঢোকা যায়। স্বাধীনতার আগে হিন্দু ডোগরা রাজত্বেরই অংশ ছিল। পরে পাকিস্তানের মধ্যে চলে যায়। ১৯৭১ সালে আবার তুরতুক, তিয়াকমি, চালুনখা ও থাঙ —এই চারটি গ্রাম ভারতের অধীনে চলে আসে। বালটিস্থানের বাকি বারোটি গ্রাম পাকিস্তানেই আছে। বালটিস্থানের বসবাসকারীরা সকলেই মুসলমান, এদের ভাষা হল বাল্টিভাষা। আর্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করে তখন বালটিস্থান দিয়েই প্রবেশ করে। ৭ এবং ৮ দশকে চুলি ও ইয়াংগড্রাংগ মধ্য এশিয়া থেকে এসে তুরতুকের রাজাকে আক্রমণ করে এবং রাজা ও সৈন্যদের হত্যা করে তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে বসবাস করতে থাকে। কিছু লোক অন্যদিকে পালিয়ে যায়। সেই জায়গাগুলির নাম দহ (DAH), হানু (HANU), বিয়াম (BIAMA), গারকন (GARKON) ও দারচিক (DARCHIK)। চুলি ও ইয়াংগড্রাংগ তুরতুকে স্থায়ীভাবে থাকে। বিভিন্ন জায়গা থেকেও কিছু লোকেরা আসে। আসুর পরিবার এদেরই বংশধর। সেই কারণে বহুজাতিক সংমিশ্রণ ঘটেছে এই অঞ্চলে। ব্রকপা জনগণের ধর্ম এখন ঠিক জানা যায়নি, কিন্তু চুলি ও ইয়াংড্রাংগরা ছিল 'বন'-এর অনুগামী। পঞ্চবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান পণ্ডিত আমীর কাবীন সৈয়দ আলি হামাদানির প্রভাবে এখানকার জনসাধারণ নুবাকসিরা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে এবং অচিরেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। কিন্তু বাল্টিদের মধ্যে এখনও প্রাক্-ইসলাম কালের 'বন' বারা বা কিছু বৌদ্ধ প্রভাবিত মানুষজন আছে। এখানে বাইরের জগতের প্রভাব নেই বললেই চলে। প্রধানত কৃষিজীবী। অ্যাপ্রিকট, স্ট্রবেরি মালবেরী নানা ধরনের ফলের গাছ আছে। বার্লি ও ধান গাছে ভরা ক্ষেত। অদ্ভুত উপায়ে এরা প্রাকৃতিক হিমঘর বানিয়ে সারাবছরের খাদ্য সামগ্রী মজুত রাখে। এমনভাবে পাথর দিয়ে সুরঙ্গ পথের মতো বানায় যেখানে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত সবসময়ই চলাচল করে। ওখানকার রাজবংশের একজন প্রতিনিধি আমাদের ওদের ঐতিহ্যের সংগ্রহশালা দেখালো।

খারদুংলা পাশ হয়ে গিয়েছিলাম প্যানগঙ্গ লেক দেখতে। নুব্রা থেকে প্যানগঙ্গ লেক ১৩০ কিলোমিটার পথ। অতি দুর্গম, যদিও রাস্তা খুব ভালো, কিন্তু সেখানে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জলধারা নামে যেখানে বরফ, জল কাদা নুড়ি পাথরে গাড়ি চালানোই দুষ্কর। মিলিটারি বেস থাকায় সারি সারি মিলিটারিদের ট্রাক, যাদের চাকায় শেকল চড়ানো যাতে স্লিপ না করে। তাই স্বভাবতই গতি অতি মন্থর। আমাদের অনেক বেশি সময় লাগলো যেতে। খারদুংলা পৃথিবীর অন্যতম উচ্চতায় গাড়ি যাবার পথ। বি.আর.ও তে যেসব শ্রমিক আছে তাদের মধ্যে স্থানীয় লাদাখী কম। হিমাচল প্রদেশ উত্তরাখণ্ড এমনকি বিহার থেকেও শ্রমিকরা গেছে। মহিলারাও কাজ করছিল। এদের মধ্যে স্থানীয় মানুষ আছে। বরফে ঢাকা পথ পেরিয়ে যেতে আনন্দ যত না, তার থেকে উত্তেজনা বেশি। গাড়ির চালকরা কোন হর্ন দিয়ে কাউকে বিরক্ত করছে না—ধৈর্য ও সহনশীলতা যথেষ্ট পরিমাণে আছে এদের মধ্যে।

প্যানগঙ্গ লেকের রূপ সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেয়। জলের কত রং। ৪৩৫০ মিঃ উঁচুতে ১৩৪ কিলোমিটার লম্বা। অবস্থান করছে ভারত তিব্বত ও চিনের মধ্যে। প্রায় ৭০০ বর্গমিটার এর আয়তন। গভীরতা ১০০ মিটার। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতায় লবণাক্ত জলের হ্রদ। শীতে বরফ এমন জমে যায় যে মিলিটারি যান-বাহন এর ওপর দিয়ে যেতে

পারে। এই অঞ্চলটাকে বলে চাংথাং। এই লেকে মাছ বা জলজ প্রাণী দেখা যায় না। কিছু জল উদ্ভিদ আছে, আর আছে পরিযায়ী পাখিরা। প্যানগঙ্গ-এর তীব্বতি ভাষায় বলে ঘাসের লেক (high grassland lake)। কনকনে হাড় হিম করা হাওয়ায় বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। হোটেল থেকেই দেখেছি মন ভরে। বাতাসে অক্সিজেনের অভাব বোঝা যায়।

এবার ফেরার পালা—চাংলাপাস হয়ে লেহ শহরে ফিরবো। পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে চাংলা পাস দিয়ে ফেরার সময় দেখলাম কত রকমের কত রঙের পাহাড়। কোনোটা সাদা, কোনোটা গোলাপি, খয়েরি, খড়, সবুজ, হলদেটে বিচিত্রবর্ণ। সবই প্রকৃতির বিভিন্ন ধাতুন উপাদান নিয়ে আছে। গাছ নেই তাই পরিবর্তন তেমন নেই। শুধু তুষারঝড়ের ক্ষয়ে যাবার ফলে অভাবনীয় ভিন্নতায় বর্তমান।

কোনো জায়গাই শুধু প্রকৃতিকে নিয়ে না। সেখানকার মানুষজন, তাদের জীবনযাত্রা, সব মিলিয়ে এক সার্থক সমন্বয়। ভোগবাদী দুনিয়ার উন্নয়ন যেন ওখানে না যায় একথাই ভাবছিলাম। লেহর হোটেলে ফিরে মনে হল, বাহ! বেশ তো ভালো আবহাওয়া। কয়েকদিনেই শরীরের বিভিন্ন সমঝোতা ভালোই হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এলাম আকাশপথে ইঁট-সিমেন্টের জঙ্গলে দিল্লিতে। উপভোগ করেছি অনুধাবন করেছি রূপসী লেহকে। ভালো লেগেছে আন্তরিকভাবেই।

লাদাখের মানুষের প্রকৃতি-প্রেমের এক উজ্জ্বল নাম সোনাম ওয়ানচু। একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাধারণ পিছিয়ে-পড়া লাদাখের অসংখ্য ছাত্রদের জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে আলোর সন্ধান দিয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন বরফের স্তূপী যাতে শীতের দিনের বরফকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যাবে। তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি আন্তর্জাতিক ভাবে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। নানা দেশ থেকে ছাত্র এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এখানে আসে। ছাত্ররাই এখানকার পরিচালকমণ্ডলী গঠন করে। স্কুলটি তৈরিই হয়েছে এক বিকল্প ভাবনায়। ছাত্রদের দ্বারা ছাত্রদের জন্যই এই স্কুল। একই সাথে পরিবেশ রক্ষা করেছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্বউষ্ণায়ণকেই কাজে লাগিয়ে। অবশ্যই অনুকরণযোগ্য এবং অনুপ্রেরণার উৎস—যারা সমাজজীবনে এমন কিছু করতে চায় যাতে পরিবেশরক্ষা করে সামাজিক উন্নয়ন হয়। লাদাখের সুসন্তানের প্রচার তেমন নেই কিন্তু লাদাখবাসীর কাছে তিনি এক নতুনসূর্য।

লেখিকা : কলকাতার এস.এ. জয়পুরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ও নারী আন্দোলনের সংগঠক

With best compliments of

ASTHA FILLING STATION

BHOTAR MORE, BURDWAN-KATWA ROAD, PURBA BARDHAMAN

Sl. No. 41

অকপট এই অরণ্যযাপন, রামসাই বনবস্তি...

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

রোদ্দুরেরও রঙ বদলে যায়। জঙ্গলের সবুজ ঘ্রাণ ও থম্ ধরা পরিবেশে আলোছায়ার অদ্ভুত লুকোচুরি। গাছগাছালির গরিমাসহ কী তার রৌণক। শীতের গুঞ্জরণে নিসর্গকে খুব কাছ থেকে ছুয়ে ছেনে, এই বেবাক জঙ্গলের ঘেরাটোপে নিজেকে মনে হয় কুয়াশাভেজা পাতাটির মতো। শীতবেলায় মৌজ করে জঙ্গলের বন্য শিহরণ খুঁজে নেওয়া। একটুকরো মাঠের জঙ্গল রামসাই গ্রামের মেদলা। লাটাগুড়ি জঙ্গলের একদম দক্ষিণপ্রান্তে, মূর্তিনদীর লাগোয়া ছোট্ট গ্রাম রামসাই। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মেদলা নজরমিনার, মূর্তি নদীখাত, চা বাগিচা, প্রজাপতি উদ্যান, জলপদ্ম ভরা পরিখার মাঝে অরণ্য আস্তানা, রাইনো ক্যাম্প, মোষটানা গাড়ি, বুনো পথ, জলঢাকা নদী। ব্যস, এই পেয়েই বেবাক ভোল পালটে উদ্যমী হয়ে উঠতে চাইছে পর্যটনবিলাসী মন।

চন্দন রঙের আলোর পোশাকে মাথার ওপর উত্তরবঙ্গের আকাশ। আর পাশে পান্না রঙের তিস্তা। আঁজলায় তার চিকন পান্না সবুজ রেওয়াজ। যাত্রাপথের প্রথম ধাপ। ডুয়ার্সের খোলা উঠোন জুড়ে তরাই প্রবাহে কত যে নদী-নালা-ঝোরা! তিস্তা, মূর্তি, পঞ্চনই, তোর্সা, শঙ্খিঝোরা, সুখাঝোরা, কালিঝোরা, ডায়ানা, নেওড়া, জলঢাকা, সংকোশ, কালজানি, রায়ডাক, বামনিঝোরা, গণেশ, নন্দীখোলা, চেল, লিস্, ঘেঁষ, মাল, করতোয়া, আরও কত যে নদী ও তার নান্দনিক আবহে প্রিয় ডুয়ার্স। বর্ষার জল পেলেই এইসব আপাত শুষ্ক নদীগুলিই বানভাসি জলে টইটুম্বুর।

শীত লেখা দুই দিনের অস্থায়ী আস্তানা নির্ধারিত হয়েছে লাটাগুড়ির রিসর্টে। আলোয়ান, হালকা সোয়েটার, কফিমগ, মোবাইল ক্যামেরা সকাল-সন্ধে-রাত-বিকেল নিয়ে জম্পেশ অবসর। ইদানীং পর্যটনে লাটাগুড়ির আকর্ষণ বহুলাংশে বেড়েছে। নতুন আকর্ষণ জঙ্গলসাফারি। বনদপ্তর রেঞ্জ অফিস থেকে জঙ্গল সফর শুরু করে ছাওয়াফুলি জঙ্গল, বড়োদিঘি জঙ্গল, বাম হাতে লাটাগুড়ি রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে কলাখাওয়া নজরমিনার। লাটাগুড়ি থেকে রামসাই মাত্র ১৪.২ কিলোমিটার। রামসাই গ্রাম ও রামসাই জঙ্গল গরুমারা জাতীয় উদ্যানের পুব পাড়ে। লাটাগুড়ি রিসর্টের ম্যানেজারের ব্যবস্থাপনায় সকালবেলায় জঙ্গলসফরে দারুনভাবে ঘুরে নিয়েছি গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রায় প্রতিটি আনাচকানাচ। মধ্যাহ্নভোজন শেষে চলে এসেছি গরুমারা জঙ্গলের প্রান্তিক পুব অংশে জলঢাকা নদীকিনারে মেদলা নজরমিনার-এ। লাটাগুড়ি থেকে জাতীয় সড়ক ৭১৭ ধরে পুবে কিছুটা পথ পেরিয়ে ডাইনে নেওড়া মোড় বাসস্টপেজ। লাটাগুড়ি ঢোকার মুখে একটা রেললাইন। এখানে ফ্ল্যাগম্যানের দায়িত্বটির সঙ্গে 'চাঁদের পাহাড়' গল্পের শঙ্করের অদ্ভুত মিল আছে। সকালে যে ট্রেনটি যায়, সেটিই আবার বিকেলে ফেরে। লাটাগুড়ি রেলস্টেশন পেরিয়ে ক্যানেল রোড বরাবর এগোলেই রামসাই বনবস্তি। রাস্তাটি মূলত দু-ভাগে ভাগ হয়েছিল। একটা গেছে চুকচুকি বিটের দিকে। ডানহাতি দু-কিমি গেলে বুধুরাম গ্রাম। এখানে আখড়া রয়েছে আদিবাসী নাচের। আরও ৪ কিলোমিটার গেলেই রামসাই গ্রাম।

গরুমারা জঙ্গল এক্তিয়ারে মোট তিন জায়গায় ইকো ট্যুরিজ়মের আওতায় পর্যটন আবাস রয়েছে। নিরিবিলি পরিবেশে নিপাট ভালো থাকার মতো কটেজ রয়েছে—একটা কালীপুর, অন্যটা ধুপঝোরা এবং তৃতীয়টি এই রামসাই। রামসাইয়ের একপ্রান্তে মেদলা অরণ্য ও নজরমিনার। মূল রামসাই সড়কপথটি উত্তরবঙ্গেরই ময়নাগুড়ির সঙ্গে যুক্ত। এই সড়কটির বিস্তৃতিও বেশ অনেকখানি। এখন আর দূর থেকে চা বাগিচা নজরে পড়ছে না। পথের দু-পাশে অনন্ত শালবন।

যাত্রাপথের এক স্থানে গাড়ির সারথী পথের একেবারে ধার ঘেঁষে থামলেন। প্রথমটায় কিছু না বুঝেই নেমে পড়লাম। কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে উন্মুক্ত স্থানে অনেকগুলি নানা মাপের পাথর সাজানো। কালো পাথরগুলিতে সিঁদুর লেপা। ইটের পুজোবেদী।

লাল রঙের কিছু নিশানা পোঁতা। একপাশে একটি টিউবওয়েল ও কুয়ো। পবিত্র এই 'মহাকাল মন্দির'-কে স্থানীয়রা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। মহাকাল অর্থাৎ শিবমন্দির হলেও গজপতিকেও এখানে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হয়। অদ্ভুত ঘটনাও শুনলাম, সরকারি এবং স্থানীয় উদ্যোগে এখানে যতবারই বাঁধানো মন্দির গঠনের চেষ্টা হয়েছে, কাজ শুরু হওয়ার পর হাতিরা এসে তছনছ করে দিয়ে গেছে সেই ভিত্তিপ্রস্তর। স্থানটি একান্তই হাতি চলাচলের নির্ধারিত এলাকা। তাদের বোধহয় পছন্দ নয় নব্য সাজানোগোছানো মন্দিরের চটকদার পরিবেশ।

জাতীয় সড়ক ছেড়ে বাঁকা পথটা চলে গেছে ঘন সবুজের অন্তরালে। এক চিলতে নির্জন, নৈঃশব্দের ভ্রমণক্ষেত্র রামসাই। একে তো রামসাই জঙ্গল এলাকা। সেখানে আবার একশৃঙ্গ গণ্ডার, হাতি, গাউর, নীলগাই ও অন্যান্য কিছু তৃণভোজী অতিকায় বণ্যপ্রাণীদের মুক্তাঞ্চল। জঙ্গল চিরে বয়ে গেছে জলঢাকা নদী। নদীর দু-পাড়েই বন্যপ্রাণীদের অন্তরঙ্গ যাওয়া-আসা। এখানকার ঘন জঙ্গলের মধ্যেই কিছু আদিবাসী জনজাতির বস্তি ছিল। বেশ কিছু বছর হল সরকারি নির্দেশে সেই বস্তিগুলিকে জঙ্গলের ত্রিসীমানার বাইরেই পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। ইদানীং 'ইকো ট্যুরিজ়ম' প্রথার তক্‌মা দেওয়া নতুন বিধিব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। সেই প্রথার রমরমায় ও সরকারি প্রচেষ্টায় রম রম করে চলছে হোম-স্টে ও পর্যটক আবাস। স্থানীয় গ্রামীণ মানুষের কিছুটা হলেও আর্থিক সুরাহা হয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে তারা স্বনির্ভর হয়েছেন কিংবা বলা যেতে পারে এগিয়ে আসছেন। এটি অবশ্যই সমাজব্যবস্থার দিক থেকে ভালো পদক্ষেপ। রুজিরুটির তাগিদে এদের অনেকেই এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানীয় পর্যটন সেবার সঙ্গে যুক্ত।

রামসাই বনবস্তিটির আরও এক দ্রষ্টব্য হল বিপরীতে অবস্থিত চমৎকার চা-বাগিচাটি। যাদরপুর টি গার্ডেন নামে নয়নাভিরাম চা বাগানটি গরুমারা জঙ্গলের প্রান্তসীমায়, মেদলাবাড়ি জঙ্গলসফরের মুকুটে একটি বাড়তি পালক গুঁজে দেবে। পর্যটকদের কাছে এটি অন্য মাত্রা আনে—জঙ্গলসফরে এসে ঘন বনানীর একপাশে চা বাগানের রূপও প্রত্যক্ষ করা। যেখানে জঙ্গলবিলাসে মাতোয়ারা পর্যটকমন বন্যপ্রাণী দেখার পাশাপাশি 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' তোলার ব্যস্ততাকেও উপভোগ করতে পারবেন।

এখানে আরও একটি আকর্ষণীয় স্থান হল রামসাই রাইনো ক্যাম্প। পর্যটকদের দারুন অরণ্য-আবাস। নয়ানজুলি দিয়ে ঘেরা সেই আবাসটিতে পৌঁছতে হয় পায়ে হাঁটা সেতুপথ পেরিয়ে। বন্যপ্রাণী যাতে অরণ্যআবাসের ত্রিসীমায় প্রবেশ করতে না পারে, সাবধানতার জন্য তাই বৈদ্যুতিন ফেনসিং লাগানো আছে। বনবিভাগের ব্যবস্থাপনায় এখানকার পুরো ব্যবস্থাই বেশ ভালো। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এইসব অঞ্চলগুলি অজানা ছিল। ইদানীং পর্যটন পরিকাঠামো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় রামসাই এলাকাটি পর্যটকমহলেও বেশ জায়গা করে নিয়েছে। নয়ানজুলি, চা-বাগান, নিসর্গ প্রকৃতি, প্রজাপতি কানন আর জঙ্গলসাফারির আদর্শ মেলবন্ধন ডুয়ার্সের রামসাই।

রামসাই পৌঁছে টিকিট কাউন্টারের সামনে গাড়ি থেকে নামতেই সামনে সার দেওয়া মোষগাড়ি। রঙিন আচ্ছাদন ও পরিপাটি বসার ব্যবস্থা। মোষের গাড়ির মুখোমুখি বসার কাঠের পাটাতনে বেশ জুত করে বসি। নাগরিক জীবনবিন্যাসে অভ্যস্ত সে এক চমকপ্রদ নতুনতর অভিজ্ঞতা। অতীতে কিছু পর্যটনস্থলে বেড়াতে গিয়ে ঘোড়ায় টানা এক্কাগাড়িতে সফর করার ভ্রামণিক অভিজ্ঞতা থাকলেও গরুরগাড়ি বা মোষেরগাড়ি চড়া হয়নি কখনও। পর্যটকমনে একটা সাবেকি গ্রামীণ স্পর্শ দিতেই এই অনন্য অভিজ্ঞতার শরিক করার নিমিত্ত বনবিভাগের এই ব্যবস্থা। রঙিন ঝলমলে আচ্ছাদন দেওয়া মোষগাড়ি জঙ্গলের ছায়াপথ ধরে মাইলখানেক যাত্রা শেষে নির্দিষ্ট একস্থানে নামিয়ে দিল।

কয়েক পা এগিয়েই মেদলা নজরমিনার। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নজরমিনারের উপরিতলে পৌঁছলে দু-চোখের সীমানায় স্রেফ ঘন সবুজের বুনোট। একপাশে বিস্তীর্ণ বালুচর ছড়িয়ে বয়ে যাওয়া আপাত ক্ষয়াটে নদী, জলঢাকা। মেদলা নজরমিনার থেকে একশৃঙ্গ গণ্ডার ও বাইসন দেখা বেশ সহজ। সামনের জলঢাকা নদীটা পেরিয়ে উঁচু ঘাসজমিটির ওই তল্লাটে গণ্ডারের আনাগোনাও বেশি। বলা যায়, মেদলা ওয়াচটাওয়ারটি অবস্থানগুণে সঠিক। বন্যপ্রাণী দেখার আদর্শ স্থানও। এখান থেকে হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল পরিভ্রমণের ব্যবস্থাও রয়েছে। অরণ্যের নিঝুমে মেদলা নজরমিনারে ক্রমশ পর্যটকের জটলা। সমগ্র গরুমারা জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রাণীর আনাগোনা বেশি এই মেদলা অঞ্চলেই। বনভূমির একপাশে রাখা নুনে ঢিবি থেকে চেটেপুটে নেয় লবণের স্বাদ। বিকেল একটু গড়াতেই এবার একে একে ভিড় জমায় গাউর ও গণ্ডার। অপেক্ষারও যেন অবসান হয় পর্যটকমহলে বেশ কয়েকটি গণ্ডারকে একসাথে দেখতে পেয়ে। এদিকে ততক্ষণে পড়শি পর্যটকদের চাপা স্বরে কথা, অতি সক্রিয় জুম ক্যামেরা, দামি বাইনোকুলার, স্মার্টফোন ক্যামেরা দিব্যি সজাগ।

সমগ্র গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চামড়ামারি অভয়ারণ্যসহ উত্তরবঙ্গের জঙ্গলমহল পর্যটকদের জন্য বর্ষার মরসুমটুকুতে বন্ধ থাকে। অর্থাৎ মধ্য জুন থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর সময়টা। সেই সময়ে বন্ধ থাকে জঙ্গলসাফারি, জিপ সাফারি, এলিফ্যান্ট রাইড সাফারি এমনকি জঙ্গলে প্রবেশাধিকারও। তবে রামসাই বনবস্তির মেদলা ওয়াচটাওয়ারের মূল ব্যাপারটা হল, উত্তরবঙ্গের জঙ্গলমহলে একমাত্র এটিই পর্যটকদের জন্য সারাবছর খোলা থাকে। এছাড়া এখানকার অন্যান্য জঙ্গল পরিভ্রমণের মতো খুব একটা কড়াকড়ি বিধিনিষেধ তেমন নেই।

প্রায় আধ কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে কালিপুর ইকো ভিলেজ। অনেকে গরুমারা ইকোভিলেজ হিসেবেও চেনেন। ঘাসজমি থেকে উঠে গেছে লম্বা সিমেন্টের থাম। এমনই পৃথক পৃথক থাম-সমষ্টির ওপর পর পর চারটি সুন্দর মাচান স্টাইলের কটেজ। দেখতে অনেকটা কুঁড়েঘরের মতো। এখানে এই মাচান কুঁড়ে-সদৃশ কটেজে থাকতে পারলে সত্যিকারের এক অরণ্যযাপনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা হবে, একথা বলাই বাহুল্য। ঘন জঙ্গলের মাঝে এই চারটি মাচানবাড়ি এক অন্য মাত্রা আনে বইকি।

জঙ্গলের প্রবেশপথে টিকিট বিক্রয়কেন্দ্রের কাছেই রয়েছে

একটি প্রজাপতি কানন। অগণিত বাহারি প্রজাপতিদের মুক্তাঞ্চল। এখানে প্রায় শতাধিক প্রজাতির প্রজাপতির দেখা মেলে। লার্ভা থেকে শুককীট, তারপর শুঁয়োপোকা থেকে রঙিন প্রজাপতির মেটামরফোসিস ঘটে এখানে। প্রজাপতি প্রজনন কেন্দ্রটি অবশ্যই দ্রষ্টব্য তালিকায় রেখে দেওয়া যায়।

ফিরতি পথে আমাদের গাড়ির চালক, আমাদের বাড়তি চাহিদা মেতাবেক ঘুরিয়ে আনলেন মেদলা থেকে আরও বেশ খানিক দূরে গ্রামীণ কোমল ছায়ার আশ্রয় মোয়ামারি। মেদলা থেকে মাত্রই ২৫ কিলোমিটার। টানা পথের শেষে, নিশ্চুপ চারপাশ ঘেরা বাঁশের নির্জন প্রলেপে এক 'বাঁশকুটি'। ডুয়ার্সের বাঁশের সূক্ষ্ম অক্ষরে অক্ষরে সাজানো তার শরীরী উঠোন-ঘর-দুয়ার। ব্যাম্বুহাট—থাকা ও খাওয়ায় মশগুল ঠেক। শিল্পী রঞ্জু রায়, যাঁর অভিভূত করা হাতের স্পর্শের চিহ্নটুকু মেখে গড়ে ওঠা এই বাঁশকুঠি পর্যটকমনে টোকা দেবেই। প্রায় প্রতিদিন বনভোজন করি এমন মানসিকতা ঘেরা এ তল্লাটে একটা রাতদিন যদি বরাদ্দ রাখতে পারতাম, বেশ হতো। শুধু থাকা তো নয়, স্থানীয় সংস্কৃতির অভিধানে আজও রয়ে গেছে নিজস্ব ভাওয়াইয়া, চোরাচুন্নি, বিষহরি, তিস্তাবুড়ির আপাত ভুলে যাওয়া গানকথা। ইচ্ছে হলে বাঁশের হস্তশিল্প সামগ্রী পরখ করা ও কিনে আনাও যায়। ঘুরে ফিরে মনে হল, নিরিবিলি একটা দিন বাঞ্ছায় হয়ে উঠতেই পারে মেয়োমারির খোলা আকাশের নিচে ওই বাঁশকুঠির নির্জনতায়।

এবার ফেরার রাস্তায় পানবাড়ি। রামসাই থেকে মাত্রই ৩ কিলোমিটার দূরে এই পানবাড়ি। মূল সড়ক ছেড়ে মেঠোপথ গড়িয়ে কিছুটা যেতেই চওড়া এক নদীসঙ্গম। তখন শীতে জল প্রায় নেই। কোথাও হাঁটুজল কিংবা আরও একটু বেশি। ডুয়ার্সের নদীগুলির অন্যতম মূর্তি-ডায়না-জলঢাকা নদীর ত্রিবেণীসঙ্গম। এই জলঢাকা নদীটিই আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে নাম হয়েছে সিঙ্গামারি নদী। এক্কেবারে ভরা বর্ষার মরসুম ছাড়া অন্য সময়ে এই অগভীর নদীজল স্থানীয়রা পায়ে হেঁটেই হেলায় পারাপার করে থাকেন। তবে শ্রাবণবর্ষায় নদী-ত্রয়ীর তুমুল জলজ লুঠতরাজ চলতে থাকে আশপাশের এলাকা সহ গ্রামগুলিতে। বর্ষাঋতু এমনই হিংসুক হয়ে ওঠে তখন, ভিজিয়ে ভাসিয়ে ছারখার করে দেয় নদীকূল। চমৎকার পরিবহ পানবাড়ির প্রশস্ত নদীখাতটিও। সে কানে কানে বলে রাখে আরও একবার কাছে আসার আমন্ত্রণী কথা।

নদীর নিঝুম পাড়ে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। যদিও গোধূলিরাঙা শেষ বিকেলের আলোটুকু যতক্ষণ জিইয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকি। শীতার্ত মন্ত্রে জলঢাকা নদীর গর্ভ থেকে উঠে আসে ক্ষণিক মায়া। ভালোবাসা বিলিয়ে দিতে চায়। হিমেল শিরশিরানি গোধূলিবেলা। আকাশে ফালি চাঁদ প্রকট হয়। তারারাও দিব্যি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ফুটে উঠল। নিশ্চিন্তে এলিয়ে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে বিছিয়ে থাকে মোয়ামারি, পানবাড়ি, রামসাই, জলঢাকা... আর মেদলার বনবৃত্তান্ত...

লেখিকা : বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

বড়বলাশন-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

মণ্ডলগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও স্বয়ংম্ভর গোষ্ঠী এবং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ, ডেঙ্গি রোগ প্রতিরোধ, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কৃষি শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের বীমা কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণে পঞ্চায়েত অঙ্গীকারবদ্ধ।

সেখ মফিজুল
উপপ্রধান

জ্যোৎস্না কৈবর্ত্য
প্রধান

Sl. No. 70

With best compliments from

PRACHESTA SELF HELP GROUP

(Lic. No. 19026/06-07, Dt. 26-06-2006)

All Sorts of Civil, Construction/Mechanical Jobs, Labour & General Order Supplier

Regd. Office : B.B.D. Nagar, Sagarbhanga, P.O. Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman
Camp Office : Qr. No. Q-2, Sagarbhanga Colony, P.O. Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman
Mob. 9832749263, Ph. 0343-6453962

Sl. No. 117

Happy Pooja Greetings From

G.S. CONSTRUCTION CO.

E N G I N E E R S & C O N T R A C T O R S

(Mechanical, Refractory, Painting, Glass Fittings & Manpower Supplier)

Regd. Office : Road 98, Nasser Avenue, Khairasole Durgapur 713212, West Bengal
Ph. : 9333503590, E-mail : gsccdgp@gmail.com

Sl. No. 116

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে নজরুল

কল্যাণী ভট্টাচার্য

সাম্প্রদায়িকতা বলতে সাধারণত আমরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকেই বুঝি এবং শব্দটির ব্যবহারও করি নিন্দার অর্থে। কোনো ধর্মসম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়ে ধর্মাচরণ করবেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ ভাবে ধর্মের প্রচার করবেন এতে নিন্দার কিছু নেই। কিন্তু ধর্মান্ধ হয়ে অন্য অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা, অশ্রদ্ধা, বিদ্বেষ বা হিংসার মনোভাব পোষণ করা—এসবই সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণচিহ্ন—অতএব নিন্দনীয়। এই মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ হয় নিজ ধর্মমত অন্যের পরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া, ধর্মকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হানাহানি, মারামারি, খুন, গণহত্যা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। বলা বাহুল্য সাম্প্রদায়িকতা একটি বিপদ-জনক সামাজিক ব্যাধি। শুধু তাই নয়, রোগটি অনেক ক্ষেত্রেই দুরারোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী।

বহু ধর্মের দেশ আমাদের ভারতও এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে মুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের 'ভারততীর্থ'-তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনাও বার বার ঘটেছে এবং আজও তা অব্যাহত। সুদূর অতীতের দিকে না তাকিয়ে বলা যেতে পারে যে এ সংঘাত মূলত দুটি ধর্ম-সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই—হিন্দু ও মুসলমান। সাম্প্রদায়িকতা বলতে এদেশে আমরা প্রায় সকলেই এই বিশেষ সীমিত অর্থই বুঝে থাকি।

বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনাও হয়েছে বিস্তর। সেখানে নানা মুনির নানা মত। আমাদের আলোচনা কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটিকে কীভাবে দেখেছেন, তা নিয়ে। নজরুল একাধারে একজন কবি, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, সৈনিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। সব ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়-অসাম্য, অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন যোদ্ধা। তিনি ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু ধর্মান্ধ একেবারেই নন। ''মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান''—তাঁর অমর গানের এই প্রথম পংক্তিটিই তার নিশ্চিত সাক্ষ্য। কিন্তু এর চেয়ে আরও গভীর অর্থবহ উচ্চারণ তাঁর আছে : ''মানবতার এই মহাযুদ্ধে একবার গণ্ডি কাটিয়া বাহির হইয়া বলো যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ—তুমি সত্য।'' অর্থাৎ ধর্ম-পরিচয় কখনোই মানুষের প্রথম বা প্রধান পরিচয় হতে পারে না। মানুষের আসল পরিচয় তার মনুষ্যত্বে।

একটি ধর্মাশ্রয়ী পরিবারে জন্মেও নজরুল যে এই মুক্তদৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন তা সত্যই বিস্ময়ের। তবে জীবনবোধ, জীবন-দর্শন গড়ে ওঠে জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে। নজরুলের কঠোর জীবন-সংগ্রাম আর বহুমুখী অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবনদর্শনের ভিত্তি।

নজরুলের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে, বর্ধমান জেলার গণ্ডগ্রাম চুরুলিয়ায়। ১৯৭৬ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও

তাঁর সাহিত্যজীবন শেষ হয়েছিল বহু আগে। ১৯৪২ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে নির্বাক হয়ে যান, তাঁর লেখনীও স্তব্ধ হয়ে যায়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেও তিনি বারে বারে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। প্রশ্ন জাগে কোথা থেকে পেলেন নজরুল এই প্রতিবাদের ভাষা। তাঁর শিল্পী মনের সঙ্গে পরিবেশের প্রভাবই কি তাকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলেছিল?

বর্ধমান জেলায় বহু মুসলমানের বাস, চুরুলিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। সেইসব দিনে চুরুলিয়ায় হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত বাস ছিল। গ্রামে রায়, মিত্র, দত্ত, পাল, কাজী, মাজী, সেখ, সৈয়দ সকলেই পাশাপাশি বাস করতেন। গন্ধবণিকেরা বাস করতেন এক পৃথক পাড়ায়। তাকে বলা হতো বেনেপাড়া। সবরকম পরিবারের ছেলেরাই সমবেতভাবে খেলাধূলা করত। সেখানে কেনো সম্প্রদায় ভেদ ছিল না। বরং অজয় নদের ওপারে লোকে যাকে কাশী বলত সেখানে এক জাগ্রত কালীর মন্দির ছিল। নজরুল সেখানে যেতে খুব ভালোবাসতেন।

তিনি যখন স্কুলে পড়তেন সেখানেও হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল বেশি, আবার যখন যুদ্ধে যোগদান করলেন, সেখানেও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল হিন্দু। অল্প বয়সেই তিনি লেটোর গানের দলে ঢুকেছিলেন। লেটোর গান অনেকটা কবিগানের মতো। শুধু গান নয়, এর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক যাত্রাপালার মতো অভিনয়ও থাকত। পরবর্তীকালে দেখা যায়, তাঁর বহু কবিতার মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অনুষঙ্গ রয়েছে। আবার বহু কবিতার মধ্যেই ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।

করাচি থেকে ফেরার পরে কলকাতায় এসে তিনি যাদের সঙ্গে মিশতেন তারাও ছিল বেশিরভাগ হিন্দু। এদের মধ্যে ছিলেন শশাঙ্কমোহন সেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, গোলাম মোস্তাফা, শৈলাজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। সর্বোপরি সঙ্গে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ। যিনি এদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ।

মুজফ্‌ফর আহমেদ যখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন তখন দলীয় নিয়ম-কানুন মেনে নজরুল সদস্যপদ গ্রহণ না করলেও তিনি যে কমিউনিস্ট মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নজরুল যখন সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে করাচিতে ছিলেন সেই সময়েই রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লব হয়। জারের রাজত্ব থেকে রাশিয়ার জনগণ মুক্তি পেয়েছেন দেখে নজরুলের আনন্দের সীমা ছিল না। এ সম্পর্কে নজরুলের সহকর্মী জমাদার শম্ভু রায় লিখেছেন : ‘‘সেদিন সারা রাতই প্রায় হৈহুল্লোরে আমাদের কেটে গিয়েছিল।’’

হয়তো এই সব ঘটনা, এতো মানুষের সঙ্গে মেলামেশা তাঁকে সংকীর্ণতামুক্ত হতে সাহায্য করেছিল।

যুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি সরাসরি করাচিতে গিয়েছিলেন। সেখান লেখাপড়া করতেন, সাহিত্য চর্চা করতেন আর শিখতেন ফার্সি ভাষা। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন যে নজরুল আর ফিরে এলেন যে নজরুল তাঁরা যেন ভিন্ন মানুষ। নজরুল জীবনীকার গোলাম খুরশিদের ভাষায়, ‘‘প্রথম নজরুল সাধারণ লেখাপড়া জানা চঞ্চল, অত্যুৎসাহী, কৌতূহলী তরুণ, দ্বিতীয়জন ভাষা, সাহিত্য, সংগীতে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, মৌলিক দৃষ্টিতে দেখতে পারেন, এমন পরিণত বুদ্ধির একজন যুবক।’’

নজরুল যে খুব পড়ুয়া ছিলেন তাঁর জীবনীকারেরা কোথাও সেকথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু নজরুল রচনাবলীর পাতা ওল্টালে চোখে পড়ে আর এক নজরুলকে, যাঁর উপন্যাসের পাতায় পাতায় রবীন্দ্রনাথের, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উদ্ধৃতি। শুধু আরবি-ফার্সি অথবা ইসলামী ধর্মগ্রন্থ নয়, রামায়ণ মহাভারত থেকে বহু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রয়েছে তাঁর রচনায়। শুধু এদেশের নয়, বিদেশের বহু লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি। শেলী, কীটস, বায়রনের নামের সঙ্গে সঙ্গে নুট হাম্পসুন, বার্ণাড শ, আনাতোল ফ্রাঁস ইত্যাদি বহু লেখকের নাম তাঁর চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। অবাক হতে হয় কখন তিনি এত পড়লেন?

নজরুলের এই পাঠের জগৎকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার তাৎপর্য হল তাঁর ভাবনার জগৎকে তুলে ধরা, যেখান থেকে তাঁর সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মনোভাবের জন্ম হয়েছিল। কবে থেকে তাঁর মনে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জন্মালো, দিন-কাল-ঘন্টা-মুহূর্তের হিসাবে তাকে আবিষ্কার করা যায় না।

শিল্পী মানুষকে বিচার করতে গেলে সাধারণ মানুষের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। তবে একথা সত্যি ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই আমরা আর এক নজরুলকে দেখতে পাই যাঁর একদিকে বিদ্রোহ, অন্যদিকে প্রেমের গান। কখনো তিনি ভক্তিমার্গের পথিক, কখনো আবার যুক্তির ধারালো বাণীতে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন—কবিতায়, গানে, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে। আমাদের আলোচনা যুক্তিবাদী নজরুলকে নিয়ে, যে নজরুল সমাজ-জীবনের সুদীর্ঘস্থায়ী সংস্কারকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পকে দূরে সরিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত একটি সুস্থ সমাজকে দেখতে চেয়েছিলেন।

নজরুল বলেছিলেন, ‘‘হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না। আমি জানি এবং আমিও মানি যে একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে।’’ তাই তিনি সাহিত্যকে হাতিয়ার করেছিলেন এবং তার মাধ্যমেই তাঁর প্রতিবাদকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। নজরুলের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মনোভাবের মূলে তাঁর স্বদেশপ্রেমের একটি বড় ভূমিকা ছিল। দেশকে সত্যিকারের ভালোবাসাই তাঁকে দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। দেশ তো কেবল মাটি নয়, মানুষকে নিয়েই দেশ গড়ে ওঠে। ‘নবযুগ’ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন, ‘‘এস ভাই হিন্দু, এস মুসলমান, এস বৌদ্ধ, এস ক্রিশ্চিয়ান আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।’’

‘কুহেলিকা’ উপন্যাসেও রয়েছে এই দেশের কথা : ‘‘আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক, দরিদ্র, নিরন্ন, পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ... আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়—আমার ভারতবর্ষ মানুষের। যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, এ আমার মানুষের, মহামানুষের মহাভারত।’’

সাম্প্রদায়িকতার ভয়ানক রূপ দেখেছেন নজরুল। সে এক উত্তাল সময়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি করার পরিণাম ভয়াবহ দাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষের দারুণ সমস্যা। নজরুল চেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, তাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি এত সোচ্চার। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বাংলাকে দেখে নজরুল বন্ধু শৈলজানন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : ‘‘আমি এবার কলকাতায় গিয়েছিলুম...আল্লা আর ভগবানে মারামারির দরুণ তোমাদের কাছে যেতে পারিনি।’’

এখানে ১৯২৬ সালের ২রা এপ্রিল কলকাতায় যে দাঙ্গা হয়েছিল তার কথা বলা হয়েছে। এই দাঙ্গা হয়েছিল রাজরাজেশ্বরী মিছিলকে কেন্দ্র করে। এই দাঙ্গার বিস্তারিত খবর জানা যায় ‘ দ্য বেঙ্গলি’ পত্রিকা থেকে। হিংসায় উন্মত্ত হিন্দু-মুসলমানের এই হানাহানিতে বেদনার্ত নজরুল লিখলেন, ‘‘দেখিলাম হত আহতদের ক্রন্দনে মন্দির ও মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী কলঙ্কিত হইয়া রহিল।’’ ক্ষুব্ধ নজরুলের মুখ থেকে শোনা গেল, ‘‘মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে।’’

শিল্পী মানুষকে বিচার করতে গেলে সাধারণ মানুষের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। তবে একথা সত্যি ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই আমরা আর এক নজরুলকে দেখতে পাই যাঁর একদিকে বিদ্রোহ, অন্যদিকে প্রেমের গান। কখনো তিনি ভক্তিমার্গের পথিক, কখনো আবার যুক্তির ধারালো বাণীতে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন—কবিতায়, গানে, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে। আমাদের আলোচনা যুক্তিবাদী নজরুলকে নিয়ে, যে নজরুল সমাজ-জীবনের সুদীর্ঘস্থায়ী সংস্কারকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন।

কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান
সে যে তোরই মাঝে রয়
চেয়ে দেখ সে তোরই মাঝে রয়।

আর একটি কবিতায় আছে :

সব ধর্মে সব মানুষ মরে যখন
থাকে না হিন্দু-মুসলমান আস্ফালন

অথবা

এরা কি মানুষ, এরা আল্লার সৃষ্টি কি?
হুঁশ নাই
ডান হাত দিয়ে বাম হাত কাটে ভাইকে
মারিছে ভাই।

এই সময়ে রচিত দুটি প্রবন্ধ হল 'মন্দির ও মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান'। এই দুটি প্রবন্ধেরই মূল বক্তব্য হল মানুষের একটাই পরিচয়, সে মানুষ। ধর্ম দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায় না।

''হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায় কিন্তু তাদের টিকিত্ব, দাড়িত্ব অসহ্য। কেননা এই দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয় ওটা হয়তো পণ্ডিতত্ব, তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয় ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়ে আজ এত চুলোচুলি।'' সবশেষে বহু প্রচলিত, বহু আলোচিত' কাণ্ডারি হুঁশিয়ার' কবিতাটির কথা উল্লেখ না করলে নজরুলকে ফিরে দেখা সম্পূর্ণ হবে না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশের ভেদ-রাজনীতির কারণে হিন্দু, মুসলমান বিচ্ছিন্ন, ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে নিযুক্ত দেখে নজরুল প্রশ্ন করেছেন :

''হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কাণ্ডারি বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।''

সে যুগে এরকম করে আর কে দেখেছে?

এই একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যখন নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখেন ''ধূমকেতু কোনো সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়, মানুষ ধর্ম্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম।'' ধূমকেতুর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ভুলে গিয়ে মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়কে তুলে ধরা, সাম্প্রদায়িকতা আর মৌলবাদীদের ধিক্কার জানানো, আর হিন্দু-মুসলমানের মিলনগীতি রচনা করা। প্রায় একই সুরে তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ছুঁৎমার্গটিকে। যেমন : ''আমরা বলি, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁৎমার্গটিকে দূর কর দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিন সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাহাকে স্নান করিতে হইবে। মুসলমান তাহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনি অপবিত্র হইয়া যাইবে...মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা....অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, ভাই মুসলমান, এস ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই ... কি ভীষণ প্রতারণা...এই দিয়া তুমি একটি জাতি গড়িয়া তুলিবে?''

বহরমপুর থাকতে তিনি রচনা করলেন :

''জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত
খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তো জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের
নয়তো মোয়া
মানুষ নাই আজ আছে শুধু জাত শেয়ালের
হুক্কা হুয়া।''

বাস্তবে এই জাত-বিচারের অভিজ্ঞতা নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু কম হয়নি। করাচি থেকে কলকাতায় এসে নজরুল শৈলজানন্দের মেসে উঠেছিলেন। তিনি মুসলমান জানার পর মেসের বাসিন্দারা বিরূপ হয়েছিল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন : ''যখন ওরা আবিষ্কার করল আমি মুসলমান তখন ওদের মেজাজ যা তা বুঝতেই পারো। দল বেঁধে ঘরে চড়াও হল, রুচিবোধের সীমা ছাড়িয়ে কোরাস কণ্ঠে (শৈলজানন্দকে) বলে উঠল, আপনি মশায় মুখুজ্যে বামুনের ছেলে হয়ে নেড়ের কাছে বোন বিয়ে দিতে পারেন, আমরা কিছু বলব না, কিন্তু জেনে শুনে আমাদের জাত ধর্ম্ম নষ্ট করছেন, এজন্য আপনাকে কি করা উচিত জানেন?''

আর একবার একটি বিয়েবাড়িতে গিয়ে নজরুল হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে খাবারে অংশ নিতে গেলে গোঁড়া হিন্দুর দল সেখান থেকে উঠে যান। উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ নজরুল 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানটি গেয়ে ওঠেন। আর একবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একটি রুগীকে রক্ত দিতে চেয়ে নজরুল বুঝলেন ব্রাহ্মণ রুগী মুসলমানের রক্ত গ্রহণ করবেন না। কঠিন দুঃখে নজরুল বুঝলেন রক্তেরও বর্ণগৌরব, জাতি-সংস্কার অতি তীব্র মৃত্যুর চেয়েও বড়। ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু মেয়ে আশালতাকে বিয়ে করবার জন্য তাঁকে কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। বিরজাসুন্দরী দেবী, যাঁকে তিনি মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন, তিনিও এ বিয়ে চাননি। আশালতার খুড়তুতো ভাই বীরেন্দ্রকুমার এ বিয়েতে শুধু বাধাই দেননি, 'বৈকালি' পত্রিকায় এ বিয়ের বিরোধিতা করে একটি রচনাও লেখেন। সরলা দেবী ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে হয়েও এ বিয়ের বিরোধিতা করেছেন। বিয়ের সময় নজরুল কিন্তু আশালতাকে ধর্মান্তরিত করেননি। শুধু বিয়ের সময় নয়, সারা জীবন নজরুলের বাড়িতে আশালতা ও তার মা গিরিবালা দেবী নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণ করেছেন। জাতের চেয়ে মানুষকেই নজরুল সত্য বলে মনে করেছেন।

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য
অধিক সত্য প্রাণের টান
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।

নজরুল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের দোষ-ত্রুটিই লক্ষ করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে বাধা কোথায় তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। নিজে মুসলমান বলেই মুসলমান সমাজের দোষ-ত্রুটি তিনি আরও বেশি করে বুঝতে পারতেন :

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনও বসে।
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকাও হাদিস চষে।

কুশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস, শাস্ত্রবদ্ধতা মুসলিমদের পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, ''বাঙালি মুসলমান সমাজ নমাজ পড়ার সমাজ। যত রকম পাপ আছে করে যাও তার জবাবদিহি করতে হয় না, কিন্তু নমাজ না পড়লে তার কৈফিয়ত তলব হয়। আবার এই নজরুলই যখন বলেন,

মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই
গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।

—তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আসলে নজরুল ধর্মাচরণের বিরোধী নন, তাঁর অভিযোগ মতান্ধ ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে। সহজেই বোঝা যায় কেন তাঁকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই বার বার নিষ্ঠুর আঘাত পেতে হয়েছে। 'শয়তান', 'অনাচারী', 'নরাধম', 'খোদাদ্রোহী', 'ধর্ম্মদ্রোহী', 'ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য', 'বুনোবর্বর', 'কুলাঙ্গার', 'ফেরাউন', 'নামরুদ' ইত্যাদি ফতোয়া ও গালাগালি তাঁর প্রতি সমানে বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু নজরুল বিশ্বাস করতেন, ''কবি সর্বদেশের, সর্বকালের, তাঁকে জাতের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না।'' ''আমি মুসলমান কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, এবং মুসলমান-কবি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি।''

ইব্রাহিম খাঁ-কে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : ''আমায় মুসলমানেরা কাফের খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি... কয়েকজন নোংরা হিন্দু ব্রাহ্মণ ঈর্ষা পরায়ণ

হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করেছেন...এদের অবিচারের জন্য হিন্দু সমাজকে দোষ দিই না এবং দেবোও না।”

নজরুলের জীবনে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নির্মম আক্রমণ বার বার ঘটেছে এবং নজরুলও কখনো বিষণ্ণ কখনো বা ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হননি—তা হল ধর্মীয় পরিচয় কখনোই কারো প্রথম বা প্রধান পরিচয় হতে পারে না। মানুষের আসল পরিচয় হল সে মানুষ। মনে রাখতে হবে, নজরুল তাত্ত্বিক ছিলেন না আদৌ, মূলত তিনি একজন সঙ্গীত সাধক কবি। সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। প্রাণভরা ভালোবাসা, বুকভরা আবেগ আর অনুভূতিশীল, সংবেদী একটি মন নিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটি বুঝতে চেয়েছেন, চেয়েছেন তাকে দূর করতে। তিনি নির্ভুলভাবে বুঝেছিলেন যে নিজ ধর্মের সারমর্ম উপলব্ধি না করে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের বিচারহীন যান্ত্রিক অনুসরণ, অন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ মানুষকে ধর্মান্ধ করে তোলে। এই ধর্মান্ধতা থেকে সাম্প্রদায়িকতার দূরত্ব মাত্র দু-এক পা। কবি নজরুলের পাশাপাশি স্বাধীনতা-সংগ্রামী নজরুল জানতেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সাম্প্রদায়িকতা কী মারাত্মক হতে পারে। নজরুলের অশেষ সৌভাগ্য ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক নরমেধ যজ্ঞ এবং ১৯৪৭-এ ধর্মের নামে যখন দেশ ভাগ হল তখন তিনি জীবন্মৃত। ১৯৭১-এ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হল, নজরুল কী ভাবতেন আমরা জানি না। ১৯৭৬-এ তাঁর দৈহিক মৃত্যু। তারপরেও চার-চারটি দশক কেটে গেছে। নজরুল সুস্থ দেহমনে আজকের এই ভারতে বেঁচে থাকলে কী ভাবতেন?

পাঠকেরা আশা করি জবাবটা জানেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১. গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল জীবনী*, ২০১৮, প্রথমা, ঢাকা
২. অরুণ কুমার বসু, *নজরুল জীবনী*, আনন্দ, কলকাতা
৩. ড. নীরদবরণ হাজরা, *এক নজরুল সহস্র সংশয়*, বুলবুল প্রকাশন কলকাতা
৪. হাবিব রহমান, *বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব*, কথা প্রকাশ, ঢাকা
৫. অঞ্জন গোস্বামী, *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলমান*, চিরায়ত, কলকাতা
৬. *কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র* —প্রথম খণ্ড থেকে ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

পত্র-পত্রিকা :

১. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুখপত্র *আকাদেমি পত্রিকা* ১৬ মে, ২০০৪, কলকাতা
২. জিজ্ঞাসা, *নজরুল বিশেষ সংখ্যা*, শিব নারায়ণ রায়, *দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা*, কলকাতা।

লেখিকা : বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপিকা

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিউ মা মনসা ইন্ডাস্ট্রিজ

পোঃ সুরেশ দেবনাথ

প্রসিদ্ধ গামঝা ও লুঙ্গি প্রস্তুতকারক

গ্রাম : ভাণ্ডারটিকুরী, পোঃ পারুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 2

মৌখিক সাহিত্য : তত্ত্বের আধারে ক্ষেত্রদৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ

ভব রায়*

মৌখিক সাহিত্য সম্পর্কিত যে-কোনো আলোচনাতেই 'লোকসাহিত্য'-র প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য, তা না হলে ব্যাপারটা 'শিবহীন যজ্ঞ'-র মতো হয়ে দাঁড়াবে। আসলে, লোকসাহিত্যের সামগ্রিকতার আধারেই মৌখিক সাহিত্যের অবস্থান। তাই প্রথমেই সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার—'লোকসাহিত্য' কী ও কেমন? এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ-অভিমতের পরিবর্তে বিনা মন্তব্যে দুটি মনীষী-অভিমতকে তুলে ধরা হচ্ছে, সেখানে লোকসাহিত্যের তাত্ত্বিক ও ফলিত ছবিটি স্পষ্ট অথচ সুনির্দিষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জগদ্বিখ্যাত সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ R.V. Williams লোকসাহিত্যকে চিহ্নিত করেছেন এইভাবে—"...It is like a forest-tree with its roots deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits." লোকসাহিত্য সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের অভিমতেও ফুটে উঠেছে প্রায় অনুরূপ ছবি—"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং যাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনই সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যে অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে তাহা বিশেষ রূপে সংকীর্ণ রূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য। সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না।"

আবার, লোকসাহিত্যের মধ্যে মৌখিক সাহিত্য লীন হয়ে থাকলেও এ দুই-এর পারস্পরিক পার্থক্যটুকুও লক্ষণীয়। লোকসাহিত্যের সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের সীমারেখাটি খুবই সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট। খুব অল্পকথায় এই পার্থক্যটুকু সূত্রাকারে তুলে ধরা যায় এইভাবে, "...সব মৌখিক সাহিত্যই লোকসাহিত্য, কিন্তু সব লোকসাহিত্যই মৌখিক সাহিত্য নয়।" তাহলে, অবিমিশ্র মৌখিক সাহিত্যের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য (identity) কী? এই বিষয়টির ওপর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণী আলোকপাত করা যেতে পারে। আদিম সমাজ থেকে শুরু করে গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় বসবাসরত মানুষের সংস্কৃতির সার্থক প্রকাশ মৌখিক সাহিত্যের গতিপথ ধরে অগ্রসর হয়ে চললেও কালক্রমে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের একটি অংশ পুনর্গঠন ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে লিখিত রূপ গ্রহণ করে। একটি অংশ আবার সংশ্লিষ্ট চলমান সমাজের সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও ক্রমশ অবলুপ্তির পথ ধরে এবং অবশিষ্ট একটি অংশ অবলুপ্তির পথ এড়িয়ে ও লিখিত রূপ অগ্রাহ্য করে আদ্যন্ত মৌখিক রূপটি রক্ষা করে চলে। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত অংশটিই লৌকিক ঐতিহ্যে সবচেয়ে সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত।

কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, লোকাচার, রীতিনীতি, তৎসহ নৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন-মূল্যবোধের সামগ্রিক রূপের নাম যদি হয় সংস্কৃতি, তাহলে সাহিত্য হল সেই মানুষদের সংস্কৃতিজাত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল—তা সে মৌখিক সাহিত্য হোক, অথবা শিষ্ট ভাষার মার্জিত সাহিত্যই হোক। সুতরাং, তথাকথিত শিক্ষা ও প্রথাগত চর্চার ওপর সাহিত্য-স্ফূরণ আবশ্যিকভাবে নির্ভরশীল নয়। জমিতে হলকর্ষণের ফলস্বরূপ শস্যোৎপাদনের মতোই জীবনের মনোভূমি-চিত্তভূমির কর্ষণক্রিয়ার ফসল শিল্প ও সাহিত্য। তাই গ্রামীণ সমাজের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সমস্যাকীর্ণ নিরক্ষর মানুষ প্রথাগত বিদ্যাচর্চা-বঞ্চিত হলেও তাদের সংবেদনশীল

মনোভূমি নিয়ত ক্রিয়াশীল, দৃষ্ট ও অনুভূত। বাস্তব এবং কল্পিত বস্তু ও ঘটনাপুঞ্জ, মানুষ ও প্রকৃতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পরিচয়—এইসব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জারিত হয়ে গ্রামীণ সমাজের শিল্পীমনা মানুষ মুখে মুখেই সৃষ্টি করে চলে অভিনব সাহিত্যকীর্তি, যার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামীণ সমাজে সুপ্রচলিত অগণিত ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি সংস্কৃতির মধ্যে। এই সংক্ষিপ্ত তত্ত্বকাঠামোর মধ্যেই ধরা রয়েছে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রবহমানতা।

২.

বাংলা মৌখিক সাহিত্য-ধারাটিও সুপুষ্ট ও নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সারা বাংলা জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে নানা রঙের, নানা রসের মৌখিক সাহিত্য। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা জরুরি, এইসব সাহিত্যের মধ্যে তথাকথিত 'গুণগত' বা 'রসোত্তীর্ণ' বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে না—কখনও বা আঞ্চলিক ভাষায় স্ফূর্ত এরকম দৃষ্টান্তে অ-শিষ্ট বা অ-মার্জিত প্রবণতাও দেখা যেতে পারে। ঘটনা হল—এসব সত্ত্বেও সেগুলি প্রামাণিক ও স্বীকৃতিযোগ্য মৌখিক সাহিত্য, কারণ সেগুলির স্রষ্টা গ্রামীণ লোকবৃত্তের প্রায়-নিরক্ষর মানুষেরা, যাঁরা তাঁদের সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত, স্ব-শিক্ষিত আবেগের প্রেরণায় এগুলি সৃষ্টি করে থাকেন। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপনার এই পর্বে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই অভিমতটি মৌখিক সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে—''লোকসাহিত্য কেহ শিখিয়া রচনা করিতে পারে না। যখন ইহার উদ্ভব হয়, তখন ইহা মুখে মুখেই রচিত হয় এবং প্রথম অবস্থায় ইহা মুখে মুখেই প্রচারিত হয়।''

আপাতত, রাঢ় বাংলার পটভূমিতে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা থেকে সংগৃহীত মৌখিক সাহিত্যের কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশটি হল বিভিন্ন ঘরানার লোকসঙ্গীত। প্রায় সমগ্র রাঢ় বাংলায় অন্যতম প্রধান লোকউৎসব 'মনসাপুজো' বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত, বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় সর্পদেবী মনসার বন্দনা ও পূজা-লোকাচারে। মনসা পুজো উপলক্ষ্যে যে বিশেষ ধরনের গান গাওয়া হয়, তার নাম 'ঝাঁপান'—কখনও ঢাক-ঢোল-কাঁসি সহযোগে, কখনও বা একজন মূল গায়েন-এর উদ্যোগে, কোরাসে। সংশ্লিষ্ট গ্রামসমাজের মানুষেরা মুখে মুখেই এই গান রচনা করেন এবং নিজেরাই সুর দেন। বর্ধমান-বীরভূম জেলায় মৌখিকভাবে প্রচলিত এরকমই একটি ঝাঁপান গান—

পথে যেতে খেলি সাপা, তুই খেপি আচকা...
ডানে যেতে বাঁয়ে মারি, ঘের দরদর ঘেরে ঝাড়ি
সাপের নাম লীলা। সেখানে খেপি সাপা,
সেখানে বিষ মালা।।
কার দ'য়—মা-মনসার দ'য়—
মা-মনসার চরণ করি ধ্যান
বাজুক বিষম ঢাকি,... চলুক ঝাঁপান।।

স্পষ্টতই লক্ষণীয়, রাঢ়ের আঞ্চলিক ভাষায় মুখে মুখে রচিত এই ঝাঁপান গানের কেন্দ্রীয় বিষয় ও মনস্তত্ত্ব হল—নাগমাতা মনসার বিষধর ভয়াল রূপকে বর্ণনা। তাঁর বিষাক্ত দংশন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে মনসাকে যেনতেন প্রকারেণ সন্তুষ্ট রাখা।

আবার, সুরে-বেসুরে কথকতার ঢঙে 'বেহুলা লখিন্দর' আখ্যান বর্ণনার রীতিও রয়েছে নির্ভেজাল রাঢ়ীয় কথ্য ভাষায়—

শুনো শুনো পাঁচজন
শুনো দিয়া মন
বেহুলা-নখিন্দর-কতা
করিব বন্নন।...
...হায়গো—নোহার বাসরঘরে
কী করে সেঁধোলো কালী-লাগ...।

এখানে 'শুনো'র মান্য শব্দে অর্থ—শোন, 'নখিন্দর'—লখিন্দর, 'কতা'—কথা, 'বন্নন'—বর্ণন, 'নোহার'—লোহার, 'সেঁধোলো'—ঢুকলো, 'কালী লাগ'—কালীনাগ।

প্রশ্ন জাগতে পারে—উপস্থিত শ্রোতা বা দর্শক সাধারণের সঙ্গে গায়ক বা কথকের সংযোগ-সঞ্চারণের প্রক্রিয়াটি ঠিক কী রকম? এসব ক্ষেত্রে, মৌখিক সংস্কৃতিধারায় এক আশ্চর্য রসায়ন যেন এক নীরব অথচ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে চলে। মনসাবন্দনার মতো গ্রামীণ লোক-উৎসবের পটভূমিতে 'ঝাঁপান' ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গায়ক বা নায়ক এবং সমবেত শ্রোতৃদর্শকবৃন্দের সিংহভাগই হল প্রায়-নিরক্ষর প্রান্তিক বর্গের পুরুষ-নারী (সাধারণত এই বিশেষ নিম্নবর্গের মানুষেরাই মনসার উপাসক, ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক)। 'মা মনসা'র উদ্দেশে এইসব 'বন্দনাগীত' শুনতে শুনতে ভয়-ভক্তি-লোকবিশ্বাস প্রভাবিত এইসব মানুষ যেন মানস-কল্পনার সরণি ধরে চলে যান এক অলৌকিক, আশ্চর্য দৈবী জগতে, সেখানে তাঁরা যেন স্বচক্ষে দেখতে পান ভীষণা, পরাক্রান্তা 'দেবী মনসা'র অসীম শক্তি-স্বরূপা অ-পার্থিব মূর্তি। তাই, ঝাঁপান বা মনসা-মাহাত্ম্য শুনতে শুনতে তাঁরা আরও ভক্তিগদগদ চিত্তে মনে মনে মঙ্গলকামনায় মা-মনসার কাছে নীরব প্রার্থনা জানান, তাঁদের সকাতর ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মৌখিক ধারা-বাহিত 'ঝাঁপান'-এর উঠান ছেড়ে আসা যাক রাঢ়ের লোকসঙ্গীতের অন্য এক বিচিত্র গানের আসরে—নাম তার 'বাঁধা গান'। এই বাঁধাগান কিন্তু ঝাঁপানের মতো 'এক দেবতা বা দেবী'-কেন্দ্রিক নয়। বাঁধাগানের কেন্দ্রীয় উৎসে থাকতে পারে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণ অথবা যে-কোনো দৈবী মহিমান্বিত ঘটনা বা আখ্যানবিশেষ। আসলে, মূল স্বীকৃত ও জনপ্রিয় ধর্মীয় বা পৌরাণিক পটভূমিকে সামনে রেখে গ্রামের মানুষ নিজেদের মতো করে, নিজেদের ভাষায় ও ভাবনায় এইসব গান বাঁধেন, নিজেরাই সুর দেন এবং বিভিন্ন পূজা-পার্বণে গেয়ে থাকেন। এই কারণেই, এইসব গানের নাম 'বাঁধাগান'। রাঢ়ভূমির আসর থেকে সংগৃহীত এরকমই একটি গানের নমুনা দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে—

ও আমের মা, ও আমের মা—
আজকে আমের অদিবাস।
চৌকাটেতে নেকা আচে
চোদ্দ বচর বনবাস।
ও আম, জটাধারী
সঙ্গে সেতা সোন্দরী।

বর্ধমান-বীরভূমের লোকভাষায় মুখে মুখে বাঁধা এই 'রামায়ণী গান'-এর মান্যভাষায় শব্দার্থ এই রকম—'আমের'—রামের, 'অদিবাস'—অধিবাস, 'চোকাটেতে'—চৌকাঠে, 'নেকা'—লেখা, 'আচে'—আছে, 'সেতা'—সীতা, 'সোন্দরী'—সুন্দরী, 'বচর'—বছর।

রামের প্রাক্-রাজ্যাভিষেক-পর্ব (অধিবাস) উপলক্ষে রামের চৌদ্দ বছর বনবাসের যে 'বিধিলিপি', তারই করুণ বর্ণনা যেন বেদনা-বিধুর গলায় শোনাচ্ছে 'রামের মা'কে রাম-অনুরাগী প্রজাবৃন্দ। তারা যেন আবার কল্পনার চোখে আগামী দিনের ছবিটিও দেখছে—দীর্ঘ দিন বনে বাস করার ফলে 'রাজপুত্র' রামের মাথাভর্তি রেশম-চিকন চুল জটায় পরিণত হয়েছে, আর তার সঙ্গে রয়েছে 'সুন্দরী সীতা'। এরকম অজস্র 'বাঁধাগান'-এর প্রচলন রয়েছে রাঢ়বাংলার মৌখিক সাহিত্যধারায়।

রাঢ়ের বিভিন্ন লোকনাট্যও মূলত মৌখিক ধারায় প্রবহমান। এককালের খুব জনপ্রিয় 'লেটো' গান বর্ধমান-বীরভূম-সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে আসর জমাতো। এই 'লেটো' গানের পুরোটাই ছিল মৌখিক ধারায় সংগঠিত—পালা-রচনা, গানের ভাষা, সুরারোপ, সংলাপ—সব কিছুই লেটো-অভিনেতাদের মুখে মুখে ঘুরতো, সর্বোপরি পালার 'ওস্তাদের' (পরিচালকের) সবটাই ছিল কণ্ঠস্থ। এমনকি, হাতে লেখা বা মুদ্রিত স্ক্রিপ্টের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আরও যা উল্লেখ্য তা হল—পালা চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনে যে-কোনো অভিনেতার তাৎক্ষণিক সংলাপ বা গানের টুকরো সংযোজিত করার সুযোগ থাকত। 'লেটো' অনুষ্ঠানে পারস্পরিক সঙ্গীতযুদ্ধে পরিবেশিত এরকমই একটি গান—

ওহে দানা করি মানা গৌরব করো না—
আমার সাথে উচিত মত হয় না তুলনা।
সাতখানা খাব না   কাপড় খুলে দাও না
কেমনে ইজ্জত রবে আমায় বল না—

মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অনেক সময়ে স্থূল ও আদিরসের আধিক্য থাকে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু করার নেই, কারণ সহজাত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল প্রকাশই হল মৌখিক সাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতি—সেখানে শিষ্ট বা মান্য ভাষা-আঙ্গিকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা বা পরিমার্জনার কোনো সুযোগ নেই, যদিও 'লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব' একটি ভিন্নতর গবেষণা ও সমীক্ষাযোগ্য বিষয় হিসেবেও স্বীকৃত। যাই হোক, পূর্ববর্ণিত মোটা দাগের লেটোগানের পাশাপাশি ছন্দোময়, সুন্দর লেটোগানও গ্রামীণ লোকবৃত্তেই সৃষ্ট হয়ে থাকে মৌখিক ধারাতেই। এরকমই একটি গানের নমুনা—

নীল আকাশে ঢেউ খেলে যায়
রঙিন আলোয় চাঁদিনী রাতে
গা মা পা ধা পা নি ধা।
চল্ গো সখি চল্ গো মোরা
এই বেলা মোরা মালা গাঁথি।

শুধুই লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য নয়, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা, ছড়া, ধাঁধা—এসবেরই আদি মাধ্যম হল মৌখিক ধারা। পূর্ববর্ণিত তত্ত্ব অনুসারে, এসবের একটি অংশ পরবর্তী কালে বিভিন্ন গবেষক ও ক্ষেত্রকর্মীদের উদ্যোগে লিখিত রূপ পায়। কিন্তু, এসবের পরেও একটি বড়ো অংশ সজীব থেকে যায় মৌখিক ধারায়। শেষোক্ত ঘরানার কিছু ধাঁধা ও ছড়া এখানে তুলে ধরা হচ্ছে—

ধাঁধা

১.
দিই তো পরপুরুষকে দিই
দিই তো পথে-ঘাটে দি-ই,
তুমি আমার, আমি তোমার
তোমায় দেব কী?
(উত্তর : 'ঘোমটা')

২.
একথালা সুপারি
গুণতে না পারে ব্যাপারী।
(উত্তর : 'আকাশের তারা')

৩.
ঘরের মধ্যে ঘর
নাচে কনে-বর।
(উত্তর : 'মশারি')

ছড়া

১.
শাশুড়ি ম'লো সকালে,
খেয়ে-দেয়ে, বাসন মেজে (বেলা থাকে তো)
কাঁদবো আমি বিকেলে।

২.
উচ্ছে খাবে ইচ্ছে করে
পটল খাবে চেখে,
দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবে
নিজের চোখে দেখে।

৩.
বদ্দমানের শোলের ঢেঁকি
দাদু ভানুনি
দাদু গো, ভাগ করে ভানাব ধান
দিদিমা রাঁধুনি।

এইভাবে দেখা যায়, ধাঁধা-ছড়া-প্রবাদ ইত্যাদির মূল উৎস বা নির্যাস হল সহজ-সরল রঙ্গ-রস, কোথাও বা রূপকের ছলে শ্লেষে, কিন্তু এইসব মৌখিক সৃজনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'হিউমার'-এর আড়ালে লীন হয়ে থাকে প্রকৃত অর্থের বহু ব্যঞ্জনা। কোথাও আবার সংশ্লিষ্ট কথক ও শ্রোতার মধ্যে সমাপতিত হয় টুকরো-টাকরা চিত্রকল্পের ঐক্যসূত্র। এইভাবে, ঐতিহ্য ও সময়ের সরণি ধরে রামধনুর বর্ণময়তা নিয়ে বিকশিত হয়ে চলে মৌখিক সাহিত্যের শত পুষ্প।

৩.

এই রচনা শুরু করা হয়েছিল তত্ত্বের ভূমিকা দিয়ে, শেষ পর্বেও যেন বা কাকতালীয়ভাবে এসে যাচ্ছে সামান্য তাত্ত্বিকতা—অন্তর্বর্তীতে ক্ষেত্র-দৃষ্টান্ত সটীক বিশ্লেষণ তো রাখাই হয়েছে। মৌখিক সাহিত্যের আর একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, যেখানে প্রাসঙ্গিকতা ও সুযোগ আছে, সেইসব ক্ষেত্রে ঘটনার পুনর্নির্মাণ বা 'Reconstruction'—স্বীকৃত ও লিখিত মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদির মূল কাঠামো ও অন্তর্গত আখ্যানকে ভেঙেচুরে অবলীলায় নিজেদের আঙ্গিকে গড়ে-পিটে নেওয়া। পূর্ববর্ণিত রামায়ণ-মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক মৌখিক দৃষ্টান্তে এই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে। এর কারণটিও সহজবোধ্য। মৌখিক সাহিত্য-স্রষ্টা বা গ্রামীণ অন্তেবাসী প্রায়-নিরক্ষর মানুষদের অতি-সীমিত পাঠসক্ষমতা দিয়ে মূল গ্রন্থের রসোপলব্ধি নিতান্তই অসম্ভব বা অবাস্তব। অথচ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকবিশ্বাসের ঐতিহ্যবাহিত ধারায় এইসব মানুষদেরও নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে রক্তের মধ্যে মিশে রয়েছে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-চৈতন্যলীলার ভাবানুভূতি। তাই, সংশ্লিষ্ট পুনর্নির্মাণ স্বাভাবিক ও অনিবার্য।

এরপরে উল্লেখ্য আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষজ্ঞ-অভিমত, যেখানে সুন্দরভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সাহিত্যের মৌখিক ধারার (oral tradition) চিরন্তনী প্রভাব কীভাবে মূল ধারার উচ্চতর সাহিত্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট সাহিত্যগবেষক G. Herzog লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন—"...(It) embraces those literary and intellectual phases of culture which are perpetuated by oral tradition, myths, tales, folksong and other forms of oral tradition literature." বাংলা সাহিত্যের মূল ধারাতেও মৌখিক সাহিত্যের ছায়াপাত ঘটেছে—হয়তো ব্যাপকভাবে নয়, কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবেই তা ঘটেছে। তবে, বাংলা সাহিত্যে এমন কয়েকজন কথাশিল্পী রয়েছেন, যাঁদের সাহিত্যকর্মের এক বড়ো অংশে মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী। এইসব সাহিত্যিকদের বিশেষ কৃতিত্ব—মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানকে মূল বিষয়ের সঙ্গে সার্থকভাবে অন্বিত করে সংশ্লিষ্ট

সাহিত্যকর্মকে ধ্রুপদী (classic) ও চিরায়ত করে তুলেছেন।

এই পর্য্যায়ে যেমন থাকবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’, তেমনই থাকবে সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’। আর এ-ব্যাপারে তারাশংকর তো তুলনারহিত। তাঁর অন্তত বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প রয়েছে, যেখানে রাঢ়ের মাটির গন্ধমাখা মৌখিক ধারার অজস্র উপাদানকে তিনি ব্যবহার করেছেন। সবার উপরে রয়েছে তাঁর ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’। সেখানে তিনি Herzog-চিহ্নিত oral tradition, myths, tales, folksong... এইসব যাবতীয় অনুষঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে গড়ে তুলেছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ‘মহাকাব্যিক ধ্রুপদী’ উপন্যাস। তাঁর সাহিত্যকর্মে oral tradition-সংশ্লিষ্ট উপাদানের দৃষ্টান্ত দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই, এককথায় বলা যায়—তা অপরিমেয়। শেষ কথা হিসেবে যে প্রশ্ন জাগা অবধারিত ও স্বাভাবিক তা হল—বর্তমান সময়ের পটভূমিতে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কী? নিঃসন্দেহে প্রশ্নটি জটিল, এক কথায় যার উত্তর হয় না। মৌখিক সাহিত্য তথা লোকসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজকাল বিভিন্ন মহলে অনুমানভিত্তিক কিছু সম্ভাবনা ও আশঙ্কার কথা বলা হয়ে থাকে। একথা ঠিক, বিগত কয়েক দশক ধরে দ্রুততর নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন, মৌলিক কৃষিজীবীদের আধুনিকীকরণ, গ্রামজীবনে নাগরিক সংস্কৃতির আগ্রাসন ইত্যাদি কারণে মৌখিক সংস্কৃতি প্রচণ্ড বাধা, বিপত্তি ও বিকৃতির মুখোমুখি হয়েছে। মৌখিক ধারার অনেক কিছুই আজ বিলুপ্তির পথে, তবে নানা গবেষক-সমীক্ষক-লেখকদের নানাবিধ লেখায় এই ধারার উল্লেখযোগ্য অংশ লিখিত ও মুদ্রিত হয়ে সংরক্ষিতও হয়ে চলেছে। আর, অবশিষ্ট অংশ এখনও মৌখিক ধারাতেই সজীব হয়ে রয়েছে। তাই, এই আশাবাদও খুব অমূলক নয়, মৌখিক সাহিত্যের চিরায়ত (perpetual) ও অন্তর্নিহিত শক্তি এবং ঐতিহ্যের জোরেই তার বহতা ধারা কমবেশি নিরবচ্ছিন্নই থাকবে আগামী দিনে।

তথ্যসূত্র

১. *বাঙালীর ইতিহাস*—নীহাররঞ্জন রায়
২. *বাংলার লোকসংস্কৃতি*—আশুতোষ ভট্টাচার্য
৩. *Descriptive Ethnology of Bengal*—E.T. Dalton
৪. *রাঢ় বাংলার মাটি, মানুষ ও সংস্কৃতি*—ভব রায়

লেখক : সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষক

With Best Compliments of

MALAKAR ENTERPRISE

CIVIL, MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

D-25/S, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Paschim Bardhaman
Mob. 9474444867, 7797770088

Sl. No. 32

শিল্পকলায় মূর্ত-বিমূর্ত রূপ

শিবশঙ্কর কুণ্ডু

মানুষের জীবনের প্রকাশ হয়েছে ইতিহাসে, সাহিত্যে, বিভিন্ন শিল্পে, চিত্রে-ভাস্কর্যে, বিজ্ঞান-দর্শনে। পৃথিবীর একেবারে সেই আদিমের অন্ধকার গুহা থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত মানুষ মননে ও চিন্তনে নিজেকে কতভাবেই না প্রকাশ করেছে!

কাল অনন্ত—পৃথিবী গতিচঞ্চলা। শিল্পকলা রচনা মানুষের আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন মাধ্যম। শিল্পকলা, বিশেষ করে, সঙ্গীত-চিত্র-ভাস্কর্যকলার ভাষা সর্বকালের। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্গীত-চিত্র-ভাস্কর্য শিল্পে কতই না অদল-বদল ঘটেছে। সঙ্গীতের রকমারি সুর-তাল-ছন্দ, চিত্রে রেখা-রঙের সুবিন্যস্ত প্রয়োগ, ভাস্কর্যে সৌষ্ঠব গঠন-আকৃতি রূপায়িত হয়েছে এবং শিল্পকলা রূপায়ণের ধারাবাহিকতায় মানুষের জ্ঞানের ধারা নানা প্রবর্তনও ঘটে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ নিজেদের যেভাবে দেখেছে সেই আদলই চিত্রে-ভাস্কর্যে প্রতিফলিত করেছে। প্রাচীন সভ্যতা—সুমেরীয়, আসীরিয়, ব্যাবিলন, মিশর, ক্রীট, গ্রীস, ভারত, চীন প্রভৃতি চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্য ধারায় এমনকি মানুষের জীবনধারা সেই ধর্মেই অনুসৃত হয়ে এসেছে। আধ্যাত্মিক বিচারে শিল্পকলার অনুভবে দুটি স্তর মননে সদাজাগ্রত রূপে অবস্থান করে। যে রূপ সৃষ্টির মধ্যে সর্বরূপে নিহিত, আবার কখনো রূপাতীত যা প্রাকৃতিক গুণের ঊর্ধ্বে। নির্গুণ, বিকারশূন্য, নিরাকার রূপী, অনামি, অরূপ অমৃতত্বে ভরা সেই রূপের অভিব্যক্তি হচ্ছে 'পরাবিদ্যা'। আর সৃষ্ট জগতে সর্বত্র যা সাদৃশ্য বর্তমান তা মননে-দর্শনে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় এবং সৃষ্টি রসগুণ অনুভব করা যায়, সেটা হচ্ছে 'অপরাবিদ্যা'।

বহু পূর্বে ঈশ্বরিক চিন্তায় শিল্পকলা সৃষ্টি ছিল খুবই দুর্বোধ্য। সৃষ্ট বিষয়বস্তুতে এবং আঙ্গিকে নূতনত্ব অভিব্যক্তিতে সমৃদ্ধ ছিল। এইসব অভিনব সৃষ্টিরস কোন্ পর্যায়ভুক্ত সেটা সাধারণের উপলব্ধির বাইরে। অভিনব সৃষ্টি চিত্রে রচিত হয়েছে শুধুমাত্র সরলরেখা ও বক্ররেখায় আবার কোনোটা গোলাকার, চতুষ্কোণাকার, ত্রিকোণাকার। এছাড়া বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রেখা বিন্যস্ত করে জ্যামিতিক আকারে ঈশ্বরিক প্রতীক চিহ্নিত যন্ত্রালেখ্য রূপায়িত হয়েছে। দেখতে গেলে, শিল্পসৃষ্টিতে দুর্বোধ্যতা বহুযুগ ধরে ধর্মীয় ভাবধারার চিত্রে-ভাস্কর্যে রূপায়িত হয়ে আসছে, তার বহু নিদর্শন ধর্মস্থানে দেখা যায়, কখনো অদ্ভুতাকৃতি মূর্ত রূপে আবার কখনো বিমূর্ত রূপে। এই ধর্মীয় সংস্কারে সাধক-শিল্পী যোগভাবধারায় নানা অবয়বী চিত্রে ভাস্কর্যে মূর্ত-বিমূর্ত রূপে শিল্পকলা রচনা করেছেন। পরে কালের পরিবর্তনে ক্রমে ক্রমে শিল্পকলার ধারাও পরিবর্তিত হয়েছে। শিল্পীর মানসনেত্রে জগতের অপরূপ রূপ-রঙ যা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে, বাহ্যজ্ঞান সম্পন্ন সমগ্র জীবজগতের মানব গোষ্ঠী মায়াময় পরিবেশে অবস্থানকালে নানা বিভ্রান্তিকর জীবনযাত্রার মধ্যে বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কর্ম করে চলেছে।

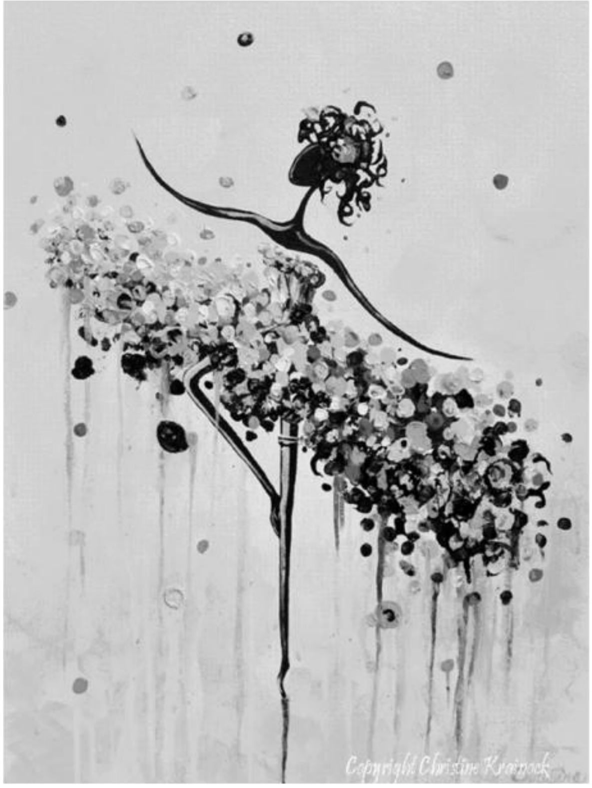

অনুরূপভাবে শিল্পী সম্প্রদায়ও শিল্পকর্মের মধ্য দিয়েই সমাজে খ্যাতি-যশলাভে প্রতিষ্ঠিত হন। তবে যুগের ধারার উত্থান-পতনে মানুষের জীবনধারা ও কর্মধারা প্রবাহিত হয়ে থাকে। যুগপরম্পরায় দেখা যায়—শাস্ত্রবিরোধী ভাবধারায় বিষয়বস্তু চিত্রে ও ভাস্কর্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন—চিত্রে শুধুমাত্র বিচিত্র বহুবর্ণ রেখার সমাবেশ, আবার কোনো চিত্রে থাকে বর্ণহীন রেখার জালে ভরা। এছাড়া এমন অনেক চিত্রে দেখা যায় যে, জীব-জীবনের নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই শুধু উজ্জ্বল বর্ণের এলোমেলো সমাবেশ, যা দেখে বলা যায় চিত্র দুর্বোধ্য—বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট।

একইভাবে কোনো আকৃতির বিকৃত মূর্ত ও উদ্ভট বিকৃত বিমূর্ত রূপ ভাস্কর্যেও প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ধরনের ভাবমূলক দুর্বোধ্য শিল্পকলা রচনায় রিয়ালিজ়ম—বাস্তবসংস্কার ভাবধারা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পকলা রচনায় শিল্পীরা ধীরে ধীরে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনায় শিল্পকলার ধ্রুপদী সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট শিল্পশৈলীর মাধ্যমে অনেক বেশি সহজ আবেগময় শিল্পকলা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। শিল্পীরা অনুভব করছেন—দৃষ্টিগ্রাহ্য কল্পনামণ্ডিত

শিল্পশৈলী থেকে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট শিল্পশৈলীতে অফুরন্ত সীমাহীন বৈচিত্র্যময়ের প্রকাশ করার অনেক রকম সুযোগ আছে। ইউরোপে দুই রেনেসাঁস যুগে ধ্রুপদী শিল্পস্রষ্টাদের পর চিত্রে-ভাস্কর্যে একটা প্রচণ্ড আবেগে পরের পর বিভিন্ন ইজ়মের জন্ম হতে থাকে, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানে নতুন নতুন উদ্ভাবনে সমগ্র জগৎটা বদলে যেতে থাকে। ফলে মানুষের ধ্যান-ধারণা আর চিন্তায় দেখা দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাতে ক্ল্যাসিসিজ়ম রীতির ধ্যানধারণা বদলে রোমান্টিসিজ়ম রীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ যেমন রিয়ালিজ়ম, ইমপ্রেশনিজ়ম, এক্সপ্রেশনিজ়ম ইত্যাদি। এইভাবে পরে পরে মানুষের জীবনে অশান্ত-অস্থিরতার মধ্যে আরো নতুন ইজ়ম বা শিল্পঘরানা সৃষ্টি হতে থাকে, যেমন—নিও-রিয়ালিজ়ম, কিউবিজ়ম, দাদাইজ়ম, সিমবলিজ়ম, সুর-রিয়ালিজ়ম প্রভৃতি। উইলিয়াম ব্লেক, ব্রাক্ পিকাসো, মাতিস, মুঙ্ক প্রমুখ শিল্পীদের চিত্রে এই সমস্ত ইজ়ম প্রকাশিত হয়েছে। এইসব মতবাদের মধ্য দিয়ে চিত্রে-ভাস্কর্যে পরপর শিল্পীরা শিল্প আন্দোলনে আরও অনেক উদ্ভট মতবাদ সৃষ্টি করেছেন। চিত্র ও ভাস্কর্য জগতে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিকৃত সৃষ্টি হল—অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট। দর্শনে যা মানুষকে শুধু বিস্মিত করে না, নৈরাজ্যের জগতে একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশে নিয়ে যায়। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট সম্বন্ধে মনীষী হার্বার্ট রীডের উক্তি, ''সমস্ত আর্টের অর্থাৎ শিল্পকলার বুনিয়াদ হল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট।'' আবার বিখ্যাত ভাস্কর হেপ্‌ওয়ার্থের মতে, ''শিল্পজ্ঞান প্রকৃতি থেকে উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতিও প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না। সেখানেও অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শনের সমাবেশ দেখা যায়।''

স্যর উইলিয়াম অরপেনের মতে, ''যখন শিল্পী প্রকৃতিকে আঁকেন, তখন প্রকৃতির রূপকে সংক্ষিপ্ত রূপে আকৃতি ও বর্ণ অ্যাবস্ট্র্যাকশন্ রূপে প্রকাশ করেন। শিল্পী চিন্তনে যখন নতুন আকারে কোনো শিল্প তৈরি করেন বা আঁকেন সেখানেও অভিনব রূপ-ছন্দের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট রূপ প্রকাশ পায়। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট বা বিমূর্ত শিল্প আদিতে সভ্যতার মূল সূত্র সেই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছে। বিমূর্ত শিল্প আদিম কাল থেকে সমগ্র বিশ্বে শিল্প-সংস্কৃতিতে জড়িয়ে আছে, ইউরোপ আমেরিকা, আফ্রিকা, সমগ্র এশিয়ায় শিল্প সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিমূর্ত শিল্পধারা আধুনিক কালে আজ নতুন করে সৃষ্টি হয়নি। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিমূর্ত শিল্প সমগ্র শিল্পের মধ্যে সিম্‌বলিজ়ম চিন্তাধারায় রচিত হয়েছে। বিমূর্ত ভাবধারার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের রকমারি রূপ দেখা যায়। চিত্রে উইলিয়াম ব্লেক্, ম্যাক্স এর্নস্ট, সাল্‌ভাডর ডালি, পল্‌ন্যাশ, জন আর্মস্ট্রং প্রমুখ শিল্পীরা সুর-রিয়ালিজ়মের মতবাদী শিল্পী হলেও মূলত তাঁরা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট শিল্পী। অনুরূপভাবে ভাস্কর্যে জ্যাকব এপ্‌স্টাইন, হেনরি মূর, রেজিনাল্ড বাট্‌লার প্রমুখ শিল্পীরা ভাস্কর্যে মূর্ত রূপের বিমূর্ত ধারায় প্রকৃত অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন প্রচলন করেন। পরে ব্রাঁকুসি, জীন্‌আর্প, রাশিয়ার আর্চিপেনকো প্রমুখ ভাস্কর্য শিল্পীরা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ভাস্কর্যকে আরও প্রমূর্ত করেছেন। শিল্পকলায় অ্যাবস্ট্র্যাকশনের মধ্যে সোজাসুজি আবেগপ্রবণতা থাকে, রিয়ালিস্টিক ধারার শিল্পশৈলীতে সেই স্বাধীন সরলতা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পকলায় নন-অবজেক্টিভ ফর্ম যা প্রকাশ করা হয় তা কখনো হয় অলৌকিক কিংবা আধ্যাত্মিক আদর্শের ভাব রূপ। অনেকে হয়তো ভাবেন, চিত্র-ভাস্কর্য শিল্প রিয়ালিজ়ম থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রকাশ হলে সেই শিল্প অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শনের পর্যায়ে পড়ে। যদি শিল্পকলায় অবজেক্টের নির্দিষ্ট কোনো আকার না থাকে তবে ধরে নেওয়া হয় সেই শিল্পকলা বিমূর্ত শিল্প। আধুনিক শিল্পীরা বিমূর্ত মতবাদে নিজ নিজ স্বতন্ত্র ধারায় শিল্পসৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁরা মনে

করেন, শিল্পীমনের অন্তর্নিহিত ভাবকে সহজভাবে ব্যক্ত করাই বিমূর্ত শিল্পের মূল কথা এবং রিয়ালিজ়ম অবজেক্টকে সম্পূর্ণ বর্জন করে কল্পনাশক্তির দ্বারা শিল্পভাবকে সিমবলাইজ় ধারায় বিমূর্ত রূপে প্রকাশ করেন। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট শিল্পধারার সূচনা আধুনিক শিল্পইতিহাসে মূর্ত ও বিমূর্ত শিল্পের বিশেষ অধ্যায় রচনা করা হয়েছে।

আধুনিক শিল্পীরা চটকদারি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের মতবাদকে পাথেয় করে আরো উদ্ভট রীতিতে উগ্র মূর্ত-বিমূর্ত চিত্র ভাস্কর্য রচনা করে চলেছেন। আলট্রামডার্ন আর্টের ভাবধারা ব্যাপক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টির ফলে সমগ্র মানুষের মনে এক নতুন শিল্পচেতনা জাগ্রত হয়েছে। আধুনিক বিমূর্ত শিল্পসৃষ্টির ব্যাপক প্রসারে ইউরোপের শিল্পীরা ছিলেন অগ্রণী। ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পীর সৃষ্ট অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের বিভিন্ন ধারা ও মতবাদ প্রচার সমগ্র বিশ্বে সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন মতবাদে শিল্পী যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা হল—শিল্প রচনায় ঐকতান রূপদানের মধ্যে ভঙ্গিমা, বর্ণচ্ছটার সুষমা, গতিবেগ ও শব্দের অস্তিত্ব অনুভূত হবে। আর এক ধরনের সৃষ্টিতে দেখা যায়—ক্যানভাসের ফ্ল্যাট্ সারফেসের ওপর নানা ধরনের বস্তু যেমন—কাঠ খণ্ড, পাথরের টুকরো, ধাতু খণ্ড, প্লাসটিক, রঙিন মোটা কাপড়ের টুকরো, মোটা কাগজ, শুকনো পাতা ইত্যাদি একত্র সহযোগে অথবা পৃথক স্বতন্ত্র রূপে শিল্পগত বিশেষ ভাব প্রকাশ করে।

আরও এক শিল্পী ভিক্টর ভ্যাসেরেলি উদ্ভট শিল্পসৃষ্টি করেছেন—তা হল অপটিক্যাল আর্ট (দৃষ্টি সংক্রান্ত শিল্প)—ক্যানভাসে ফ্ল্যাট সারফেসে উদ্ভট চিত্ররূপ দেখে নতুন করে আরো রূপ দৃষ্টিতে অনুভূত হয়ে ধরা পড়ে। সেই বিচিত্র রূপের মধ্যে ছন্দ ও গতি ভাবদৃষ্টিতে সঞ্চারী হয়। এইরূপ চিত্রশৈলীর নাম প্ল্যাস্টিক সিনেটাইসিজ়ম।

জিওমেট্রিক্যাল কিউবিক অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চিত্রশিল্পে শিল্পী ব্রাক্ ও

পিকাসো চিত্ররচনার চিরাচরিত প্রথাকে বর্জন করে কখনো অবজেক্টিভ, কখনো নন-অবজেক্টিভ ফর্মে চিত্র রচনা করেছেন। শিল্পী ব্রাক্ ও পিকাসো চিত্রে মহাজাগতিক সত্তাকে কবিতা চিন্তনে রহস্যময় রূপে প্রকাশ করেছেন। শিল্পী ব্রাক্ ও পিকাসো এক সময় জ্যামিতিক-কিউবিক পদ্ধতিতে মূর্ত বিষয় সমূহের রূপকে বীভৎসাকৃতি রূপে চিত্রিত করার পর তাঁরা আরেক নতুন পদ্ধতি চিত্রে আরোপ করেন। তাঁদের চিত্রে দেখা যায় টেন্সিল করা অক্ষর, জ্যামিতিক সংখ্যা সমন্বয়ে চিত্ররচনা। সেই সঙ্গে শুরু ক্যানভাসের ওপর রঙিন কাগজের টুকরো, তাস, কাঠ, মার্বেলের অনুকৃতি অলংকরণ রূপ চিত্রিত করেন। এই পদ্ধতির চিত্ররীতিকে বলা হয় সিন্থেটিক্যাল কিউবিজ়ম। পল ক্লি, ক্যান্ডনস্কির চিত্রেও এই পদ্ধতি দেখা যায়।

ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী উইলিয়াম ব্লেক্ অভিজাত জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ বিরোধী শিল্পী ছিলেন। তিনি বলতেন, চিত্রে চিন্তন ও মনন প্রকাশের প্রয়োজন। শিল্পই মনের ভাবকে প্রকাশ করে—যেমন সাহিত্য, কবিতা, চিত্র-ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, অভিনয় ইত্যাদি কল্পনাশক্তির মধ্য দিয়ে শিল্পের বিকাশ ঘটে। কাব্যিক ও ধর্মীয় অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন হয়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে শিল্পীরা প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃত আকারে যা দেখা যায় তা চিন্তনে-মননে অনুভূতিতে ক্যানভাসে বিমূর্ত রূপে রচনা করেছেন। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বা বিমূর্ত শিল্প মতবাদের সমসাময়িক সময়ে পিউরিজ়ম মতবাদে পিউরিস্ট শিল্পীরা চিত্রে শুধুমাত্র বর্ণ (কালার) প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে বর্ণের ভিব্জিওর তথ্য বিশ্লেষণ করে চিত্রে প্রকাশ করেছেন।

ডাডাইজ়ম : শিশুদের পুতুল খেলনা ঘোড়ার নাম 'ডাডার'। এই নাম অনুসারে ডাডাইজ়ম নাম দিয়ে একটা নতুন শিল্পমতবাদ গড়ে ওঠে। শিশুরা যেমন নিজের খেয়ালখুশি মতো খেলনা ঘোড়াকে এদিক-ওদিক খেলাচ্ছলে চালায়, কোনো নিয়ম মানে না, তেমনি ডাডা মতবাদী শিল্পী সমস্ত রকম বন্ধনহীন মনে দুর্বার গতিতে কোনো নিয়ম রীতি না মেনে খেয়ালখুশি মতো চিত্রে নিজের চঞ্চল মনের ভাব প্রকাশ করেন। এই মতবাদের শিল্পী হলেন সুইজারল্যান্ডের শিল্পী তিস্তান-জারা। এই মতবাদে যাঁরা আগ্রহী শিল্পী তাঁরা হলেন মার্সেল ডুক্যাম্প, হ্যান্স আর্প, মাক্স এর্নস্ট, জর্জ ডি চিরিকো, পল্ ক্লি, ফ্র্যাঞ্জ মার্ক, ভাসিলি ক্যান্ডিনস্কি, লিওনেল্ ফনিনিজার, অস্কার কোকোসচকা, ফ্রান্সিস্ পিকাবিয়া প্রমুখ।

ভোর্টিজিম : আবর্তনবাদ—এই মতবাদী শিল্পীরা বলেন, প্রকৃতিতে একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সমস্ত প্রাণশক্তি চক্রাকারে প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চিত্রে যা কিছু সৃষ্টি হবে তা প্রকৃতির এই মূল সত্যকে এড়িয়ে যেতে পারে না, চিত্রে গতি-প্রকৃতি ও প্রাণ অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে।

টাশিজ়ম মতবাদের শিল্পধারা : টাশ্ হল ফরাসি শব্দ। এই মতবাদকে কেন্দ্র করে ক্যানভাসের ওপর রঙ ভরপুর এবং শিল্পীর তুলি চালনার দ্রুত গতিময় ছন্দের প্রকাশ থাকে। চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল—চিত্রসৃষ্টিতে অবাধ স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততায় সম্পূর্ণ অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপের ওপর জোর দেওয়া হয়। চিত্রে বিষয়বস্তু সম্পর্কে টাশিস্ট্ শিল্পীদের কোনো গোঁড়ামি নেই। এই মতবাদের শিল্প আন্দোলনে আমেরিকান শাখা অ্যাকশন পেন্টিং নামে পরিচিত এবং এই মতবাদে নেতৃস্থানীয় শিল্পী ছিলেন জ্যাক্সন পোলক। অ্যাকশন মতবাদের শিল্পীরা প্রাকৃত আকারের হুবহু যথাযথ রূপদানে বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে চিত্র রচনা করেন।

শিল্পী জন মিরো স্বপ্নে দেখা রূপকে চিত্রে সহজভাবে ক্যানভাসে প্রকাশ করেছেন। এই চিত্রশিল্পের ধারা কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না, সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত হয়।

ইতালিতে আরেকটি শিল্পকলা মতবাদ প্রচারিত হয়। সেটি হল ফিউচারিজ়ম। এই শিল্পমতবাদে চিত্রিত হয় আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার শক্তি ও গতিকে উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। শিল্পমতবাদ সম্বন্ধে শিল্পীদের মূল ধারণা—শিল্পের জন্য শিল্প নয়, আদর্শবাদের জন্য শিল্প। এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করে ফিউচারিস্ট্ শিল্পীরা চিত্ররচনা করেছেন। চিত্রে যান্ত্রিক গতিশক্তি ও সংঘাতকে বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত করাই ফিউচারিস্ট শিল্পীদের সাধনা। আর এক ধরনের চিত্র রচনা পদ্ধতি দেখা যায়। একই সারফেসের ওপর বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুকে নানা আভাসে প্রকাশ করা হয়। পেন্টিংয়ে মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাকগ্রাউন্ডে বিষয়বস্তু যা থাকে সেগুলিকে স্বচ্ছ করে আঁকা হয়।

প্রাচীনপন্থী মহান শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি থেকে আধুনিক শিল্পীদের অনুভূতি ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ আলাদা। পরিবর্তনশীল জগতে কোনো প্রাকৃত-অপ্রাকৃত রূপকে সত্যরূপে চিহ্নিত করা যায় না। সে-কারণে শিল্পীদের মতবাদ ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনে শিল্পের বিভিন্ন রূপ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। মনন ধন্দে শিল্পী কোনো বস্তুর সত্যতাকে স্বীকার করতে পারে না।

নেচার‍্যালিজ়ম : প্রকৃতিবাদী শিল্পীরা বলেন, সমগ্র রূপের উৎস হল সূর্য। সূর্যের আলোকে ও উজ্জ্বল রৌদ্রতপ্ত আবহাওয়ায় বিশ্বপ্রকৃতি প্রাণময় খুশিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই চঞ্চলময় সূর্যের আলোছায়ায় প্রকৃতি প্রতিমূহূর্তে রূপান্তরিত হতে থাকে। সেইজন্য সূর্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সারাক্ষণ প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতির কোনো নির্দিষ্ট স্পট্‌কে চিত্রিত করার সময় উদয়-অস্তের পরিবর্তিত বিভিন্ন আলো-ছায়ায় একাধিক চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন। বিভিন্ন আলো-ছায়ায় প্রকৃতির রূপ মূর্ত-বিমূর্ত রূপাকৃতিতে চিত্রে ভাব প্রকাশিত হয়।

এক্সপ্রেশনিজ়ম : অভিব্যক্তিবাদ শিল্পধারায় শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে শিল্পসৃষ্টিতে নিজের অন্তরের আবেগকে অভিব্যক্ত করার প্রয়াস করেছেন। মানুষের দৈন্য অবস্থা, দুর্ভিক্ষ, হানাহানি, কলহ-দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ইত্যাদি অশান্ত চরম আবেগময় অভিঘাত শিল্পে প্রকটরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। মনে তীব্র অনুভূতির প্রবল আবেগে বিষয়ের আকার বেপরোয়াভাবে বিকৃতিরূপে প্রয়োগ করেছেন নরওয়ের শিল্পী এড্‌ভার্ড ম্যুঙ্ক। শিল্পী স্বাধীন নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে মানুষের অস্তিত্বকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেন। এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা সৌন্দর্য, মাধুর্য, লালিত্যকে পরিহার করে মানব জীবনের অস্তিত্বের করুণ, রুক্ষ্ম, কঠোর বাস্তবকে চিত্রে প্রকাশ করেন।

ফোভিজ়ম : এই মতবাদের শিল্পীরা ভাবেন আধুনিক সভ্যতা যদি ক্ষয়প্রাপ্ত ও জরাজীর্ণ হয় তবে আধুনিক শিল্পও জরাগ্রস্ত হয়। সেজন্য শিল্পকে সুস্থ ও প্রাণবন্ত করতে শিশুমনের সারল্য ভাবধারায় দুঃস্থ সংস্কারকে মুক্ত করে আদিমতার সংস্কারকে চিত্রে প্রকাশ করেন। এই চিত্রধারার সব চেয়ে বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন ফ্রান্সের আঁরি মাতিস্। আসলে মাতিস্ পেশায় ছিলেন আইনজীবী। বৃদ্ধ বয়সে হাসপাতালে থেকে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন হওয়ার পর সুস্থ হয়ে যখন বিশ্রাম নেন তখন তাঁর মা তাঁকে রঙের বাক্স-তুলি ও চিত্র শিল্পকলা বিষয়ের কিছু বই দেন। তা থেকেই শিল্পী মাতিস্ নিজেকে খুঁজে পেয়ে একমনে চিত্রচর্চায় সজীব হয়ে ওঠেন এবং সেই থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি চিত্রসৃষ্টিতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ফোভিজ়ম চিত্রধারায় তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনও করেন।

ইউরোপে ঘন ঘন মতেবাদের আন্দোলনে চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পধারার বহু পরিবর্তন হয়েছে।

ইন্‌টিমিজ়ম মতবাদ বা ঘনিষ্ঠতাবাদ : এই মতবাদে চিত্রসৃষ্টিতে শিল্পী সমকালীন বিভিন্ন ইজ়মকে পরিহার করে নিছক আটপৌরে সাধারণ মানুষের জীবনের নিত্যকার বিষয়বস্তু অবলম্বনে ইমপ্রেশনিজ়ম চিত্রশৈলী ধারায় চিত্র রচনা করেন। তাঁদের সৃষ্ট চিত্রে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ-প্রেম-প্রীতির আন্তরিকতা ও অশান্ত ভাব পরিহারে শান্তিভাবের পরিবেশ প্রকাশ পায়।

নেঈভ্ পেন্টিং মতবাদী আর এক শিল্পীদল : ফ্রেঞ্চ পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা পল গোগ্যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আদিম অকৃত্রিমতায় চিত্র রচনা করেন। শিল্পীরা চিত্রকলার অ্যাকাডেমিক কোনো শিক্ষা না নিয়ে শিশুসারল্য সুলভ মনোভাব নিয়ে চিত্র রচনা করতে প্রবৃত্ত হন। এই শিল্পীগোষ্ঠীর পথিকৃৎ হচ্ছেন শিল্পী হেনরি রুস্‌সো। তিনি ছিলেন কাস্টম্‌স বিভাগের কর্মচারী। চিত্ররচনার কোনো কলা-কৌশল, কোনো শিল্পকলা মতবাদের কিছুই তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। শুধু সাদামাটা রঙের প্রয়োগে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রেখার টানে যেসব চিত্র রচনা করেছেন তা নিতান্ত অপুটতায় ও অনভিজ্ঞতায় অত্যন্ত বেপরোয়া, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। অনভিজ্ঞ স্বয়ংসিদ্ধ আর একজন সার্থক শিল্পী মার্ক শাগাল, রাশিয়ায় তাঁর জন্ম, পরে তিনি প্যারিসে আসেন। মতবাদী শিল্পআন্দোলনে লোকশিল্পের শিশুসুলভ অভিব্যক্তিকে চিত্রে রূপ দিয়েছেন। এই শিল্পীগোষ্ঠী ইনস্‌টিংটিভ পেন্টার্স নামে পরিচিত।

যুগের অত্যাধুনিক মতবাদী অদ্ভুত বিকটাকৃতি বীভৎস রূপ শিল্পধারা—চিত্রে তুলির পরিবর্তে আঙুল অথবা হাত দিয়ে ক্যানভাসে বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙ প্রয়োগে চিত্ররচনা করার রীতি পূর্বে কিছু কিছু প্রচলিত ছিল। তবে পরবর্তী আধুনিককালে এমন সব অভাব্য উদ্ভট রীতিতে চিত্র রচনা করেছেন শিল্পীরা, যা আধুনিক যুগচিত্র রূপে প্রচারিত হয়েছে। এই উদ্ভট চিত্ররীতির পথিকৃৎ আমেরিকার শল্পী ক্লাইন। ত্র্যাক্‌শন্ পেন্টিং রীতিতে অনেক সময় দেখা যায়—শিল্পী বিবস্ত্র মডেলের সারা দেহে রঙ লাগিয়ে ক্যানভাসের ওপর শোয়ানো অবস্থায় তার হাত অথবা পা ধরে উল্টে-পাল্টে নিজের ইচ্ছা মতো সারা ক্যানভাসে টেনে গড়িয়ে বিভিন্ন ছন্দে ও গতিতে চিত্র রচনা করেন।

বীভৎসাকৃতি চিত্র রচনায় আর এক শিল্পী হলেন আমেরিকার আধুনিক শিল্পী ফ্রান্সিস বেকন্। তাঁর সমস্ত চিত্রের বিষয়বস্তু পুরুষ-মহিলার সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ। এই সমস্ত চিত্র দেখলে রীতিমতো শরীর ও মনে শিহরণ জাগে। এই ধরনের উদ্ভট বিভ্রান্তিকর নিম্নমানের চিত্ররচনা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনুশীলিত হয়েছে। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার শিল্পী ক্লিফ্‌টন পাঘ, ব্রাজিলের শিল্পী ফেরনান্‌জে ওড্রিওজোলা, ওয়েস্‌লে ডিউক লি, চেকোস্লোভাকিয়ার শিল্পী ক্যারেল ভাকা, জার্মানির শিল্পী (আলট্রামডার্ন) হেইন্‌জ ম্যাক্। ইতালির আলট্রামডার্ন শিল্পী জিউসেপ্পি ক্যাপোগ্রোস্‌সি, জিউসেপ্পি উন্‌সিনি নিকেলকরা লোহার রডকে জ্যামিতিক আকারে বাঁকিয়ে বোর্ড ক্যানভাসের ওপর কম্পোজ করে সিমেন্ট দিয়ে আটকে চিত্রবৎ রচনা করেন। শিল্পী ন্যাটোফ্র্যাসকা তেলরঙ ও ডিসটেম্পার রঙের দ্বারা কম্পোজ করে চিত্র রচনা করেন। শিল্পী গ্যাস্‌টোন বিগ্গিও অনুরূপভাবে ডিস্‌টেমনপার দ্বারা আলংকারিক চিত্র রচনা করেন। নেদারল্যান্ডের শিল্পী ই.ভি. হ্যামেল্ গুয়াচ পদ্ধতিতে চিত্র রচনা করেন। রুমানিয়ার শিল্পী লন্ বিট্যাল্ শুধু তেলরঙের পোঁচে বিমূর্ত রূপে চিত্র রচনা করেন। আমেরিকার শিল্পী স্টুয়ার্ট ড্যাভিস্, রবার্ট মাদারওয়েল্ বিমূর্তাকারে কোলাজ ধরনের সেরিওগ্রাফ চিত্র রচনা করেন। আমেরিকার সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার চার্লস আর্নোল্ড, জ্যান লোগ্‌ম্যান, অ্যালান ম্যাক্ কল্লাম, অ্যান্ ম্যাক্ কয়, জেরি ম্যাক্ মিল্লান, ডি ওয়েইন ভ্যালেনটাইন প্রমুখ শিল্পীরা নিম্নমানের আলট্রা মডার্ন বিমূর্ত রূপ ধারায় চিত্র রচনা করেছেন।

শিল্পীদের পাগলামি-যুক্ত এই সব চিত্ররাজি দেখলে সহজেই দর্শক মানুষের মনে চিন্তার উদ্রেক হয়, মনে হয় বিমূর্তরূপী উদ্ভট এইসব চিত্র কি সত্যই শিল্পীদের চারুকলা প্রতিভার রূপ সাধনার পর্যায়ে পড়ে? নাকি একটা চারুকলাকে অবজ্ঞা করার একটা বড়ো রকমের প্রতারণা—বা অন্য কিছু?

লেখক ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ-এর প্রাক্তনী এবং শিল্পশিক্ষক

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গ

রঙ্গনকান্তি জানা

গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে আড়াই হাজার বছরের কিছু আগে, আনুমানিক ৬২৪ (মতান্তরে ৫৬৩) খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এই সিদ্ধার্থ গৌতম ছিলেন রক্তমাংসে গড়া একজন ঐতিহাসিক মানুষ। রাজবংশজাত সিদ্ধার্থ গৌতম, বুদ্ধত্ব লাভের পর পরিচিত হয়েছিলেন গৌতমবুদ্ধ নামে। তিনি বুদ্ধত্ব লাভের পর ভারতবর্ষের এক অংশ জুড়ে আমৃত্যু তাঁর মত এবং আদর্শ প্রচার করেছিলেন (নির্বাণ আনুমানিক ৫৪৪ খ্রি.পূ., মতান্তরে ৪৮৩ খ্রি.পূ.)। তাঁর কার্যকালে গৌতমবুদ্ধ নিজেকে কোনোভাবেই দৈবী মহিমায় আচ্ছন্ন করেননি। নিজের সাধনার ফলে ইহজীবন সম্পর্কে তাঁর বাস্তব যে উপলব্ধি হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করে নিজের মতাদর্শকে বিন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত মতাদর্শ ছিল তৎকালীন প্রচলিত বৈদিক পূজা-যজ্ঞ-সর্বস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে। সমকালীন ভারতীয় প্রচলিত জ্ঞান-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তাকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করে ইহজীবনে মানুষের এক সাম্যবাদী সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে তিনি বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তায় মানুষের তৈরি করা সমাজ

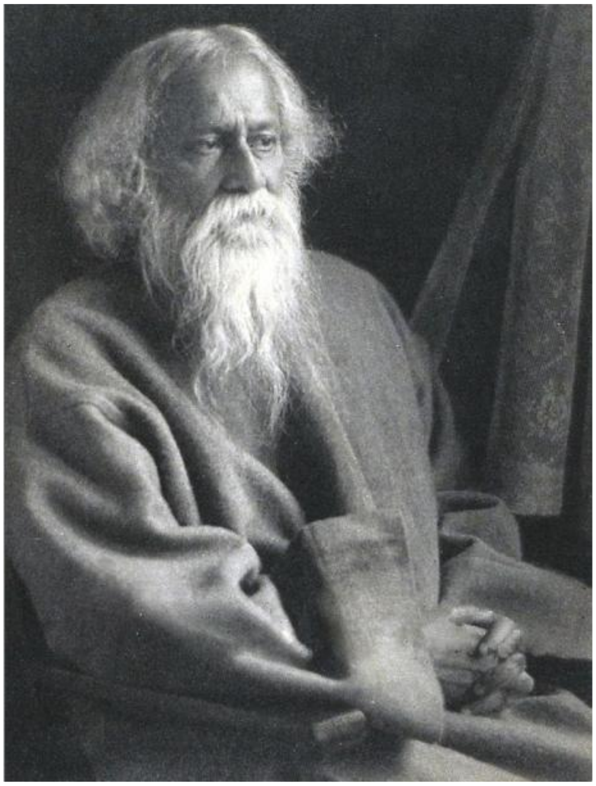

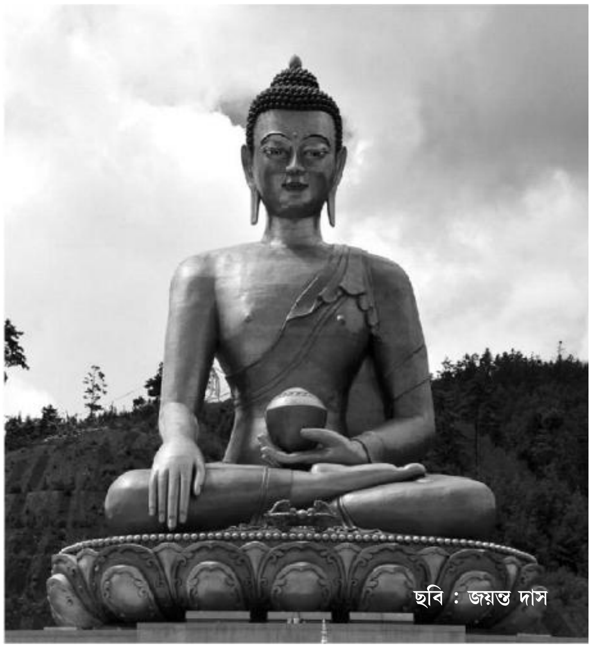

ছবি : জয়ন্ত দাস

ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি জীবিত মানুষ সমান। ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র-ম্লেচ্ছ-এর কোনো ভেদ নেই ও উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ নেই। গৌতম বুদ্ধ নিজেকে যেমন ভগবান বলে প্রচার করেননি, তেমনই অদৃশ্য শক্তিকে ভগবান বলে মেনে নেননি। একথা বলতে দ্বিধা নেই—তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক মানুষ, যিনি সে-সময়ে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে এই সাহস দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও মতাদর্শকে যদি একবাক্যে 'বৌদ্ধধর্ম' বলে নামাঙ্কিত করা হয়, তার প্রচারে জীবৎকালেই তিনি স্বয়ং বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে প্রয়াস করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর মতাবলম্বীরা এই মতবাদকে যে আকার দিয়েছিলেন, তা হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কালপর্বে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত উপমহাদেশের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ বা ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। এই বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্রমশ প্রসার ঘটতে থাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্রে।

এই দীর্ঘ বছরের বিবর্তনে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন যে প্রতিটি যুগের মানুষের মনে ঔৎসুক্য জাগাতে সমর্থ্য হয়েছিল সে-কথা বলাই

বাহুল্য। আমাদের বাংলাদেশের (অবিভক্ত অর্থে) সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের যোগাযোগ দীর্ঘদিনের।[১] গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং বাংলাদেশের ভৌগোলিক খণ্ডে এসেছিলেন কিনা তা এখনও অজ্ঞাত এবং বুদ্ধ-সমকালীন এই মতাবলম্বীদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সঠিক এবং স্পষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও, মৌর্য বংশীয়দের ভারতবর্ষ শাসনকালীন বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের বাংলাদেশের ভৌগোলিক খণ্ডে উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে—মৌর্য সম্রাট অশোকের উদ্যোগে বোধিবৃক্ষ তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সিংহলে পাঠানো হয়েছিল। চীনা পর্যটক ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎ-সিং, সেং চি প্রমুখের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে বাংলাদেশের (অবিভক্ত অর্থে) ভৌগোলিক খণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব এবং প্রসার সম্পর্কে অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়।[২] খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে বাংলাদেশে মুসলিম অধিকারের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের ও সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। তবে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বৌদ্ধ সাহিত্যে, প্রত্ন-উপাদানে ও চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে তার বেশ কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে একথা মানতেই হবে—বুদ্ধ-প্রবর্তিত দর্শনে এবং আদি মধ্যযুগে রূপ নেওয়া বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে অবশ্য কিছু তফাৎ ছিল। তবে মূল আদর্শে বুদ্ধ-ধম্ম-সঙ্ঘ-এর প্রতি প্রতিটি বৌদ্ধ মতাবলম্বীর অটুট আস্থা ছিল। তবে বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ গুহ্যতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে যাবার দরুন এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ক্রমশ লোকপ্রিয়তা হারাতে থাকে। দেশান্তরী হয় ভারতবর্ষের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসরে (স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে) বৌদ্ধ চিন্তন-বৌদ্ধ দর্শন বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব যে রেখেছিল সেকথা বলাই বাহুল্য।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের মনে বৌদ্ধ দর্শন ও স্বয়ং বুদ্ধদেব সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগ্রত হতে থাকে। তবে শ্রীরামপুর-স্থিত খ্রিস্টান মিশনারিরা পালি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তথা বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে বেশ আগ্রহ দেখায়। উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফিলিক্স কেরীর উদ্যোগে পালি ব্যাকরণ লেখার চেষ্টা করা হয়। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ফিলিক্স কেরী স্বয়ং খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম কলকাতা স্থিত জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের প্রাণপুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর দুই পুত্র যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ এবং তরুণ ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে সিংহল সফরে যান ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। লক্ষ্য ছিল বুদ্ধদেব, তাঁর শিক্ষা, তাঁর প্রবর্তিত আদর্শ সম্পর্কে আরও জ্ঞান আহরণ।[৩] দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে বৌদ্ধ দর্শন ও রীতিনীতি প্রয়োগ করেন। অপরদিকে কেশবচন্দ্র সেন বৈশাখী পূর্ণিমাতে বুদ্ধদেবের জন্মতিথির উদ্‌যাপন, বুদ্ধগয়া পরিদর্শন এবং ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ‘শাক্য সমাগম’ নামে এক বার্ষিক সভার প্রচলন করেন। সেই সভায় বৌদ্ধ দর্শন আলোচনা বেশি প্রাধান্য পেত। এই বার্ষিক সভাটি বেশ কয়েক বছর আয়োজিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গী তাঁর দুই পুত্র বুদ্ধজীবন ও দর্শনে প্রভাবিত হয়ে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঠাকুর পরিবার নয়—সেই সময়ের শিক্ষিত বাঙালি মননও ক্রমশ বুদ্ধদেব ও তাঁর দর্শন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠছিল। যে-সব বাঙালি বুদ্ধদেবের জীবন, দর্শন, সাহিত্য, পালিভাষায় ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে অঘোরনাথ গুপ্ত—‘শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণ তত্ত্ব’ (১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ); রাজেন্দ্রলাল মিত্র—‘The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal’ (১৮৮২ খ্রি.); কৃষ্ণবিহারী সেন—‘বুদ্ধচরিত’ ও ‘অশোকচরিত’ (১৮৯২ খ্রি.); দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত’ (১৮৯৯ খ্রি.); সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘বৌদ্ধধর্ম’ (১৯০১ খ্রি.), চারুচন্দ্র বসু—‘ধম্মপদ’ অনুবাদ (১৯০৪ খ্রি.); বিধুশেখর শাস্ত্রী—‘পালি প্রকাশ’ ব্যাকরণ (১৯১১ খ্রি.)। এছাড়াও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন শরৎচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। এছাড়াও ইংরেজ কবি এডুইন আর্নলডের ‘Light of Asia’ (১৮৭৯ খ্রি.) নামে ইংরেজি কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত সমকালীন বাঙালিদের মনে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ‘‘গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘বুদ্ধচরিত নাটক (১২৯২ বঙ্গাব্দ) এবং নবীনচন্দ্র সেনের ‘অমিতাভ’ (১৩০২ বঙ্গাব্দ) কাব্যে শুধু যে তৎকালীন বাঙালি মনই প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়, এসব গ্রন্থ তখনকার জাতীয় চিত্তকে গৌতম বুদ্ধের মহত্বের প্রতি উন্মুখ করে তুলতেও অনেকখানি সহায়তা করেছিল।’’[৪]

বাঙালি জাতির অন্যতম যুগ-পুরুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি যে-সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১৮৬১ খ্রি.), ‘‘সে যুগটাকে বলা যায় ভারতীয় চিত্তবৃত্তির পুনরুদ্দীপনের সন্ধিপর্ব।’’[৫] উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয় মন ও মনন এক নতুন মাত্রায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। স্বদেশের মন ও মনন তার নিজস্ব অধিকার খোঁজার দিকে ক্রমশ উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে। উনিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি ভারত উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সিপাহী মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রি.) ঘটে যায়। এই মহাবিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা নির্মমভাবে দমন করা হলেও ভারতীয় মন ও মনন, স্বদেশে নিজেদের অস্তিত্বকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের জন্য, অধিকারের প্রশ্নে এক বিশেষ বোধে দানা বাঁধতে থাকে। যা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী বোধের রূপ নেয়। কলকাতা-স্থিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এই প্রভাবের বাইরে ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রি.) বছর কয়েক পরে জন্মগ্রহণ করলেও এবং তাঁর বাল্য-কৈশোর-যৌবন প্রারম্ভ ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিপুষ্ট হলেও অগ্রজ দাদাদের—যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-এর কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে, বহির্জগতের আলোড়ন তাঁকেও স্পর্শ করে। পরাধীনতার গ্লানি কী, তাঁর কাছে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সুস্পষ্ট হয়। তাঁর প্রারম্ভিক সাহিত্য রচনা থেকে তার আঁচ পাওয়া যায়। মানবসভ্যতায় জাতিতে জাতিতে ক্রমবর্ধমান হানাহানি, লোভ-হিংসা, ক্ষমতার অপব্যবহার যৌবনেই তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করে। এই মানসিক সংকটে তিনি খুব সম্ভবত বুদ্ধজীবন ও দর্শনে আকর্ষিত হন। ঠাকুরবাড়ির, বিশেষত, পিতা দেবেন্দ্রনাথ, অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে সিংহল যাত্রা (১৮৬৯ খ্রি.) এবং তাঁর লেখা আত্মজীবনী ‘জীবন স্মৃতি’[৬] থেকে জানা যায় প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও গবেষক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৯১ খ্রি.) সঙ্গে পারিবারিক যোগযোগ তাঁকে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, বুদ্ধ দর্শন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। যার প্রভাব পরবর্তীকালে আমৃত্যু তাঁর জীবন ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একাই ছিলেন অবিভক্ত বাংলাদেশে

বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার এক অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান বিশেষ। একদিকে যেমন রবীন্দ্র সাহিত্য, রবীন্দ্র দর্শন বাঙালির জনগণমনকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁর দীর্ঘ জীবন ও সৃষ্ট সাহিত্যেও বুদ্ধজীবন, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছিল, সেকথা অনস্বীকার্য।

বুদ্ধজীবন, বুদ্ধ-নির্দেশিত শিক্ষা, বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের ওপর পড়েছিল, যাকে দুটি পর্বে আলোচনা করা যায়—যথাক্রমে তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অন্যান্য কার্যকলাপে।

বুদ্ধপ্রসঙ্গ-যুক্ত রবীন্দ্র সাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথাক্রমে—কবিতা, গদ্য (প্রবন্ধ-নিবন্ধ-উপন্যাস) ও নাটক (কাব্যনাটক, নৃত্যনাটক)। বুদ্ধজীবনী ও বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কিত প্রথম রচনা কবিতা। 'কথা' সংকলনের বেশ কিছু কবিতা বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধভারতের অন্যান্য কাহিনির আশ্রয়ে গড়ে তোলা। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (১৮৮২ খ্রি.) নামক গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে—বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ অবশ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে আসার পর। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এই গ্রন্থটির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে (৩ মার্চ, ১৮৯৩ খ্রি.) জানান (ছিন্নপত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ১৬)। চিঠি থেকে মনে হয় গ্রন্থটির গুরুত্ব তাঁর কাছে অপরিসীম ছিল। 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি হল যথাক্রমে—'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', বস্ত্রাবদান কথাবৃত্ত—অবদান শতক (৫ কার্তিক, ১৩০১ বঙ্গাব্দ)[৭]; 'মস্তক বিক্রয়', অজ্ঞাতকৌন্‌ডিল্য জাতক—মহাবস্তু অবদান (২১ কার্তিক, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ)[৮]; 'পূজারিণী', শ্রীমতী কথাবৃত্ত—অবদান শতক (১৮ আশ্বিন ১৩০৬ ব.)[৯]; 'অভিসার', উপগুপ্তনম কথাবৃত্ত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা (১৯ আশ্বিন ১৩০৬ ব.)[১০]; 'পরিশোধ', কনবের জাতক এবং শ্যাম্য জাতক-মহাবস্তুবদান (২৩ আশ্বিন ১৩০৬ ব.)[১১]; 'সামান্যক্ষতি', শ্যামাবতী জাতক কথাবৃত্ত দিব্যাবদানমালা (২৫ আশ্বিন ১৩০৬ ব.)[১২], 'মূল্যপ্রাপ্তি' পদ্মাবদান কথাবৃত্ত অবদান জাতক (২৬ আশ্বিন ১৩০৬ ব.)[১৩]; 'নগরলক্ষ্মী', সুপ্রিয়া কথাবৃত্ত কল্পদ্রুম বদান-অবদান জাতক (২৭ আশ্বিন ১৩০৬ ব.)।[১৪] 'কথা' কাব্য সংকলনে বৌদ্ধ কাহিনি ভিত্তিক কবিতাগুলি যে-সময় রচিত অর্থাৎ ১৮৯০-৯৬ খ্রি. যখন রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধ আপ্লুত ছিলেন। এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের কাছে বৌদ্ধ ভারতের সমুজ্জ্বল কাহিনিগুলিকে প্রসারে উদ্যোগী হন। স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যও যে বিস্মৃতির অন্ধকার গর্ভে চলে গিয়েছে, জাতীয়তাবাদী মননের জাগরণে তার ব্যবহার তিনি বিশেষভাবে করেছিলেন। বৌদ্ধ শিক্ষার ক্ষমা, দয়া, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা বৌদ্ধ কাহিনি অবলম্বনে এই কবিতাগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের বাঙালি মন ও মনন ভারত ইতিহাসের পুনঃনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিল। তখন মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন স্বদেশীয় সভ্যতার স্বরূপকে প্রকৃত অর্থ জানা, এবং ঐতিহ্যের গৌরবকে স্বদেশের বলে অনুভব করা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই বুঝতে পেরেছিলেন স্বদেশের ইতিহাসের জন্য পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির মুখাপেক্ষী হলে চলবে না। তিনি ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় প্রকৃত ভারতীয় বিশ্লেষত্মক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আহ্বান করেছিলেন। 'কথা' সংকলনের কবিতাগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ গৌতম বুদ্ধ, তাঁর দর্শন, বিশ্ব মানবসভ্যতার প্রেক্ষাপটে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবস্থান ইত্যাদি বিষয়কে নিজস্ব চিন্তায় রেখে বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন, যথাক্রমে—পুনশ্চ কাব্য সংকলনে 'শাপমোচন' যার কথাবৃত্ত মহাবস্তু অবদানের কুশজাতক (পৌষ, ১৩৩৮ ব.)[১৫]; 'পরিশেষ' কাব্য সংকলনের—সিয়াম (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রি.),[১৬] বুদ্ধ জন্মোৎসব (২১ ফাল্গুন, ১৩৩৮ ব.)[১৭], বোরোবুদর (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রি.)[১৮], বুদ্ধদেবের প্রতি (২৪ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রি.)[১৯], প্রার্থনা (২৯ জুলাই, ১৯৩৩ খ্রি.)[২০], সকল কলুষতামসহর (বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩৪৪ ব.)[২১]; পত্রপুট কাব্য সংকলনে, কবিতা সংখ্যা ১৭ (পৌষ ১৩৪৪ ব.)[২২], নবজাতক কাব্য সংকলনে, বুদ্ধভক্তি (৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ খ্রি.)[২৩] এবং 'জন্মদিনে' কাব্য সংকলনে কবিতা নং ৬ (বৈশাখ, ১৩৪৭ ব.)।[২৪] এখানে মনে রাখতে হবে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব মানবসভ্যতার প্রতি বুদ্ধদেব ও তাঁর শিক্ষাকে সভ্যতার সুস্বার্থে উপস্থাপনে প্রয়াসী হন।

'কথা' কাব্য সংকলনে বৌদ্ধ কাহিনি ভিত্তিক কবিতাগুলি যে-সময় রচিত অর্থাৎ ১৮৯০-৯৬ খ্রি. যখন রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধ আপ্লুত ছিলেন। এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের কাছে বৌদ্ধ ভারতের সমুজ্জ্বল কাহিনিগুলিকে প্রসারে উদ্যোগী হন। স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যও যে বিস্মৃতির অন্ধকার গর্ভে চলে গিয়েছে, জাতীয়তাবাদী মননের জাগরণে তার ব্যবহার তিনি বিশেষভাবে করেছিলেন।

তাঁর রচিত নাটকে, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ দর্শনের বেশ কিছু বিষয়কে সংযুক্ত করেছিলেন—যেমন সাম্য, শান্তি, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা। মানব সভ্যতার অসুখ—যথাক্রমে অস্পৃশ্যতা, বর্ণবিদ্বেষ, জাতপাতের দ্বন্দ্ব, শ্রেণিদ্বন্দ্বকে সমূলে উৎপাটন করে এক আদর্শ সমাজের স্বপ্নও দেখেছিলেন। বুদ্ধ নীতিশিক্ষার গুণগুলি দিয়ে আদর্শ সমাজের চিত্রপট সাজিয়েছিলেন তাঁর নাটকগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি হল যথাক্রমে—মালিনী, আখ্যান উৎস মহাবস্তু অবদান (১৮৯৬ খ্রি.) রাজা, কথা উৎস কুশজাতক মহাবস্তু অবদান (১৯১০ খ্রি.), অচলায়তন, পঞ্চক কথাবৃত্ত দিব্যাবদান মালা (১৯১২ খ্রি.), গুরু, আখ্যান উৎস পঞ্চককথাবৃত্ত, দিব্যাবদানমালা (১৯১৮ খ্রি.) (গুরু ও অচলায়তন নাটকদুটিতে একই আখ্যান উৎস ব্যবহার করা হয়েছে); অরূপরতন-কুশজাতক, মহাবস্তু অবদান (১৯২০ খ্রি.); শোধবোধ নাটকে প্রাসঙ্গিক কিছু উক্তি (১৯২৬ খ্রি.); নটীর পূজা—শ্রীমতী কথাবৃত্ত অবদানশতক (১৯২৬ খ্রি.) (পূজারিণী কবিতা ও এই নাটকের আখ্যান উৎস এক)। শাপমোচন—কুশজাতক মহাবস্তু অবদান (১৯৩১ খ্রি.) (শাপমোচন, রাজা, অরূপরতন নাটক তিনটির আখ্যান সূত্র এক, তবে নাটক তিনটির গল্পের বিস্তারে ভিন্নতা আছে); চণ্ডালিকা—শার্দুল কর্ণাবদান কথাবৃত্ত অবদান শতক (১৯৩৭ খ্রি.); শ্যামা—আখ্যান উৎস কনবের জাতক এবং শ্যাম জাতক—মহাবস্তু অবদান (১৯৩৯ খ্রি.)। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে রাজর্ষি উপন্যাস (১৮৮৭ খ্রি.) এবং বিসর্জন নাটক (১৮৯০ খ্রি.) একই কাহিনিতে রচনা করা হলেও, দুটির আখ্যানে কোনো বৌদ্ধ কথাবৃত্ত উৎস নেই। তবে এই দুটি রচনায় অহিংসা ও জীবহত্যার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ নীতিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন আখ্যান রচনায়।

বুদ্ধ বিষয়ক তাঁর রচিত প্রবন্ধে, নিবন্ধে এবং কিছু কিছু শীর্ষক

বিহীন গদ্যাংশে, রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, তাঁর কার্যকলাপ, তাঁর দর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন, যার থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি নিজে এই মানুষটিকে, তাঁর কার্যকলাপ ও বাণীকে কতটা আত্মস্থ করেছিলেন এবং নিজের কার্যকলাপে তার সঠিক প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের গূহ্য গূঢ় তত্ত্বে বা বিশ্লেষণে তিনি কখনোই যাননি। তিনি বলেছেন—''ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন...।''[২৫]

আবার তিনি একথাও বলেছেন— ''বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ, অহংকার ত্যাগ, ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা...।''[২৬] রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের সফলতাকে দেখেছেন এইভাবে : ''মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন।''[২৭] বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বলেছেন—''বৌদ্ধধর্মের তিনটি মুখ—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ, তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে।''[২৮] বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে তিনি মনে করতেন—''বৌদ্ধ ধর্ম যে কী, তাহা নির্ণয় করিবার বেলায় তাহার সচলতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম সংসারের অতীত কোনো পূজনীয় সত্তাকে স্বীকার করে না একথাকে আমরা বৌদ্ধ ধর্মের নিত্য সত্য বলিয়া মানি না—এবং বৌদ্ধধর্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে একথাও তাহার চিরসত্য নহে। বৌদ্ধধর্ম এখনো মানুষের জ্ঞান ভক্তি কর্মের মধ্যে আপনার অমর সত্যকে বাধামুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য-অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্মের গম্য স্থান যেখানে।[২৯] গৌতন বুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাশীলতার প্রকাশ দেখা যায়—''আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বারবার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।''[৩০] বৌদ্ধধর্মের যে বিষয়গুলি রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিশেষভাবে আলোকিত করেছে সেগুলি হল যথাক্রমে অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সব মানুষের মধ্যে সমতা। প্রধানত এই কটি নীতিই বৌদ্ধ সংস্কৃতির ও রবীন্দ্র সংস্কৃতির মধ্যে গভীর যোগসূত্র রূপে কাজ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের গূঢ় অন্তঃস্থলে তাঁর সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যাননি। তিনি মূলত রক্তমাংসের বুদ্ধদেবকে, তাঁর অষ্টপন্থাকে নিজের সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে মাত্র দুবার বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করেছিলেন, যথাক্রমে ১৯০৪ এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। গৌতম বুদ্ধের মতো একজন ঐতিহাসিক পুরুষের কর্মভূমিতে স্বয়ং তাঁর স্পর্শকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ''একদিন বুদ্ধগয়া গিয়েছিলাম মন্দির দর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল—যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন আমি কেন জন্মাইনি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করিনি?''[৩১] গৌতম বুদ্ধের জীবনের দুটি উল্লেখযোগ্য তিথি—যথাক্রমে বৈশাখী পূর্ণিমা, যা তাঁর জন্মতিথি, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ তিথি এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমা—যা 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' তিথি রূপে পরিচিত, রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্মরণীয় বলে মনে করেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে তিনি শান্তিনিকেতনে ধর্মচক্র প্রবর্তনোৎসব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করেন। এই দিনটির গুরুত্ব ছাত্র ও আশ্রমিকদের মধ্যে প্রসারের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ। 'বুদ্ধ পূর্ণিমা'-র বিশেষ গুরুত্বকে খুব সম্ভবত স্মরণ করে রচনা করেন 'বুদ্ধজন্মোৎসব' কবিতাটি (২১ ফাল্গুন, ১৩৩৩ ব.)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর বিশ্বের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ক্রমশ জটিলতার মেঘ জমতে থাকে। এই হানাহানিক্লিষ্ট মানবসভ্যতায় বুদ্ধের পুনরাগমনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের আর্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর তৈরি করা ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বৌদ্ধ সংঘ ও শীলব্রতকে অনুসরণ করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে অবলম্বন করেছিলেন দেশীয় তপোবনের শিক্ষাদর্শকে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''আজ বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে একে অর্পণ করে দেব। ...এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতিক্রমে বরণ করেছি। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধি রূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন।... বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীন দেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নাই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্য সাধনার ক্ষেত্রকে আবার গড়ে তুলতে হবে।''[৩২] তিনি বিশ্বভারতীর সংগঠনে ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি এবং প্রকরণকে অবলম্বনের কথা ভেবেছিলেন। শান্তিনিকেতনে পালি ভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীকে তাঁর উৎসাহে সিংহল ও মায়ানমারে বৌদ্ধ পুথি সংগ্রহে প্রেরণ করা হয়। বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মধর মহাস্থবিরকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বক্তৃতা দেবার জন্য সিংহল থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সিলভাঁ লেভিকে তাঁর উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হয়।

গৌতম বুদ্ধের প্রতি মুগ্ধতা ও অনুরাগ তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর রচিত কবিতা, নাটক, কাহিনি ও প্রবন্ধে-নিবন্ধে। রচনাগুলি সমস্তই মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহারে। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধজীবন ও আদর্শ উপলব্ধি একান্ত নিজস্ব বিশ্লেষণে। তিনি এই ঐতিহাসিক মানুষটিকে বিভিন্ন অভিধায় অলংকৃত করেছেন—মহাপ্রাণ, দানবীর, মহাভিক্ষু, করুণাঘন, অনন্তপুণ্য ইত্যাদি। তবে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের বিশ্লেষণে গুরুত্ব দেখাননি, যেমনটি দেখা যায় 'শূন্যতামার্গী নির্বাণ সম্পর্কে'। বৌদ্ধধর্মের মূল শিক্ষাকে আধুনিক মানবসভ্যতায় জাতিতে জাতিতে হানাহানি, শ্রেণিতে শ্রেণিতে দ্বন্দ্ব, বর্ণে বর্ণে সংঘাত—এইসব অসুখগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধশিক্ষার অমূল্য প্রাসঙ্গিকতা, তাঁর মতো করে আর কেউ অনুভব করেছিলেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি ঠিকই, তবে তিনি গৌতম বুদ্ধকে বিশ্ব মানব সভ্যতার পরিত্রাতা হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরই ভাষায়—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।।

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
করো ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চির মধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন, ধরনীতল কর কলঙ্কশূন্য।

—বুদ্ধজন্মোৎসব, ২১ ফাল্গুন, ১৩৩৩ ব.

তথ্যসূত্র

১. মজুমদার, আর.সি., (সম্পা.), *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, ভল্যুম ১, ঢাকা, ১৯৪৩, পৃ. ৪১১-২৫
২. প্রাগুক্ত
৩. চক্রবর্তী সুমিতা, *আমার রবীন্দ্রনাথ : গ্রহণে বর্জনে*, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৩
৪. সেন, প্রবোধচন্দ্র, 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি', *রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধচর্চা*, হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী (সম্পা.), কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১০
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা , ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯৭-৯৮
৭. বসু, সুজিত ও অন্যান্য (স.), *রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬০-৬২
৮. তদেব, পৃ. ৮৭-৮৯
৯. তদেব, পৃ. ৬৩-৬৬
১০. তদেব, পৃ. ৬৭-৬৯
১১. তদেব, পৃ. ৭০-৭৭
১২. তদেব, পৃ. ৭৪-৮২
১৩. তদেব, পৃ. ৮৩-৮৪
১৪. তদেব, পৃ. ৮৫-৮৬
১৫. তদেব, পৃ. ৯০-৯৪
১৬. তদেব, পৃ. ৫৭-৫৯
১৭. তদেব, পৃ. ৪৮
১৮. তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫
১৯. তদেব, পৃ. ৫৩
২০. তদেব, পৃ. ৯-১০
২১. তদেব, পৃ. ৫০
২২. তদেব, পৃ. ৯৭-৯৮
২৩. তদেব, পৃ. ৯৫-৯৬
২৪. তদেব, পৃ. ৯৯
২৫. তদেব, পৃ. ৪১
২৬. তদেব, পৃ. ৪৩
২৭. তদেব, পৃ. ৪৮
২৮. তদেব, পৃ. ২৬
২৯. তদেব, পৃ. ৩১
৩০. তদেব, পৃ. ১১
৩১. তদেব, পৃ. ১১
৩২. 'বিশ্বভারতী', রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সং), একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৭৫২

---

*বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথির অধ্যক্ষ

With best compliments of

SUPARNA TRADING

CONTRACTOR & EARTHMOVERS

REGD. OFFICE : 2/18, Derojio Path, SAIL Co-Operative
City Centre, Durgapur-713216, Phone : (0343) 2566021

CITY OFFICE : Urvashi Commercial Centre, 1st Floor, Unit No. 017
Bengal Ambuja Housing Dev. Ltd., City Centre, Durgapur-713216
Mobile : 93337 46254

Sl. No. 81

With best compliments of

SRB REFRACTORIES ENTERPRISE LTD.

61, Kankulia Road, Flat No. 202B, 2nd Floor, Kolkata-700 029, WB
Mob. 9832195056, 9830472172, E-mail : sgupta.srbc@gmail.com

Specialist in

MAKING ALL TYPES OF BAKING, RE-BAKING FURNACES, TUNNEL, GRAPHITISATION UNIT, CIVIL, ANNUAL MAINTAINANCE OF ANY TYPES OF FURNACES, CASTING REFRACTORY SPECIALIST.

Sl. No. 82

ছড়া-কবিতায় শিশু-কিশোরদের বারোমাস্যা

বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

আজকের শিশু-কিশোররা আগামী দিনের দেশের, বিশ্বের ইতিহাস-স্রষ্টা। দেশ-চালানোয়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সংগীত, খেলাধূলা, আঁকা, অভিনয়—সব দিকে তারা হবে সেরা রত্ন। শিশু-কিশোরদের অসীম সুপ্ত প্রতিভা, প্রতিশ্রুতি আগামীতে দেশকে, বিশ্বকে করবে ঝলমলে। এই শিশু-কিশোরদের নানা দিক—সমস্যা, বঞ্চনা, প্রাপ্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা সব নানা কবিতা ও ছড়ায় কীভাবে বাণীরূপ লাভ করেছে তা দেখা যেতে পারে এই ছোট্ট প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের নিয়ে বলেছেন ‘ইহাদের করো আশীর্বাদ/ধরায় উঠেছে ফুটে/শুভ্র প্রাণগুলি/নন্দনের এনেছে সংবাদ।’ কচিকাঁচাদের ওপর কবির গভীর ভরসা। তাদেরই তিনি প্রয়োজনে বড়োদের আঘাত দিয়ে ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে বলেছেন। তিনি বলেছেন—‘ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা/ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,/আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।’ ছোট্ট খোকার কুকুরছানা ও টিয়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা স্পন্দিত হয়েছে তাঁর ‘সমব্যথী’ কবিতায়—‘যদি খোকা না হয়ে/আমি হতেম কুকুরছানা—/তবে পাছে তোমার পাতে/আমি মুখ দিতে যাই ভাতে/তুমি করতে আমায় মানা?/সত্যি করে বল্/আমায় করিস নে মা, ছল—/বলতে আমায় ‘দূর দূর দূর।/কোথা থেকে এল এই কুকুর?’/যা মা, তবে যা মা,/আমায় কোলের থেকে নামা।/আমি খাবো না তোর হাতে/আমি খাবো না তোর পাতে।’ খোকা টিয়ে পাখি হলেও খোকাকে মা খাঁচায় রাখতো। শেকল কাটতে চাইলে মিলত শাসন, সাজা। তাই টিয়া পাখির প্রতি এক গভীর সমব্যথায় খোকা সোজা বনে চলে যেতে চাইছে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর এক সেরা মজার ছড়া ‘কাজের ছেলে’তে সাবলীল ও সহজভাবে শিশুমনস্তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। দুটো ছেলের খেলা দেখতে দেখতে ‘কাজের ছেলে’ জিনিসের ফর্দ মুখস্ত করতে করতে যাচ্ছিল, কীভাবে ফর্দ ভুলে গিয়ে সে দোকানদারকে কী বলছে দেখা যাক—‘দাদখানি বেল/মুসুরির তেল/সরিষার কই/চিনি পাতা চাল, দুটো পাকা ডাল/ডিমভরা দই।’ (আসল ফর্দটা ছিল—দাদখানি চাল মুসুরির ডাল/সরিষার তেল, দুটো পাকা বেল/চিনিপাতা দই/ডিমভরা কই।)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনেক কবিতা কচিকাঁচাদের অসীম শক্তি ও কর্মক্ষমতায় মুখর। ‘ছেলের দল’ কবিতায় তিনি ছেলেরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তা বলেছেন। তিনি লিখেছেন—‘পদ্মকোষের বজ্রমণি/তারাই ধ্রুব সুমঙ্গল/আলাদিনের মায়ায় প্রদীপ/এই আমাদের ছেলের দল।’ শিশুদের হাসি যেমন খুশির, আনন্দের ঝরনা, কান্নাতেও বাসন্তী ভোরের বাতাস। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন, ‘হাস্যতে যত শোভা তত শোভা রোদনে/বিজয়ায় যত ধুম তত ধুম বোধনে।’ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পদ্য ‘আমার পণ’-এ শিশুর মানস-গঠনের সুর সুন্দরভাবে বেজে উঠেছে—‘সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। /আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে/আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।...’

কুসুমকুমারী দাশের ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে কবির চাওয়া কাজে নিবেদিত, হাসিমুখে প্রাণবন্ত ছেলের মূর্তি—‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?/মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন/‘মানুষ হইতে হবে’—এই যার পণ।’ কবি জসীমুদ্দিন শিশুমনের আবেগ অনুভূতি হাসিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলে দিয়েছেন তাঁর ‘এত হাসি কোথায় পেলে’ ছড়াতে—‘এত হাসি কোথায় পেলে/এত কথার খলখলানি/কে দিয়েছে মুখটি ভরে/কোন বা গাঙের কলকলানি।’

খোকাখুকিদের সাথে পশু-পাখিদের প্রাণের সম্পর্ক। খুকি একটা কাঠবেড়ালির সাথে প্রাণখুলে কথা বলে। শিশুদের এই পাখিদের সাথে কথা বলার ভঙ্গিটি সাবলীলতার মুন্সিয়ানা দিয়ে হাজির কাজী নজরুলের ‘খুকী ও কাঠবেড়ালি’ কবিতায়—‘কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?/গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?/বেড়াল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?/ডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক/খাও একা পাও যেথায় যেটুক!/বাতাবি-নেবু সকলগুলো/একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!/তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও?/ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!’

কুসুমকুমারী দাশের ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে কবির চাওয়া কাজে নিবেদিত, হাসিমুখে প্রাণবন্ত ছেলের মূর্তি—‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?/মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন/‘মানুষ হইতে হবে’—এই যার পণ।’

অজিত দত্তের ‘আসল কথা’ ছড়াতে একটা শিশুর মধ্যে দুষ্টুমি, শান্তভাব, কান্না হাসি, জেদ, বায়না শিল্পসম্মতভাবে টইটুম্বুর। দেখা যাক কটা লাইন—‘একটি আছে দুষ্টু মেয়ে,/একটি ভারি শান্ত,/একটি মিঠে দখিন হাওয়া,/আরেকটি দুর্দান্ত।.../আসল কথা দুটি তো নয়/একটি মেয়েই মোটে/কান্না হাসির লুকোচুরি/লেগেই আছে ঠোঁটে।’ বেশিরভাগ ছড়াতেই খোকাদের দাপুটে উপস্থিতি, খুকিদের কথা কম। এই কথাই বেশ সাবলীলভাবে সরল দে ‘খুকুর জন্য’ ছড়াতে

লিখেছেন—'একটি দুটি ছড়ায় খুকু,/শ্বশুরবাড়ি যায়,/হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম/গয়না বাজে হায়!/ওমা, খুকুর ভাবনা ভেবে/মুখ কেন থমথম,/না ভেবো না মাউস হাতে/লিখছে সে ডটকম।/খোকাখুকু ভাগ করে নেয়/টফি লজেনচুস,/তারপরে কি? রকেট চড়ে/ওই দুটিতেই হুস্।' অনেক ছেলেমেয়ের পড়াশুনায়, বিশেষ করে, অঙ্কে ভারি আতঙ্ক। এই সহজ সত্যটি স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছন্দমুখর করেছেন তাঁর 'কারণ কী' ছড়াতে—'এটা কেন হয় দাদা, এটা হয় কেন?/অঙ্কের নামে পিলে চমকায় হেন?/অথচ অঙ্ক ক্লাস শেষ হল যেই/বাস, আর কোনখানে কোনো গোল নেই।/এটা হয় কেন দাদা, এটা কেন হয়?/ অঙ্কের নামে কেন রাজ্যের ভয়?'

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অশেষ প্রতিভা, সুপ্ত ক্ষমতা। একথা অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় ভাষায় স্পন্দিত হয়েছে গোলাম মুস্তাফার 'কিশোর' শীর্ষক কবিতায়। কটা লাইনে চোখ রাখা যাক : 'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে/ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে/আকাশ আলোয় আমরা সূত, নতুন বাণীর অগ্রদূত/কত কি যে করব মোরা নাই কো তার অন্ত রে।'

শঙ্খ ঘোষ শিশুর মধ্যে জেদ, কান্না আবার অনেক ঝক্কি-চাপ সহ্য করার মতো শান্ত লক্ষ্মীরূপ দেখেছেন। তাঁর 'আমন' ছড়ার পত্রে একথা তিনি একেবারে উপুড় করে ঢেলে দিয়েছেন—'আমন বড় জেদী/একটু এদিক ওদিক হলেই চ্যাঁচায় গগনভেদী/আমনটা কি লক্ষ্মী/ইস্ ভারি তো! সমস্ত দিন/লক্ষ রকম ঝক্কি।' অভাব-ক্লিষ্ট শিশু-কিশোররা বাধ্য হয়ে পড়াশুনা, খেলাধূলার জগৎ থেকে দূরে থাকে। দুমুঠো অন্নের জন্য কাজের মরুভুমিতে তাদের সাধ-আহ্লাদ ঘাসের মতো শুকিয়ে যায়। সেই সত্যটাই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে, সাবলীল ভঙ্গিতে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার লিখেছেন তাঁর 'জারি হল ডিক্রি কৈশোর বিক্রি' ছড়াতে। ছড়ার ঝর্ণাধারায় ডুব দেওয়া যাক—'কোথা গেল সকালের আলোকিত দিনটাই?/রাশি রাশি মজা হাসি তাক ধিন ধিন তাই/পেটে ক্ষুধা মনে শুধু বাঁচবার চিন্তাই/শৈশব বিক্রি/সব হল ছিনতাই/শৈশব হল চুরি, কৈশোর বিক্রি/সীমাহীন দারিদ্র্যে জারি হল ডিক্রি/শৈশব বিক্রি, কৈশোর বিক্রি।'

সুতপা ঘোষের 'দোকানের ছেলেটা' ছড়ায় শিশুশ্রমিকের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের ফুলকি বেশ ঝলসে উঠেছে—'চায়ের দোকানে মোছে টেবিল/বানায় গরম চা/গামছা গায়ে খালি পায়ে/ঐ ছোট্ট ছেলেটা/কচি হাতে ধোয় কাপ/কম পায় খেতে/ভুল হলে আছে বকা/মারও পিঠেতে।' ছড়ার শেষ চার লাইনে বক্তব্য গভীর—'আমরা সবাই বড়রা/যে দেখেও কি দেখি?/সবাই স্কুল না গেলে প্রগতি যে মেকি।' ছোট্ট শিশুর কান্না-হাসিতে যে স্বর্গীয় মাধুর্য, পবিত্রতা ও বিরল প্রাপ্তি তা প্রদীপ কুমার সামন্তের 'শিশুর হাসি' ছড়াতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে—'ছোট্ট শিশুর কান্না ঝরে/পান্না হীরে মতি/মধুর ছোঁয়া চুমুতে থাকে/দেবলোকের জ্যোতি।/ফুলের মতো মনটা শিশুর/পবিত্রতায় ভরা/মিষ্টি মধুর কথার ডালি/সতেজ মিঠে কড়া। হা-ভাতে, হতদরিদ্র পরিবারের দুই বোন জুঁই মালতী। পায়নি পড়ালেখার সুযোগ। তারা বনে কাঠ কুড়ায়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও শিশুদের এরিকম যন্ত্রণাজর্জর জীবন যাপন করতে হয়। কত দুঃখের, লজ্জার এ ঘটনা। এমন মর্মন্তুদ ছবিই এঁকেছেন সনৎ বসু তাঁর 'জুঁই মালতী' ছড়ায়। প্রথম চারটি লাইনে নজর রাখা যাক—'জুঁই মালতী দুই ভগিনী বনে কুড়োয় কাঠ/অভাব ঘরে নিত্যসাথী, বাইরে ধূ ধূ মাঠ/জুঁই মালতী আঁধার ঘরে অবহেলায় থাকে/উপোস পেটে জ্বলে আগুন কে দেবে ভাত তাকে।'

শিশুরা আজ শৈশব ছাড়া। বাবা-মা'র সুইচ-টেপা পুতুলের মতো তাদের ছুটতে হচ্ছে শুধু পড়ালেখার, নানা কোচিং-এর মিসদের কাছে। এই বাস্তব সত্যটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে অশোক কুমার ঠাকুরের 'শিশু' ছড়ায়। দেখা যায়, চারটি লাইন—'উড়বে কখন ছুটবে কখন/ধরা বাঁধা রুটিন শুধু/হাসতে মানা কাঁদতে মানা/শৈশব আজ মরুর ধূ ধূ।' জ্যোতির্ময় দাসের 'ছেলেবেলা' ছড়াতে হাল আমলের শিশুদের একবুক যন্ত্রণা বর্ষার জলের মতো উপচে পড়ছে—'দাদু দিদা কাছে নেই/হাসিখুশি নাচে নেই/ছোটাছুটি আজ নেই/পড়া ছাড়া কাজ নেই/ হাসিমাখা সাজ নেই/ছেলেবেলা আজ নেই/আর যা যা চাই নেই/'ছেলেবেলা' তাই নেই।' চরম অভাবগ্রস্ত পরিবারের শিশুরা ক্যালেন্ডারে নানা তারিখ দেখ, কিন্তু দেখতে পায় না দাদার চাকরি, দিদির বিয়ে কবে হবে সেই তারিখ। রস-সমৃদ্ধ ভাষায় শ্যামাপদ রায় এই বাস্তব সত্যটি ঝংকৃত করেছন তাঁর 'কথাটা হল ইয়ে' ছড়াতে। নয় থেকে বারো লাইনে চোখ বুলানো যাক : 'কিন্তু তবু একটা কথা বলতে হবে সাবধানে/ক্যালেন্ডারে পাবে না তো জানতে সেটা মন টানে/কোন্ কথাটা? বলেই ফেলি—কথাটা হল ইয়ে/দাদার কবে চাকরি হবে দিদির কবে বিয়ে।' নীতীশ চৌধুরীর 'ছোট্ট খোকা' ছড়াতে শিশুশ্রমিকের যন্ত্রণা ও মানসিক কষ্টের ধারায় পাঠকরা ডুবে যান। দেখি ছড়াশিল্পী কী বলছেন—'ছোট্ট খোকার বয়স আট/অনাথ সে তাই/চুকে গেছে/লেখাপড়ার পাট/পেট ভরাতে খোকা এখন/রেল বাজারে খাটে/জীবন থেকে হারানো সুখ/মাত্র বয়স আটে।'

ঝর্ণা মুখোপাধ্যায়ের 'ভোরের আলো' ছড়াতে শিশু শ্রমিকের কষ্ট-ক্লিষ্ট জীবন সাবলীলভাবে চিত্রিত হয়েছে—'সেই ছেলেটা ভোরের আলো ছুঁয়ে/বাবুর বাড়ি গিয়ে/কাজ করে সে গাড়ির তলায়/শুকনো শরীর নিয়ে/রোদে ঘামে, শীতে কাঁপে/মাথায় তেল কালি/ভুল হলেই চড়থাপ্পড়/বাবু পাড়েন গালি।'

খুব ভোরে উঠে বাসে চেপে অন্য জায়গায় গিয়ে চা-বেচা একটি ছেলের বেদনার ও বিড়ম্বনার কথা স্পষ্ট হয়েছে গিরীন্দ্রনাথ চাকীর 'আমোদপুরের ছা' ছড়াতে—'চেনো কি কেউ চিনতে পারো/বেচছে গরম চা?/ঐ ছেলেটাই ভোরের বাসে/আমোদপুরের ছা।'

এখনো অনেক পরিবারে ছেলেরা কিছুটা কুলীন, আত্মীয়পরিজনের কাছে মেয়েরা একটু হেলাফেলার। এই নির্মম সত্যটি বর্তমান লেখককৃত লিমেরিকে যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে—'দাদা পায় বেশি বেশি, আমি বোন কম/আমি পাই লজেন্স, দাদা চমচম/দাদা যায় উটি-পুরী/আমি শুধু গাঁয়ে ঘুরি/এই ভেদে নেই ছেদ দেখি হরদম।'

শিশুশ্রমিক নিয়ে অনেক কথা, পরিকল্পনা, ঘোষণা হলেও তা আজও দেশে এক জ্বলন্ত সমস্যা। হোটেলে কাজ করা ছেলের বঞ্চনাময় জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে 'কাজের ছেলে' ছড়ায়—'দুই বেলা মাজি আমি/কী বলতো? কী বলতো?/বল বিনু বালা/—দাঁত নয়, মেজে যাস/হোটেলের থালা।'

আমাদের দায়িত্ব হল সুপরিকল্পিতভাবে কচিকাঁচাদের জন্য পৃথিবীটাকে যতটা সম্ভব বাসযোগ্য করা। কবি সুকান্তের অঙ্গীকারকে আমাদের প্রাণপণে কাজে পরিণত করতে হবে। নইলে ইতিহাসের কাছে আমরা ক্ষমা পাবো না।

লেখক : ছড়াকার, সংস্কৃতি কর্মী

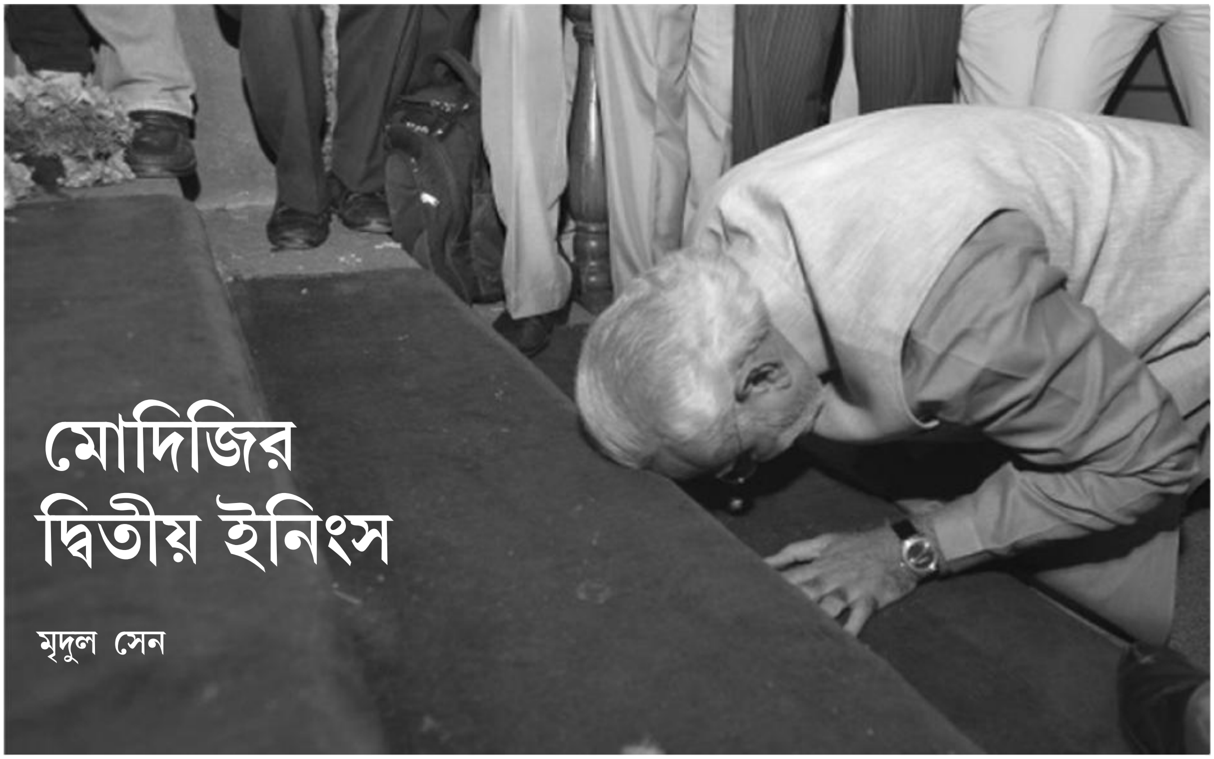

মোদিজির দ্বিতীয় ইনিংস

মৃদুল সেন

সবে দেশ ভাগ হয়েছে। আমি বালকমাত্র। তখনও পশ্চিমবাংলায় আমরা পাড়ি দিইনি। পূর্ববাংলার চট্টগ্রামে দেশের বাড়িতেই থাকি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ছোঁয়া এই জেলার শহর ও গ্রামে এসে তখনও ধাক্কা মারেনি। সম্প্রীতির বাতাবরণ একেবারে মিলিয়ে যায়নি। স্কুলে যাই—মুসলিম ছেলেরা আমার বন্ধু, একসঙ্গে খেলাধূলা করি। ঠাকুরমার কাছে মুসলিম প্রজারা এসে বললেন—কোথায় যাবেন মা ঠাকরুণ? আমাদের দেখবে কে? এই সম্পর্ক।

হঠাৎ একদিন বাবা প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ঢুকলেন—চিৎকার করে উঠলেন গাঁধিজী শট ডেড। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। রান্না ফেলে মা ছুটে এলেন—কী হল? শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সমস্ত বাড়িতে যেন পিতৃবিয়োগের শোকের ছায়া। বাবা চিৎকার করে বলতে লাগলেন—আর এস এস-এর লোকেরা ওঁকে খুন করেছে। এই প্রথম এমন একটি শব্দের সঙ্গে আমি পরিচিত হলাম।

বাবার ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি গান্ধীবাদী ছিলেন। ইংরাজের গোলামি করবেন না এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে সাহেব কোম্পানির ভালো চাকরি ছেড়ে স্বাধীন জীবিকার জন্য কালো কোট পরে চট্টগ্রাম কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। মা বললেন— আজ অরন্ধন, কোনো রান্না-বান্না হবে না।

সবাই যেন আপনজনকে হারিয়েছেন।

গ্রামাঞ্চলে রেডিও নেই। কিন্তু ‘দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেলা ক্রমে’। দেখা গেল সমগ্র গ্রামেই কোথাও উনুন জ্বলল না।

বড় হয়েও ভেবেছি, এতবড় জননেতা আমাদের দেশে আর কেউ জন্মেছিলেন কিনা—যার ডাকে লাখো লাখো মানুষ আত্মবলিদান দিতে পারেন? আমি গান্ধীবাদী নই। তাঁর মত এ পথের অনেক বিষয়ের সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি না—কিন্তু জননেতা হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করি। এত জনপ্রিয়তা আর কোনও নেতার ছিল না, আজও নেই।

অথচ নিয়তির চরম পরিহাস, আজ ভারত নামক রাষ্ট্রটি শাসিত হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক দল দ্বারা যার ‘রিমোট কন্ট্রোল’ ওই সংগঠনটির হাতে। বস্তুতঃ আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি লালিত পালিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দ্বারা। ১৯২৫ সালে ডাঃ বি. হেডগেওয়ার এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুললেও গুরু গোলওয়ালকরের নেতৃত্বে তা একটি সংঘবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে। যার মূল শ্লোগান হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ। গোলওয়ালকর নিজেই বলেছেন তিনি হিটলারের পূজারী, কারণ তিনি প্রথম জাতিতত্ত্বের কথা বলেছেন। তাঁর মতে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ভারতে থাকতে হলে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে থাকতে হবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ গান্ধীজির ডাক—‘হিন্দু মুসলিম একসাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করবে’—ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। যার ফলে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসকে প্রস্তাব নিতে হয়েছিল—কোনো কংগ্রেস সদস্যকে আর.এস.এস., হিন্দু মহাসভা অথবা মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না।

কিন্তু ইতিহাস এক জায়গায় থেমে থাকে না। ১৯৩৭ ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি শুধু নষ্টই করেনি, প্রায় বৈরিতার পর্যায়ে পৌঁছে যায় ব্রিটিশ কূটনীতির কল্যাণে। মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা উভয়কে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। আর.এস.এস. সংগঠনটিকে বেশ কয়েকবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও নানা কারণে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। ভারতীয় জনতা পার্টির মূল শিকড় ভারতীয় জনসংঘ। ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসান ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়। জনসংঘ দলটি অন্যান্য দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে জনতা পার্টিতে অনুপ্রবেশ করল। কিন্তু এই দলের নেতৃত্বে যাঁরা মন্ত্রিসভায় এলেন তাঁরা আর.এস.এস.-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদে রাজি হলেন না। এর পরের ইতিহাস আমাদের জানা। মোরারজিজির নেতৃত্বে জনতা পার্টি তিন

বছর কেন্দ্রে শাসন চালানোর পর ১৯৮০ সালে এই সরকার ভেঙে পড়ে। জনসংঘ নতুন নামে রাজনীতিতে আবির্ভূত হল—নাম গ্রহণ করল ভারতীয় জনতা পার্টি, সংক্ষেপে বি জে পি।

১৯৮৪ সালে এই দল সাধারণ নির্বাচনে মাত্র ২টি আসন সংগ্রহ করতে পারে। ফলতঃ আবার ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দিয়ে এই দলকে 'রাম জন্মভূমি' আন্দোলন শুরু করতে হয়। ফলও হাতে হাতে মেলে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সংসদে একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয় বিজেপি। বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ১৩ দিনের সরকার চালায় বিজেপি। ১৯৯৮তে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক এ্যালায়েন্স বা এন.ডি.এ গঠন করে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে পাঁচ বছর পূর্ণ সময় এই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার চালাল। পরবর্তী দশ বছর মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার। আর ২০১৪ সালে বিজেপির উত্থান, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপির সরকার গঠন।

নরেন্দ্র মোদী বললেন—'আচ্ছে দিন আনেওয়ালা হ্যায়'।

প্রায় দশ বছর দেশ চালাবার জনাদেশ যে কংগ্রেস দল লাভ করেছিল ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাকে ধূলিসাৎ করে নরেন্দ্র মোদীকে সরকার চালাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন দেশের সাধারণ মানুষ। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে এই জনাদেশ, না নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে এই জনাদেশ—তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে। কারণ সমগ্র নির্বাচনে শ্লোগান তোলা হয়েছিল—মোদী লাও, দেশ বাঁচাও। যেন অনেকটা তিনিই পরিত্রাতা। দেশের সুদিন, আপামর জনসাধারণের সুদিন আনার শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তিনি। গ্রামে জলাভাব—মোদীজিকে ভোট দিলেই সমাধান। বিদ্যুৎ নেই—মোদীজিকে ভোট দিলেই বিদ্যুৎ এসে যাবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে—মোদীজিকে ভোট দিলে সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রী ফুড়ে সোনার ফসল আসবে আপনার আমার দুয়ারে। শিক্ষা যেন ম্যাজিক। সঙ্গে সঙ্গে শতকরা পঞ্চাশ শতাংশ ভারতবাসী, যাদের এখনও অক্ষরজ্ঞান হয়নি, তারা মোদীজিকে ভোট দেওয়ামাত্র বিদ্যের জাহাজ হয়ে উঠতে পারবে। কলকারখানা, খেতখামার এমন চালু হয়ে যাবে, বেকারের 'ব'-এর দেখা মিলবে না। শুধু ভোটের অপেক্ষা। মোদীজির অভিষেকের অপেক্ষা। তিনিই নাকি সোনার গুজরাট বানিয়েছেন। অথচ পরিসংখ্যান অন্য কথা বলে। দারিদ্র্যসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় গুজরাটে কম নেই, আবার সেই সীমার মাপকাঠিতে জোচ্চুরি আছে। শ্রমিকের কথা বলার অধিকার প্রায় নেই বললেই চলে, ন্যূনতম মজুরির বালাই নেই, যেখানে শোষণের রথচক্র অব্যাহত।

হাজার হাজার কোটি টাকার বিজ্ঞাপনে দেশ ছেয়ে গেল। কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া আদা-জল খেয়ে এহেন নেতার জন্য ঢাক ঢোল বাজাতে শুরু করলো। বলল—নেতা হো তো এ্যায়সা হো। আওয়াজ উঠল সেই হিটলারির কায়দায় "ওয়ান লীডার, ওয়ান নেশন।" আর যে দলের ছত্রছায়ায় তিনি উঠে এসেছেন, সে দলের মতে হিন্দুস্থান, হিন্দুরাই এখানের মূল বাসিন্দা, সংখ্যালঘুরা এখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মাত্র। বাজপেয়ীর শাসনকালে আর.এস.এস-এর শীর্ষ নেতা সুদর্শন বলেছিলেন—'মুখে কিছু নরম কথা বললেও বিজেপি আর এস এস-এর নির্দেশে অক্ষর অক্ষরে মেনে চলতে বাধ্য'। এমনকি ১৯৯৮ সালের ৩১ মার্চ তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল. কে আদবানি লোকসভায় মন্তব্য করেছিলেন, 'আর এস এস'-এর পরামর্শ নিয়ে চলছি—চলব।

ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রের মতে সাম্প্রদায়িকতা এক ধরনের ভাবাদর্শ। গোলওয়ালকার তা জানতেন। তিনি এটাও বুঝেছিলেন একটি মিশ্র-সংস্কৃতির দেশে এই ধরনের ভাবাদর্শকে কায়েম করতে গেলে আর.এস.এস-এর মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন প্রয়োজন।

তাই একদিকে গুজরাটে গণহত্যার অন্যতম নায়ক অমিত শা'র ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতির পদ গ্রহণ, অন্যদিকে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে আর.এস.এস-এর সদস্যসংখ্যা দশগুণ করার সংকল্প।

শ্রদ্ধেয় বিপান চন্দ্র তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন—"১৯৩৭ সালের পরে যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিল, আমি তার নাম দিয়েছি উগ্রবাদী বা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতা। এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বলেন, হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ শুধু যে ভিন্নমুখী তা নয়—তারা পরস্পর বৈরিতামূলক এবং সে কারণে সমন্বয়ের অযোগ্য। ফলে দেখা দিল পারস্পরিক ঘৃণা ও বিচ্ছিন্নতার পর্যায়। জিন্না ও মুসলিম লীগ যুক্তি দিলেন, ভারতের দুটি জাতি বিদ্যমান এবং তাদের একই রাষ্ট্রের মধ্যে সহাবস্থান সম্ভব নয়। অপরপক্ষে ভি ভি সাভারকর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও হিন্দু মহাসভার বক্তব্য হল, ভারত একটিমাত্র জাতি নিয়েই গঠিত এবং সে জাতি হল হিন্দুজাতি—মুসলমানরা এদেশে বিদেশি হিসাবে রয়েছে।"

আশ্চর্যের বিষয় আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছেন সব ভারতীয়ই হিন্দু। এদেশের মুসলিম ও খ্রিস্টানরা ধর্মান্তরিত হিন্দু।

যতই দিন গড়াতে লাগল মোদীর প্রথম ইনিংসের ভাবমূর্তি ততই ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে লাগল। এক নাগাড়ে আগ্রাসী হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় সরকারের হাত। 'আচ্ছে দিন আনেওয়ালা' তো দূরের কথা বেকারি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষিসঙ্কট, মজুর ছাঁটাই একের পর এক কারখানা বন্ধ এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল দেশে। এর পর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো দেখা দিল জি. এস. টি চালু ও নয়া নোট চালু করা নামে কালো টাকা সাদা করার হাত সাফাই।

বড় বড় শিল্পপতিরা বাহবা দিলেন—ব্যাঙ্কশূন্য করে টাকা শিল্পপতিদের ঘরে ঢুকল। নীরব মোদী, মেহুল চোকসীর মতো লোকেদের তখন পোয়াবারো। মোদীজি সরকার চালাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে হাত দিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর আপত্তি জানালেন—তাতে কী। সরিয়ে দিয়ে তুঘলকি কায়দায় গভর্নর নিযুক্ত হয়ে গেল।

সারা দেশে কৃষকদের আত্মহত্যা, শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরিবৃদ্ধির আন্দোলন মহারাষ্ট্রে কৃষকদের লংমার্চ, দিল্লি শহরের বুকে একের পর এক আন্দোলন ও জমায়েত মোদীজির কপালে ভাঁজ ফেলল।

এর মধ্যে উত্তর ভারতে তিনটি রাজ্যে পরাজয় মোদীজির আতঙ্ককে আরও বাড়িয়ে দিল। কিন্তু মোদীজির ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন। ইনিংশের শেষ বলে ওভার বাউন্ডারি মেরে জিতলেন। কাঁধে বন্দুক নিয়ে তিনি জঙ্গল সাফারি করতে গেলেন আর সেই মুহূর্তে ১৫ ফেব্রুয়ারি জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ধরে চলা সি.আর.পি কনভয়ে পুলওয়ামার জেলায় বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে আতঙ্কবাদী হামলা। মৃত্যু ঘটে প্রায় চল্লিশ জন জওয়ানের। তাৎক্ষণিক ওই হামলার দায় স্বীকার করে নেয় জইশ-ই-মহম্মদ। প্রধানমন্ত্রী জানলেন অনেক পরে, কারণ তাঁর সাফারির কাজ যাতে বিঘ্নিত না হয়।

যাই হোক, জঙ্গি দমনে চলল অভিযান। বালাকোটে জইশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিমান হানা। ভারত হারাল মিগ-২১ এবং পাকিস্তান নাকি হারিয়েছে এফ-১৬। মিডিয়ার চাপান উতর। দেশে যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি। রণহুঙ্কার—এই বুঝি আবার একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি। সুতরাং এ মুহূর্তে মোদীর মতো লৌহমানব পারে দেশ বাঁচাতে।

অতএব নির্বাচনে বিজেপি একাই সংসদে ৩০৩। শরিকদল নিয়ে আরও অনেক বেশি। এবারকার লোকসভা নির্বাচন নিয়ে গত মে মাসে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার শ্রদ্ধেয় অমর্ত্য সেন এক প্রবন্ধ লেখেন, যাতে তিনি বলেছেন মোদী ক্ষমতার লড়াইয়ে জিতেছেন, মতাদর্শে নয়। লিখেছেন, নির্বাচনী প্রচারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন যা প্রায় সব দলগুলির মিলিত অর্থের থেকে বেশি। মিডিয়া প্রচার পেয়েছেন অনেক অনেক বেশি। পুলওয়ামার ঘটনায় জাতীয়তাবাদের উত্থান সম্ভব করে তাকে কাজে লাগাতে পেরেছেন—ঠিক যেমন মার্গারেট থ্যাচার ১৯৮২ সালে ব্রিটেনে ফকল্যান্ড যুদ্ধকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

খালি চোখে দেখলে মোদীজির এই জয় এক অসাধারণ সাফল্য। বিরোধীরা ই.ভি.এম নিয়ে যতই চেঁচাক না কেন, সব চাইতে আশ্চর্য কয়েকদিন পূর্বে যে তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস বিধানসভায় নিজের দখল নিয়েছিল সেখানে লোকসভার কোনো আসন কংগ্রেস পেল না। এটা মোদী ম্যাজিক না অন্য কিছু, কোনো কিছু দিয়ে তা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

লোকসভায় একাই বিজেপি ৩০৩টি আসন দখল করল, তারপরে শরিকদলগুলি তো আছেই। গোটা বিরোধীদলকে এককথায় লন্ডভণ্ড করে দিলেন। কংগ্রেস দল বিরোধী দলের মর্যাদা পর্যন্ত পেল না।

বুদ্ধিমান মোদী লোকসভার সেন্ট্রাল হলে ঢোকার আগে যে বিশাল সংবিধানের প্রস্তরখণ্ডের অবয়ব রয়েছে সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে সংবিধানের প্রতি মাথা নোয়ালেন—কারণ তিনি জানেন এবার অনেক অসাংবিধানিক কাজ তাকে করতে হবে। সঙ্গে যে গান্ধীজিকে হত্যা করেছিলেন তারই আর. এস. এস ভাইরা, সেই গান্ধীকে বগলদাবা করে নিলেন। এবার নতুন শ্লোগান—'সবকো সাথ' এর সঙ্গে যোগ হল 'সবকো বিশ্বাস'। বললেন— 'ফকিরের ঝুলি ভরে গিয়েছে।' শেয়ার বাজার চর চর করে বাড়তে শুরু করল। অল্প সময়ে শিল্পপতিরা ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে নিল—কারণ অনেক টাকার নির্বাচনী বন্ড তাদের কিনতে হয়েছে মোদীজির জন্য। 'পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্টের খেলা শেষ। জুয়া খেলায় নির্বাচনী খরচের দ্বিগুণ তারা উশুল করে নিল—এবার শেয়ার নিম্নমুখী। সাধারণ মানুষ যারা শেয়ারে টাকা খাটিয়েছিলেন তাদের মাথায় এখন বজ্রাঘাত।

যাইহোক, ফকিরের মন্ত্রিসভায় তো ফকিররাই থাকবেন। এ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রাটিক রিফর্মস (ADR)-এর তথ্য অনুযায়ী ৩০৩ জন সাংসদের মধ্যে ২৬৫ জনই ক্রোড়পতি। আর মন্ত্রিসভায় ৫৬ জনের মধ্যে ৫১ জনই ক্রোড়পতি। তাঁর বিশ্বস্ত অমিত শাহের সম্পদ ৪০ কোটি টাকারও বেশি।

সিদ্ধান্ত হয়েছে ১০০ দিনে ৪২টি রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থা বেচবে কেন্দ্র। ইতিমধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে অন্য পথে পরিচালিত করার তাগিদে হঠাৎ করে কাশ্মীর ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসা হল। মানুষের ক্ষোভকে উল্টো পথে চালাতে, উগ্র স্বাদেশিকতার ভড়ং বিজেপি-র পক্ষে নতুন কোনো ঘটনা নয়।

তা না হলে দুদিন আগেও যে মেহেবুবা মুফতির সঙ্গে যৌথভাবে সরকার গড়েছিল, পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচনের আসরে নামিয়ে দিয়ে হঠাৎ পুরো কাশ্মীর সেনা পরিবৃত করে ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রয়োজন ছিল কি?

আমরা জানি অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা গঠনের সময় তা অন্ধ্র বিধানসভায় পেশ করতে হয়েছিল। এখানে রাজ্যকে না জানিয়ে একটি রাজ্যকে তিন টুকরো করা সংবিধানের কোন নিয়মের মধ্যে পড়ে, জানি না।

এ এক ধরনের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। আগামীদিনে সমস্যার সমাধানের বদলে তা আরও জটিল হতে বাধ্য।

দেশে এক ধরনের ফ্যাসিবাদ চলছে। সন্ত্রাসবাদী আইন চালু হয়েছে। যে সব নিরপেক্ষ সংস্থা ছিল সেগুলি এখন বিজেপির নিয়ন্ত্রণাধীন করা হচ্ছে। পাঠক্রম শাসকশ্রেণির ইচ্ছায় সাজানো হচ্ছে এবং তার জন্য দেশের ইতিহাস পাল্টাতেও দ্বিধাবোধ করছে না। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা হয়েছে। বিরোধীদের দমন করার জন্য সিবিআইকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

ইতিমধ্যে রাম নামকে কাজে লাগিয়ে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন শুরু হয়েছে। বিহারে উত্তরপ্রদেশে 'জয় শ্রীরাম' না বলার অপরাধে সংখ্যালঘুদের পিটিয়ে খুনও করা হচ্ছে। এটা আর কিছু না। সামাজিক আতঙ্কবাদ কায়েম করে স্বাধীন মতামত বন্ধ করার নয়া চক্রান্ত। যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতাদের যেভাবে নৃসংশভাবে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদী সংস্থা, তাতে বোঝা যায় শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে কথা বললে এইভাবেই জবাব দেবে হিন্দুত্ববাদী দল। বিখ্যাত কন্নর সাহিত্যিক অনন্তমূর্তি, পানসারে, গৌরী লঙ্কেশের খুনও একই সুতোয় গাঁথা। নরেন্দ্র দাভোলকরের খুনে অভিযুক্ত শারদ কালাসকরের জবানবন্দি প্রমাণ করেছে খুনের তালিকা আরও দীর্ঘ। সারা দেশে শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে প্রতিবাদপত্রও পাঠিয়েছেন। অমনি বুদ্ধিজীবী নামধারী আর একদলকে মোদীজির সমর্থনে হাজির করেছেন এই হিন্দুত্ববাদী দল।

এই অসহিষ্ণুতা থেকেই বোঝা যায় দলটির শ্রেণি চরিত্র। আমরা ৩০-এর দশকে জার্মানিতে এই ঘটনা দেখেছি। সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকের উপর নেমে এসেছিল নির্মম অত্যাচার।

একদিকে বার্লিনের রাস্তায় বই পোড়নো, উৎসব, পিস্তলের ডগায় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের দেশ ছাড়ার হুমকি, অন্যদিকে তুলে ধরা হল ভাগনারের সংগীত ঐতিহ্যকে, হাউপ্টম্যানের মতো নাট্যকারকে, মারিয়েত্তির মতো কবিকে।

হাওয়া বুঝে আমাদের দেশের বেশ কিছু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মোদী বন্দনা কি তাই প্রমাণ করে না?

দিন যত গড়াবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ ততই বাড়বে। ইন্দিরার আমলে ঘোষিত অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ছিল। এবার চলবে অঘোষিত জরুরি অবস্থা। মোদীজি তাঁর বিশ্বস্ত সৈনিক অমিত শাহকে নিয়ে সেকাজে সদা ব্যস্ত থাকবেন। আর আম্বানী, আদানী সহ বহুজাতিক সংস্থাগুলি লুট করে চলবে দেশের যাবতীয় সম্পদ—রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প। প্রতিবাদের গলায় ছুরি বসাবার জন্য নতুন 'সন্ত্রাসবাদী' আইন তো আছেই।

অতএব 'মাভৈঃ'। 'জয় শ্রীরাম'!

লেখক : সাংস্কৃতিক সংগঠক

With Best Compliments of

M/s SREE KHAITAN TRADERS

Hattala Road, Durgapur

Sl. No. 120

With best compliments of

UNITED SAW MILLS

TIMBER MERCHANT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G.T. Road, Main Gate, Durgapur-713203, Phone : 0343-2582381
Contact : AMIT SINGH, 9434647691, 7699999426

Sl. No. 121

একুশ শতকের রানার : রিচ দ্য টার্গেট

পঙ্কজ রায় সরকার

রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে
রানার ছুটেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে রানার!

সুকান্ত ভট্টাচার্যের রানার দৌড়তো ঝুমঝুম ঘন্টা বাজাতে খবরের বোঝা নিয়ে। ২১ শতকের রানারের এগোনোর সংকেত আর ঘন্টা বাজিয়ে জানাতে হয় না দেশ দুনিয়াকে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের (জি পি এস) মাধ্যমে প্রতি পদক্ষেপের খবর আসতে থাকে। আজকের ২১ শতকে ২৮ বছর বয়সী রানার খবর নয় খাবারের বোঝা হাতে ট্রাকড হতে হতে পৌঁছে যায় আমাদের বাড়ির কলিং বেলে। বাড়ির ছেলের জন্মদিনে চিকেন রেশমি কাবাব, বাটার নান এবং মটন রগন যোশের প্যাকেট হাতে তুলে দিয়ে যায়। পরিবারে চাঁদের হাসি খেলে যায়। যাবার সময় রানার বলে—"ম্যাডাম ফিডব্যাকটা ঠিক করে দিয়ে দেবেন।" ম্যাডাম—"তুমি তো ঠিক সময়েই নিয়ে এসেছো। ৩ স্টার দেব। কিন্তু আজ সকালে কার্ট সার্ভিস যা দেরি করেছে তা আর বলার নয়। আমি Complain করেছি।"

রানার ঃ "কেন ম্যাডাম? কী হয়েছে?"

খাবারের প্যাকেটগুলো বাড়ির পরিচারিকার হাতে দিতে দিতে ম্যাডাম ঃ "আর বলো না ... ছেলের বার্থডে গিফটগুলো অর্ডার দিয়েছিলাম। গতকাল রাত্রে দেখালো এইখানে চলে এসেছে ডেলিভারি হবে আগামীকাল সকালেই। সে তো এলো সকাল ১১.৩০ এর পর। এলো তো এক কান্ড! হাত পা কেটে এক সার!! কার্ট সার্ভিসের ডেলিভারি বয়ের!! বাচ্চা ছেলে। ২১/২২ বছর হবে। আসার সময় বাইকে কোথাও লাগিয়েছে বোধ হয়। আমার ছেলে আবার ব্যান্ডেজ, ওষুধ লাগিয়ে দিলো। তবে এতো দেরী? আমি কোনো স্টার দিই নি। নেগেটিভ ফিডব্যাক সাবমিট করেছি।"

এমন সময় ১২ বছরের বার্থ-ডে-বয় ভিতর-ঘর থেকে বলে উঠলো "মা তুমি আমার কথা শুনলে না আজ। আঙ্কেলের কি রকম লেগেছিলো দেখলে না? আঙ্কেল এত বার বললো ভালো ফিডব্যাক দিতে; আমি বললাম ৫ স্টার দিয়ো আঙ্কেল কে। আঙ্কেলটা আমার জন্মদিনের গল্পের বই এবং জগার নিয়ে এলো। কেনো এরকম করলে?"

মাসে ৭-১০ হাজার টাকা (কমিশন ব্যাতিরেকে) পাওয়া ডেলিভারি বয়রা নগরজীবনে প্রতিদিন আজকে মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র হয়ে উঠেছে। কারোর বাড়িতে নিজের মা-এর ওষুধ কিনে নিয়ে যাওয়ার পয়সা জোটে না অথচ কাস্টমারের অনলাইন অ্যাপে বুক করা ওষুধ সময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছে রানারেরা। কেউ সকাল বেলায় খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে পিঠে খাওয়ার পৌঁছানোর বাকেট নিয়ে। সারা দিনে ৩০/৪০ জনকে অর্ডার পৌঁছানোর টার্গেট পূরণ করার জন্য অস্থিরতা এবং ভালো ফিডব্যাক পেয়েছে কি না দেখার তাড়নায় নিজেও খাওয়ার সময় পায় না। রৌদ্র, জল, বৃষ্টি নিস্তার নেই। পৌঁছে যেতে হবে ঘরে ঘরে সময়ে। এরকম প্রায় ১০ লক্ষ তরুণ-তরুণী আমাদের দেশে অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে খাওয়ার পৌঁছে দিচ্ছেন বাড়ি বাড়ি। টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার এক সমীক্ষা রিপোর্টে আরো লিখেছেন এই ১০ লক্ষের মধ্যে ৬৭৯০০ জন মহিলা। ফুড ডেলিভারির কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। গত ১ বছরেই বেড়েছে প্রায় ২৭৯০০ জন।

ফুড ডেলিভারির কাজে যুক্তদের কতগুলি শহর ভিত্তিক চার্ট—

রাজ্য	২০১৮
মুম্বাই	২.৭৯ মিলিয়ন
দিল্লি ২.৫১ মিলিয়ন	
ব্যাঙ্গালুরু	১.২৮ মিলিয়ন
চেন্নাই	১.১৫ মিলিয়ন
কলকাতা	০.৮৬ মিলিয়ন
হায়দ্রাবাদ	০.৭২ মিলিয়ন
পুনে	০.৬২ মিলিয়ন
আমেদাবাদ	০.৪৯ মিলিয়ন
বিজয়ওয়াদা	০.০৯ মিলিয়ন
এলাহাবাদ	০.০৭ মিলিয়ন
কোলাম / কোহিজকোদে	০.০৭ মিলিয়ন
গৌহাটি	০.০৬ মিলিয়ন
কোচি	০.০৫ মিলিয়ন
রায়পুর / সম্বলপুর	০.০৫ মিলিয়ন
হনুমানগড়	০.০৪ মিলিয়ন
মাঙ্গালুরু	০.০৩ মিলিয়ন
তিরুভানাথপুরম	০.০২ মিলিয়ন

ফুড ডেলিভারি বাদ দিয়েও আরো প্রায় ৪০ লক্ষ যুবক-যুবতী বিভিন্ন কার্ট সার্ভিসের ডেলিভারির কাজের সাথে যুক্ত। প্রায় সব ক্ষেত্রেই Amazon, Flipkat, Walmart বা অন্যান্য অনলাইন বহুজাতিক হাঙ্গরেরা থার্ড পার্টির এজেন্সির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীদের এই কাজে রাখেন। থার্ড পার্টি এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ হলেও ডেলিভারি বয়দের গ্রুমিং করার ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলির তীব্র নজর থাকে এবং গ্রুমিং মান রাখার ক্ষেত্রেও কঠোর। ২০১৬ সালে Business Today-এর একটি রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে : "These men will need to go through multiple mock tests to polish up these skills, re-skill and up-skills before the rubber of their two wheelers meet the road"। গ্রুমিং-এর ব্যাপারে আন্তরিক হলেও ভারতবর্ষেরই কমার্সের বাজারের এই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রদের জীবন মান উন্নত করার প্রশ্নে কতটা আন্তরিক এই সমস্ত বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো? সার্ভিস লাইফের স্থায়িত্ব, দুর্ঘটনা, বীমা, পি.এফ, চিকিৎসার সুবিধা কার্যত অবহেলিত। ন্যূনতম মজুরির কোনো তালিকা নেই দেশের সবচেয়ে বেড়ে ওঠা এই সেক্টরের। কাজের সময়, বহন করার উচ্চসীমা, প্রকৃতি-পরিবেশ সব কিছুকে উপেক্ষা করেই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত এই উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীদের দল। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এই ধরনের কার্ট সার্ভিসের সাথে যুক্ত ডেলিভারি যুবক-যুবতীরা দিল্লী, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোরে গড়ে ৫০-৬০ টি প্যাকেট ক্রেতাদের বাড়িতে নিয়ে পৌঁছায়। সম্প্রতি একটি বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিগ বাস্কেট নামক সংস্থা বলেছে ডেলিভারি এক্সিকিউটিভদের ১৫ কেজির বেশি ওজন দেওয়া হবে না।

বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর আধুনিকতম এই কাজ বাদ দিয়েও নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা শপিংমল, বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ফিল্ড ওয়ার্কের সাথে যুক্ত। একমাত্র লক্ষ্য "রিচ দা টার্গেট"। কোম্পানির মান্থলি মিটিং এ সাদা বোর্ডে ব্লু বা ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে টার্গেট ফিক্স করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বিপণনের দুনিয়াতে। প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর অস্থিরতা নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে শুধু টার্গেট পূরণের লক্ষ্যে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বা শিল্পে কাজ করা শ্রমিকের বাড়ির ছেলেটারও মন্ত্র 'রিচ দা টার্গেট'। এই টার্গেট পূরণ করতে পারার গতিশীলতা বনাম না পারার যন্ত্রণায় কখন যে তার নিজের বাবার কর্মক্ষেত্রটাও ছেলের শত্রুতে পরিণত হয় তার খবর কে রাখে! সকাল ৯টা তে বের হয়ে রাত ১০ টাতে বাড়ি ঢুকে ২১ শতকের রানার বাথরুমে মাথায় জল ঢালতে ঢালতে চিন্তা করে এতো পরিশ্রম করেও আজ টার্গেটে পৌঁছাতে পারলাম না, অথচ বাবা আমার থেকে পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক আগে বাড়িতে পৌঁছে মাসে ৫৫,০০০ হাজার টাকা বেতন পায়! Ambition Box-এ প্রকাশিত ডেলিভারি এক্সিকিউটিভদের বেতন (সমস্ত সুবিধা সহ)

কোম্পানি	গড় বাৎসরিক আয়
অ্যামাজন	১.০৬ লাখ
ইকসুলা	১.৩৮ লাখ
ফ্লিপকার্ট	১.৪৩ লাখ

ই-কমার্সের ফলে ২১ শতকের রানারদের কাছে পৌঁছায় না বেতন বৈষম্যের চিত্রও। ডেলিভারি বয় / এক্সিকিউটিভরা জানতেও পারে না ওয়ার হাউসের বা শিপিং ম্যানেজার বা সংস্থার অফিসে বসে থাকা কর্মীর মাইনে কত? রিচ দা টার্গেট। পর্দার পিছনে থাকা কেউ কখন যে ২১ শতকের রানারদের সামনে থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রকৃত টার্গেটকে সরিয়ে অন্য টার্গেট বসিয়ে দিয়েছে তার হিসাব রাখে কে! শিল্পাঞ্চলের ২১ শতকের রানারদের কাছেও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে কাজ করার কথা ভাবা তাই বিলাসিতা। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বন্ধ হলে রানাররা

ভাবছে 'আমাদের কী?'

নতুন প্রজন্মের শ্রমিকদের ভাষা, কাজের প্রতি ডেডিকেশন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কৃতি, অবসর সময়ে জীবনযাপন প্রক্রিয়া, ২৪ ঘন্টার লাইফ স্টাইল সবটাই আজ নতুন। জানার আগ্রহ বা অনুসন্ধিৎসু মন আছে কিন্তু সময় কম। তাই যদি কিছু তথ্য / ঘটনা টেমপ্লেট আকারে হোয়াটসঅ্যাপে আসে সেটাই ধ্রুবসত্য। তথ্য যাচাই করবে সময় নেই যে! ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ ইত্যাদি জানার সময় কই! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। কেউ কেউ ভাবছেন কিসের সাম্রাজ্যবাদ? ১৫ আগস্ট মানে কাশ্মীর দখল। ১৫ আগস্ট মানে পাকিস্থানকে টাইট দেওয়া।

□

বিশ্বজুড়ে মন্দা চলছে। দীর্ঘস্থায়ী মন্দা। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও তাই মাইক্রো মার্কেট ধরতে নেমেছে। ২২৫ টাকার শ্যাম্পুর বোতল কেনার লোক কমেছে। তাই শ্যাম্পুর স্যাসে ১ টাকায় মিলবে ২ টাকাতে মিলবে। ৩৫ টাকার বিস্কুটের প্যাকেট মাইক্রো সাইজে ৫ টাকাতে। সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ তাও কেনার লোক নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ হলে না হয় দেশজ গুণে ভরপুর আর এস এস খুব সূক্ষ্মভাবে প্রচার চালায় এগুলোর (পড়ুন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের) জন্ম হয়েছে মরার জন্য। কিন্তু আজ দেশের সমস্ত বেসরকারি অটোমোবাইল শিল্পে তরুণ-তরুণীদের ভবিষ্যত সংকটে। ছাঁটাই চলছে। উৎপাদন বন্ধ হয়েছে বেশ কিছু বেসরকারি কারখানাতে। আইটি সেক্টরগুলোতেও চলছে হায়ার এন্ড ফায়ার। ফ্লিপকার্টে ছাঁটাই হয়েছে। জোম্যাটোর মূল অফিস গুরুগ্রামে কয়েকদিন আগেই ৫৪০ জন শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। জোম্যাটোর বক্তব্য "গত কয়েকমাসে আমাদের প্রযুক্তি ও প্ল্যাটফর্ম অনেক উন্নত হয়েছে। ব্যবসা যেমন বেড়েছে তেমনই অর্ডার সংক্রান্ত এনকোয়ারি কমেছে। এখন মাত্র ৭.৫ শতাংশ গ্রাহকের অর্ডার সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকে, যা মার্চ মাসে ছিলো ১৫ শতাংশ। এর ফলে আমাদের কাস্টমার, মার্চেন্ট ও ডেলিভারি পার্টনার সাপোর্ট টীমে এত কর্মীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই ১০ শতাংশ কর্মী ছাটাই হয়েছে।" অফরোল পজিশনে লোক নিয়োগ হচ্ছে এই সংস্থাতে। আবার অন্যান্য পদে ছাঁটাই চলছে। ভাবতে পারেন মজুত শ্রমিকবাহিনীর সংখ্যাই শ্রমিকদের রিপ্লেস করছে। প্রতিকার কী? বুর্জোয়াদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়বে কে? প্রলেতারিয়েত। সেই প্রলেতারিয়েতদের অধিকাংশই হবে সংগঠিত শিল্পশ্রমিক—এরকম ধারণাই মূলত আছে। আমাদের দেশে একদিকে যেমনভাবে সংগঠিত

শিল্প-শ্রমিক কমছে ঠিক তেমনিভাবে কৃষি-নির্ভর পরিবারের সংখ্যাও কমে ৭০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশতে এসে দাঁড়িয়েছে। পুঁজির বিরুদ্ধের লড়াইতে বিকল্প কী তাহলে? আজকে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে সার্ভিস সেক্টরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের জি ডি পি-তে ৬০ শতাংশের বেশি যোগদান এই সার্ভিস সেক্টরসমূহের। যদিও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হল ২৫ শতাংশ এই সার্ভিস সেক্টরে। যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কমার সাথে সাথে এই সেক্টরে উচ্চতর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের লোভনীয়, বৃহৎ আয়তনের, unexplored বাজারের ফলে আমেরিকা এবং চীনা অর্থনীতির সাথে তুলনামূলক চিত্রেও দেশের সার্ভিস সেক্টরের ঈর্ষণীয় অংশগ্রহণ।

রেখচিত্র -১ : সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরের জি ডি পি তে যোগদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি—

সেক্টর	**জি ডি পি**	**কর্মসংস্থান**
কৃষি এবং কৃষি নির্ভর ক্ষেত্র	১৫.৪ %	৫৩ %
ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প	২৩ %	২২ %
সার্ভিস সেক্টার	৬১.৫ %	২৫ %
(এর মধ্যে আই টি সেক্টর সর্বাধিক)		

রেখচিত্র-২ : আমাদের দেশের সাথে অন্যান্য কয়েকটি দেশের এই সার্ভিস সেক্টরের জি ডি পি তে ভোগদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির তুলনামূলক চিত্র—

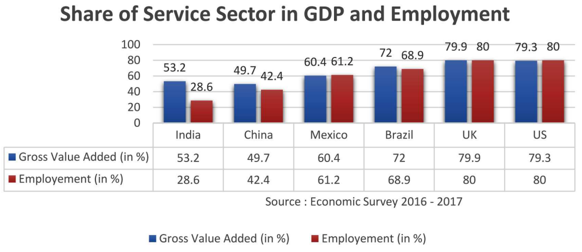

সূত্র : ইকনমিক সার্ভে ২০১৬-১৭

বি পি এম সহ আই টি, রিটেলিং, হেলথকেয়ার, পর্যটন, লজিস্টিক, পরিবহণ, অ্যানিমেশন, গেমিং, ডাবিং, স্পোর্টস সেক্টর (আই পি এল, আই এস এল সহ অন্যান্য মেগা ইভেন্টস) সহ ই-কমার্সের এক বড় ক্ষেত্র সহ সমস্ত জায়গাতেই এই ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। উদার অর্থনীতির পরবর্তী সময়ে মুদির দোকানগুলোর মাছিমারার অবস্থা তৈরি হলেও শপিং মলে ঝাঁ চকচকে মুদির দোকান এবং অনলাইনে মুদির দোকান বেড়েছে সন্দেহ নেই। শুধু মুদির দোকান নয়—ফ্যাশন, লাইফ স্টাইল, মদ, মাংস, ওষুধ, সবক্ষেত্রেই চেইন স্টোর এবং অনলাইন ই-কমার্সের ব্যবসার বহর বেড়েছে। আরবানাইজেশনে আজ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো চেইন বাজার, সুপার মার্কেট, মল, অনলাইন মার্কেট। আসলে Per Capita Income বা দেশের জি ডি পি বাড়ুক বা না বাড়ুক ভোগবাদীদের বৃদ্ধির গ্রাফ উর্দ্ধমুখী। অসাম্যের এই দুনিয়ায় তাই হানাহানি অস্থিরতা বাড়ছে। পরিণতিও হচ্ছে করুণ। World Bank-এর সমীক্ষায় Per Capita Income-এ ২০১৬ সালে ১৬৪ টি দেশের মধ্যে ১২২-এ আমরা। PPP (Purchasing Power Parity) তে আমাদের Rank ১০৬। Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSP) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ সালে আমাদের দেশে মাথাপিছু আয় ছিলো ৯৫৭৯.৮৩ টাকা। অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রেও ২০১৩-২০১৪-এর জি ডি পি তে ৬.৪ শতাংশের কাছাকাছি নেমে গিয়েছিলাম আমরা ২০১৮-২০১৯ সালে। ৬.৮ শতাংশ। ২০১৭-২০১৮ তে ছিল ৭.২ শতাংশ। ২০১৯-২০২০ প্রথম কোয়ার্টারে যা অস্বাভাবিক ভাবে নেমেছে; প্রায় ৫ শতাংশ। সবচেয়ে দুর্বলতম অর্থনীতি বিকাশের চিত্র এই বিকাশরাজে।

□

বিকল্পের সন্ধান শুধু নীতিতে নয়; বন্ধুবৃত্ত প্রসারিত করার প্রক্রিয়াতেও বিকল্পের সন্ধান আমাদের করতে হবে। পায়ে হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে কালিঝুলি মাখা অদক্ষ শ্রমিক হোক বা এসি বাসে চেপে আইটি টাওয়ারে নামা জিন্‌স-পরা যুবতীই হোক বর্গ বা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে এরা সবাই শ্রমিক। কায়িক শ্রমদাতা এবং মানসিক শ্রমদাতাদের মধ্যে ফারাককে কীভাবে আমরা বিশ্লেষণ করবো? যেহেতু কায়িক শ্রমই উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে বাজারে মূল্য সৃষ্টি করে তাই কেবলমাত্র কি কায়িক শ্রমদাতারাই শ্রমিক বলে বিবেচিত হবে? আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে উৎপাদনে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি এসেছে। এই প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি অপারেট করার জন্য নলেজবেস স্কিল প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এমনকি সংগঠিত শিল্পেও ক্রেন অপারেটর, হলেজ অপারেটর, ব্লাস্ট ফার্নেস, ফিনিশিং বিভাগে সহ অন্যান্য বিভাগে কাজ করতে গেলে পূর্বে যতটুকু নলেজবেসড দক্ষতার (জ্ঞান নির্ভর দক্ষতা) প্রয়োজন ছিলো এখন শুধু সেইটুকু থাকলে হবে না। বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, মনিটর, কাটিং মেশিন সহ অন্যান্য উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার জানতে হচ্ছে; এগুলো সবই হচ্ছে জ্ঞান-নির্ভর মানসিক কাজ। আজকের উৎপাদন জগতে ইন্টেলেকচুয়াল শ্রমিকেরে (মেধা শ্রমিক) সংখ্যা বাড়ছে। তার সাথে বাড়ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা। পুঁজির বিপরীতে শ্রমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে কোনো পূর্ব আলোচনাকৃত ন্যারেটিভের ভিত্তিতে এই নতুন শ্রমিকবর্গকে বিশ্লেষণ করলে কি এগোনো যাবে? মাইক্রো লেভেলের যন্ত্রণাকে মাইক্রো লেভেলের লড়াইতে পরিণত করতে হবে। মাইক্রো লেভেলের লড়াইকে সাগরে মেশাতে হবে।

মাইক্রো লেভেলের লড়াইতে যুক্ত হতে গেলে নতুন শ্রমিকবর্গের সমকালীন বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করলেই কি কাজ শেষ হবে? অনুশীলনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও স্লোগান উত্থাপন প্রয়োজন। পরিকল্পনাতে থাকতে হবে মাইক্রো লেভেলের হৃদয় স্পর্শ করে যাওয়ার ভাবনা এবং স্লোগানে থাকতে হবে মাইক্রো লেভেলে ব্যবহৃত ল্যাংগুয়েজ।

নবপ্রজন্মের এই শ্রমিকবর্গকে বৃত্তে যুক্ত করতে গেলে সৃজনশীল সমস্ত সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই চেতনা ও ধ্যানধারণার দ্রুত চর্চা-পুনঃচর্চাও প্রয়োজন। আনতেনিও গ্রামশির মতে, শ্রমিকশ্রেণির পার্টিকে সমাজে তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে হলে তাকে হতে হবে সমগ্র সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মনন ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক; কারণ একমাত্র সেক্ষেত্রেই পার্টির নেতৃত্ব হবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন এবং এভাবেই পার্টি সমাজে স্থান করে নেবে আধিপত্যকামী এক শক্তিরূপে। নিকালো মাকিয়াভেলি পঞ্চাশ-ষোড়শ শতকের ইতালিতে যেমন কল্পনা করেছিলেন এক কাল্পনিক 'রাজকুমারের', গ্রামশি তেমনভাবেই অতীতের এই অসাধারণ চিন্তাবিদকে অনুসরণ করে তাঁর 'কারারচনায়' পার্টিকে আখ্যায়িত করেছেন 'আধুনিক রাজকুমার' হিসাবে। মাকিয়াভেলি তাঁর 'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থের অন্তিম অধ্যায়ের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে যেমন কল্পনা করেছিলেন ভবিষ্যতের সেই রাজকুমারের আবির্ভাবকে, যার মাধ্যমে সূচিত হবে ইতালির নবজন্ম এবং যাঁর নেতৃত্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ও প্রবল উৎসাহে, তেমনভাবেই গ্রামশি মাকিয়াভেলির এই বক্তব্যকে স্মরণ করে আধুনিক ইতালিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কমিউনিস্ট

পার্টিকে, যেখানে পার্টি হবে জনগণের সার্বিক স্বার্থের যোগ্যতম প্রতিনিধি। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে গ্রামশি তাঁর এই অভিনব তাত্ত্বিক চিন্তার মাধ্যমে এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, পার্টিকে নেতৃত্বের এই পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে শ্রমিকশ্রেণির তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করাটাই যথেষ্ট নয়; প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব শ্রেণিস্বার্থের সীমানাকে অতিক্রম করে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিতে হবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে, অর্থাৎ পার্টি জন্ম দেবে এক নতুন চেতনা ও বিশ্ববীক্ষার, যা অতিক্রম করে যাবে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া-কেন্দ্রিক আন্দোলনের পুরানো ধ্যানধারণা এবং সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতাকে। পুঁজির দাপট অব্যাহত রাখার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে ইস্যু; টার্গেটও করা হচ্ছে মাইক্রো লেভেলে। শ্রমিক বর্গের এই নতুন অংশ মানসিক উচ্চতার স্তরে পৌঁছে যতক্ষণ না সুনির্দিষ্ট ইস্যু নির্দিষ্ট করতে পারবে, ততক্ষণ তাদের কাছে মিথ্যা এবং অর্ধসত্যই সত্যি বলে প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ৯০ কোটির বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন। দেশে হোয়াটস্অ্যাপ ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটির বেশি। দেশে আজকের দিনে প্রায় ১ লক্ষ সংবাদপত্র রেজিস্ট্রিকৃত। নিউ লিবারেলে যুগের পূর্ব পর্যায়ে প্রায় ২.৫ দশক আগেও আমাদের দেশে একমাত্র ব্রডকাস্টিং চ্যানেল ছিলো ‘দূরদর্শন’। দেশের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৯০০ চ্যানেল আজ Air এ, তার মধ্যে ৪০০ চ্যানেল শুধুমাত্র খবরের চ্যানেল। আজ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৩৪ কোটি; কমবেশি ২০০ কোটি টিভি সেট ব্যবহার করেন দেশের মানুষ! তারও পর রয়েছে মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি গ্যাজেট। ইন্টারনেট ব্যবহার করেন দেশের প্রায় ৩৩ শতাংশ মানুষ। একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত, খবর বা খেলা দেশবাসীর প্রায় ৬০-৬৫ শতাংশ দেখেন নন-টেলিভেশন যন্ত্রে। অর্থাৎ মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদিতে। সবমিলিয়ে শ্রমজীবী মানুষের ভাবনা এবং মুক্তির সংগ্রামকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতি সেকেন্ডে সারা বিশ্বে কয়েক হাজার ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে। শত্রুপক্ষের এই এজেন্সিসমূহের স্বরূপের ব্যাপকতা ১৮৪৬ সালে কমিউনিস্ট লিগের ইশতেহার রচনার সময় অনুপস্থিত ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুঁজির বিশ্বব্যাপী আগ্রাসনের মুখে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবোধের ভাবনা আজ আরো প্রাসঙ্গিক হয়েছে সন্দেহ নেই।

রানার। গ্রামের রানার।
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার,
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে
পৌঁছে দাও, এ নতুন খবর,
অগ্রগতির মেলে,
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি
নেই দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো,
আরো বেগে
দুর্দম হে রানার।

তথ্যসূত্র

১. ‘Business Today’, June 6, 2018
২. Invest Indian (National Invest Promotion and Facilitation Agency)
৩. ‘The Economic Times‘, Sep 7, 2019
৪. John Merington (সোসালিস্ট রেজিস্টার, লন্ডন ১৯৬৮) থিওরি অ্যান্ড প্রাকটিস ইন গ্রামসিও মার্কসিজম
৫. নিকোলো মাকিয়াভেলি—‘দ্য প্রিন্স’
৬. বামপন্থী আন্দোলন ও শ্রেণি রাজনীতি—রতন খাসনবিস
৭. শোভনলাল দত্তগুপ্ত—গ্রামশি চর্চা

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বড়পলাশন-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

(মেমারি-২নং পঞ্চায়েত সমিতি)

গ্রাম ও পোঃ ঞ্ম পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০১, ফোন ঞ্ম (০৩৪২) ২৭১৬৩৭২

আমরা এলাকার মানুষের স্বার্থে NRGS-এর কাজ, বড়পলাশন-২নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজে এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। আগামী দিনে প্রতিটি গরিব পরিবারের মাথায় ছাদ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে বড়বলাশন-২ গ্রাম পঞ্চায়েত মানুষের পাশে, মানুষের সাথে।

পরেশ দাস
উপপ্রধান

রুবি খাতুন
প্রধান

Sl. No. 145

সরোজিনী নাইডু : একশো চল্লিশতম বর্ষে ফিরে দেখা

সেদিনের বর্ধমানে এক বর্ণময় ভারতীয় নারী

জহরলাল সাঁই

খিলাফৎ আন্দোলন এবং গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য গড়ে উঠলেও সে ঐক্যের ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। ১৯২২-এর পর খিলাফৎ আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা এবং নৈরাশ্যকে আশ্রয় করে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯২৩ থেকে চরম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বছরের পর বছর নিকৃষ্টতর হতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গার প্রকোপ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯২৬-এর এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে কলকাতায় তিন বার দাঙ্গায় ১৩৮ জনের প্রাণ যায়। এই সময়ে পাবনা'র দাঙ্গায় যে নৃশংসতা দেখা যায়, তার প্রতিবাদে ১৫ জলাই বর্ধমান টাউনহলে এক প্রতিবাদসভা হয়। জগবন্ধু মিত্র-র সভাপতিত্বে সে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পাবনায় দুর্গত, বিপন্নদের সাহায্যার্থে অর্থ এবং স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো হবে। শহর বর্ধমানে তখন দাঙ্গা না ঘটলেও 'মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো'-কে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা ছিল। ২৩ জুলাই মহরমের মিছিল পরিত্যক্ত হয়। ওইদিন দুপুর বেলা থেকে রাণীগঞ্জ বাজার, বড়বাজার এবং অনান্য রাস্তায় (যেখান দিয়ে মহরমের মিছিল যায়) হিন্দুদের দোকানপাট বন্ধ থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্তরূপে হরতাল পালিত হয়। সময়োচিত প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণের ফলে কোনোরকম অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়নি। এইরকম সামাজিক পটভূমিতে সেদিন সরোজিনী নাইডু বর্ধমানে এসেছিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবোধকে আরও উজ্জীবিত করে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে মজবুত করতে। ১৯২৬-এর ২ আগস্ট তাঁর আগমনের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করতে গিয়ে বিনয় চৌধুরী (তখন নবম শ্রেণির ছাত্র) বলেছেন, "আমার মনে আছে টাউন হলের পশ্চিম দিকের যেদিকে টেনিস কোর্ট ছিল সেইদিকেই একটা মিটিং-এ সরোজিনী নাইডু এসেছিলেন শান্তি মিটিং করতে..... আমরা সেই প্রথম তাঁকে দেখি ও তাঁর বক্তৃতা শুনি।"

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী সেদিন বর্ধমান স্টেশনে নেমেছিলেন বেলা এগারোটায়। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মৌলভি মহম্মদ ইয়াসিন, বর্ধমান রাজ এস্টেটের প্রধান তত্ত্বধায়ক শ্রী অমরনাথ দত্ত, এম.এল.এ., বাবু কালীকৃষ্ণ রায় এবং শহরের আরও অনেক নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক। মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অতিথি হিসেবে সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজবাড়ির অন্যতম অংশ দেলারাম প্রাসাদে। বিকেলে টাউন হলে তিনি

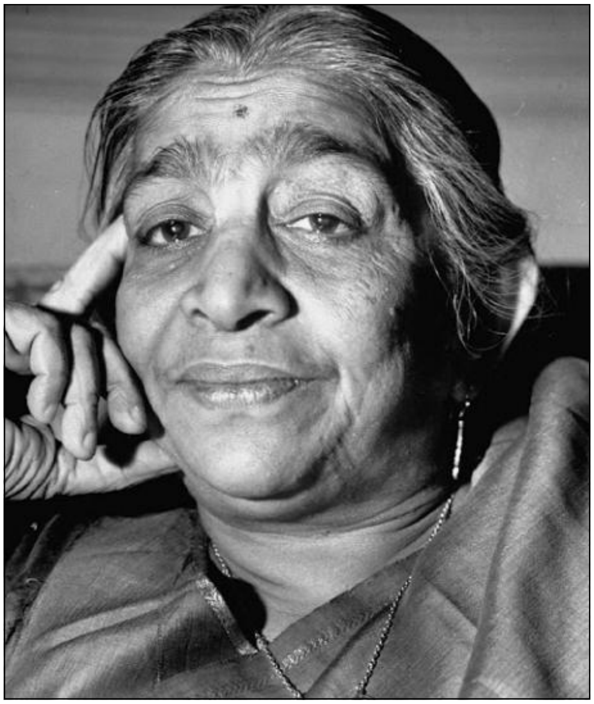

মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইয়ংমেন্স মুসলিমস অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ হতে সম্ভাষণ গ্রহণ করেন, এবং জনসমাবেশে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সে আলোচনায় যাওয়ার আগে তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মজীবনের কয়েকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহিলা ছিলেন। কবি, রাজনৈতিক নেত্রী, অসাধারণ বাগ্মী ও খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিশ্চিতভাবেই ছিলেন বিশ শতকের স্মরণীয় ও বর্ণময় ভারতীয় মহিলাদের অন্যতমা। তিনি শুধু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় মহিলা সভাপতিই (১৯২৫) ছিলেন না, স্বাধীন ভারতে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য যুক্তপ্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) রাজ্যপালের দায়িত্বও পালন করেছেন আমৃত্যু। ভারতের বে-সরকারি সাংস্কৃতিক দূত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে তাঁর একটা আন্তর্জাতিক উপস্থিতিও

আমাদের নজর কাড়ে। সুতরাং তাঁর সময়ের উজ্জ্বল প্রতিনিধি ও নিজ গুণের অধিকারেই সরোজিনী আমাদের কাছ স্মরণযোগ্য। চারিত্র্যধর্মে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী সরোজিনীর কর্মজীবনের নানা ঘটনাবলী উপন্যাসের চাইতেও রেমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয়। আজ, জন্মের একশো চল্লিশ বছর পরেও তাঁর শক্তি, সাহস, সহিষ্ণুতা, বাগ্মিতা, কাব্যপ্রতিভা, সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রভৃতি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বরদাসুন্দরীর আট সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠা সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হায়দরাবাদে ১৮৭৯-র ১৩ ফেব্রুয়ারি। অঘোরনাথের আদি নিবাস ব্রাহ্মণগ্রামে (বিক্রমপুর, ঢাকা) হলেও তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল হায়দরাবাদ। এডিন্‌বার্গ থেকে ডি.এস.সি ডিগ্রি অর্জনকারী অঘোরনাথ ছিলেন হায়দরাবাদে আধুনিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজসংস্কারক, রসায়নবিদ, অধ্যাত্মবাদী ও মহাপণ্ডিত। পাশাপাশি স্বদেশী আন্দোলন, নারীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সবরকমের প্রগতিবাদী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। ব্রাহ্ম গৃহে শিক্ষিতা বরদাসুন্দরীও ছিলেন চমৎকার মানুষ। তিনি শুধু সুগৃহিণীই ছিলেন না, প্রতিভাময়ী গায়িকা ও গল্পকার হিসবে তাঁর খ্যাতি ছিল। দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর খোঁজখবর রাখতে তিনি সবিশেষ কৌতূহলী থাকতেন। এহেন পিতা-মাতার প্রত্যেক সন্তান-সন্ততিই ছিলেন বৌদ্ধিক জগতে ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এক একজন দিক্‌পাল।

ঘরে শিক্ষাগ্রহণের পর সরোজিনীকে মাদ্রাজে পাঠানো হয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতির জন্য। বারো বছর বয়সে মাদ্রাজ ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। ইংরেজি ভাষায় দীর্ঘ নাটিকা রচনা করার জন্য নিজাম বাহাদুরের কাছ থেকে বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য তিনশো পাউন্ড বৃত্তি পান। ইংল্যান্ডে কিংস কলেজে ও পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজে তিন বছর পড়াশোনার পর ১৮৯৮-এ মাদ্রাজে ফেরেন। বিদেশে বৃত্তিভোগী ছাত্রী হিসেবে বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয় রাখতে পারেননি, যেহেতু সময়ের বেশির ভাগই কাটিয়েছেন কবিতা পড়া ও লেখায় কবি-সমালোচকদের সান্নিধ্যে তাঁর কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনা ছাড়াও ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখার জন্য তাঁকে 'প্রাচ্যের নাইটিঙ্গেল' নামে অভিহিত করা হয়।

বিলেত থেকে হায়দরাবাদে ফেরার পর ভিন্ন জাতের মানুষ ড. মোতিয়ালা গোবিন্দরাজলু নাইডু-র সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স টায়ে টায়ে উনিশ, চার বছর আগেই ড. নাইডুর সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মজার কথা হলো যে 'স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুসারে সে-রাজ্যে তাঁদের বিবাহটিই (ভিন্ন জাতের মধ্যে) ছিল প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৯০১-১৯০৪ সময়কালে তিনি চারটি সন্তানের জন্ম দেন : জয়সূর্য, পদ্মজা, নীলমণি ও রণধীরা। চিকিৎসক স্বামীর উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে স্ত্রী, জননী ও সেবিকার কর্তব্য পালনের মধ্যেই দিন কেটে যায়। কিন্তু তাঁর চঞ্চল প্রাণপ্রাচুর্য প্রাত্যহিক অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ করতে চায়। গৃহস্থালীর শ্রমসাধ্য নীরস কাজের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কবিতা প্রকাশ করা শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'The Golden Threshold' প্রকাশিত হয় ১৯০৫-এ। পরের বছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা দেন। একই সময়ে কলকাতাতেই 'ইন্ডিয়ান সোশাল কনফারেন্স'-এ 'দ্য এডুকেশন অব্ দ্য ইন্ডিয়ান উইমেন' বিষয়ে বক্তৃতা বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সময়ে ভারত সরকার তাঁকে 'কাইসার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক দিয়ে ভূষিত করেন, যে পুরস্কার তিনি পরবর্তীকালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফেরত দেন।

একাধিক ব্যাধিতে আক্রান্ত সরোজিনী নিজের চিকিৎসার জন্য ১৯১২-র মে মাসে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। প্রায় তিন বছর লন্ডনে থাকাকালীন তাঁর সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ হতো গোপালকৃষ্ণ গোখলে-র। প্রকৃতপক্ষে গোখলে-র সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমেই ভারতীয় রাজনীতির মূলস্রোতে তাঁর প্রবেশ ঘটে। সরোজিনীর কাছ হতে গোখলে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে তিনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য নিজের জীবন নিবেদন করবেন। এটাই যে ছিল তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণ—যা তাঁর পরবর্তী জীবনের রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায়। ভারতে ফিরে আসেন ১৯১৪-র অক্টোবরে। বাবা অঘোরনাথ ও গোখলে-এর মৃত্যুর (১৯১৫) পর তিনি হায়দরাবাদ ত্যাগ করে বোম্বাই-এ থাকতে শুরু করেন। শীঘ্রই গান্ধী, নেহেরু, জিন্না ও গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও তিনি গান্ধীজির একনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন। প্রধানত গান্ধীর প্রভাবে কানপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯২৫) সভাপতিরূপে সরোজিনী তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হন। এই পদে তিনিই হলেন প্রথম ভারতীয় নারী।

আমরা আগেই বলেছি যে ১৯২৩ থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বিঘ্নিত হয়, বহু এলাকা দাঙ্গা-কবলিত হয়। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে সরোজিনীর ডাক পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই বর্ধমানেও তাঁকে আহ্বান করা হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, যদিও এখানে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্য আজও বর্তমান। সেদিন টাউন হলের ভিতরেই তাঁর ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা মত ও ধর্মের অত্যধিক জন-সমাগমের চাপে হলের বাইরে পশ্চিমের খোলা মাঠে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতার সামনে সরোজিনী তাঁর বক্তব্য রাখেন। শ্রোতৃবৃন্দ গভীর মনোযোগসহ সেদিন শুনেছিলেন জাতীয়তাবাদে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী তাঁর বক্তব্য। বহুভাষাবিদ সরোজিনী প্রথমে ইংরাজিতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—ডাঃ নাজেম তাঁকে উর্দুতে বক্তৃতা দিতে দেন। কারণ অধিকাংশ লোক তা ভালোভাবে বুঝতে পারছিলেন না। তিনি যখন ভালো উর্দুতে বক্তৃতা শুরু করলেন, তখন সেই উর্দুও সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। তখন ডাঃ নাজেম তাঁর বক্তৃতার সারাংশ বাংলায় বলে দিলেন। এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ঐক্যের গুরুত্বকে অনুধাবন। তিনি বলেন, কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দু-মুসলিম-এর মধ্যে বিভেদ বাড়াতে সক্রিয় থাকে। আর সেই ফাঁদে পা দিয়ে সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়, এমনকি প্রাণ চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ তিনি পাবনায় সংগঠিত সাম্প্রতিক দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য—'তিনি না হিন্দুর পক্ষে, না মুসলমানের সমর্থনে, তিনি জাতীয়তাবাদের পক্ষে' শ্রোতাদেরকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপিত করে। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের অনুরোধ করেন তাঁরা যেন একে অপরের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং তার মূল সুরকে বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, পারস্পরিক ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ যে-কোনো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই মূল ভিত্তি। তাঁর শান্তি ও ভালোবাসার বার্তা দর্শকের মন হতে সন্দেহের মেঘ দূর করতে সহায়ক হয়।

বর্ধমান শহরে মানুষদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যবন্ধনের পিছনে ধর্মীয় প্রভাব দেখা গেলেও এখানে ধর্মান্ধতার স্থান ছিল না এবং আজও নেই। ধর্মান্ধতার কারণে শহরের জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বড় আকারের কোনো দ্বন্দ্ব বা বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটেনি। এ শহরে মুঘল

আমলে অধিক সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস শুরু করে। শহরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানরা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও মুসলিম সমাজের, বিশেষত কয়েকটি মুসলিম পরিবারের ভূমিকা আজও স্মরণীয়। সেদিনও মুসলমান জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী চেতনায় কতখানি ঋদ্ধ ছিল তা জানার জন্য ইয়ংমেনস্ মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন সরোজিনীকে যে ভাষায় সংবর্ধনা জানিয়েছিল তার কিছুটা উল্লেখ থাকা দরকার :

> সরোজিনী দেবী, যুবদের প্রেরণাদাত্রী, ঐক্যের মশালবাহিকা, ভগিনী,
> এই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহরের মুসলিম যুবসমাজের পক্ষে আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তোমাকে জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন। তোমাকে পেয়ে আজ আমাদের হৃদয় এতটাই আবেগাপ্লুত যে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর উপযুক্ত ভাষা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, তোমার সৌন্দর্যমণ্ডিত হৃদয়ের মহানুভবতা আমাদের আপাত অভদ্রতা ও রূঢ়তাকে অগ্রাহ্য করবে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের মাঝে তোমার সাময়িক অবস্থান নিশ্চিতরূপে ফলপ্রদায়ী হবে; বাংলার গৌরব, যা ভীতিপ্রদ সাম্প্রদায়িক ক্ষয়রোগের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তা আবার দেখা যাবে, দীপ্ত ঐক্যের চিরস্থায়ী অগ্নিশিখা আবার ঝিলিক দেবে। আমরা একান্তরূপে প্রার্থনা করি যে, শান্তি ও প্রাচুর্য আবার আমাদের গৃহকোণে অবস্থান করবে, আবার একবার আমাদের সোনার বাংলা 'শান্তিনিকেতন' (চিরস্থায়ী শান্তির আশ্রয়স্থল) হয়ে উঠবে।
> আল্লা তোমাকে দীর্ঘজীবী করুক যাতে ভবিষ্যতে তুমি আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পার, চালনা করতে পার শান্তির পথে।

সেদিনের (১৯২৬-র আগস্ট) সরোজিনী দেবীকে বর্ধমানবাসী তাদের 'আপনজন' হিসেবে কেমন সংবর্ধনা জানিয়েছিল, প্রত্যুত্তরে 'শান্তি মিটিং'-এ তিনি কী বার্তা দিয়েছিলেন— তা সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এরপর আবার একবার আমাদের তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। সংক্ষিপ্ত আকারে আরও কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ না করলে লেখাটির অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

ভারতের স্বাধীনতার তাৎপর্য বোঝাবার জন্য সরোজিনী ১৯২৮-এ আমেরিকাবাসীদের সামনে বক্তব্য রাখেন। ১৯৩০-এর ১৫ মে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে গ্রেফতার হয়ে ছাড়া পান। কিন্তু ৬ দিন পরে ২৫০০০ সঙ্গী নিয়ে পুনরায় দর্শনা যান। সেবার দর্শনার ইতিহাসে থেকে যায় তাঁর নেতৃত্বে চরম পুলিশী বর্বরতার মুখে নারীর এক আশ্চর্য অহিংস প্রতিবাদ। তাঁর দীর্ঘ কারাবাস হয়। ১৯৩১-এ কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ১৯৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এক বছর পর ১৯৩৩-এর এপ্রিলে মুক্তি পান। দীর্ঘকাল AIWC-এর সদস্যা ছিলেন। দিল্লিতে লেডি আরউইন কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পুণায় আগা খান প্রাসাদে অন্তরীণ থাকেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সংযুক্ত প্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু (১৯৪৯, ২ মার্চ) সে দায়িত্ব পালন করেন।

জন্মসূত্রে সরোজিনী বাঙালি হলেও কর্মসূত্রে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান ভারতীয় চরিত্র। কর্মের খাতিরে ভারতে এবং ভারতের বাইরে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সবার উপরে ইংরেজি ভাষায় বাগ্মিতার জন্য তিনি ছিলেন যশস্বিনী। তাঁর বক্তৃতা যেমন ছিল বুদ্ধিদীপ্ত তেমনি মাধুর্যমণ্ডিত। ভাষণের ছত্রে ছত্রে নির্ভীকতা ও দেশপ্রেম ফুটে উঠতো। তাঁর জীবন-পরিক্রমা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, জীবনভোর তিনি কোনো নির্বাচনী পদের জন্য দৌড়াননি। স্বাধীন ভারতে প্রথম মহিলা রাজ্যপাল হিসেবে নিজেকে একজন পরিহাসপ্রিয় ব্যক্তি (জোকার) বলতেও দ্বিধা করেননি।

সরোজিনী এক সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ, কর্মতৎপর এবং দৃপ্ত জীবন অতিবাহিত করে ৭০ বছর বয়সে ১৯৪৯ সালের ২ মার্চ পরলোক গমন করেন। এক দীর্ঘ জীবনযাপনই তাঁর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না এজন্য যে, তিনি জীবনব্যাপী ছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্যের শিকার। তিনি ভুগেছেন বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হৃদয়ঘটিত রোগ, বাত, কটিবাত, স্নায়ুর বিশৃঙ্খলা, ম্যালেরিয়া, মেরুদণ্ডের আঘাত, মাথাধরা ইত্যাদি। বলা ভালো যে তাঁর নিজের জীবনের প্রতি তীব্র আসক্তি সম্বন্ধে সরোজিনী নিজেও সচেতন ছিলেন, যা তাঁকে বিচিত্র রকমের অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা যুগিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. বিনয় চৌধুরী, *অতীতের কথা কিছু অভিজ্ঞতা*, এন.বি.এ. ১৯৯৮
২. এম. আর. পরানজাপে, *সরোজিনী নাইডু, সিলেকটেড পোয়েট্রি এন্ড প্রোজ*, রূপা অ্যান্ড কোং, ২০১০
৩. 'অমৃতবাজার পত্রিকা', জুলাই-আগস্ট (প্রত্যহ), ১৯২৬

লেখক : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ইতিহাসসন্ধানী

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

অন্নপূর্ণা এন্টারপ্রাইজ

প্রো. গৌতম চ্যাটার্জী

উখড়া রোড, অণ্ডাল মোড়, পশ্চিম বর্ধমান

Sl. No. 135

With best compliments of

GULSON CONSTRUCTION

CIVIL, REFRACTORY, MECHANICAL & GENERAL ORDER SUPPLIERS

In Front of Hindustan Refractories
Sagarbhanga (Near 112 No. Rail Gate)
Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman

Sl. No. 122

With best compliments of

Shree Balaji Glass MFG Pvt. Ltd.

SALANPUR, DENDUA, PASCHIM PARDHAMAN

Sl. No. 48

জালিয়ানওয়ালাবাগ : কবি-কথা

দেবেশ ঠাকুর

এক.

উনিশশো এক-এ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র আঠারো বছরের মধ্যে একটা আশ্রমিক বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং মূলত একজন মানুষের একক চেষ্টায় এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। অর্থ, জনবল, রাজশক্তি ইত্যাকার বহুবিধ সহযোগিতা থাকলে অন্য কথা।

উনিশশো আঠারোয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। রচনার শিরোনাম আর বিশ্বভারতীর প্রেক্ষাপট আপাতভাবে অসঙ্গত মনে হতে পারে। কিন্তু এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট। অন্তত এই সময় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে রাজশক্তির বিরোধিতা করা আর বৃক্ষমূলে কুঠারাঘাত প্রায় সমার্থক। একজন একক মানুষের অনন্য যাত্রাপথে মাত্র আঠারো বছর! আশ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-তিন জন ছাত্র নিয়ে পথ চলা। এই কর্মযজ্ঞ মহাসমুদ্রে অবশেষে আছড়ে পড়ল বিশ্বভারতী। বিশ্বসাথে যোগে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন বিশ্বনাগরিক। আটই পৌষ, ১৩২৫। বিশ্বভারতীর ভিত্তি গড়ে কবি বললেন, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র বিদ্যার উদ্বোধন। বললেন, মানব সংসারে জ্ঞানালোকে দেওয়ালি উৎসব চলছে। বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। তিনি জানতেন পরগাছার মতো ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরদেশীয় বনস্পতির ছায়ায় দুলছে, তাই বিশ্বভারতী হবে দেশের মাটিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বুনিয়াদ। ঘোষণা করলেন—‘‘এই আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি বিশ্বভারতী নাম দিবার প্রস্তাব করিতেছি।”

দুই.

এই সময় ভারতের বড় দুর্দিন। প্রথম মন্ট-ফোর্ড পরিকল্পনা তারপর কদর্য রাওলাট অ্যাক্ট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চারিদিকে ভাঙা স্বপ্ন। চারিদিকে বিপন্ন মানুষ। পৃথিবী টুকরো হচ্ছে কাঁটার বেড়ায়। অক্ষশক্তি একদিকে, মিত্রশক্তি অন্যদিকে হুংকার ছাড়ছে। দাম বাড়ছে অন্নের। নিত্যপণ্যের। মজুরি নেই। লক্ষ লক্ষ বেকার। কর্মহারা শ্রমিকের হাহাকার উঠছে সারা দেশে।

পাঞ্জাবের পল্লিতে বলপূর্বক লঙ রুটমার্চ। কামগাটমারু জাহাজে যুদ্ধ-ফেরত পাঞ্জাবিদের ওপর আক্রমণ। প্রতিবাদে জনকল্লোল। যুদ্ধফেরত, শারীরিকভাবে ক্ষতবিক্ষত সৈনিকেরা মানবে না আর শাসকের ইচ্ছেমতো নির্দেশ। তুরস্কে খিলাফত আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারতীয় মুসলিম সমাজ বিচলিত।

দেশজুড়ে ধিকি ধিকি আগুন যেন বিস্ফোরণ প্রতীক্ষায়। ঘুমিয়ে থাকা দেশবাসী জেগে উঠছে প্রতিবাদের উন্মাদনায়।

৬ ফেব্রুয়ারি পেশ হল রাওলাট আইন। বাংলা ও পঞ্জাব প্রদেশে আন্দোলন শুরু হল। জনরোষ ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। গান্ধিজি বললেন, এ অন্যায়, ভারতবাসীর স্বাধীনতার

পরিপন্থী। শুরু করলেন সত্যাগ্রহ। উপেক্ষা করলো ইংরেজ সরকার। গান্ধিজির এই 'সত্যাগ্রহ'-র লক্ষ্য আর উপলক্ষ্য বুঝতে সাধারণ মানুষ দিশাহারা। সবকিছু উপেক্ষা করে পাস হলো রাওলাট অ্যাক্ট। এক বীভৎস আইন। শুধু দেশবিরোধী নয়, মানবতাবিরোধী। গান্ধিজি বললেন, বর্জন করো এই আইন। এই আইন সত্যের পরিপন্থী। মুসলিম লিগ আর কংগ্রেস চাইছিল পূর্ণ স্বরাজ। গান্ধিজি বা মন্ট-ফোর্ডকে না বেছে কেন বাছলেন শুধুমাত্র রাওলাট অ্যাক্ট, এর ব্যাখ্যা তিনিই জানেন। সাধারণভাবে মনে হয় যখনই কোনো আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, মানুষের আবেগ তীব্রতর হয়, তখনই গান্ধিজির সত্যাগ্রহ অথবা অসহযোগ শুরু হয়। একথা ঠিক হতে পারে নাও হতে পারে, হিংসা দিয়ে হিংসা জয় করা যায় না। অসহযোগ আন্দোলনের ফল সুদূরপ্রসারী। কিন্তু কিছু আন্দোলন ইংরেজের অত্যাচারের ভিত্তিমূলে আঘাত না করলে শাসনের মেয়াদ আরও দীর্ঘদিন চলত। ছোটোখাটো গণবিস্ফোরণের একটা মেয়াদি প্রতিফলন আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বজোড়া নানাবিধ আন্দোলন আন্তর্জাতিক চেহারা পাচ্ছিল।

তিন.

চারিদিকে মিছিল, জমায়েত, মিটিংয়ের ফলে আন্দোলনকে পূর্ব-পরিকল্পিত রূপরেখা-প্রসূত বলা যাবে না। আন্দোলন তীব্রতর হলে নেতৃত্বের হাতে রাশ থাকে না সব সময়। সংঘর্ষ বেড়েই চলে প্রতিদিন। অমৃতসর, বোম্বাই, আমেদাবাদে রক্তের বন্যা বয়ে গেল।

দিল্লি যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার হলেন গান্ধি। আগুনে ঘি পড়ল। আগুন জ্বলে উঠলো সারাদেশে। অমৃতসর কাসুর গুজরানওয়ালায় তীব্রতর আন্দোলনে শামিল হলেন কয়েক হাজার মানুষ। দাবি একটাই—এ দেশ আমাদের। তোমরা কে, শাসন করো আমাদের!

পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর ও. ডায়ার বললেন, দমন করো, পীড়ন করো। নিকেশ করো। মাথা তোলার আগেই অবদমিত করো।

আন্দোলনের ঝঞ্ঝা দেখে গান্ধি কি আতঙ্কিত হলেন? কিন্তু তখন মুক্তধারার শাসন ধনঞ্জয়ের হাতে। বাধ বাঁধে এমন বিভূতি কই!

চার.

এতশত আন্দোলনের তরঙ্গে দেশ যখন হলো উথাল-পাথাল, কোথায় তখন রবীন্দ্রনাথ? কোথায় তখন মানবতার বিশ্ববিবেক? সিটিজেন অব দ্য ইউনিভার্স কী-ই বা ভাবছেন তখন? পাঞ্জাব থেকে বহুদূরে কখনো শান্তিনিকেতনে কখনো কলকাতায়, অনুভব করছেন আন্দোলনের গতিবেগ। প্রতিদিন নতুন নতুন খবর পাচ্ছেন। সবকিছু দেখে যাচ্ছেন। বিচার করছেন নিজের ঘরানায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রম্যাঁ রলাঁর মূল্যায়ন, আত্মশিক্ষায় শিক্ষিত, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

সরাসরি রাজনৈতিক কর্মসূচি যাকে বলে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ অত্যন্ত কম। সচেতনভাবেই কম। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গে সরাসরি যোগদান, পরবর্তীকালে সেখান থেকে ফিরে আসা, উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। স্বাদেশিকতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়'—দুটি উপন্যাসে তাঁর সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অবস্থান এতটুকু বদলায়নি।

সেই সময় জালিয়ানওয়ালাবাগের আন্দোলনের দিনলিপি দেখে তীব্র আত্মদহনে ভুগছেন। মন পুড়ছে প্রবল দাহে। হিংসা দেখে বলে যাচ্ছেন, শক্তির প্রকাশে কোনো যুক্তি নেই। যেন রথের সামনে অন্ধ ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে অলক্ষ্যে। হিংসা দিয়ে হিংসা জয়, রক্ত দিয়ে রক্ত জয়, হত্যা দিয়ে হত্যা জয়, এসব শুধু মানবতার বুকের ওপর অমানবতার দাপট। যুদ্ধ লড়া বীরের ধর্ম। কিন্তু যুদ্ধোন্মাদেরা আমোদিত রক্ত নিয়ে হোলি খেলতে গিয়ে। কোথায় যেন মনে হচ্ছে কবির বাগ্মিতা নেতার থেকে অনেক বেশি যুক্তিগত। অনেক বেশি সত্যগত। গান্ধিজিকে লিখে দিলে, স্বাধীনতা অধিকার। দয়া বা করুণাতে স্বাধীনতা আসবে কেন! হঠাৎ হঠাৎ সত্যাগ্রহ, হঠাৎ হঠাৎ প্রত্যাহারে কবির মনে হচ্ছিল, দ্বিধা—দ্বিধার ওপর জাতির বাঁচা মরা দোদুল্যমান।

পাঁচ.

জনগণের চোখের ভাষা, একটা কিছু করতে হবে, শত্রু যখন চৌকাঠে হয় তাকে মারতে, না হয় মরতে হবে। মরতে মরতে জনগণের হাতে নখে তীক্ষ্ণ ছুরি। চোখে তখন দহন আনে, মানুষ পোড়ায় সে তন্দুরি। মরতে মরতে দু-চোখে নীল স্বপ্ন দেখে স্বাধীনতার। একটা ধ্বনিই কানে বাজে জয়যাত্রা মানবতার। মানবতা যখন মরে কাল বিষে কালিদহে, নীলকণ্ঠ থামাবে বিষ! অনশন বা সত্যাগ্রহে! যখন পোড়ে বসত তোমার, বসন তোমার যখন পোড়ে, বজ্রমুঠি তখন তোল, কণ্ঠ ছাড়ো প্রবল জোরে। যুদ্ধ যখন সামনে তখন মরবে নাকি অপঘাতে? তূণীর বর্ম বাগিয়ে ধরো অমাবস্যার আঁধার রাতে।

ছয়.

পয়লা বৈশাখ বাঙালির নববর্ষের উৎসব। পাঞ্জাবের আনন্দের দিন। আনন্দে সামিল হবে বলে প্রায় দশ হাজার সাধারণ মানুষ গ্রামবাসী সমবেত হলেন অমৃতসরে-জালিয়ানওয়ালাবাগে। এই সব খেটে খাওয়া মানুষের বেশিরভাগ জানতো না মন্ট-ফোর্ড। জানতো না রাওলাট অ্যাক্ট। জানতো না গান্ধিজির সত্যাগ্রহ। জানতো না লাহোর অমৃতসরে পুলিশের গুলি চালনা। জানতো না অমৃতসরের শান্তি রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত এডওয়ার্ড হ্যারি ডায়ার সারা শহরে নিষিদ্ধ করেছেন যাবতীয় সভা-সমাবেশ।

নতুন বছরে আনন্দে মেতেছে মানুষ। আকবর বাদশার পয়লা বৈশাখ তখন শুধু বাংলা আর পাঞ্জাবে সাড়ম্বরে পালিত হয়। সাধারণ মানুষ আনন্দের সঙ্গে নববর্ষ উদ্‌যাপন করছে। শিশু, বৃদ্ধ বাগানের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধেরা জানতেন না কী ভয়ংকর ভবিতব্য অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য। যে ঘটনাকে পরবর্তীকালে রুডইয়ার্ড কিপলিং সহ বহু সুধীজন পরিকল্পিত জমায়েত হিসেবে গণ্য করেছেন, তা কতখানি অর্থহীন, সমকালে চার্চিলের চিঠি থেকে বোঝা যায়।

যাই হোক, জমায়েত দেখে এগিয়ে এলেন জেনারেল ডায়ার। সঙ্গে গোর্খা রেজিমেন্ট। প্রথমেই পরিকল্পনামাফিক বাগানের মূল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। জালিয়ানওয়ালাবাগের সামনের রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। এরপর গোর্খা রেজিমেন্ট-এর গোলাবর্ষণ শুরু হলো। এরা স্থানীয় ভাষা বোঝে না। ডায়ারের আদেশ পালন করা ছাড়া গোর্খা রেজিমেন্টের দ্বিতীয় পন্থা ছিল না। নিরীহ চাষি, শিশু, রমণী, বৃদ্ধের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হল। হত্যা-হত্যা। নির্মম হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে অসহায় মানুষের ওপর। বাইরে যাবার দরজা বন্ধ। ছুটে আসছে গুলি। কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ছে কুয়ার মধ্যে। কেউ দৌড়চ্ছে শিশুকে বুকে আঁকড়ে ধরে। দেওয়ালে ছিটকে লাগছে মানুষের মাথার ঘিলু। হাজার হাজার শিশু-নারীর কান্নার আর্তনাদ। একসময় গুলি ফুরিয়ে গেল গোর্খা রেজিমেন্টের। বাগানের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে দিশেহারা মানুষ। জানিনা সেদিনের অসহায় মানুষের আর্তনাদ ওয়েস্টমিনস্টারে পৌঁছেছিল কিনা! সরকারি হিসাব অনুযায়ী মৃত্যু এগারোশোর বেশি। গুলিতে জর্জরিত আহত ও পঙ্গু

মানুষের সংখ্যা কয়েক হাজার। এতেও অতৃপ্তি ডায়ারের মুখে। আরো গুলি থাকলে দশ হাজারকেই নিকেশ করা যেত।

জালিয়ানওয়ালাবাগ। ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯।

মাটিতে রক্তের স্রোত। আকাশে সালফার গন্ধ।

কালো ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ। মানুষ আজও খোঁজে আপন জনের মৃতদেহ। আত্মজনের লাশ। এই রক্ত-জমাট মাটি কয়েকদিন পর কপালে ঠেকিয়ে এক কিশোর সেদিন বলেছিল, এর প্রতিশোধ আমি নেব। বালকের নাম ভগৎ সিং। সে অন্য কথা। অন্য সময়।

এত রক্ত ঝরানোর পরও পাঞ্জাবের গভর্নর ডায়ার আর জেনারেল ডায়ার শান্ত হতে পারছেন না। চৌদ্দ এপ্রিল পাঞ্জাবে জারি হলো সামরিক শাসন। গুজরানওয়ালায় বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করা হল। যারা বেঁচে ফিরেছিল তাদের মাটিতে নাক ঘষানো হল। হামাগুড়ি দিয়ে শহরের মধ্যে চলতে বাধ্য করা হল। সারাদিন গ্রীষ্মের প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। জনসমক্ষে চাবুকের পর চাবুক মারা হল। ইউরোপীয়দের দেখলেই সেলাম দিতে বাধ্য করা হল। কারাবাসে দ্বীপান্তরে পাঠানো হল শত শত মানুষকে। সারা পাঞ্জাব জুড়ে নেমে এলো অবরোধের অন্ধকার। ভারত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল, অবরুদ্ধ হয়ে রইল পাঞ্জাব।

সাত.

রবীন্দ্রনাথের বুকের ভেতর তখন যন্ত্রণার কাঁকড়া কুরে কুরে খাচ্ছে। অ্যান্ড্রুজকে বললেন, আমি পাঞ্জাব যাবো। আমার দেশবাসীর পাশে দাঁড়াবো। তুমি গান্ধীজিকে বলো আমার সঙ্গে যেতে। অ্যান্ড্রুজ সিমলা হয়ে পাঞ্জাব যাবার পথে গ্রেপ্তার হলেন। গান্ধীজি কিন্তু কবির অনুরোধ পাঞ্জাব যেতে রাজি হলেন না। বরং কবির এই তৎপরতায় অপরিণামদর্শিতা উপলব্ধি করলেন। রবীন্দ্রনাথ ভেতর ভেতর পুড়ে যাচ্ছেন। স্বজন হারানোর তীব্র দাবদাহ তাঁর সারা দেহে মনে।

এই সময় রানু অধিকারী সিমলা গিয়েছিলেন বেড়াতে, সপরিবার ছুটি কাটাতে। সিমলার সুন্দর শীতল আবহাওয়ার খবর দিয়ে মনোরম পরিবেশের কথা জানিয়ে কবিকে চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠি পড়ে মর্মাহত কবি বললেন, তোমরা পাঞ্জাবের আগুনের আঁচ পাচ্ছো না? এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠছে। কবির চিত্তে তখন ভারতের খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি অবিচারের ছবি। যাদের জন্য এক সময় লিখেছিলেন, ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা—।

রাজনীতির আঁচ থেকে নানা সময় দূরে থাকতে চাইলেও গা বাঁচিয়ে চলতে পারছেন না। প্রথমেই উল্লেখ করেছি, নির্মীয়মান বিশ্বভারতী তাঁর স্বপ্ন এবং প্রতিবাদের মধ্যে একটি বিশেষ সমস্যা।

২২ মে। সীতাদেবী কবিকে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন!

—যে-রকম চারিদিক উত্তপ্ত, ভিতরে ভিতরে পুড়ে পুড়ে কী করে ভালো থাকবো?

সংবাদপত্র, চিঠির মাধ্যমে পাঞ্জাবের খবর কবির কাছে আসছে। রুচিরাম সাহানির মাধ্যমে সাম্প্রতিক খবর জানা গেল। পাঞ্জাবের এই ঘটনায় ভারতের বিশিষ্ট জনেরা কোনো প্রতিবাদ করবে না। তাঁর অসহ্য লাগছে এটা। গান্ধীজি সরাসরি বললেন, "I do not want to embarrass the government now." শুনে কবি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন।

অনেকে দেখা করতে আসছেন। কবি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। প্রশান্ত মহলানবিশকে বললেন, কাল তুমি এখানে এসো না।

অবাক প্রশান্ত জানতে চাইলেন—কেন?

—তা তোমার জানার দরকার নেই। কাল তুমি আসবে না।

পরের দিন ভোরবেলা প্রশান্তচন্দ্র জোড়াসাঁকো গেলেন। দেখলেন, কবি ঘাড় নিচু করে কিছু লিখছেন। জিজ্ঞাসা করতে কবি বললেন, নাইটহুড পরিত্যাগ করার চিঠি। বললেন, সারারাত ঘুমোতে পারিনি। ব্যস, এখন চুকলো। আমার যা করবার তা হয়ে গিয়েছে। গান্ধীজি রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে, এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ সভা ডাকো। আমি নিজেই বলছি যে আমি সভাপতি হবো।

চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে। বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তারপরে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট।

আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সবচেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা ডাকা হোক।

বুঝলুম, ওদের দিয়ে হবে না। তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই বলে চলে এলুম। অথচ আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে। কিছু করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি, তবে লোক জড়ো করার দরকার কী? আমার নিজের কথা নিজের মতো করে বলাই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেলে। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।

প্রশান্ত কুমার মহলানবীশ লিখছেন—'আস্তে আস্তে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলুম। অ্যান্ড্রুজ সাহেব এলেন। বড়লাটকে তার পাঠানো খবরের কাগজে দেওয়ার জন্য কপি তৈরি করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।'

—রামানন্দবাবুকে এক কপি এনে দিলুম। এই সব করতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল।

অ্যান্ড্রুজ চিঠির ভাষা একটু নরম করতে বলায় কবি কঠোর চোখে তাকালেন তাঁর দিকে। অ্যান্ড্রুজ লিখছেন—'Such a look I had never seen in the eyes of Gurudev before or after.' কবি পদত্যাগপত্রে লিখেছিলেন—

The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous context of humiliation and I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of Kinghthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King and the hands of your predecessor.

Yours faithfully,

Rabindranath Tagore

লেখক : শিক্ষকগবেষক ও সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সুবর্ণ রাইস মিল

খেতুরা, গলসি, বর্ধমান

যোগাযোগ

৯৪৩৪১২৪৭১২, ৯৭৩২১৮৯২৬৬, ৯৭৩২২৪৯১৭৫

Sl. No. 102

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সবার আশীষে

প্রোঃ সেখ তাজউদ্দিন

পায়খানার রিং, ডাবা, খুঁটি পাওয়া যায়।

তীরীঙ্গা মোড়, বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৮৩২১৮৫৪১১

Sl. No. 100

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার (যুবকল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত)

গলসী ব্লক যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নীলকণ্ঠ ভবন, পুরাতনচটি, গলসী বাজার, পূর্ব বর্ধমান

Mob. : 9064781261, 8515912156, 8116551970

Sl. No. 101

Happy Puja Greetings from

United Agri Tech. Pvt. Ltd.

Galsi (East), NH-2, Dist. Purba Bardhaman

Sl. No. 103

ঝোড়ো যুগের দিনলিপি

বীরেন ঘোষ

বর্তমানের অস্থির সময়ে বহুমুখী আক্রমণের মুখে বাংলার বুকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে সন্ত্রাস ও আক্রমণকে প্রতিহত করে এগিয়ে চলার পথে সত্তর দশকের আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের যুগে লড়াই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আজকের নতুন প্রজন্মের কর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। সেদিনের চলার পথের অসংখ্য অভিজ্ঞতার কয়েকটি রক্তাক্ত স্মৃতি— 'ঝোড়ো যুগের দিনলিপি'

■ **বাবাকে গাছে বেঁধে গুলি করে খুন করতে দেখেছিল সাত বছরের মেয়ে**

''তোমরা আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন?'' বলতে বলতে বাড়ির উঠান পেরিয়ে বাগানের দিকে যেতেই পরপর গুলির শব্দ শুনে সাত বছরের ছোট্ট মেয়েটি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার মধ্যেই জ্ঞান হারিয়েছিল। কাছেই তখন বাগানের মধ্যে গাছের সাথে হাত-পা বেঁধে কংগ্রেসি ঘাতকেরা তার বাবা আহম্মদ মল্লিককে কাছ থেকে পরপর গুলি করে নৃশংসভাবে খুন করেছিল।

সত্তর দশকের আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের যুগে বর্ধমানে পা রাখার জায়গা করতে কংগ্রেসি ঘাতক বাহিনী শহর থেকে গ্রাম—বর্ধমানের শিবশংকর (কালো) চৌধুরী থেকে ভবদীশ রায়, কালনার মহাদেব ব্যানার্জী থেকে গফুর সেখ, বৈদ্যনাথ মুর্মু, নারায়ণ দুলে থেকে লক্ষ্মী নায়েক, আহম্মদ মল্লিক—প্রায় প্রতিদিন চলেছে হত্যা অভিযানে মৃত্যুর মিছিল। কংগ্রেসি ঘাতক বাহিনীর হাতে কালনা থানার ৪২ জন গণআন্দোলনের নেতা ও কর্মীকে শহিদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

সুলতানপুর বাজারে ১৯৭১ সালের ২০ অক্টোবর জনসভায় বক্তৃতারত সিপিআই(এম) নেতা মনসুর হবিবুল্লাহকে লক্ষ্য করে কংগ্রেসি গুণ্ডাবাহিনীর ছোঁড়া গুলিতে মৃত্যু হয় ন'পাড়া গ্রামের খেতমজুর কর্মী বৈদ্যনাথ মুর্মুর। তারপর শুরু হয় গ্রামে গ্রামে পুলিশ ও গুণ্ডাদের হামলা। এইরকম এক সশস্ত্র হামলায় ন'পাড়া গ্রামের জওয়ান কৃষককর্মী আহম্মদ মল্লিক পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় এলাকা ছেড়ে চিকিৎসার প্রয়োজন মুর্শিদাবাদে আত্মীয়বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হন। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সেখান থেকে কাটোয়া সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে (খড়ের বাজার) আসেন। সেখানে আমরা কয়েকজন এলাকাছাড়া কমরেড একসঙ্গে ছিলাম। রাত্রিতে আহম্মদভাই বললেন, 'কমরেড, আমার ন'মাসের কচি মেয়েটাকে চোখে দেখিনি—মেয়েটাকে এক ঝলক দেখতে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন। রাতের অন্ধকারে বাড়ি গিয়ে মেয়েটাকে একবার দেখেই ফিরে আসবো। আমরা বারণ করতাম—গ্রামের অবস্থা ভালো নয়—এখনও সেখানে 'হায়নার আনা গোনা....'

আহম্মদ ভাইকে আমরা বিরত করতে পারিনি। জন্মের পর যে মেয়েকে চাক্ষুষ দেখতে পারেনি, সেই মেয়ের প্রতি দুরন্ত টানেই আহম্মদ ভাই বাড়ি গিয়েছিলেন—কিন্তু আর ফিরতে পারেননি। ১৯৭২-এর ৮ মে কংগ্রেসি খুনে বাহিনীর বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল তাঁর জোয়ান দেহটা।

কন্যার আর্তি—আমার বাবাকে নিয়ে যাচ্ছ কেন, না অশক্ত বৃদ্ধ পিতার আকুল আবেদন জল্লাদদের টলাতে পারেনি। গাছে বেঁধে পরপর গুলি করে আহম্মদ ভাইকে হত্যা করা হয়। তার মৃতদেহও পরিবার পায়নি। পৈশাচিক নির্মমতায় তার দেহ লোপাট করে দেয়।

এই ধরনের নৃশংস বর্বর আক্রমণ ছিল কালনার গ্রামের রোজনামচা। আহম্মদ মল্লিক সহ সুলতানপুর অঞ্চলেই খুন হয়েছিলেন মঞ্জুর আলি (ভাটরা), ভোলা প্রামাণিক, গোলাপ ঘোষ (রেলেরহাট), বৈদ্যনাথ মুর্মু (ন'পাড়া), গোপাল কোঁড়া, কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা (গোপালপুর), হরিপদ বাগ (খাঁপুর) প্রমুখ ৮ জন যুবক-খেতমজুর কর্মী। লাগোয়া বাঘনাপাড়া অঞ্চলে ১০ জন কর্মী শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। ৪২ জন মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের রক্তস্নাত শহিদ তীর্থ কালনা থানার সুলতানপুরের বীরভূমি ছিল কৃষক আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি। জমি, মজুরি আন্দোলনের সাথে সাথে অধিকার রক্ষায় শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ আন্দোলনে সুলতানপুর ছিল অগ্রণী ঘাঁটি। তাই সুলতানপুর ছিল শাসকশ্রেণির টার্গেট।

একইভাবে ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের টার্গেট সুলতানপুর। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে সুলতানপুর রেলহাট বাজারে তৃণমূলের সশস্ত্র বাহিনী দুটি পার্টি অফিস দখল করে নেয়। বিধানসভার প্রার্থী, পার্টি নেতার বাড়ি সহ বিভিন্ন গ্রামে, গরিব পাড়ায় সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। ভাঙচুর, লুঠ, মারপিট, জরিমানা আদায়, মিথ্যা মামলা, নানা ভাবে সন্ত্রস্ত করে তোলা হয়। এসব আক্রমণের মধ্যেও সুলতানপুরের মানুষ জোট বাঁধছেন। সুলতানপুর দেখছে সত্তর দশকের খুনে বাহিনীরাই তৃণমূল কংগ্রেসের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। সুলতানপুর তার রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় দেখছে—

''শহিদের খুনে রাঙা পথ
হায়নার আনা গোনা...''
সুলতানপুর জেগে উঠছে—
সালতানপুর জোট বাঁধছে :
হুঁশিয়ার
ও সাথী, কিসান মজদুর ভাইসব....

■ **‘আমার নাবালক ছাওয়ালডারে জেলে ঢুকাইলি ক্যান?’**

সত্তর দশকের পশ্চিম বাংলার অমানবিক বধির প্রশাসনের কাছে অসহায় বন্দি পিতার আকুল আর্তি বর্ধমান জেলখানার লৌহকপাটে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে—‘‘আমার নাবালক ছাওয়ালডারে ৪নং সেলে আমার কাছে ফিরায়ে দে।’’ কালো বেঁটে, পেটাই চেহারার ৫০/৫৩ বছরের কালনা থানার ফড়িংগাছি গ্রামের যোগেন দাস। ১৯৭২ সালের অক্টোবরে এলাকাছাড়া হয়ে আত্মীয়বাড়ি যাবার পথে সূর্যপুর গ্রামে আরও অনেকের সাথে নাবালকপুত্র (সুনীল দাস) সহ গ্রেপ্তার হন। তাঁর নামে ১২টা সাজানো মামলা দেওয়া হয়। কয়েকটি কেসে জামিন পাবার পর তাকে ‘কুখ্যাত’ মিসা (MISA) আইনে বিনাবিচারে ৬ বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। তার আগে ১৯৭১ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে তাঁর পরিবারের ১জন মহিলা সহ ৬জন সদস্য কংগ্রেসি ঘাতকবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। ১০ অক্টোবর ফড়িংগাছি গ্রামে হামলা করে তাঁর বাড়িঘর ভেঙে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাঁর অপরাধ তিনি বামপন্থী আন্দোলনের একজন দক্ষ সংগঠক। পঞ্চাশের দশকে ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় এসে কালনা থানার সূর্যপুর গ্রামে ত্রাণশিবির বা রিফিউজি ক্যাম্পে পরিবার নিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে উদ্বাস্তু মানুষের নানা দাবি নিয়ে উদ্বাস্তু আন্দোলন গড়ে তোলেন একজন সংগঠক হিসাবে। উদ্বাস্তু আন্দোলনের মাধ্যমে বামপন্থী নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী সময়ে বাঘনাপাড়া অঞ্চলের ফড়িংগাছি গ্রামে অসীম দারিদ্রের মধ্যে কঠিন পরিশ্রমের মধ্যমে ঘর বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ওই এলাকার গরিব মানুষকে সংগঠিত করে জমি, মজুরির আন্দোলন গড়ে তোলায় শাসক শ্রেণির টার্গেটে পরিণত হন তাঁর দৃঢ় প্রতিবাদী চরিত্রের জন্য। তাকে দুর্বল করার জন্য পরিবারের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়।

১৯৭১ সালের ২৮ আগস্ট যোগেন দাসের মামা প্রবীণ দ্বারিকামোহন দাস (যিনি গ্রামে সাধু বলে পরিচিত ছিলেন)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বল্লম দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁর ভগ্নিপতি পার্টি সমর্থক গোপাল দাস বাঘনাপাড়ার একটি চায়ের দোকানে আক্রান্ত হন। তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজালি দিয়ে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে হত্যা করে। যোগেন দাস পার্টিকর্মী হিসাবে সব বাধা প্রতিহত করে আক্রমণ উপেক্ষা করে সংগঠন, আন্দোলন ও প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালনে মাশুল দিয়েই চলেছেন।

১৯৭১-এর ১০ অক্টোবর রক্তের নেশায় মেতে ওঠা কুখ্যাত খুনে বাহিনী প্রকাশ্য দিনের বেলায় সশস্ত্র ভাবে ফড়িংগাছি গ্রামে যোগেন দাসের বাড়ি আক্রমণ করে। যোগেন দাসকে বাড়িতে না পেয়ে তার বাড়িঘর ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বাড়ি থেকে ছেলে উমেশ দাস, দাদা প্রভাত দাস ও ভাগ্নে নিতাই দাসকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। বাঘনাপাড়ায় আকন্দপুকুরে কংগ্রেসী বধ্যভূমিতে হাত-পা বেঁধে বর্বরোচিত ভাবে তিনজনকে হত্যা করে। এতেও তাদের রক্তপিপাসা মেটে না—যোগেন দাস, তার নবালক পুত্র তার সাথে তার ভাই ও ভাইপোকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তার ভাই সুবীর দাস গ্রেপ্তার হয়ে জেলখানায়। ঘরে সদ্য বিবাহিতা ২৪/২৫ বছরের অসহায় তরুণী বধু বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী। ১৯৭১-এর ১৬ অক্টোবর নরপশুর দল ঝাঁপিয়ে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দাসীর উপর। তাকে বলাৎকার করে নৃশংসভাবে হত্যা করে গলায় দড়ি বেঁধে ঘরের আড়ায় টাঙিয়ে দিয়ে যায়। জননী জঠরের লজ্জা নরপশুর দল বর্বরতার এক নিষ্ঠুর নিকৃষ্ট নিদর্শন রেখে যায়। শিউরে ওঠে সমগ্র ফড়িংগাছি। বাঘনাপাড়ার অবরুদ্ধ, ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীর কণ্ঠে অনুচ্চারিত কবির বজ্রবাণী—

‘‘শিশুঘাতী, নারীঘাতী কুৎসিৎ বীভৎস পরে
ধিক্কার হানিতে পারি যেন।’’

আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত অপরাজয়ে যোগেন দাস পরিবারের ৬জনকে হারিয়েও জেলখানাতেও সমান প্রতিবাদী। অল্পশিক্ষিত সাদামাটা গরিব কৃষক যোগেন দাস। নাবালক ছেলেকে কেন মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হল? কেন নাবালক পুত্রকে বাবার থেকে আলাদা রাখা হবে? কেন একসাথে রাখা হবে না? এইসব দাবিতে জেলের ভেতর সোচ্চার যোগেন। তাঁর দাবিতে তাঁর নাবালক পুত্র সুনীল দাসকে (১২/১৪ বছর) যোগেন দাসের সাথে ৪নং সেলে বদলি করতে বাধ্য হয় জেল কর্তৃপক্ষ। পাশের ৫নং সেলে তখন বন্দি ছিলেন পার্টিনেতা বিনয় কোঙার, মহবুব জাহেদি, রামনারায়ণ গোস্বামী, কালিশংকর পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পুত্র সুনীল দাস ১ বছর পর জামিন পেলেও যোগেন দাসকে মিসা আইনে বিনা বিচারে আটক করা হয়। ৬ বছর পর ১৯৭৭ সালে তিনি মুক্তি পান।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আমৃত্যু তিনি বাঘনাপাড়া অঞ্চলে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যোগেন দাসের সাহসিকতা, দৃঢ় মানসিকতা, পুত্র-ভাই-পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের বিয়োগব্যথায় ভেঙে না পড়া অনুকরণীয়। অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস, আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক যোগেন দাস নতুন প্রজন্মের কর্মীদের চলার পথে প্রেরণা যোগাবে।

■ **আমাকে কেউ একটা গুলি দিল না**

১০ মার্চ, ১৯৭২ বিধানসভার নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে। এলাকার বাইরে থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। নাদনঘাট কেন্দ্রে পার্টির প্রার্থী মনসুর হবিবুল্লাহ। সন্ত্রাস-কবলিত এলাকায় প্রচারের সুযোগ কম। তাই গোপন যোগাযোগের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার চলছে। মনসুর সাহেবের বক্তব্য : নির্বাচন গোপনে হয় না, প্রকাশ্যে মানুষের কাছে সাহসের সাথে উপস্থিত হতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম কাকুরিয়া অঞ্চলের সহজপুর বাজারে জনসভা করা হবে। মনসুর সাহেবের ব্যবস্থাপনায় বক্তা ঠিক হল—কমরেড সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাম চ্যাটার্জী (মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক) ও মনসুর হবিবুল্লাহ। আমরা তখন বেগপুর অঞ্চলের ইন্দপুর গ্রামে নদীর ধারে ক্যাম্প করে আছি। জনসভার প্রচার-প্রস্তুতিতে গ্রামে গ্রামে গোপনে লিফলেট বিলি, বৈঠক, প্রচার চলছে। রামপুর-পাথরডাঙা গ্রামে কিছু লিফলেট পড়ে থাকতে দেখে কংগ্রেসি মস্তানবাহিনী রাতের অন্ধকারে পাথরডাঙ গ্রামের খেতমজুর পাড়ায় ব্যাপক হামলা চালিয়ে গরিবদের মারধোর করে, ঘরবাড়ি ভেঙে, এমনকি গ্রামের গরিব মহিলাদের উপরেও হামলা চালিয়ে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। খবর পেয়ে

১৯৭১ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে তাঁর পরিবারের ১জন মহিলা সহ ৬জন সদস্য কংগ্রেসি ঘাতকবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। ১০ অক্টোবর ফড়িংগাছি গ্রামে হামলা করে তাঁর বাড়িঘর ভেঙে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাঁর অপরাধ তিনি বামপন্থী আন্দোলনের একজন দক্ষ সংগঠক।

পরদিন আমরা গদাধর পাল ও জয়দেব মণ্ডল সহ তিনজন ওই গ্রামে গিয়ে দেখি গোটা গ্রাম জুড়ে এক রহস্যময় নীরবতা। খেতমজুর পাড়ায় ভাঙচুর, লন্ডভণ্ড ঘরবাড়ি। পুরুষরা গ্রামছাড়া, কেউ কোনো কথা বলছে না। ভয়ার্ত, থমথমে পরিবেশ। সন্ত্রস্ত পাড়ায় আমরা নিরস্ত্রভাবে ঘুরছি, হঠাৎ পাড়ার একজন আক্রান্ত আহত খেতমজুর মা গুরুদাসী সর্দার ছুটে এসে তার ক্ষতবিক্ষত হাত-পা দেখিয়ে চিৎকার করে বললেন, ''দ্যাখ আমাদের কীভাবে মেরেছে! তোরা কিছু করবি না?'' এই কথাতেই যেন বাঁধ ভেঙে গেল। ভেঙে গেল সন্ত্রাসের ব্যারিকেড। সন্ত্রস্ত ঘর ছেড়ে পাড়ার মেয়েরা বেরিয়ে এলেন। সামনে একটা ছোট খড়ের পালুইয়ের উপর লাফ মেরে উঠেই 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতেই দলে দলে গ্রামের গরিবরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ভয়ের বেড়া ভেঙে। খড়ের পালুই-এর উপর থেকে পথসভার মতো বক্তৃতা—''জোট বাঁধো তৈরি হও। ঘরে ঘরে তৈরি হও।'' আক্রান্ত হলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের অঙ্গীকার নিয়ে তাৎক্ষণিক মিছিল গ্রাম প্রদক্ষিণ করলো। প্রমাণ হল 'বন্দুকের নল নয়—জনগণই শক্তির উৎস।' নতুন আবেগ, উত্তেজনা আর একবুক উৎসাহ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। আমাদের সাথে ইন্দপুর গ্রামের এক কিশোর বালক (১২-১৩ বছরের) ছিল। তার নাম দিয়েছিলাম আমরা 'ফরিয়াদ'। সাহসের সাথে সর্বদা আমাদের সাথে থাকতো। ফরিয়াদ বলল, ''মিটিংয়ে বললেন রাইফেলের বুলেট শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু জনগণ শেষ হবে না। কথাটা সত্যি?'' সেই মুহূর্তে কোনো জবাব দিতে পারিনি।

পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৭২) সহজপুরে জনসভা। সকাল থেকে নানা কৌশলে সভার প্রচার চলছে। কয়েকটা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে স্কোয়াড করে আমরা প্রচার করছি কয়েকজন মিলে। গ্রামের রাস্তায় যাবার পথে মাঠ থেকে খেতমজুরেরা কাজ ফেলে ছুটে এসে কয়েকজনের স্কোয়াডকে কয়েকশোর মিছিলে পরিণত করল—মানুষ উত্তেজনায় ফুটছে। কাদিপুর-সিমলা-ইন্দ্রপুর গ্রামে ঢোকার মুখে গ্রামের মেয়ে পুরুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কলসী করে জল এনে জল ঢেলে মিছিলকে স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের অভিব্যক্তি—''কতদিন লালঝাণ্ডার মিছিল দেখিনি। তোরা গ্রামে গ্রামে মিছিল কর, আমরা আছি।''

দুপুরে আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম রামপুর, পাথরডাঙা, বাঘাডাঙা, ফকিরডাঙা, খরসগ্রাম ইত্যাদি গ্রাম থেকে ইন্দ্রপুর গ্রামে মিছিল সংগঠিত করছি—অন্যদিকে শিমুলগরিয়া ফকিরডাঙা, ঘনশ্যামপুর গ্রাম থেকে কর্পূরডাঙায় জমায়েত হয়ে দুটি মিছিল সহজপুর জনসভায় ঢুকছে। হঠাৎ খবর এল কর্পূরডাঙার মিছিল আক্রান্ত হয়েছে। কমরেডরা বাঁকার ধারে লম্বা গাছের মাথায় উঠে পরিস্থিতি লক্ষ্যে করছিলেন। আমরা খবর পাঠালাম আক্রমণকে উপেক্ষা করে দৃপ্ত মিছিল এগিয়ে যাবে। খবর এল কালনা থানার বিভিন্ন গ্রামের বন্দুক বাহিনী জড়ো হয়ে পুলিশের সহায়তায় সহজপুর বাজার ঘিরে রেখেছে।

বর্ধমান থেকে আগত বক্তাদের মাঝরাস্তা থেকে জোর করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর তাণ্ডবে মিছিল ছত্রভঙ্গ। সভাস্থলের চেয়ার, টেবিল, ফেলে দেওয়া হয়েছে। নাদনঘাট থেকে আনা মাইকও অক্ষত নেই। ইন্দ্রপুর আমাদের ঘাঁটি, সশস্ত্র বাহিনী ইন্দ্রপুর গ্রামে হামলা করতে অসছে আমরা রিট্রিট্ করছি—মিছিলের লোকজন নিয়ে গ্রাম ছাড়িয়ে বাঁকা নদীর ধার—নদী পেরিয়ে ওপারে পূর্বস্থলী থানার খরস গ্রাম। আমাদের লক্ষ্য ওই গ্রাম। কোমর জলে নদী পেরিয়ে ওপারে পৌছাতে দেখা গেল—বোমা বন্দুক হাতে গুণ্ডা বাহিনী নদী পেরোচ্ছে। পুলিশ, সি.আর.পি নদী পাড়ে পাহারায় রয়েছে, আমাদের পিছনে বন্দুক বাহিনী ছুটছে। ওদের হাতের উঁচিয়ে ধরা বন্দুকের ইস্পাতের নলগুলো বিকালের পড়ন্ত রোদে চক্চক্ করছে। ছুটতে ছুটতে মনে হল—আমরা অনেক, ওরা কয়েকজন গুণ্ডা মাত্র। ওদের প্রতিরোধ করা যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলাম—কমরেড, ঘুরে দাঁড়ান, ওদের আমরা ঘিরে ফেলবো। বলেই শ্লোগান ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলার আগেই গুণ্ডাদের বন্দুকের গুলির শব্দ। বন্ধুকের গুলি সোঁ-ও-ও করে আমাদের মাথার উপর দিয়ে সামনে এসে পড়লো। খবর এল একজন কমরেডের রক্তাক্ত দেহ মাঠে পড়ে আছে। ছুটে গিয়ে দেখি শক্তসমর্থ তাজা জোয়ান আম্বিয়া মণ্ডল (খরসগ্রাম) রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠে পড়ে আছে। মুখে গোঁঙানির মতো অস্পষ্ট আওয়াজ—''আমাকে কেউ একটা গুলি দিল না—গুণ্ডারা পালিয়ে গেল....''

প্রতিরোধের কথা শুনে পিছনের দিকে থাকা আম্বিয়া হামলাকারীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজনের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে পাল্টা মারতে চেষ্টা করে। গুণ্ডারা ওর হাত থেকে বন্দুক কাড়তে পারেনি। টাঙ্গি দিয়ে ডান হাতের কবজির উপর কোপ মেরে রক্তাক্ত করে বন্দুক কেড়ে নিয়ে সদলবলে পুলিশের আশ্রয়ে পালিয়ে যায়। নিজেদের গামছা বা জামাকাপড় দিয়ে অচৈতন্য আহত আম্বিয়ার হাত কোনো রকমে বেঁধে ধরাধরি করে খরসগ্রামে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসাবে এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রয়াত হন। সংগ্রামের সাথী সহযোদ্ধা আম্বিয়ার দৃঢ়তা, বীরত্ব, সাহসিকতা আজকের দিনে প্রেরণার প্রতীক হয়ে থাকবে।

লেখক : গণআন্দোলনের সংগঠক ও প্রাক্তন বিধায়ক

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আপনার স্বপ্নের ইমারত গড়তে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রথম পছন্দ

'D.B.F.' মার্কা পগমিল ইট ব্যবহার করুন

দামোদর ব্রিক ফিল্ড

শম্ভুপুর, পোঃ চক্ষণজাদি, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৮০০১৭৬৯১৫০, ৯৭৩২১৬১২০৬

Sl. No. 43

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সোমনাথ কোল্ড স্টোরেজ (প্রা.) লিমিটেড

ইটলা, পর্বতপুর, পূর্ব বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 112

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমবায় সমিতি লি.

তেলিনওপাড়া, পারুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান

কৃষি ঋণ এবং ব্যবসায়িক ঋণ দেওয়া হয় ।। ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়া হয়।

গৌরাঙ্গ দেবনাথ
সভাপতি

মানিক দেবনাথ
সম্পাদক

পঙ্কজ দেবনাথ
ম্যানেজার

Sl. No. 52

With best compliments from

SHYAMALI COLD STORAGE (P) LTD.

Sarul, Galsi, Dist. Purba Bardhaman

Sl. No. 99

With best compliments from

HOTEL PRABHU

Malanchapara Road, (Near Bishnupriya Railway Station) Nabadwip, Nadia
Phone : 9734272272, 9732555015, Web. hotelprabhu.in, E-mail : infor@hotelprabhu.in

AC, Non A.C. Rooms, Tourist spot visit by car (rental), Automated Lift, 24 Hours. Hot and Cold Water, Generator, Fire Safety Accessories, Car Parking, Intercom, Cellphone, Wi-Fi facilities

Sl. No. 4

বিদ্যানগর স্কুলের জন্মকথা

প্রবাল সেনগুপ্ত

বর্ধমান জেলার একেবারে পূর্বপ্রান্তে পূর্বস্থলী ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যানগর গ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল প্রাচীন কাল থেকেই খুব সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। বিদ্যানগর নাম সার্থক করে, নবদ্বীপ সন্নিকটস্থ এই স্থানটি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে থেকেই, সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। প্রচুর টোল/চতুষ্পাঠীর অস্তিত্ব ছিল এখানে। মধ্যযুগে 'বাংলার অক্সফোর্ড' হিসাবে খ্যাত সংলগ্ন নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্রই ছিল বিদ্যানগর। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, নবদ্বীপের সমৃদ্ধির চূড়ান্ত যুগে প্রায় সাতশো পঞ্চাশ জন খ্যাতনামা পণ্ডিত বিদ্যানগরে বসবাস করতেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব এই বিদ্যানগরের বড়কোবলা অঞ্চলের গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে বিদ্যাশিক্ষা করতে আসতেন বলে কথিত আছে। কিংবদন্তি অনুসারে চৈতন্যদেব তাঁর ব্যবহৃত লেখনী মাটিতে রোপণ করার ফলে তার থেকে এখানে একটি বৃক্ষের জন্ম হয়।

বাংলার কুখ্যাত বর্গীদের আক্রমণের প্লাবনে সপ্তদশ শতক থেকেই বিদ্যানগরের আপাত পত্তনের সূচনা হয়। কালনা থেকে কাটোয়া—এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষ সেইসময় বর্গীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে পলায়ন করতে শুরু করে। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো এর কিছু পরেই কুখ্যাত 'বর্ধমান জ্বর'-এর প্রাবল্যে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়—এককালের মধ্যবঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র বিদ্যানগরে নেমে আসে শ্মশানের স্তব্ধতা।

এই কালো দিনের অবসানের জন্য বিদ্যানগরবাসীকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল অনেক কাল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ। দেশ একই সঙ্গে স্বাধীন ও বিভক্ত হল। সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বাংলায় শরণার্থী হিসাবে আসতে থাকল। পূর্বস্থলীর অন্যান্য অংশর মতো বিদ্যানগরের পরিত্যক্ত জমিজমা ও ঘরবাড়ির আকর্ষণে এই মানুষদের একাংশ ছুটে এলো এখানে। বিশেষ করে কৃষক ও তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষদের অভ্যাগমনে অঞ্চলটি আবার জনকল্লোলে মুখরিত হয়ে উঠল।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁরা যেখানেই যাক, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নতুন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করত। তাই স্বল্পশিক্ষিত হলেও, বিদ্যানগরে আগত চাষি ও তাঁতিরা তাঁদের সন্ততিদের জন্য এই অঞ্চলেও অন্ততপক্ষে ন্যূনতম শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছিল। এলাকার আদি বাসিন্দারাও বিদ্যাস্থান হিসাবে বিদ্যানগরের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্য উৎসাহী ছিল। এই দুই ধারার সম্মিলিত চেষ্টায়, বিদ্যানগরে প্রথমে গড়ে তোলা হয়েছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আঞ্চলিক শিক্ষা-অনুরাগী রসরাজ দেবনাথ ও ধীরেন পণ্ডিতমশাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এড্‌ভোকেট বিধূভূষণ চৌধুরীর স্মৃতি রোমন্থন থেকে জানা যায়—এই বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা দেবার মানসে দূর দূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা চাল/ডাল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বিদ্যানগর গ্রামে আসত। তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করত গ্রামবাসীরাই। স্কুলের এমত সাফল্যের ফলে, এক বছরের মধ্যেই বিদ্যানগরের বিদ্যালয়টি মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জুনিয়র হাই এবং পরিশেষে ১৯৫৫-তে হাই স্কুলে পরিণত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।

সেই সময় এক তরুণ শিক্ষাবিদ স্কুলের হাল ধরবার জন্য বিদ্যানগর গ্রামে উপস্থিত হন। প্রধান শিক্ষক পরেশচন্দ্র গোস্বামীর কথাই হচ্ছে। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়টি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। অবশ্য তিনি তাঁর যোগ্য সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন, বামপন্থী জননেতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অনুকূল গোস্বামী, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কালিপদ দাস, কালিকিঙ্কর কর, দেবেন্দ্র বিজয় দেবনাথ, রাজমোহন চৌধুরী, ভগবানচন্দ্র নাথ-এর মতো আঞ্চলিক শিক্ষানুরাগীদের। স্কুলের প্রথম সম্পাদক ছিলেন গয়ারাম দাস। বিদ্যালয়টির মূল ভবনটি প্রথমে তাঁর দেওয়া ভূমিখণ্ডেই গড়ে উঠেছিল। অবশ্য ভবন কথাটি একটু অতিরঞ্জিতই হবে। বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল দশ কাঠা জমির উপর একটি টিনের চাল যুক্ত মাটির ঘর নিয়ে। ক্রমশ গড়ে উঠেছিল স্কুলের অফিস ও প্রধান শিক্ষকের কক্ষ—প্রাথমিক পর্বে অবশ্য সব নির্মাণ ছিল কাঁচা ঘর।

বিদ্যালয়ের প্রথম দিককার শিক্ষক শ্রী তপন পোদ্দারের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী, গ্রামবাসী ও শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে স্কুলটি আক্ষরিক অর্থেই শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে শুরু করল। এর পিছনে বিদ্যালয়টির তৎকালীন শিক্ষকদেরও একটি বড় ভূমিকা ছিল। আজকের যুগে অবশ্য এই আবেগের সবটা আমরা ঠিক অনুধাবন করতে পারব না—কিন্তু সেদিনের সেই কথা ছিল নিখাদ সত্য। নবদ্বীপ শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে জলাজঙ্গল বাঁশবনে ঘেরা, কর্দমাক্ত রাস্তায় পরিপূর্ণ স্কুলটি এই 'আন্তরিকতার' সোপান বেয়েই আস্তে আস্তে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল।

৫০-এর দশকেই কাটোয়ার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সূর্যকুমার চক্রবর্তী বিদ্যালয়টিকে অনুমোদন দেওয়ার যোগ্য কিনা তা বিচারার্থে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে এসেছিলেন। বিদ্যানগরের মোড় থেকে ঘোড়ার গাড়িতে মহাসমারোহে তাঁকে বিদ্যালয়ে আনা হল। প্রতিষ্ঠাতা প্রধানশিক্ষক পরেশচন্দ্র গোস্বামীর স্মৃতিচারণ অনুযায়ী 'মুলো-কলাটা ও একহাঁড়ি টাটকা আখের গুড়ের' কল্যাণে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি বিদ্যানগরের স্কুলটি প্রথমে '2nd class জুনিয়র হাই' এবং ১৯৫৪ থেকে '4th class জুনিয়র হাই স্কুল' হিসাবে স্বীকৃতি পেল। এই সময়েই বাৎসরিক সাতশো কুড়ি টাকা 'Lumpgrant' হিসাবে সরকার থেকে সাহায্য আসতেও শুরু করল। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মূল বেতন না দিলেও, মহার্ঘ্যভাতা দেওয়ার দায়িত্বও স্বীকার করে নিল সরকার।

এরপরেই শুরু হল নবম ও দশম শ্রেণির পঠন পাঠন। নতুন করে ঘর বানানো হল—মুলিবাঁশের বেড়া, মাথায় টিনের ছাপড়া। স্কুলের প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে তৎকালীন 'R. R. Education Department'-এর কর্তা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে 'স্কুলের ভবন' নির্মাণের জন্য বাইশ হাজার টাকা অনুদান হিসাবেও পাওয়া গেল। তৎকালীন বাজারদর অনুযায়ীও ওই টাকায় স্কুলগৃহ নির্মাণ অসম্ভব ছিল। খরচের বাকিটাও অবশ্য যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সবটাই 'Local Contribution'। ইতোমধ্যেই বিদ্যালয়টি শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের অনুমোদন

পেয়েছিল। শেষ অবধি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি নবম-দশম শ্রেণি সমন্বিত স্কুলে পরিণত হয় স্কুলটি। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও জমিদাতা গয়ারাম দাসের সম্মানে স্কুলটির নাম রাখা হয় বিদ্যানগর গয়ারামদাস বিদ্যামন্দির, সংক্ষেপে বিদ্যানগর জি. ডি বিদ্যামন্দির।

এই উন্নয়নের পিছনে তৎকালীন প্রধানশিক্ষক পরেশচন্দ্র গোস্বামীর অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য। শহর থেকে দূরে, এক অজ গণ্ডগ্রামে যে সুবিশাল বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল, তার মূলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছাড়াও প্রথম দিককার অন্যান্য সহশিক্ষকদের অবদানও ভুলবার নয়। সুরেশচন্দ্র নাথ, অরিণি সূদন ব্যানার্জী, অনিলকুমার দেবনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল কুমার দেবনাথ, লেখা ভট্টাচার্য প্রমুখ শিক্ষিক/শিক্ষিকাবৃন্দের এবং সীতানাথ দেবনাথ, অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস প্রমুখের অক্লান্ত ত্যাগের কথা স্বতঃই স্মরণে আসে।

স্কুলের অনুমোদন তো পাওয়া গেল। কিন্তু দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলটিতে প্রচুর মানুষের বসবাস সত্ত্বেও ছাত্র-স্বল্পতায় ভুগছিল প্রতিষ্ঠানটি। দারিদ্র্যের কারণেই অঞ্চলটির 'ছাত্র' হবার উপযুক্ত বয়সীরা অল্প বয়সেই কৃষিকাজ বা তাঁতের কাজের সহযোগী, নিদেন পক্ষে জনমজুরির কাজে লেগে পড়ত। পড়াশোনার মর্ম তাদের বা তাদের অভিভাবকদের বোঝানো সহজসাধ্য কাজ ছিল না। তৎকালীন প্রধানশিক্ষক পরেশচন্দ্র গোস্বামী তাঁর স্মৃতিচারণায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''... বসার জন্য তো ঘর নেই, আর বসবেই বা কে? ছাত্র কোথায়? সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ছাত্র সংগ্রহ, ভগবানবাবুকে সাথে করে, কখনো গয়ারামবাবু কখনো কালিবাবু, আরও কেউ কেউ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছাত্র সংগ্রহ করে বেড়ান। আশে পাশে যদিও কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই, তবু কে আসতে চায়, ঐ রকম চালচুলোহীন একটা স্কুলে? সাধারণের তো লেখাপড়ার আগ্রহ নেই। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ইচ্ছা থাকলেও দারিদ্র্য চরম বাধা।''

অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছ অবশ্য ধীরে ধীরে সব বাধা পরাজয় মানল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকল। বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনেই বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সমাজসেবামূলক শিবির প্রভৃতি আয়োজিত হতে শুরু করল। সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও অঞ্চলে অগ্রণী হয়ে উঠল বিদ্যানগর বিদ্যামন্দির।

অখ্যাত বিদ্যালয়টির ছাত্র দীপক গোস্বামী মহকুমা-ভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হল। সেই প্রথম যুগে সিরাজদৌল্লা নাটকে বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র, পরবর্তীকালে বামফ্রন্টের বিধায়ক মনোরঞ্জন নাথ-এর স্কুল-ক্যাম্পাসে অতুলনীয় অভিনয়ের কথা আজো অঞ্চলের বয়স্ক ব্যক্তিরা স্মরণ করেন। স্কুলের ছাত্র কৃষ্ণবন্ধু নাথ, তাঁর স্কুলবেলাতেই কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। শুধু 'মুখস্থ বিদ্যা' নয়—সৃজনশীল শিক্ষার উপর বরাবরই বিদ্যানগরের স্কুলটি গুরুত্ব দিত। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেই সময়, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, ডাকঘর, মহারাজ নন্দকুমার, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই অভিনয়সমূহ স্কুলের তো বটেই—সামগ্রিকভাবে অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দ্যোতক ছিল। এছাড়াও বসতো সঙ্গীত-নৃত্যের আসর, মঞ্চস্থ হতো যাত্রাপালা।

এই নবীন বিদ্যালয়টি খেলাধূলার ক্ষেত্রেও অল্প সময়ে এত উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল যে, শিক্ষাদপ্তর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুলেই 'বর্ধমান জেলা বিদ্যালয় স্পোর্টস'-এর আয়োজন করে। স্কুলে নিয়মিত কবাডি, বাসকেট বল, ফুটবল খেলা হতো—এখানকার অনেক ছাত্রছাত্রীই পরবর্তীকালে 'State Represent' করে বিদ্যানগরের মুখোজ্জ্বল করেছিল। মাঝেমাঝেই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হতো। কখনো রাজগীর—নালন্দা-পাওয়াপুরী, কখনো বা কোনারক-বোকারো- তিলাইয়া, অথবা হাজারিবাগ-নেতারহাটে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হতো শিক্ষামূলক ভ্রমণে। এদিকে পাঠ্যক্রমিক শিক্ষায়ও উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল বিদ্যানগর স্কুল। ১৯৫৯ থেকে পুরানো একাদশ শ্রেণি ব্যবস্থায় কলা-বিজ্ঞান ও বাণিজ্য পাঠ্যক্রম চালু হয়ে গেল এখানে। ১৯৬২-র জানুয়ারিতে কৃষিবিদ্যার আলাদা অনুষদ গঠনের মধ্য দিয়ে বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। প্রাথমিক বুনিয়াদী ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একই অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষার একটা সামগ্রিক চালচিত্র গঠিত হল বিদ্যানগরে। গড়ে উঠল হাইস্কুলের বিশাল ত্রিতল ভবন। দূরবর্তী ছাত্রদের জন্য তৈরি হল ছাত্রাবাস। শিক্ষকদের থাকবার সুবিধার্থে গড়ে তোলা হল একাধিক শিক্ষক আবাস।

এদিকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিদ্যানগর বিদ্যামন্দিরেই আহূত হয় 'নিখিলভারত বৈষ্ণব সম্মেলন'। প্রচুর বৈষ্ণব পণ্ডিতের আগমনে 'বিদ্যানগর' যেন সত্যিই সার্থকনামা হয়ে ওঠে। সেই সম্মেলনের বিবরণ তৎকালীন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হলে, ক্ষুদ্র পূর্বস্থলী অঞ্চলের ঘেরাটোপের বাইরে স্কুলটির পরিচিতি সারা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের রাজস্তরের সম্মেলনগুলির কথাও উল্লেখ করতে হয়। এগুলি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের সম্মান বৃদ্ধি করেছিল তাই নয়, এর ফলে দূর-দূরান্তরের ছাত্রছাত্রীরা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির উন্নত পরিকাঠামোর কথা জেনে এখানে শিক্ষালাভ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজনীতিবিদ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, প্রফুল্ল সেন, বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লাহ, পরবর্তীকালের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, ভূদান আন্দোলনের নেতা বিনোবা ভাবে ছাড়াও সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, হুমায়ুন কবির প্রমুখ এই অখ্যাত পল্লীর বিখ্যাত স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। ছাত্রছাত্রীরাও ঋদ্ধ হয়েছে তাঁদের বাণীতে।

পরেশবাবু, অনুকূলবাবুদের মতো বিদ্যালয়ের স্থপতিদের কাজ কিন্তু এখানেই শেষ হল না। তাঁরা বুঝেছিলেন দুর্গম বিদ্যানগরে যাতায়াত ব্যবস্থা সহ অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নতি বিধান না করলে, দূরবর্তী মেধাবী ছাত্ররা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি আকর্ষিত হবে না, তদুপরি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না হলে, এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশও হবে অবরুদ্ধ। তাই ধার করে সরকারি সাহায্যে তৈরি করা হল স্কুলের পার্শ্ববর্তী নিমতলা এবং চাঁদপুরের সংযোগকারী পাকা রাস্তা—নবদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করার জন্য মুড়িগঙ্গার উপর নির্মিত হল চৈতন্যসেতু। এর ফলে স্কুলে যাতায়াত তো সহজসাধ্য হলই, এলাকার মানুষের জীবনধারাই গেল বদলে।

শুধু স্কুল নয়—সান্ধ্য বি.এড. কলেজ থেকে শুরু করে, সরকারি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, সম্প্রতি গড়ে ওঠা কবিরাজ প্রশান্ত দাশগুপ্তের অর্থ সাহায্যে নির্মিত বেসরকারি বি.এড কলেজ, প্রস্তাবিত আই.টি.আই.-এর সমবায়ে বিদ্যানগর আজ সত্যিই একটি 'এডুকেশনাল হাব'-এ পরিণত হয়েছে। গড়ে উঠেছে চৈতন্য রিসার্চ সেন্টার। আগামীদিনে ডিগ্রি কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নও দেখছেন এলাকার অনেক শিক্ষানুরাগী মানুষ। ১৯৪৭-এর দেশভাগের ব্যথা বুকে চেপে যাঁরা চৈতন্যদেবের বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রে পুনরায় জনগণের মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন, তাঁদের সেই মশাল আগামী প্রজন্ম বহন করে চলবে—এ আশা করা যেতেই পারে।

তথ্যসংগ্রহে সাহায্য করেছেন বিদ্যানগরবাসী তপন পোদ্দার এবং ড. দেবাশিস নাগ।

লেখক : হুগলি মহসিন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবিদ্যা চর্চা

সর্বজিৎ যশ

সাধারণ অর্থে প্রাচ্যবাদ বলতে বোঝায় এশিয়াটিক সোসাইটির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত উইলিয়াম জোন্স, হ্যালহেড, কোলব্রুক, উইলকিনস, প্রিন্সেপ প্রমুখের প্রাচ্যবিষয়ক বিদ্যাচর্চা। তবে ভারতীয়দের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই তা ভারত বিদ্যাচর্চায় পরিণত হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি সৃষ্টির পর থেকেই এই প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা শুরু হয়, তবে অনেকে মনে করেন, ১৯৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা ছিল ইউরোপীয়দের বিচার্য বিষয়, ভারতীয়রা এতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি। অবশ্য এই বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রামমোহন পাশ্চাত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সম্পর্কে গবেষণাকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন। বহু দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা তিনটি কেন্দ্রের (এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশন) সঙ্গে যুক্ত পণ্ডিতবর্গের অনেকের সঙ্গেই রামমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল এবং আলোচনার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদানও হয়েছিল। একইভাবে দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমনকি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রামকমল সেন, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখের মতো শিক্ষিত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাচ্যবিদ্যা ইউরোপীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতীয়গণ প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় এগিয়ে আসেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন। রাজেন্দ্রলালের মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাস উন্মোচন করা। কিন্তু তাঁর সেই ইতিহাসচর্চায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কোনো স্থান ছিল না। এই যুগেই আবার আমরা দেখতে পাই রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ জাতীয় গৌরব এবং প্রাচীন ভারতের গৌরব ও সংস্কৃতির রচনায় কলম ধরেছিলেন। এরা কেউই তথাকথিত ঐতিহাসিক ছিলেন না, কিন্তু ইতিহাসে ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁরা যে স্বপ্ন রচনা করেছিলেন তার সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি বিস্ময়কর। যেমন রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন : ‘‘আমার এইরূপ আশা হইতেছে পূর্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, ধর্ম প্রভৃতির জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিলটন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন..... আমিও সেই রূপ হিন্দু জাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি।’’ প্রায় একই সময়ে বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ শুরু করেন এবং ‘শকুন্তলা’র মতো কাহিনিকে তাঁর নিজস্ব সৌষ্ঠবপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করে সংস্কৃতকে জনপ্রিয় করে তোলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ করেন। এইভাবে একটি পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতীয়রা

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি ফিরে তাকাতে উদ্বুদ্ধ হন।

তবে ভারতবিদ্যাচর্চা নতুন অর্থ লাভ করে বিবেকানন্দের লেখনীর দ্বারা। যদিও ‘ভারততত্ত্ববিদ্’ বলতে যা বোঝায় প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দ তা ছিলেন না। ভারতবর্ষকে জানতে বিবেকানন্দ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পদব্রজে পরিক্রমা করেন। তাঁর মতো করে আর কেউ ভারতবর্ষকে খোঁজার চেষ্টা করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনত্ব সন্ধান করতে গিয়ে ‘সন্ন্যাস’ আদর্শের বিষয়টি শুধুমাত্র উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ এই বিষয়টির উপর জোর দেন। বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতীয় সভ্যতার ‘স্বাতন্ত্র্য সূচক’ বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেন। এখানে ‘স্বাতন্ত্র্য সূচক’ কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে এই কারণে যে বিবেকানন্দের পূর্বে যাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরাই

ভারতীয় সভ্যতার 'সার্বজনীন' দিকগুলির উপর জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রামমোহন এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের রচনাতেই একই ধরনের সার্বজনীনতার উল্লেখ পাই। একথা সত্য যে রামমোহনের সর্বজনীনতা প্রাচীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতার বিষয়টিকে তেমন জোর দেয়নি। কিন্তু বৈদান্তিক 'একেশ্বরবাদের' চেতনা এসেছিল হিন্দু-ইসলাম-খ্রিস্টান—এই তিন প্রধান ধর্মের এক সাধারণ ভিত্তির অনুসন্ধানের অভিলাষ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র একেশ্বরবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু তিনি এই তিন বিশ্বধর্মের সাধারণ ভিত্তি হিসাবে ভক্তিবাদের উপর জোর দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, হিন্দুদের মধ্যে আদর্শ মানুষ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে সমসায়িক ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দু আদর্শবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি কলম ধরেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যদিও বিবেকানন্দকে কৃষ্ণ চরিত্রের এই অনুচ্ছেদটি প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণের শিষ্য, তাই তাঁর মতে 'আদর্শই হল হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ বিষয়।'

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, ভারতের জাতীয় লক্ষ্য হল 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি' বা 'আত্মপোলব্ধি'। ধর্ম কী? এর উত্তরে তিনি লিখেছেন—"যা ইহলোক বা পরলোকে সুখ ভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিন রাত সুখ খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করেছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।" মোক্ষ কী? এর উত্তরে তিনি লিখেছেন—"যা শেখায় যে ইহলোকের সুখ ও গোলামি পরলোকেরও, তাই এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো ইহলোকও নয়, পরলোকও নয়, তবে সে দাসত্ব 'লোহার শিকল' আর মুক্তির 'সোনার শিকল'। তারপর প্রকৃতির মধ্যে হলে বিনাশশীল সে থাকবে না, অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীরী বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না, অতএব মোক্ষ শেখায় প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি। স্থূল সুখের দাসত্ব থেকে মুক্তি? বিবেকানন্দের মতে এটি ছিল ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ। এবং ভারতের জাতীয় জীবনেরও লক্ষ্য বা ভাব।

অতঃপর প্রশ্ন ওঠে ভারতীয়দের কি পাশ্চাত্য অর্থে ধর্ম ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে মোক্ষমার্গী হওয়া উচিত। আবার এই প্রশ্নও আসতে পারে, মীমাংসা-বাদী দার্শনিকদের অর্থে ধর্ম যদি সুখান্বেষণের পথ হয় এবং সেই পথ যদি ভারতীয় জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন না করে, তা হলে কি সমগ্র ভারতীয় জাতি মোক্ষ কামনায় সন্ন্যাসী হয়ে উঠবেন? বিবেকানন্দ বলেছেন, দুটো পথের মধ্যে সমন্বয় সাধন দরকার। বুদ্ধদেব মোক্ষকেই জাতীয় জীবনের একমাত্র প্রকাশভঙ্গি করে তুলেছিলেন। বিবেকানন্দ বঙ্কিমের জাতীয় আদর্শকে গ্রহণ করেছেন।

বিবেকানন্দ জানতেন ভারতবর্ষের জীবন-ইতিহাস ও সাধনার বিকাশ দ্বারা পরিবর্তন ও পরিণামকে বুঝতে গেলে তার বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গের গতিপথটি বুঝতে হবে। এই কারণে তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। পরিব্রাজক বিবেকানন্দের মনে তখন অনেক প্রশ্ন। বহু আঘাত ও উত্থান-পতনের মধ্যেও যে ভারতীয় সভ্যতা, যে জাতিকুল, যে সংস্কৃতি হারিয়ে যায়নি, তা কি ইউরোপীয় সভ্যতার আঘাতে বিলীন হয়ে যেতে পারে? পরিব্রাজক স্বামীজি সর্বশ্রেণির মানুষের সঙ্গ লাভ করে সেই রহস্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। স্বামীজি দেখলেন ভারতবর্ষের কী নিদারুণ অবস্থা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং উৎপীড়নে সে কীরূপ বিপর্যস্ত, জাতিভেদ প্রথায় নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা কী বীভৎস। একই সঙ্গে তিনি প্রাচীন ভারতের ঐশ্চর্যের সন্ধান পেলেন এবং সেই ঐশ্বর্যের কথা ভেবে তিনি বারে বারে অতীতে ফিরে গেলেন। তাঁর সমকালীন ভারতের কদর্য রূপ দেখে তিনি দুঃখিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন। আবার একই সাথে ভারতের ঐশ্বর্য ও সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা দেখে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়েছেন। তাঁর মন ফিরে গেছে উপনিষদের কালে, আবার ফিরে এসেছে বর্তমান ভারতে। এই অতীত ও বর্তমান ভারতের মানসিক পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তার মানসপটে ভেসে উঠেছে ভারতবর্ষের দুটি চিত্র, একটি সুন্দর—মুখরিত অতীতের, অপরটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও সঙ্গতিহীন বর্তমানের।

স্বামী বিবেকানন্দ এইভাবে নতুন করে তাঁর ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন ভারতবর্ষ শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক সীমায় সীমিত ভূখণ্ডমাত্র নয়, একটি প্রাচীন জাতির বাসভূমি বা দুর্লভ সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র মাত্র নয়, ভারতবর্ষ হল পুণ্য ভূমি এবং দেবভূমি। ভারতবর্ষ একটি মহান আদর্শের প্রতীক। বিবেকানন্দ দেখালেন যে ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই শুরু হয়েছে। বৈদিক যুগের ঋষিরা তা উপলব্ধি করেছিলেন—বিভিন্ন দেবদেবীর স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও তা হল একই সত্তার বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ। ঋক্‌বেদের 'পুরুষ সূক্তে' বিশ্ব ভুবন বিদ্ধৃত এবং ভুবন অর্থে এক পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে। এথেকে বোঝা যায়, 'ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা প্রাচীন কাল থেকেই শুরু হয়েছিল'।

স্বামীজি ভারতবর্ষের যথার্থ রূপটি ধ্যানের মধ্যে নয়—জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সেই নিত্যকালের ভারতবর্ষকে উনিশ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্য ভোগ-সর্বস্বতা কখনোই চরম শান্তি দিতে পারে না, শান্তির পথ হল ত্যাগের পথ, তা মোটেই ভোগবাদী পথ নয়। স্বামীজি বলেছেন, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তা স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে নয়, জাতীয় ঐতিহ্যকে বর্জন করে নয়, আমাদের ঐশ্বর্য এবং পশ্চিমীদের সম্পদ—এই দুইয়ের যখন মিলন ঘটবে, আমরা তখনই সার্থক হব। অনুকরণ নয়, সুস্থ আদান-প্রদান এবং সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়তে হবে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে। স্পষ্টতই স্বামীজি দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জাতীয় চিত্তের মিলন ঘটিয়ে জাতিকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বিস্মৃতকে স্মরণের পথে টেনে এনেছিলেন, উদ্ধার করেছিলেন ভারতীয়দের হারানো পরিচয় এবং ভারতবাসীকে অতীত ও বর্তমান জীবনচর্চা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

স্বামীজি ভারতবর্ষের যথার্থ রূপটি ধ্যানের মধ্যে নয়—জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সেই নিত্যকালের ভারতবর্ষকে উনিশ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্য ভোগ-সর্বস্বতা কখনোই চরম শান্তি দিতে পারে না, শান্তির পথ হল ত্যাগের পথ, তা মোটেই ভোগবাদী পথ নয়।

লেখক : ইতিহাস অনুসন্ধানী

■ গল্প

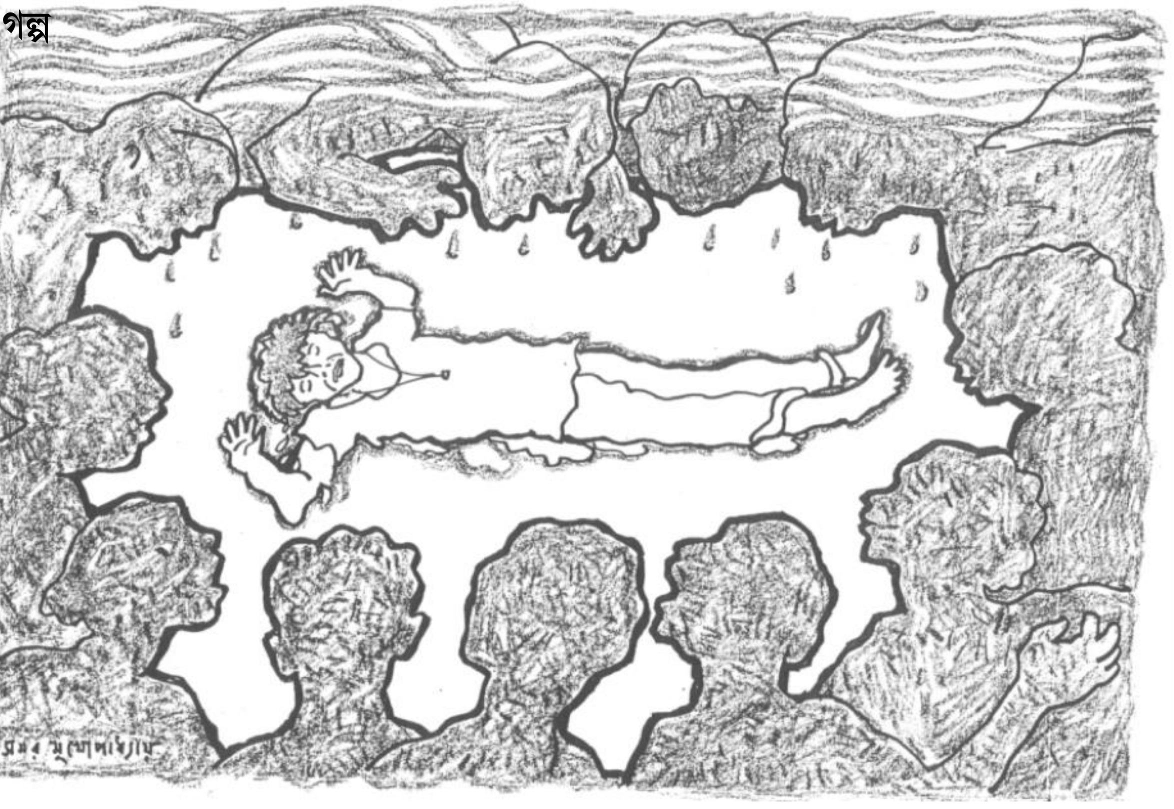

জলে ডোবা মানুষেরা

রূপক মিত্র

রাস্তার দুপাশে ঝাঁ চকচকে নতুন বাড়িগুলো পেরিয়ে একটানা পাঁচিল, ফাঁকা জমি। রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিচ্ছে টালি আর টিনের ছাউনিঅলা চার-পাঁচটা বাড়ির সামনে এসে। তারপর বাঁদিকে ঘুরেই প্রাণেশের মন ভালো হয়ে গেল। এখানে এতো বড়ো পুকুর! সাইকেল কিছুক্ষণ থামায় প্রাণেশ। রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করে আবার চোখে লাগায়। নাঃ, পুকুরটা সত্যি। এখনো এই হঠাৎ আনন্দিত হয়ে ওঠার অভ্যাস তাকে ছেড়ে যায়নি ভেবে স্বস্তি পায় প্রাণেশ। ছোটোবেলায় এমন তার প্রায়ই হতো। অনেকদিন পর আজ আবার নিজেকে একটুখানি ফিরে পেল সে। পুরোনো গান বাজলো আবার।

পুকুরের ওপারটা উত্তর দিক। কিছু গাছপালা সেখানে, তারপর ধানের মাঠ অনেক দূর অব্দি। রেল লাইন দিগন্তের একটু আগে। মন্থর রেলগাড়ি যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে। নীল আকাশ, হু হু বাতাস আর সাদা মেঘ। লম্বা একটা শ্বাস টেনে প্রাণেশ নিজেকেই যেন বলে, আঃ। আর কেউ যে নেই আশেপাশে, থাকলে কথা হতো দু-চারটে।

এই মোরাম রাস্তাটা পুকুরের চারধারে নেই, প্রাণেশ দাঁড়িয়ে আছে মাঝ বরাবর। পুকুরের পাড়ও দু-তিন ফুটের বেশি উঁচু নয়। মোরাম রাস্তা বাঁদিকে ঘুরে পশ্চিম পাড় ধরেছে। তারপর যতদূর দেখা যায় ধানখেতের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে উত্তরে। প্রাণেশ এগোয়। এরই মধ্যে তাকে পেছনে ফেলে কয়েকজন মানুষ এগিয়ে গেল সাইকেল বা মোটরবাইকে। এদিকে সে কখনো আসেনি ভেবে প্রাণেশ একটু আশ্চর্য হয়। শহরের কতো জায়গায় সে ঘুরে বেড়ালো অথচ এ-দিকটা তার সম্পূর্ণ অচেনা! আজ রবিবার। আজ প্রাণেশের স্কুটার ছেড়ে সাইকেলে ঘুরে বেড়ানোর দিন। সাইকেলে চারপাশ দেখা যায় ভালোভাবে। সাইকেল বাউন্ডুলে হবার বাহন, কথা বলে চালকের সঙ্গে। সাইকেলে উঠলেই প্রাণেশ ফিরে যায় কৈশোরে, জীবন যখন নানান রূপকথার ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে যেতে চায় দিগন্তে। বেহিসেবি স্বপ্ন দেখায়।

পুকুরের পশ্চিম পাড়ে তিনটে বড়ো বড়ো গাছ। অশথ, শিরিষ আর কৃষ্ণচূড়া। মাঝখানেরটা, অর্থাৎ শিরিষ গাছের নিচে একটা চায়ের দোকান। থাকবেই, প্রাণেশ জানতো। এক একটা দিন তার কাছে ইচ্ছাপূরণের রূপকথা হয়ে আসে। ছোটো ছোটো ইচ্ছা, সবই পূরণ হয় শেষ পর্যন্ত। রূপকথা ছাড়া আর কী? একটু বিশ্রাম আর চা খাওয়ার ইচ্ছে জেগেছিল তার মনের এক কোণে। আর ওই তো, হঠাৎ একটা চায়ের দোকান গজিয়ে উঠলো পুকুরপাড়ে, শিরিষতলায়।

মন্থর গতিতে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণেশ পুকুরটা দেখছিল। একটু নীল মেশানো কালচে জল। পুবালী বাতাস আজ, তারই ঠেলায় কচুরিপানার দল নোঙর ফেলেছে পুকুরের পশ্চিমদিকে। সারা পুকুর জুড়ে ঢেউয়ের চুড়োয় শরত

রোদ্দুরের ঝিকিমিকি। বড়ো পুকুর এটা, কিন্তু তাদের গাঁয়ের কালোদিঘির সিকি মাপেরও কম। মাসখানেক হলো যাওয়া হয়নি গাঁয়ের বাড়ি, যাবে শিগ্গির, মনে মনে ঠিক করে প্রাণেশ। কালো দিঘির জল তাকে এখনও টানে। ওখানেই সাঁতার শিখেছিল প্রাণেশ। জল তোলপাড় করা সেইসব দিনগুলোর কথা ভাবলেই মন খারাপ করে। একবার সাঁতার শিখলে কেউ নাকি কখনও ভোলে না। সত্যি? পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে একদিন, ওই কালো দিঘিতেই, পুরোনো সঙ্গীদের জুটিয়ে। কেউ কি রাজি হবে আর, চল্লিশ পেরিয়ে? যদি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, প্রাণেশ নিজেকে শুনিয়ে রাখে, পরীক্ষাটা দিতেই হবে একবার। এক ঝলক খুশির হাওয়া খেলে যায় তার বুকের ভেতর। হয়তো, অনেকদিন পর, মনে হলো প্রাণেশের। তার মধ্যে একটা ছেলেমানুষি আছে, সে জানে, চল্লিশ পেরিয়েও পুরোপুরি সাবালক হয়নি। কোনোদিন হবেও না, হয়তো। একটা পুকুর দেখে এতো পুলক! লোকে শুনলে কী বলবে? এই ছেলেমানুষি সত্তাটা প্রাণেশ তাই লুকিয়ে রাখে। এটা তার গভীর গোপন, অন্য কারুর জন্যে নয়। তার দূষণহীন মুক্তির আকাশ ওটা। ওখানে সে একলা পাখি, স্বেচ্ছাচারী। তার বেঁচে থাকার অবলম্বন ওই আকাশের অপরিসীমায়। বড়ো কথা হয়ে গেল? তা হোক, ওটা সত্যি। বোধহয় সব মানুষেরই ওরকম কিছু আছে, অন্যেরা তার খবর জানে না। নইলে মানুষ বেঁচে থাকে কিসের আশায় কোন লক্ষ্য সামনে রেখে?

একটা পুরোনো গুমটিতে চায়ের দোকান। সামনে দুটো বেঞ্চ, পলিথিনের ছাউনি তার ওপর। গাছতলায় বেঞ্চ সমান উঁচু একটা বাঁশের মাচা, পাঁচ-ছ জন ভালোভাবে বসতে পারে সেখানে। দোকানদারের বয়েস তিরিশের নিচেই, দোকানটাও বেশিদিনের নয়। মাচাটা তো নতুনই মনে হচ্ছে। পাঁচজন খদ্দের, তারাও দোকানদারের বয়সি। গাছতলায় একটা মোটর বাইক, দুটো সাইকেল। প্রাণেশ ফাঁকা মাচায় গিয়ে বসে, দুটো বিস্কুট হাতে নিয়ে। চা তৈরি হচ্ছে। প্রাণেশের দু-চোখের সামনে গোটা পুকুরটা। খুব হাওয়া এখানে। পুকুরের জলে হাজার হাজার ঢেউ, তার চুড়োয় রোদের ঝিকিমিকি। একটুও ঘাম নেই, বরং মাঝে মাঝে যেন সির-সির করছে সারা শরীর। প্রাণেশ বিস্কুটে কামড় বসাতে ভুলে যায়। হাসিমুখে মাটির ভাঁড়ে চা আর জলের জগ এসে গেছে। আনমনা প্রাণেশ কি আজ এই দোকানের মাননীয় অতিথি?

এরকম ভালো চা প্রাণেশ এখানে আশাই করেনি। দোকান জমে যাবে মনে হয়। কিন্তু বিস্কুট, জল খেতে গিয়ে চা ঠাণ্ডা মেরে গেল। আরেক বার চা দিতে বলে প্রাণেশ। ঠাণ্ডা মেরে গেল, তাদের গাঁয়ের ভাষা, মনে মনে প্রাণেশ এরকমই ভাবে, অনেক কিছুই। কিন্তু বলতে গেলে শহরের অনেকে হাসে। মনের ভাষা তাই মুখে চেপে রাখতে হয়। যদিও গ্রাম দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘেরা এই শহর। মনের কথা সব যায় না মুখে বলা, এরকম একটা গান শুনেছিল না প্রাণেশ? বাউল? তাদের গাঁ থেকে কেঁদুলি কতোই বা দূর, পঁচিশ মাইলও হবে না। বাবা যদি এই শহরে একটা বাড়ি না ফেঁদে বসতো বা চাকরিটা যদি না জুটতো তার, প্রাণেশ কি শহরবাসী হতো কখনো? শহরটা যত বাড়ছে হু হু করে, বাড়ছে যত ভিড়, হৈ হল্লা, ধাক্কা ধাক্কি, মনের ওই জিজ্ঞাসাটা প্রাণেশের জাগছে বারে বারে। এটা মনের কথা। বাস্তব অন্যরকম। সে শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা জানে। পিছু ফেরা যায় না আর। ফিরলেই বিপদ। দিনে দিনে আরো বেশি ভুগতে হবে, লড়তে হবে তাকে, প্রাণেশ জানে। কিন্তু মনকে সে বাঁধবে না, উড়তে দেবে। নইলে সে বাঁচবে না। সে তো একা নয়, এই যুদ্ধটাই লড়ছে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ। মানুষের জীবন এরকমই হয়।

মোরাম রাস্তা দিয়ে অনেক লোক এল গেল, বাইক বা সাইকেলে। ভ্যান রিকশা, টোটো বা মোটর ভ্যানও গুটিকয়েক। ওদিকে, রেল লাইনের ওপারে নিশ্চয়ই গ্রাম আছে একাধিক। আজ নয়, অন্য কোনোদিন প্রাণেশ গ্রামগুলো দেখে আসবে। বারোটা প্রায় বাজতে চললো। বাড়ি থেকে সে চলে এসেছে পাঁচ মাইলেরও বেশি দূরে। আনমনা প্রাণেশ হিসেবি প্রাণেশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে একবার।

শিরিষতলা থেকে খানিক দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছটা। সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল চার-পাঁচজন। হঠাৎ হৈ চৈ ওঠে সেখানে। চায়ের দোকানি চেঁচিয়ে বলে, কী হলো রে?

একজন উত্তেজিত গলায় উত্তর দেয়, একটা লোক ভাসছে জলে।

—লোক ভাসছে মানে?

—দেখে যাও এসে।

দোকানদার এবং খদ্দের সবাই দৌড়ে যায় ওখানে। প্রাণেশের একটু দেরি হয় ওখানে যেতে। এরই মধ্যে তিনজন জলে নেমে পড়েছে। এক গলা জল। সত্যিই একজন মানুষ, পানার আড়ালে ভাসছিল। সব মিলিয়ে মিনিট দশ, তারই মধ্যে লোকটাকে এনে কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। সকলে প্রায় বাক্যহারা।

নেই, হয়ে গেছে অনেকক্ষণ—কেউ একজন শেষ পর্যন্ত বলে।

খানিক সময় নিয়ে অন্য একজন জানায়, ভেসে উঠলে আর থাকে নাকি।

—চিনি না, এদিকের কেউ নয়।

—পেচ্ছাপ করতে গিয়ে দেখি পানাগুলো উঁচু। ভালো করে দেখে মনে হল একটা মানুষ।

—জোর হাওয়া দিচ্ছে। পানাগুলো এপাড়ে এসে জমাট হয়ে গেছে।

—ভালো করে দ্যাখ সবাই, কেউ চিনিস?

—না। অন্য কোথা থেকে এসে ডুবেছে।

—ডুবেছে না মেরে ফেলে দিয়ে গেছে দ্যাখ।

এক পায়ে ফিতে আটকানো জুতো, অন্য পা খালি। নীল প্যান্ট, হাফ হাতা লালচে জামা, মুখের চামড়া ফ্যাকাশে। মোটা গোঁফ, এক মাথা ঘন চুল। চোখ দুটো খোলা, ফেটে বেরিয়ে আসছে যেন। প্রাণেশ দেখছিল। হতভম্ব ভাবটা তার এখনও কাটেনি। তারই মতো বয়েস, কানের পাশের চুলেও একই রকম সাদা রং ধরেছে।

—আমি কোনোদিন জলে ডোবা মানুষ দেখিনি।

—তোর আর বয়েস কতো? আরো অনেক দেখতে হবে জীবনে। আমি দেখেছি জলে ডোবা মানুষ। দুটো বাচ্চা মেয়ে এক সঙ্গে ডুবেছিল। চারিদিকে ভিড়। শেষকালে উঠলো। মরে গেছে দু-জনেই।

—কী করা যায় এখন?

—দাঁড়া, আমি ফোন করছি বাদলদাকে।

—কে বাদল?

—থানার কনস্টেবল। আমাদের গাঁয়ের জামাই।

এরই মধ্যে হৈ চৈ শুনে অনেকেই এসে গেছে। পথচলতি মানুষ ছাড়াও পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের বাসিন্দারা। অনেকেই বাক্যহারা। কারুরই চেনা নয়। একজন মাঝবয়েসি মহিলা বিমর্ষ মুখে

বললেন, কাদের সর্বনাশ হলো গো!
—কী বললো তোর বাদলদা?
—খোঁজখবর নিল। আসছে ওরা।
একটা ছেলে ভিজে জামা নিংড়ে কাঁধে ঝুলিয়েছে। একজন তাকে বললো, তোরা সাত তাড়াতাড়ি জলে ঝাঁপাতে গেলি কেন? এখন থানা পুলিশ হবে।
—বাঃ, আজব কথা বলছো তো! একটা লোক জলে ডুবেছে, দেখবো না বেঁচে আছে কিনা? হোক থানা পুলিশ।
—কেউ চিনতে পারছে না। কোত্থেকে এখানে এসে ডুবলো মানুষটা?
—নিজে এসে ডুবলো, না কি মেরে ফেলে দিয়ে গেছে দ্যাখ। এরকম তো খুব হচ্ছে চারদিকে।
—সেসব পুলিশ দেখবে। আমাদের নিয়ে টানাটানি না হলেই বাঁচি।
—আমাদের টানবে কেন? আমরা তো চিনিই না লোকটাকে।
—ভয়, বুঝলি। খুব ভয় লাগে আজকাল।
—কিসের ভয়?
—জানি না। সবসময় সবেতেই ভয়।
—এরকম হলে তো মহা মুশকিল। ডাক্তার দেখাতে হবে তোকে।
এদেরই মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে প্রাণেশ। নড়তে পারছে না, পা দুটো যেন গেঁথে গেছে মাটিতে। বার বার ঘুরে ফিরে দেখছে লোকটাকে। চোখের দিকে তো তাকানোই যাচ্ছে না। কী বলতে চায় ওর চোখ? ভাষাহীন মহা বিস্ময়? পৃথিবী ছেড়ে যেতে হচ্ছে। প্রাণেশের আজ ইচ্ছেপূরণের দিন ছিল। সেটা এই ইচ্ছে? একজন মানুষ মানে একটা পৃথিবী। তার ইচ্ছে-অনিচ্ছে, স্বপ্ন-কল্পনা, বাস্তব-অবাস্তব, জয়-পরাজয় নিয়ে গড়া ওর নিজস্ব এক পৃথিবী, ঠিক যেমন প্রাণেশ বা অন্য আর সব মানুষেরই আছে, সেটা আজ চিরকালের মতো হারিয়ে গেল অসীম মহাশূন্যে। এসব কথাই তো আজ সকাল থেকে, মনের আবছায়াতে, ভাবছিল প্রাণেশ। একটা মানুষের এই হারিয়ে যাওয়া কম কথা নয়। কজন এখন ভাবে এসব কথা? তার ছেলেবেলায়, প্রাণেশ দেখেছে নিজের বা আশপাশের গাঁয়ের কেউ মারা গেলে অনেকদিন তাকে নিয়ে কথা চালাচালি হতো। যেন সুদীর্ঘ এক স্মরণসভা। গরিব, বড়োলোক যে-ই হোক, তাকে নিয়ে অনেক কথা বা গল্প থাকে, তখনই জেনেছিল প্রাণেশ। আর এখন? মরে যাওয়া যেন স্বাভাবিক, বেঁচে থাকাটা নয়! এতখানি কি? এখানের ভিড় বোধহয় সেকথা বলছে না। প্রাণেশ নিজেকে শোনাতে চায়। সে-ই বা এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন?
চায়ের দোকানি বার বার যাচ্ছে আসছে। এক সময় সে একটা গামছা নিয়ে এসে বলে, এই অনেক হয়েছে, কেউ চেনে না ওকে। গামছাটা ওর মুখে চাপা দে। চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।
—কই রে, তোর বাদলদার কী হলো?
—আবার ফোন করলাম তো। আসছে। এরকম করলে হয় না। পুলিশের অনেক রকম কাজ, বুঝতে হবে। ঝামেলা দিনে দিনে বাড়ছে চারিদিকে। তুই আর জানবি কী করে, খবরের কাগজ পড়িস না, টিভিতেও নাচাগানা আর সিরিয়াল ছাড়া অন্য কিছু দেখিস না।
—ধুৎ, বাড়িতে টিভি দেখার চান্সই পাই না। খেলাও এখানে ওখানে দেখতে হয়।
—ক্লাবে যাস না কেন?
—কী হয় ক্লাবে, অ্যাঁ? ওসবে নিজেকে আমি জড়াবো কেন?
অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে। প্রাণেশ চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে থাকে কিছুক্ষণ। চা খায়। চায়ের দোকানদার প্রাণেশকে বলে, কী কাণ্ড বলুন তো! সকাল সাতটায় দোকান খুলেছি আমি। কিছুই বুঝতে পারিনি।
জলে ডোবা মানুষ প্রাণেশ দেখেছে একবারই। তার ন বছরের ভাগ্নি। দেরিতে খবর পেয়ে প্রাণেশরা যখন গেল, মর্গ থেকে ফিরে এসেছে ফুটফুটে মেয়েটা। তারপর বেশ কিছুদিন প্রাণেশ রাতে ঘুমোতে পারেনি ঠিক ঠাক। দম বন্ধ হয়ে আসতো, ধড়মড় করে উঠে বসতো বিছানায়—খুব কষ্ট হয়েছিল তোর, খুব ছটফট করেছিস জলের তলায়, আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল জলকেই? বোকা মেয়ে, জল কখনো আঁকড়ে ধরা যায়? শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিস সত্যিকে। চোখ তোর বন্ধই ছিল, যেন ঘুমোচ্ছিস শান্তিতে! ওই বয়েসে, কী করে শিখলি অতো?
বাড়ি থেকে ফোন এলো প্রাণেশের।
—দেরি হবে আজ।
—কেন?
—পরে বলছি।
কথা বাড়ায় না। ফোন কেটে দেয় প্রাণেশ। ফিরে যায় কৃষ্ণচূড়ার আলোছায়ায়। আধ ঘণ্টা পেরিয়ে যায় আরো।
দুটো মোটর বাইকে পাঁচজন যাচ্ছিল। ব্যাপার দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। নামে না বাইক থেকে।
—কী হলো রে?
—মরে গেছে। পুকুরে ভাসছিল।
—এই মরেছে। কোথাকার লোক?
—কেউ জানে না। পুলিশ আসছে।
—মুখটা খোল একবার, দেখি।
দূর থেকে দেখে ওরা। পরস্পরে কথা বলে, মাথা নাড়ে।
—আমরাও চিনি না।
কেউ কোনো কথা বলে না।
—তা কাদের মড়া এটা, দেখেছিস?
—বললাম তো, কেউ জানে না।
—হিন্দু না মুসলমান?
খানিক নীরবতার পর কেউ একজন বললো, মানুষ।
—সে আর নতুন কথা কী? কোথায় যাবে মড়াটা, আগুনে না মাটিতে, তাই শুধোচ্ছি। কোথায় গতি হবে ওর, জানতে হবে না?
কেউ কোনো কথা বলে না। ওরা চলে যাবার আগে মুচকি হেসে বলে, সহজ কথাটা বুঝলি না তোরা।
সত্যিই তো, সহজ কথা বুঝলো না এরা। মানুষ, সে তো খুব পুরোনো কথা, না মনে রাখলেও চলে। নতুন এবং সহজ কথাই চলছে এবং বাড়ছে এখন। তাহলে?
ওই আবার, সুখী গৃহকোণ থেকে ফোন আসছে প্রাণেশের।
—বললাম না, দেরি হবে। একটু আটকে পড়েছি।
—আর কতো দেরি হবে? কোথায় আটকে পড়েছো?
—গিয়ে বলবো।
আগে ওই কণ্ঠস্বর রিনরিনে জলতরঙ্গের মতো বাজতো। এখন মাঝে মাঝে কেমন যেন বেসুরো লাগে। এখন যেমন লাগছিল।
সবই হয়তো মনের ভুল, প্রাণেশ নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা শুরু করে। আসলে চল্লিশ পেরোলেই চালশে, ঝাপসা চোখ। তখন কাছের সবকিছু, এমনকি খুব কাছের মানুষেরাও ঝপসা হয়ে যেতে থাকে। ঠিক সময়ে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে না পারলেই ঘোর বিপদ।
প্রাণেশ আরো কিছুক্ষণ কৃষ্ণচূড়ার আলোছায়ায় থাকবে। মন চাইছে না যেতে।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অগ্রসেন হিমঘর

সাতগেছিয়া, পূর্ব বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
আলু চাষের জন্য উন্নত মানের বীজ পাওয়া যায়

Sl. No. 11

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আলু রাখার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মহাশক্তি কোল্ড স্টোরেজ

পাকড়েপাড়া, চকদিঘি, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান
দূরভাষ : ০৩৪৫১-২৮৮২১৪, ২৮৮৩৫১

Sl. No. 111

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

প্রফুল্ল কোল্ড স্টোরেজ

তারকেশ্বর মেমারি রোড, চকদিঘি, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : (০৩৪৫১) ২৮৬৬৪৬

রেজি. অফিস : ২৩১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 6

With Best Compliments from

TIRUPATI COLD STORE

Karala, Jamalpur, Purba Bardhaman
Mob. 9874410306, 9874410304

Sl. No. 110

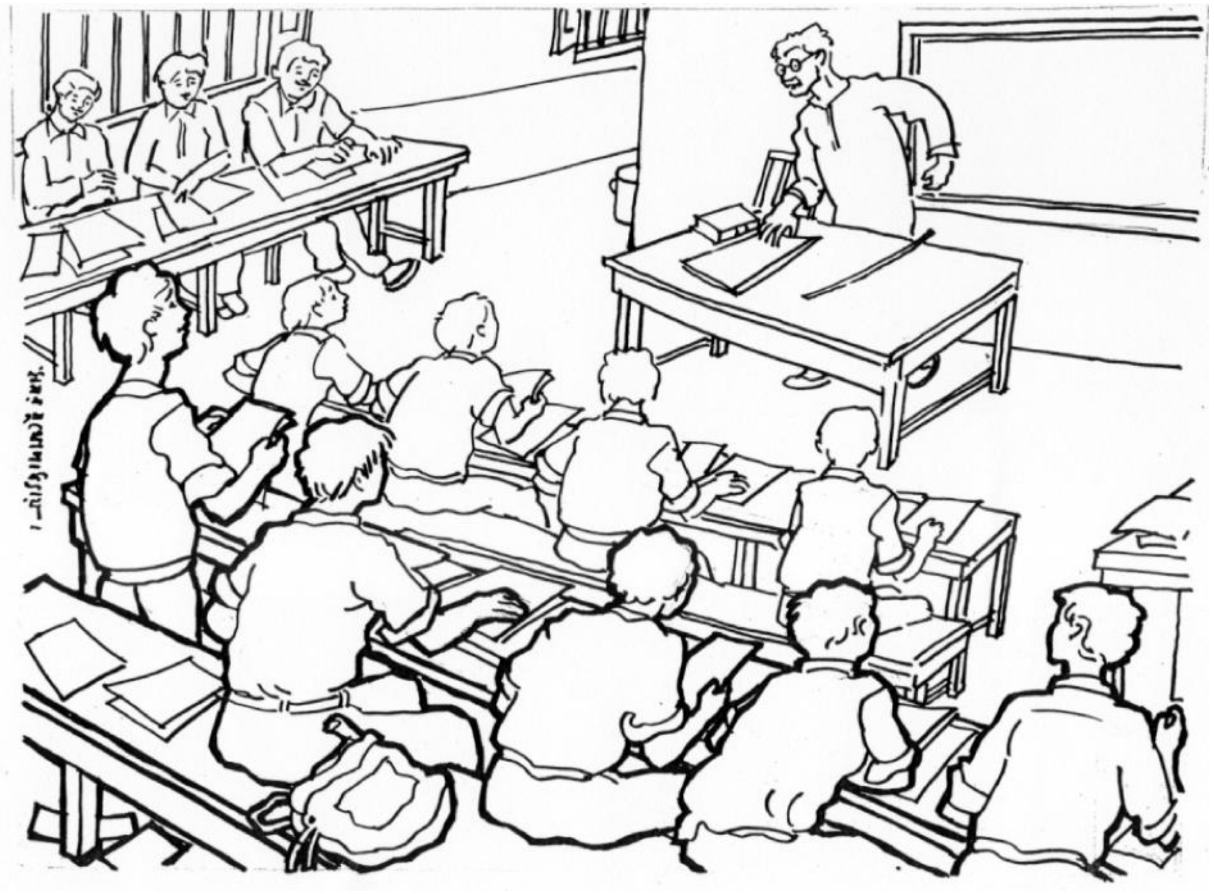

পাড়ি

স্বপন ঘোষ চৌধুরী

ক্লাসে আটষট্টি জন ছাত্র। আটষট্টি কণ্ঠস্বর রীতিমতো কলরবে মুখর। এই সময় মাধববাবু ক্লাসে ঢুকলেন। হাত দু-ফুট লম্বা একটা বেত, পরনে ধুতি আর শার্ট। তার ওপর চাপিয়েছেন একটা কালো কোট। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা নাম দিয়েছে কেরি সাহেবের মুন্সী।

ক্লাসে ঢুকেই মাধববাবু বেতটা দুবার নাচিয়ে সপাৎ করে টেবিলে ঘা মেরে বলে উঠলেন—সিট ডাউন।

গোলমাল তো আগেই থেমে গিয়েছিল, এখন চুপ বলায় ক্লাসে সবাই বসে পড়ল। মাধববাবু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাইকে দেখে নিলেন, যেন মনে মনে মেপে নিলেন। মঙ্গলকে বললেন—স্ট্যান্ড আপ।

মঙ্গল উঠে দাঁড়াল।

মাধববাবু বললেন, দশরথের বাবার নাম কী?

—সহদেব নন্দী।

—হ্যাপ! কী বললে? কোন বইতে লেখা আছে?

—লেখা নেই স্যার, চোখের সামনেই আছে, ওই আমাদের পাড়ার ঠিক পাশের পাড়াতেই। ওই স্যার নকুলকে জিজ্ঞাসা করুন। ওর পাশেই তো দশরথ বসে আছে। ওর বাবার নাম সহদেব নন্দী কি না!

মাধববাবু, বেতটা আর একবার টেবিলের ওপর সপাৎ করে বলে উঠলেন, রামায়ণের দশরথের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ক্লাসের দশরথের নয়।

মঙ্গল মাথা চুলকে বলল, বুঝেছি স্যার। রামায়ণের দশরথের বাবার নাম এগারোরথ।

মাধববাবু তেড়ে উঠলেন,—তোর মাথাটা ঠিক আছে তো?

—বিলকুল স্যার। একদম ঠিকঠাক আছে।

—রামায়ণ পড়েছিস?

—হ্যাঁ স্যার। পাতলা চটি বই, না পড়ার কী আছে! পড়ে কিন্তু আনন্দ হয় না।

—মঙ্গল, তোর কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে।

—কেন স্যার?

—যা নয় তাই বলে যাচ্ছিস। আমি তোর ইয়ার?

—না তো স্যার। আপনি চাইলে দশরথের সব ভাইয়ের নাম পর্যন্ত বলে দেব।

মাধববাবু অবাক হলেন। রামায়ণে কোথায় দশরথের ভাইয়ের নাম লেখা আছে ভেবে পেলেন না। বললেন—ফের বাজে বকছিস?

—বাজে নয় স্যার। মিলিয়ে নিন। দশরথের মেজ ভাইয়ের নাম নয়রথ, সেজ আটরথ, ন সাতরথ, ফুল ছয়রথ, ছোটো হল গিয়ে পাঁচরথ।

—উঠে আয়, সামনে এসে দাঁড়া।

মঙ্গল বুঝতে পারল আজ কপালে

বেত নাচছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ পাশের দরজা দিয়ে এক দৌড়ে বারান্দা ধরে সোজা মাঠের মধ্যে নিম গাছের আড়ালে।

মাধববাবু নিউকাট জুতোর খটখট শব্দ তুলে বাইরে এসে আর মঙ্গলকে দেখতে পেলেন না। কুচকাওয়াজের ঢঙে ঢুকে পড়লেন হেড মাস্টার মশাইয়ের ঘরে। বললেন—আমি তো বড্ড ভুল করলাম।

হেড মাস্টারমশাই মুখ তোলেন—ভুল, মাধববাবু?

—এই স্কুলে ট্রান্সফার নিয়ে ভুল।

—কেন কী হল? ক্লাসঘরগুলো ছোটো ছোটো বুঝি?

—না না, ওসব কিছু না, এক মাস হল জয়েন করেছি, আজ আমার যা অভিজ্ঞতা হল, ওঃ!

—আরে কী হল বলবেন তো!

—ক্লাস টেনের ওই মঙ্গল, বিচ্ছু শয়তান একেবারে।

—ও বাব্বা, সাংঘাতিক। আপনি ওর খপ্পরে পড়েছিলেন তো? পড়া ধরেছিলেন তো?

—হ্যাঁ। এমন সব উত্তর দিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গুলিয়ে যাচ্ছে আমার।

—একদম না, একদম না। সারা স্কুলে ওই একটা ছেলেকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। করেছেন কি মরেছেন।

—ও কে?

—স্টুডেন্ট। মোস্ট গবেট স্টুডেন্ট। ক্লাস সেভেনে একবার, এইটে একবার, নাইনে একবার, এবছর টেনেও আবার ডিগবাজি খেয়েছে, এবার ডিগবাজি খেলেই টিসি ধরাতে হবে। স্কুলের যে কী হবে!

—কী আবার হবে! স্কুল বেঁচে যাবে।

—মোটেই না। স্কুলের যেটুকু সম্মান ছিল তা চলে যাবে।

মাধববাবু ধাঁধায় পড়লেন। বললেন—কী সব বলছেন, মগজে কিছুই ঢুকছে না।

—না ঢোকারই কথা। আসলে আমাদের স্কুলের পড়াশোনায় তেমন সুনাম নেই, যেটুকু আছে তা ওই ফুটবলে। স্কুল ফুটবলে আমরা পর পর চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আর তা হয়েছে ওই মঙ্গলের জন্য। ফি বছর ও-ই তো আমাদের স্কুলকে জেতায়। ও যাই করুক, একটু ক্ষমা ঘেন্না করে দেবেন।

—বেশ, বলছেন যখন তা-ই হবে। কিন্তু ছেলেটার ফিউচারটা তো নষ্ট হচ্ছে।

হেডমাস্টার বললেন, আমরা চেষ্টার কিছু কম করিনি। সব ফেল। আমাদের অঙ্কের টিচার শ্যামলবাবু তো ওর পাল্লায় পড়ে এমন নাকানি-চোবানি খেয়েছিলেন যে চাকরিই ছেড়ে দেবেন বলেছিলেন।

—ওরে বাবা, এ তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

—ওকে না ঘাঁটালে মোটেই ভয়ঙ্কর নয়। ও যেমন আছে থাকুক না, বছর বছর ফুটবলে স্কুলকে ট্রফি এনে দিচ্ছে, সেটাই আমাদের বড়ো লাভ।

মাধববাবু বললেন, শ্যামলবাবুও তাহলে আমার মতো ভুক্তভোগী!

—আপনার চেয়েও বেশি। যাকে বলে ল্যাজে গোবরে! উনি ক্লাসে অঙ্ক দিয়েছিলেন—একটা বিশ-ফুট দণ্ডায়মান বাঁশে তেল লাগানো আছে। একটা হনুমান সেই বাঁশ দিয়ে দু-ফুট উঠে ছ-ইঞ্চি নেমে যাচ্ছে। সে কতবারের চেষ্টায় বাঁশের ডগায় গিয়ে পৌঁছবে। অঙ্কটা দেখে মঙ্গল কী বলেছিল জানেন? সরাসরি শ্যামলবাবুকে প্রশ্ন করেছিল,—এটা কী করে অঙ্ক হয় স্যার? একটা হনুমানের কি কাজকম্ম নেই! তেলমাখা বাঁশ বেয়ে ডগে উঠতেই বা যাবে কেন? জানতাম বাঁশের ডগায় এক ছড়া পাকা কলা বাঁধা আছে তাহলে না হয় বুঝতাম হনুমানটা কলার লোভে বাঁশের ডগায় যেতে চাইছে। আর স্যার, দ্বিতীয় অঙ্কটা তো আমাদের সৎ মানুষ হবার বদলে অসৎ পথে যাবার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। একটা গয়লা এক লিটার দুধ বিক্রি করে সাত টাকা লাভ করে। প্রতি লিটারে পাঁচশো মিলিলিটার জল মেশালে দশ লিটার দুধে সে কত লাভ করবে? তা স্যার, দুধে জল মেশানো কি সুশিক্ষা? আপনি তো এখন থেকেই আমাদের খাদ্যে ভেজাল দিয়ে অসৎ কাজ করতে শেখাচ্ছেন! —কী বলব মাধববাবু, শ্যামলবাবুর তো কেঁদে ফেলার অবস্থা। তাই বলছি—ও ছেলেকে ঘাঁটাবেন না, যেমন আছে থাকুক।

একটা হনুমানের কি কাজকম্ম নেই! তেলমাখা বাঁশ বেয়ে ডগে উঠতেই বা যাবে কেন? জানতাম বাঁশের ডগায় এক ছড়া পাকা কলা বাঁধা আছে তাহলে না হয় বুঝতাম হনুমানটা কলার লোভে বাঁশের ডগায় যেতে চাইছে।

মাধববাবু কমন রুমে এসে বসলেন। টিফিন চলছে। দুটো কলা আর দু-পিস পাউরুটি শেষ করে জল খেলেন। ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে ভাবছিলেন, এও এক প্রতিভা!

এরপর কমলবাবু যা বললেন, তা তো আরও চমকপ্রদ। বললেন, আরে মশাই আপনাদের তো পাঠ্য বিষয় নিয়ে বলেছে, আমাকে একবার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সে এক ঝঞ্ঝাটে ফেলে দিয়েছিল।

—কী রকম?

শ্যামলবাবু গুছিয়ে বসেন।

কমলবাবু বলতে লাগলেন, আরে মশাই, আমি তো এই স্কুলে জয়েন করে দু-মাস মেসবাড়িতে ছিলাম। ঘরে সোমত্ত দুই মেয়ে, সুন্দরী স্ত্রী। তাদের নিয়ে তো আর হুট করে যে কোনো বাড়ি ভাড়া নিতে পারব না। একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে দু-মাসের মধ্যে বাড়ি পেয়ে যাব শুনে আগাম বায়না দিয়ে দিলাম। একদিন নিজের বাড়িতে যাবার আগে কিছু বাজার-হাট করছিলাম। বাজারে ওই মঙ্গলের সঙ্গে দেখা। সে আর কোণে বসা ছেলেটা পয়লা নম্বরের বিচ্ছু। প্রায় ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে দুটো থলি কেড়ে নিল, —এটা আমার হাতে দিন স্যার। আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

বড়ো খুশি হয়ে থলি দুটো দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে মেসে ঢুকতেই সে বলল, একি স্যার, আপনি মেসে থাকেন!

—হ্যাঁ থাকি।

মঙ্গল বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে স্থির হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সে আবার বলল—আপনি মেসে থাকেন?

—বললাম তো থাকি। এমন করে তাকাচ্ছো যেন মেসে থাকাটা অপরাধ।

—না স্যার। তবে ফ্যামিলি নিয়ে মেসে থাকা...!

—ফ্যামিলি আনিনি। তারা গ্রামের বাড়িতে আছে।

—ফ্যামলি কেন আনেননি স্যার?

ঘাড় চুলকে মঙ্গল তো চলে গেল।

পরদিন টিফিনের সময় এসে বলল, একটা কথা বলব স্যার?

—একশো বার বলবে।

—স্যার, আপনি ফ্যামিলি আনেননি কেন?

সেই যে শুরু হল, রোজ টিফিনের সময় আমার কাছে এসে একই প্রশ্ন—আপনি ফ্যামিলি আনেননি কেন?

চার-পাঁচ দিন একই কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম, তাতে তোমার কি

সুবিধে হবে? ফিক করে হেসে ও কী বলেছিল জানেন! বলেছিল—তাহলে আপনার বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে যেতাম।—বুঝুন সাহস! এইসব ছেলেকে কী বলা যায়!

শ্যামলবাবু বললেন, সঙ্গে সঙ্গে দিলেন না কেন বেতের এক ঘা!

হাতে বেত থাকলে তো ঘা দেব! আমি যে আপনার মতো সদাই বেত হাতে ঘুরি না।

নাকে একটিপ নস্যি নিয়ে শ্যামলবাবু বলে উঠলেন, হাতে বেত নিতে চলাফেরা অভ্যেস করুন। বেত ছাড়া এরা জব্দ হয় না।

—তা আপনার হাতেও তো বেত ছিল, সেদিন বেত না মেরে দৌড়ে হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে চলে এসেছিলেন কেন?

—কারণ ছিল। আমি তো নতুন এসেছি। কে কেমন ছাত্র জানা নেই। একটা উঁচু ক্লাসের ছাত্রকে দুম করে বেতের ঘা দেব, তারপর কী হবে কী করে বুঝব? এমন বিবেচনা করে বেত চালাই নি। দিনকাল যা পড়েছে বুঝতেই তো পারছেন। কিছু একটা গোলমাল করেছেন কি মরেছেন। এখন শিক্ষকতা করতে গেলে প্রতি পদে হিসেব করে চলতে হবে।

বেশ কয়েক দিন মঙ্গল স্কুলে আসছে না। আপাতত মঙ্গলের ক্লাসরুমে আর কোনো অসুবিধে নেই। শ্যামলবাবু তো বলেই ফেললেন, আপদটা বোধহয় স্কুল ছেড়ে রোজগারের রাস্তায় নামল।

সোমবার সকালবেলা ক্লাস শুরুর আগেই হেডমাস্টারমশাই স্কুলে এসে নিজে তাঁর ঘরের তালা খুললেন। ফোন করলেন কেরানিবাবুকে।

কেরানি আসতেই বললেন, একটা ছুটির নোটিশ লিখুন। "আমাদের স্কুলের দশম শ্রেণির 'ক' বিভাগের ছাত্র, স্কুলের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীমান মঙ্গলকুমার দত্ত গত কয়েকদিন আগে বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। গতকাল রাত্রে তার মৃত্যু হয়েছে। প্রয়াত মঙ্গলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আজ স্কুল বন্ধ থাকবে।"

শ্যামলবাবু বললেন, এ কী কাণ্ড!

মাধববাবুর মুখে কথা নেই।

কমলবাবু বললেন, যতই যা-ই বলি, ছাত্র সব সময় সন্তানতুল্য। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—বিশ্বাস তো করতেই হবে। হেডমাস্টার মশাই বললেন। —আমি ওকে কোনোদিন ধমক পর্যন্ত দিইনি। শিশু বয়সে বাবা-মাকে হারিয়েছে, মামার বাড়িতে মানুষ। গরিব মামার বড়ো সাধ ছিল মঙ্গল বড়ো হয়ে ভালো ফুটবলার হবে। অনেক নাম হবে। তাঁর সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল।

তিমিরবাবু গুটিগুটি পায়ে হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকলেন। বেশ বোঝা গেল তাঁর চোখে জল এসে গেছে। ধরা গলায় বললেন—স্কুলের এক হাজার ছেলে আজ চুপ করে গেছে। তাদের সকলের চোখে জল। হেডমাস্টারমশাই, এতদিন আমরা তো অনেকেই মঙ্গলের শুধু নিন্দেই করেছি, আজ ওর যতটুকু গুণ ছিল তার কথা শোকসভা করে সবাইকে জানিয়ে দিলে বোধহয় মঙ্গলের আত্মা শান্তি পাবে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, আত্মা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না, ও নিয়ে বিতর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। এমন প্রশ্নও আজ কেউ তুলবেন না। যার যার মতামত তার তার কাছে রেখে দিয়ে আজ মঙ্গলের জন্য আমরা একটু চোখের জল ফেলি!

With Best Compliments from

FRIENDS CONSTRUCTION

DURGAPUR, PASCHIM BARDHAMAN

Sl. No. 80

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালেশ্বর এস.কে.ইউ.এস. লি.

রেজি নং ৫৪ তারিখ : ১৪-০৪-১৯৩০ ।। পোঃ কুচুট, বর্ধমান, ফোন : ০৩৪২- ২৭১৯২৭০

আমাদের কার্যসমূহ

সার, কীটনাশক, বন্ধকী, ট্রাক্টর, কুটিমাড়া মেশিন, ১৮টি সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে জমিতে সেচ দেওয়া। এছাড়া ব্যাঙ্কিং, এস.বি., আর.ডি., টি.ডি. করা হয় এবং যে-কোনো ব্যাঙ্কের চেক ভাঙানো হয়। টি.ডি বন্ধক রেখে লোন দেওয়া হয়।

Sl. No. 29

With Best Compliments from

DEBARGHA MEMORIAL ITI COLLEGE

(NCVT UNDER GOVT. OF INDIA)

Kamnara Pirtala, Purba Bardhaman, Contact : 9434667278

Sl. No. 38

With Best Compliments from

DAFARPUR INDANE GRAMIN VITARAK

Vill. Dafarpur, P.O. Baharkuli, Purba Bardhaman, West Bengal

Sl. No. 27

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সনাতনী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লিমিটেড

বোলপুর, পারাজ, বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৪৩৪৩১৮২৯০

Sl. No. 25

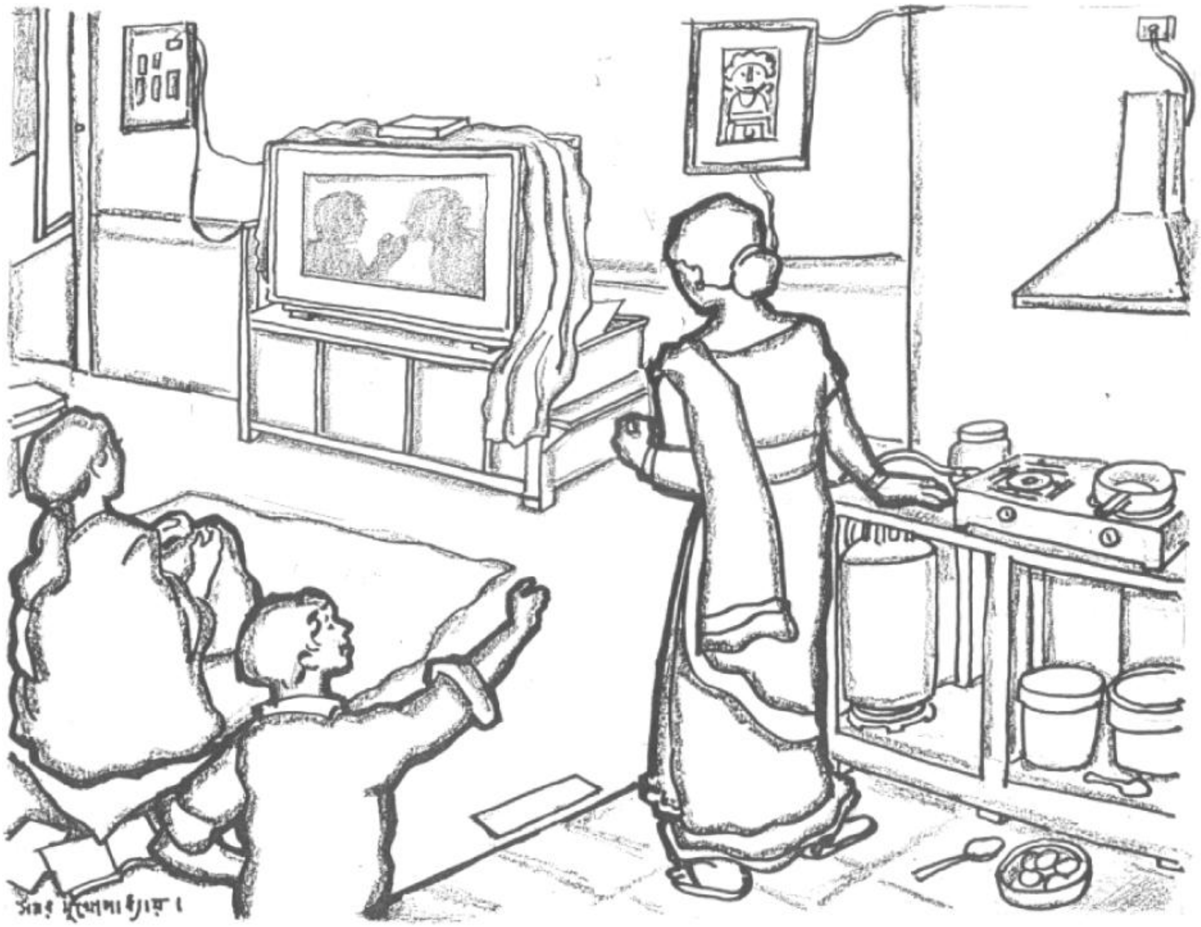

এক সফল পুরুষের বৃত্তান্ত

তপোময় ঘোষ

সন্ধে থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে টিভিতে সিরিয়াল দেখে সুমিতা আর তার শাশুড়ি ঊষারানি। আজও দেখছে আর বিজ্ঞাপনের বিরতির ফাঁকে রান্নাঘরের টুকটাক কাজ সেরে আসছে। পাশের ঘর থেকে শ্বশুরমশাই অন্তত তিনবার হাঁক দিয়েছে—বৌমা, শুভ ফিরল?

উত্তর দিয়েছে—না। এখন রাত্রি প্রায় নটা। শ্বশুর ধীরেন পালের চতুর্থ হাঁকেও উত্তর দিতে হল—না।

হ্যাঁ, এই সিরিয়ালটাও শেষ হল। অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় নটা বাজল। শুভর না ফেরাটা এবার আর শুধু তার দাদুর একার না হয়ে সবার উদ্বেগ হয়ে দাঁড়াল। সেই বিকেলে বেরিয়েছে। সারাদিন যেখানেই থাকুক, যা-ই করুক—বিকেলে একবার খেলার মাঠে যায় ছেলেটা। ঠিক সন্ধ্যা লাগলে ফিরে আসে। চাট্টি মুড়ি খায়। আবার হয়তো বেরোয়। কিন্তু আজ এখনও ফিরল না। উদ্বেগের বটে। তার ওপর আজ সে বাইক নিয়ে বেরিয়েছে।

টিভির খবরে চারদিকে অ্যাক্সিডেন্টের যা খবর পাওয়া যায়, তাতে এই বয়সের ছেলেরা গাড়ি নিয়ে বাইরে গেলে মা-ঠাকুমা-দাদুদের বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত ভয় লাগে। এই ভয় লাগাটা এক্ষেত্রে আরও স্বাভাবিক এজন্য যে, শুভ খুব জোরে গাড়ি চালায়। বলা যেতে পারে, গাড়িতে স্পিড তোলাটা শুভর একটা নেশা। শুধু দাদু কেন, সবাই বলে এ নেশা খারাপ নেশা। কিন্তু কারো কথা শুনলে তো! বেপরোয়া গাড়ি চালানো শুধু নয়, শুভ আজকাল বেপরোয়া জীবনযাপনও করছে। সাধে কি তার দাদুর উদ্বেগ! বুড়োটা আবার হাঁকে—বউমা, শুভ এলো?

এবারও মালতিকে ‘না’ বলতে হল। শুনে ধীরেন পালকে বেরিয়ে আসতে হল। তারপর ঊষারানিকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—তোমাদের কি আক্কেল গো! ছেলেটা এখনও ফিরল না, আর তোমরা নিশ্চিন্তে সিরিয়াল দেখছো! রাতটা কম হল!

—জষ্টি মাসের রাত নটা বাবা, খুব বেশি নয়।

—সন্ধেয় মুড়ি খেয়ে গিয়েছে?

—না।

—তবে, খোঁজ করো, ফোন করো। মোবাইল তো সঙ্গে আছে। শ্বশুরের ধমকে বাধ্য হয়ে মোবাইলের খোঁজ করে সুমিতা। না পেয়ে বোঝে মেয়েটা নিয়েছে তারও ফোনটা। সুতরাং মেয়েকে হাঁকে। সাথী,

দাদাকে একবার ফোন কর। কোথায় আছে খোঁজ নে। বাবা, আপনি ঘরে যান, সে ঠিক চলে আসবে। বাধ্য হয়ে ধীরেন নিজের ঘরে ঢুকল। তার নাতনি, নাতির খোঁজ নেবে এবং তাকে দেবে এ প্রত্যয় রেখে ঘরে ঢুকেই গেলেন।

এদিকে সাথী যতবার ফোন করে মোবাইল ফোন জানায়—'আপনি যাকে ফোন করতে চাইছেন, তিনি এখন পরিসীমা ক্ষেত্রে বাইরে।' স্বভাবতই উদ্বেগ বাড়ে বোনেরও। বোন মাকে জানায়। মা, মানে ধীরেন পালের বৌমা কিন্তু বড়ো পালমশাইকে জানাতে পারে না। আশঙ্কা-উদ্বেগের মধ্যেই বার বার ফোন করে যায় সাথী। এক সময় ওপার থেকে সাড়া পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাথী চেঁচায়—মা, দাদা এখন বাজারে আছে। আসতে একটু দেরি হবে।

যাক, বাজারেই আছে! হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন বাড়িশুদ্ধ সবাই। শুভর বাবা কিন্তু সন্ধ্যায় বেড়াতে যায়। আজও গিয়েছে। ফেরেনি। পুত্র যে বাড়ি আসেনি, সে জানেও না। এবার কর্তা ধীরেন পাল জানতে চায়, বৌমা, মিহির ফিরল?

—না বাবা। সে তো গাঁয়েই আছে। আসছে। আর শুভর এত রাতে বাজারে কী কাজ আছে সে-ই জানে!

—আর তোমার এই প্রধানের বেটাটা জানে না ভাবছ! তার খোঁজ নাও। দেখবে সেও তোমার পুত্রের সঙ্গে আছে। একেবারে বিষাক্ত ছেলেটি। আমার দুর্ভাগ্য যে আমার নাতিটিকে আমি ওই ছেলেটির থেকে বিযুক্ত করতে পারলাম না। বলে কিনা মাসে মাসে গাড়ি পাল্টায়!

আশি বছরের বৃদ্ধ ধীরেন পাল ঘরে আবদ্ধ থাকলে কী হবে, গোটা গাঁয়ের খবর সব ঠিকঠাক রাখে। এ-বাড়ির ছেলেটাও যে খুব ভালো অবস্থায় আছে তা বিশ্বাস করে না সে। তার নাতি যে বংশের মুখ খুব উজ্জ্বল করছে না, তাও তিনি বিলক্ষণ জানেন।

সেদিন রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ শুভ বাড়ি ফিরেছিল এবং 'এতক্ষণ কোথা ছিলিস? কী করছিলি?' এসব প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছিল, গাড়িটায় শেষ চড়া চড়ছিলাম। চমকে উঠে মা বলেছিল, মানে...!!

—গাড়িটা বেচে দিলাম।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে-শুনে-বুঝে দীপের মা দীপকে পরামর্শ দিলেন দুটো গাড়ির একটা বেচে দে। আর শুভকে গাড়ি কিনতে যে টাকাটা তুই দিয়েছিলি সেটা ফেরত চা। দীপ উত্তর দিল, সেসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সে কাজ চলছে। কালই শুভ গাড়ি গ্যারেজে দিয়ে দেবে। আমি তোমাকে বলেছি এক লাখ পর্যন্ত আমি দেব। ঠিক সময়েই দিয়ে দেব।

—না দিলে দেখলি তো মানুষের মেজাজ। দুদিন আগেও যারা এসে পায়ে পড়ত, আজ তারাই সেই হাত গলার কাছে আনছে...

হ্যাঁ, দীপের মা চিন্তামণি কুণ্ডু ধানপুর পঞ্চায়েতের প্রধান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অজস্র মানুষ তার কাছে আসে। সুযোগ-সুবিধা অন্তত চকাম সহ (স্ট্যাম্প সহ) সইটা নিতে। এখন এ ক-দিন আসছে টাকা ফেরত নিতে। শুধু আবাস যোজনা বা একশো দিনের কাজ নয়, হাবিজাবি নানা কাজের জন্য নানাভাবে টাকা তুলতেন তিনি। তাতে সবসময় নিজে সরাসরি নয়, সুপুত্র দীপকান্ত কুণ্ডুর মারফৎ।

পুত্রটিও ধুরন্ধর। দু-তিন বারে মাধ্যমিক পাশ হলে কী হবে! বাস্তব এবং বিষয়বুদ্ধিতে একেবারে টম্বুর। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে এসে মা প্রধান হওয়ার পর থেকে বেটা শুরু করে দিয়েছিল দলোপযুক্ত কার্যকলাপ। এতটাই টাকা আদায়ে দক্ষ হয়ে উঠেছিল যে, প্রথম বছরে তার ইচ্ছেমতো তিনটে মোটরবাইক, পৈতৃক বাড়িটার মেঝেয় পাথর বসানো, দোতলা করা, ব্যাঙ্কে লাখ বিশেক টাকা গচ্ছিত রাখা হয়ে গেছিল।

দীপকান্ত এবং তার মা যতই মনে করুক, এসব তারা খুব চুপি চুপি করছে, জনগণ কেউ কিছু জানতে জানতে পারছে না—তা কিন্তু নয়। সবাই প্রায় সবটাই জেনে গেছিল, কারণ তাদের আজীবনের জীবনশৈলীই তো বদলে গেছিল। আর তাই বিলম্ব না করে এবছরই সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের সুযোগ পাওয়া মাত্র জনগণ একটু হাত দেখিয়েছে।

হ্যাঁ, প্রধান সাহেবা আর তার পুত্রের দাপট থাকা সত্ত্বেও নিজের বুথে তারা হেরেছেন। হেরেছেন মানে বলা যায়—গোহারা হেরেছেন। এত মানুষ তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন!! ভেবে আতঙ্কে, কদিন তো বাড়ি থেকেই বের হয়নি। পুত্র দীপও অনেক সংযত। ছ্যা, ছ্যা, মাইনাস বুথ!!

আর এ-সময়েই রাজ্যে কলরব শুরু হল কাটমানি ফেরত দেওয়ার পালা। কদিন পরে ঢেউটা চলে এলো খোদ ধানপুর পঞ্চায়েত এলাকার দশখানি গ্রামেও। প্রমাদ গোনলেন চিন্তামণি-দীপ-ভোম্বল-সদা, মানে সদানন্দ মাস্টার—সব্বাই। মানে এ-গাঁয়ের রুলিং পার্টির নেতা কর্মীরা সবাই। তবে যেহেতু বেশি মেরেছেন প্রধানের পরিবার তাই তাদের গাড়ি আগে গ্যারেজে যাবে।

মিহিরের বাবা ধরণী পাল এই ধানপুর পঞ্চায়েতে তিন টার্মের, মানে পনেরো বছরের নির্বাচিত প্রধান ছিলেন, ছিলেন এবং ছিলেন। তিন বারই সত্যি। আর এটাও সত্যি যে মিহির ঘোষকে এখনও রাতবিরেতে পাওয়া যায়। লজঝড়ে সাইকেলটা চালিয়ে হাটে, মাঠে, বাজারে যেতে হয় আসতে হয়। এই বয়সে কষ্টও হয়।

তো এত কষ্ট শুভরঞ্জন সইবে কেন? সে বলল, দাদু একটা ব্যর্থ পুরুষ। তার পুত্র—তুমি, বাবা, তুমিও সমান ব্যর্থ। নইলে তিনবারের প্রধানের বাড়িতে একটা দু-চাকা মোটরবাইক নেই। চালচুলো যা আছে, না হয় থাকল, আমি আজকালকার এই বয়সের ছেলে গাড়ি ছাড়া বেরোই কীভাবে বলো তো?

মা সুমিতার মনে হল—তা বটেই তো। তোমরা কোনো আদর্শে বিগলিত ছিলে বলে, ছেলেপিলেও যে থাকবে, তার কোনো মানে নেই। ও যদি ওই প্রধানের বেটা দীপের সঙ্গে মিশে কিছু করতে পারে তো পারুক না!

—আমাদের পার্টি কী ভাববে?

—হুঁ, তোমাদের পার্টি? তাদের ভাবনার কথা বোলো না। দিল তোমাকে চাকরি? তোমার না হোক, আমি তো উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছিলাম। দিল আমাকে? আর ওরা দ্যাখো তো কতজনে নিজে নিজে নিল। তোমাদের পার্টির কথা আর বোলো না। শুভরা সব জানে। ওরা যা বোঝে করুক। তোমরা তো আর করছ না। কেউ কিছু বললে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। উত্তর দেব।

রুলিং পার্টির সঙ্গে ঘোরাঘুরির পূর্বাহ্নেই শুভর মা আর বাবার মধ্যে ইত্যাকার কথা একদিন নয়, বহুদিন সন্ধ্যায়, রাত্রে হয়েছে। আজও সেই গভীর রাত। তবে এখনও শুভর বাবা বাড়ি ঢোকেনি।

—গাড়ি বেচবি মানে?

—মানে দীপের কাছে কিছু ধার করে এ গাড়িটা কিনেছিলাম। শুভ এখন ফেরত চাইছে। ওর মাকে 'কাটমানি' ফেরত দিতে হবে।

—ওঃ, তা কাটমানি তো সব গাঁয়ে ফেরৎ দিচ্ছে না।

—কোন গাঁয়ে কী হচ্ছে জানি না। তবে

এ গাঁয়ে হবে। শিবতলায় সালিশি সভা ডেকেছে। দীপদের সবাইকে হাজির থাকতে হবে। পুলিশ ওদের কথা শুনছে না, বড়বাবু বলে দিয়েছে, আমরা যেতে পারব না।

—যা বাব্বা! এখানেও কাটমানি ফেরৎ!

—টিভিটা দেখো না নাকি?

—না রে, সিরিয়াল দেখি।

—এবার খবর দেখো, যাও। সোনা পালের জামাইকে দেখলাম। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে জনতার কাছে।

—আজ সোনার বাবা টাকা জোগাড় করে মেয়ের বাড়ি গেল জামাইয়ের সম্মান বাঁচাতে। কল্যাণ স্যারের মামা শিয়ালডাঙার পঞ্চায়েত মেম্বার। তিনিও টাকা তুলেছিলেন। ফেরৎ দিতে হবে। কল্যাণ স্যার আজ বাজারে টাকা ধার করতে বেরিয়েছেন। সামাজিক সম্মান বুঝলে? আমার তো পরের টাকার গাড়ি। কত জনের কত কী ঘুচে যাচ্ছে।

—সবচেয়ে বেশি যাচ্ছে মান-সম্মান বলো! ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল শুভর বাবা মিহির। ওরা মায়ে ব্যাটায় অবাক হলো। সুমিতা জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলে গো?

—আড়াল থেকে সব শুনছিলাম। তোরা, যারা টাকা নিয়েছিলি তাদের কথা শুনলাম। তার আগে গাঁয়ের এ পাড়ায় ও পড়ায় শুনে এলাম জনগণের কথা। সব শুনে কী মনে হচ্ছে জানিস?

—কী মনে হচ্ছে বলো?

—মনে হচ্ছে গলায় দড়ি দি...

—তুমি গলায় দড়ি দেবে কেন, তুমি তো কিছু করোনি।

—তোকে জন্ম দিয়েছি... এই বলে ফুঁপিয়ে উঠলো।

বাইরে এসব কথা রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে যাচ্ছিল। অপ্রিয়, অসত্য, অঘটনের ভেদনক্ষমতাও বেশি। ফলত ধীরেন পাল আর তার বউ ঊষা, নাতনি সাথী সবাই এ ঘরের দরজায়। পুত্রের চোখে জল দেখে বুড়োর তীক্ষ্ণ ধারালো, বজ্রকঠিন প্রশ্ন : কী হলো রে?

শুভ উত্তর দিল—কিছু না।

—কিছু নয় তো তোর বাবা কাঁদছে কেন?

—তুমি আবার এখানে এলে কেন, মিহির বলে উঠল।

আর শুভর মা সেই ফাঁকে কানের দুল দুটো খুলে ছেলের হাতে দিয়ে বললো—গাড়িটা শখ করে কিনেছিলি, বেচিস না। এ দুটো বন্ধক দিয়ে দীপকে টাকা ফেরৎ দিয়ে আসবি। গাড়িটা থাকুক।

—হাঁ, গাড়ি ছাড়া তুই বাঁচবি না। ঠাকুমা ঊষারানি বললেন, সাথীও গাড়িটা রাখার পক্ষে। মিহির তার বাবাকে জিগ্যেস করল, ধান ক-টা বেচে দিলে হয় না?

পরিস্থিতি খুব জটিল বুঝে শুভ বলল—না, না। গাড়িটাই যে পাপের টাকায় কেনা...

—সে কী রে সফল পুরুষ! তোদেরও পাপপুণ্য জ্ঞান আছে! খোঁচা দিলেন ধীরেন পাল।

বাবা বললেন, এতদিন তোর মনে হত আমরা সবাই ব্যর্থ পুরুষ, ব্যর্থ ছিলাম। এবার বুঝছিস তো?

পালবাড়ির মধ্যরাত্রি যখন এমনতর পারিবারিক আলোচনায় মগ্ন, স্তব্ধতা খান খান করে শুভর মোবাইল বেজে উঠল। অন্যপ্রান্তে দীপ। বিরক্ত শুভ উত্তর দিল, খুব হয়েছে থাক। কাল তোকে টাকা দিয়ে সম্পর্ক শেষ করব। আর জ্বালাস না।

এক প্রাণ স্বস্তি নিয়ে পালবাড়ির লোকজন নিজের ঘরে ফিরে গেলে বুড়ো বুড়িকে বলল, চলো আরও কিছুদিন বাঁচা যাবে।

With best compliments of

M/s PRAKASH CONSTRUCTION

FABRICATOR, ERECTOR, MECHANICAL, CIVIL CONTRACTOR
& GENERAL ORDER SUPPLIER

Qr. No. L/32, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211
Phone : 2558523, Mobile : 9332017271, 9932653994

Sl. No. 79

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

বিজুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

এই পঞ্চায়েতের কর্মকাণ্ড হয়ে চলেছে জনগণমুখী এবং জনগণ হয়ে উঠেছে গ্রাম পঞ্চায়েতমুখী
এটা আমাদের গর্বের বিষয়, আমাদের অহংকার

মিঠু সাঁতরা
উপপ্রধান

বৃন্দাবন ঘোষ
প্রধান

Sl. No. 12

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কুচুট গ্রাম পঞ্চায়েত

মানুষের পাশে, মানুষের সাথে

রত্না নন্দী
উপপ্রধান

রুমকী মণ্ডল
প্রধান

Sl. No. 108

ধানু হাজরার জোলের জমি

স্বপন পাঁজা

গ্রামে ঢোকার মুখে অশ্বত্থগাছের নিচে প্রায় সারাদিনই বসে থাকে ধানু হাজরা। ভোর রাতেই গুটি গুটি হেঁটে সে এখানে চলে আসে। দুপুরে ছেলে বা নাতি তাকে ধরে না নিয়ে গেলে ভাত খাওয়ার কথা তার মনেই থাকে না। সন্ধেয় অবশ্য নিজেই বাড়ি যায়।

এখানে সে খক্‌খক্‌ কাশে আর বিড়বিড় করে। ছেলে-ছোকরারা মাঝেমধ্যেই তাকে ছেঁকে ধরে। কেউ বলে—ও দাদু, তোমার সেই বগলদাবা করে দুটো ডাকাত ধরার গল্প বলো না, সেই যে দাঙ্গা আটকাতে লাঠি হাতে আল্লা মুসলমানদের দিকে আর খাঁড়া হাতে কালী হিন্দুদের দিকে তেড়ে গিয়েছিল!

এরপরই কেউ বলে, তোমার জোলের জমির গল্পটাই বলো! একই গল্প বারবার বলতে ও শুনতে ক্লান্তি নেই কারোরই।

ধানু শুরু করে, জমি তো নয়, মাখন! তোদের টেরাক নয়, সে সামলে একহাত ঢুকে যেত মোষের লাঙল! ওই সাতপোতেই এক মরাই! তখন কেউ ফুট কাটে, তুমি তো জমিদার দাদু! একথা গায়ে না মেখে জোলের জমির বৃত্তান্তই বলে চলে ধানু অনর্গল।

মাঠের সব জমির সার-ধোয়া জল ওই জমিতে ভাঙে বলেই সেটা জোলের জমি। তাই ফসলও হয় প্রচুর! সেদিন জোয়ান ধানুকে তার দাদুর টিপসই দেওয়া দলিল দেখিয়ে অশোক সামন্ত ওই জমিটা কেড়ে নিয়েছিল। বাপ-মরা ধানু ওই সামন্ত বাড়িতেই মাহিন্দার হয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে ওই জমিটাই খোরাকি হিসেবে চেয়ে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে সামন্তদের বেশ কিছু জমি খাস হলে ধানু ওই জমিটারই বর্গা পাট্টা পায়। সেদিনের জমি উদ্ধার বা দখলের আন্দোলনে সেও ছিল, তারই ফলশ্রুতিতে সে জমিটা ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু বুড়ো বয়সে সাতপুরুষের ওই জমিটা নিয়ে যে আবার সমস্যা হবে, তা ভাবেনি ধানু হাজরা। এবার সামন্তরা পরিবর্তিত সময়ের সুযোগে তার বিরুদ্ধে বর্গা উচ্ছেদের মামলা করেছে।

আজ দুপুরে ধানুকে কেউ বাড়িতে নিয়ে যায়নি। ওর ছেলে ও নাতি আজ শহরে গেছে। ওদের বারণ না শুনে আজও ধানু এখানে এসেছে। আজ আর গাঁয়ের ছেলে-ছোকররা বিকেলে তাকে ঘুমন্ত দেখে বিরক্ত করেনি। সন্ধেয় অচৈতন্য অবস্থায় তাকে ধরাধরি করে গাঁয়ের লোকেরা বাড়িতে দিয়ে এসেছে। রাত আটটা নাগাদ ওর ছেলে ও নাতি বাড়িতে ফেরে।

ধানু এখন জেলার হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এখনও শোনেনি, মামলায় সে জিতেছে, তার বর্গা উচ্ছেদ হয়নি, জোলের জমি তারই! সে এটাও শোনেনি যে ওই জোলের জমি বিক্রির বায়নাও নিয়ে নিয়ে নিয়েছে তার ছেলে-নাতি!

সমস্ত দর্শকবন্ধুদের জানাই
শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
মফঃস্বলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সিনেমা হল

উর্বশী সিনেমা

ধাত্রীগ্রামী রেলগেট, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 74

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০১

Sl. No. 63

মায়ার খেলা

যযাতি দেবল

ফাটকে আটক নেই দুবৃত্ত দুর্জন—বুঝে গেছে রাজত্ব তাদের
ছা-পোষার ত্রস্ত চোখে ভয়ের প্রচ্ছায়া
ন্যাপলা কেলোদের ভোট—গণতন্ত্র জয় জয় হে

বাড়িতে ফেরেনি মেয়ে, শুয়ে আছে পোড়ো পাঁচিলের পাশ
থাবা চেটে ফিরে গেছে জান্তব উল্লাসে
এসব দৈনিক ছবি গাঁ-গঞ্জে ঘুম নেই জনক জননীর

চিটফান্ড কাটমানি তোলাবাজ মাফিয়া শাসনে
কথাঞ্জলি ভেসে যায় গাঁজাখুরি বচন বাচনে
পাদুকার ফিতে বেঁধে নৈতিকতা ধুয়ে সাফ আরক্ষা বাহিনীর

আসলে মায়ার খেলা দেখে শুনে পিঠটান মিডিয়াকুলের
ভাইঝি ভাইপোর দাপে চুপসে গেছে নিরপেক্ষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া
বিরোধীশূন্য সভা স্বৈরমুখী পলান্নে ঢালো ঘৃত ঢালো হে

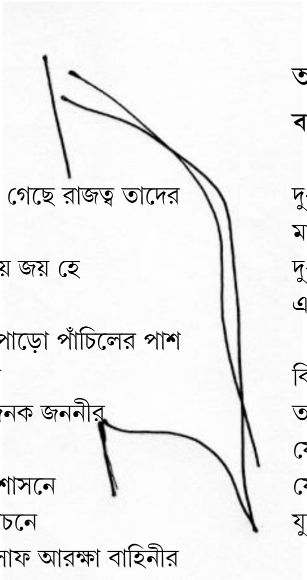

জীবনটা যেমন

সত্যনারায়ণ মাজিলা

নিজের মধ্যে গুনছি স্মৃতির পাতা
গোবরে নিকানো উঠান, বাউলের গান
ছোটো সে পল্লি, সোনার ফসল সবুজ ধান
করে আনচান—অসংখ্য আশালতা।

মনের ভেতরে ভাঙাচোরা ছবি
লেখকের মতো হয়নিকো লেখা
মানুষের মানুষ, নতুনের মাঝে পুরাতন একা
শূন্য হাটে আছে তবু সাধ, আছে অসংখ্য দাবি।

নিজের মধ্যে অগুনতি ফাঁকি
যত ঋণ তার সবটুকু বাকি
ফাঁকা হয়ে আজ ঢাকা খুলে যাই
দিয়েছো যা কিছু হারিয়ে ফেলেছি তার সবটাই।

কত দেখা হলো কত চেনা হলো গ্রাম থেকে শহর
অসংখ্য মুখ অসীম প্রকৃতির শত্রু-মিত্র সকলে আপন
কখনো কি আর ফিরে পাবো এই মনোহর
দ্বন্দ্ব ছন্দে উথালি-পাথালি অরূপ রতন।

জীবনটা বড়ো খেয়াল খুশি
দুঃখ-সুখের আসা-যাওয়া হাট
জীবনটা সেই স্রোতের প্রতিবেশী
জমানো যা কিছু বাতিল সেসব অসংখ্য আসবাব।

আমি সেই যুদ্ধ চাহি

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ আমাকে বলেছে : ভালো আছো?
মারণযজ্ঞের পরে কী রকম সোয়াস্তিতে আছো?
দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষগুলি বলে :
এর পরেও যুদ্ধ চাও? এর পরেও রক্ত-রঙ্গ চাও?

বিনীত সম্ভ্রম নিয়ে বললাম : আমি যুদ্ধ চাই
তবে হিরোসিমা নয়, সেই নাগাসাকি আর নয়
যেখানে অশিক্ষা আর যেখানে দারিদ্র্য ভর করে
যেখানে অন্যায় আর যেখানে দুর্নীতি ঘর করে—
যুদ্ধের সপক্ষে আমি, সেইখানে চালাব লড়াই।

কোরিয়ার রণাঙ্গন, ভিয়েতনাম, পশ্চিম এশিয়া
মধ্যপ্রাচ্য, উপসাগর, আফ্রিকা, ইরাক-ইরান
অনেক দেখেছি আমি। আর দেখতে চাই না বলেই
মানবিক ধর্মের সপক্ষেই যুদ্ধ করতে চাই।

পারমাণবিক আর ভয়ঙ্কর নাইট্রোজেন বোমা
কুইজ মিসাইল কিংবা আরও তীক্ষ্ণ নিউট্রন বোমা
যুদ্ধবিমান কিংবা সাবমেরিন—চাই না কিছুই
আমার আয়ুধ হবে রক্তাল্পতায় রক্তদান।

পরিচিত যুদ্ধ মানে মৃত্যু, অপচয়, অবক্ষয়
শ্মশানপুরীর দৃশ্য পৃথিবীতে অনেক দেখেছি।
আমি সেই যুদ্ধ চাই, যেখানে মানুষ হেসে হেসে
দুঃখ ভেঙে সুখ দেখবে, পেয়ে যাবে প্রার্থিত বিকাশ।

বৈদেশিক যুদ্ধ নয়। অন্য যুদ্ধে দেশের শাসক
পরমত ভেঙে দিতে সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলায়
মুক্তমনা যুক্তিবাদী কেউ জেলে, কেউ মশানে যান—
রাজধর্ম ধাক্কা খেলে জারি থাকবে আমার জেহাদ।

বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথের
পদতলে বসে আছি। তাঁদেরই সেরা অস্ত্র করে
পৃথিবীতে যুদ্ধ করব ‘শান্তির ললিত বাণী’ নিয়ে—
দরাজ আকাশে উড়বে পায়রার শুভ্র পদাবলি।

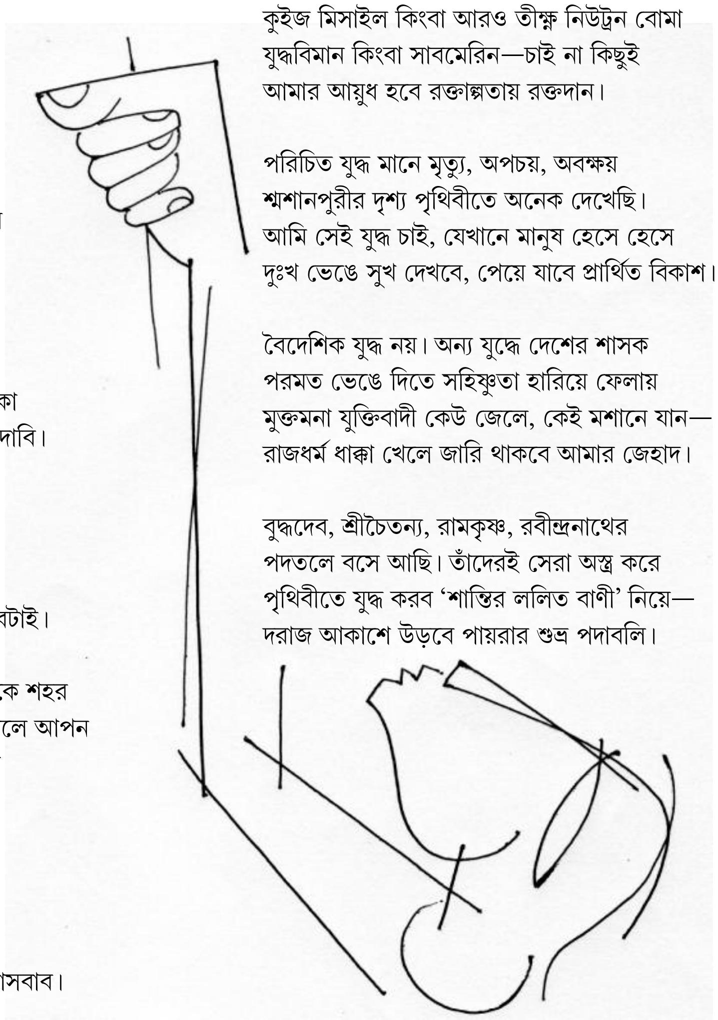

ডিরোজিওর ডাক
নলিনীরঞ্জন সরকার

প্রশ্ন কর মনের সুখে
সাহস করে সবাইকে
সমাজের সব পুরোনো প্রথা সম্পর্কে,
প্রশ্ন কর পরিবারের চলা রীতিকে।
দেশের সব কর্মসূচির কর বিশ্লেষণ
সঠিক বস্তু পেলে তবেই তার বরণ
নইলে ত্যাগ কর মোহ ছেড়ে
সন্দেহ কর প্রশ্ন ছুঁড়ে।

অলৌকিক কি কিছু হয়
ভেবে বল তাতে কী ভয়
গোঁড়ামির গোড়ায় কুড়ল মারো
প্রবল প্রচারককে চেপে ধরো।

রাত বলেছিল
অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

প্রতিটি ক্ষুদ্র জাগরণের গভীরে একটা
মহাজাগরণ আছে, সমুদ্রের মতো।
বিপুল গর্জন আর সমাহিত স্তব্ধতা মিলে
কালের সাক্ষী হয়ে থাকে
অনন্ত জলকল্লোল।

বিষাদ ও আনন্দে আর ভেদাভেদ নেই কোনো,
আমাদের মুহূর্তগুলো জমে জমে
সময়ের জন্ম হয়
মানব মানবী সেই সময়ের বুকে গভীরে বসে কাঁদে,
হাসে, খেলাঘর বাঁধে, ভেঙে দেয়, ভেঙে যায়...।

আমিও খেলেছি সেই বেলা-অবেলার খেলা
খেয়া নৌকায় ভেসে গেছি
দেখিনি কোথায় কোন ঘূর্ণি জাল
দু-হাত বাড়িয়ে আছে টেনে নেবে বলে।

সঙ্গী ছিল না তাই সাধনায় ব্যর্থ তাপস
ভেবেছিল নিষ্প্রাণ পথ পার হলে
খুঁজে পাবে নিজস্ব পৃথিবী।

স্বপ্ন দেখিনি কতদিন!
সোনালি রোদ্দুর আসে
সকালের রূপকথা গায়ে মেখে খোলা বাতায়ন হাসে
বিগত রাত্রির কথা মনে পড়ে
রাত বলেছিল—আজ ঠিক স্বপ্ন দেখাবে।

বয়স
কনিষ্ক আচার্য

রোদের বয়স বড়লে সুস্থির দুপুর দাঁড়ায় দৃঢ়পায়ে
টিকফুটো রোদে, সচেতন পাখিকেও চেতনা হারায়

হয়তো বা পথ—পথেই আছে শুয়ে, তবু—
পথিক পায়না খুঁজে তারে—আধুটির চোখে।
এরপর মুহ্যমান, বেলা নেমে এলে—
আরামের দাবি নিয়ে মুদে আসে আঁখি
প্রাণপাখি—বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায়
খোঁজে শান্তির নীড়।
ধরণীতে কৃষ্ণকায়, ছায়ার শরীর নেমে আসে;
শৈশবের স্মৃতিগুলি দুর্নিবার যেন—
ভিড় করে রেশন লাইনে, তবু কোনো কোনো স্মৃতি
লাইনের আইন ভেঙে তছনছ করে দেয়—
স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি, রীতিনীতি ভুলে যাওয়া রীতি
চেতনা বিজলি হানা চোখে দেখে নেয়
দু-চার ঝিলিক, সবকিছু ঠিকঠাক আছে
কিনা?—না গেলেও বোঝা অবশ্যই এইটুকু
বোঝা যায়—শৈশব থেকে বার্ধক্যের
মহিম মঞ্জিল—অনেক দূরের পথ।
অনেক দূরের!

মেঘসীমানা
পরেশ কর্মকার

দাঁড়াও একটুখানি আলো জ্বেলে দিই
পাথর ডিঙিয়ে শিশির কণায় পা রেখে
সমুদ্র উৎসব ব্যস্ততায় উন্মুখ হবে
অনেকখানি বোবাকান্না বুক চেপে বসে আছে
দৃষ্টি নেই আওয়াজ নেই সাজসজ্জা নেই
গড়িয়ে নামছে মেঘসীমানা মানুষের অবয়বে
যা কিছুকাল পর্যন্ত মুখস্ত ছিল তা সব ভুলতে বসেছি
ব্যক্তিকুণ্ঠাবোধ, ব্যঙ্গাত্মক পর্যায়গুলি চাউর করে
মাথা চাড়া দেয় কৌলীন্য বজায় ধরে রাখতে
স্পর্শ করলে সম্পূর্ণ হওয়ার স্বাদ ঘেমে ওঠে
হাউইয়ের মতো ফস্কে আকাশলীন হতে থাকে সর্বৈব চেতনা
ভাবি তখনও একাকী পেরিয়ে গেছো কি ওই মেঘসীমানা?
সাহসের ডানায় ভর করে কত না উড়বে মত্ত বাতাসে।

হে বন্ধু—বিদায়!

অজয়রঞ্জন বিশ্বাস

১.
কল্লোলিনী সময় বহে যায়...

একটি বাঁকে থমকে থাকে হাত
চমকে ওঠে চোখ
কারা যেন ফিসফিসিয়ে বলছে ডেকে কাকে
তোমার উদ্যান ভরে উঠুক পুষ্পে-ফলে
বিকেল-ভরা থাকুক সূর্যালোক!
পাহাড়-চুড়ায় পাথর ভেঙে-ভেঙে
নামছে নামুক উচ্ছ্বলিত জলপ্রপাত
গানের সুরে কারা যেন জানায় প্রণিপাত
কে যেন কার জড়িয়ে ধরে হাত
অনুচ্চার্য বেদনায় বলছে : বিদায় বন্ধু কমরেড বিদায়...
কল্লোলিনী সময় বহে যায়... বহে যায়...

২.
বন্ধু তোমার চমকে ওঠা চোখে
বিষাদ কেন তরঙ্গিত? হাসিরাশি উঠুক উথলে!
স্মৃতির স্তরে অঙ্গীভূত কণাগুলি দুহাতে ঠেলে
কোন্ আগুনের স্ফুলিঙ্গ হঠাৎ উঠুক জ্বলে?
সেই আগুনে কোনো কমরেড কি সিগারেট ফোঁকে?

৩.
চরৈঃবেতি চরৈঃবেতি যে-যার মতো নিজস্ব আলোকে
নিজস্ব বোধের সত্যে নিজস্ব আবহে
কল্লোলিনী সময় যাচ্ছে বহে!
ইতিহাসের এই দশকের বাঁকে পা-ফেলে
জানি তোমার অমোঘ অঙ্গুলি
ছিন্ন করবে মুখোশ মূর্খদের
ঘৃণ্য জানে ক্ষমতাকে পূজার অঞ্জলি
ঘৃণ্য জানে ক্ষমতার উচ্ছিষ্টের ভোজ
অন্তরালের মায়ামৃগ খোঁজ
ঘৃণ্য জানে বিষদন্ত হাসিতে লুকানো—
কী হবে হৃদয় খুঁজে বীভৎস কবর জাগানো?
ইতোমধ্যে হুহুঙ্কারে কল্লোলিনী সময় বহে যায়...
হে বন্ধু বিদায়!

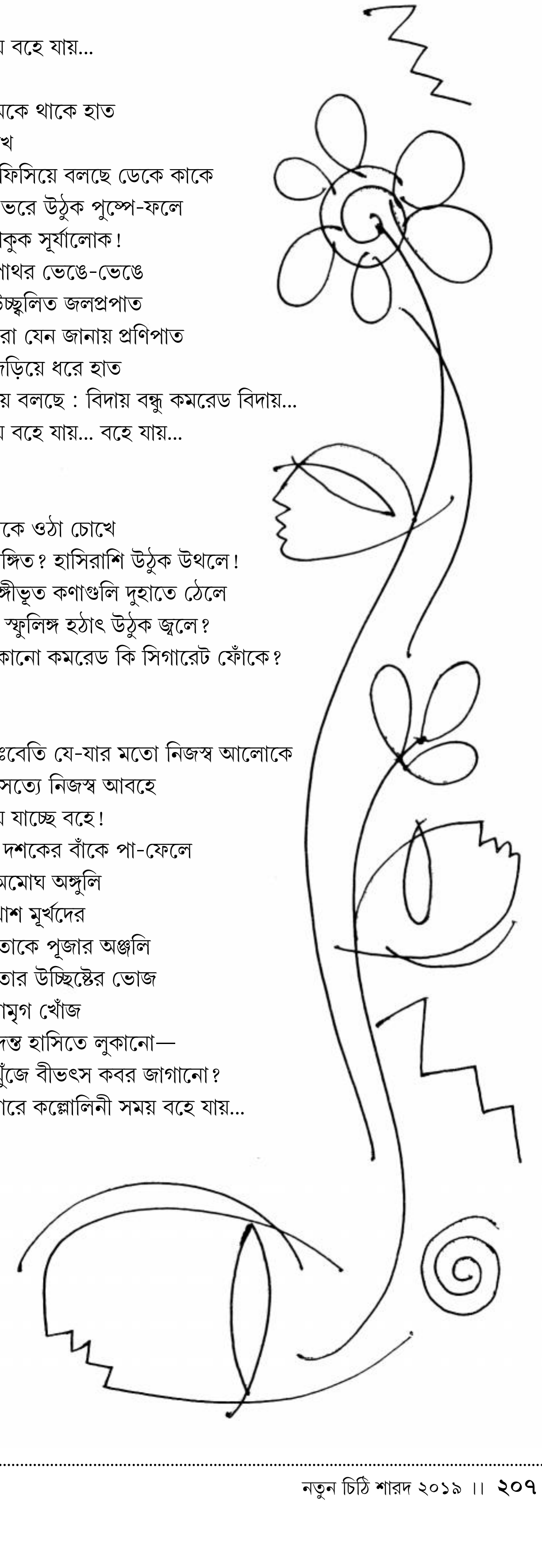

শেষ গান : কোনো এক শিশুকে

রবার্ট ফ্রাস্ট
অনুবাদ : **দিলীপ মুখোপাধ্যায়**

যেই দেখা খুলে দ্বার
বলে কাক, —নমস্কার
একটি খবর আছে, মহাশয়—
পৌঁছে দেবেন কি লেস্‌লি-আলয়?
ছোটো নীল পাখি তার
জানাতে দিয়েছে ভার :
গত রাতে ছিল হাওয়া উত্তর
চিকচিক করেছিল তারার অধর,
পাত্রে পানীয় যত জমাট বরফ—
সে কাশে সমস্ত রাত বুকে নিয়ে কফ।
ঝড়ের তুমুল বেগে জীবন সঙ্গিন
নিজের পালক খসে ক্ষীণ হতে ক্ষীণ।
তাই যেতে হল তারে নিরুপায়—
অবশেষে জানিয়ে বিদায়।
বলে গেছে, ভালো থেকো—
রাঙা উষ্ণীষ মাথায় রেখো
বরফের স্তূপ ভেঙে চালিয়ে কুঠার
পথের সন্ধান তুমি কোরো উদ্ধার,
আর কোরো সব ঠিকঠাক।
কোনোদিন বসন্ত ফিরে এলে
সে-ও আসিতে পারে গানের প্রদীপখানি জ্বেলে।

আসলে মানুষ

তপন পাল

আচরণ বলে 'ম্লেচ্ছরে' তুই
        শরীরটা বলে 'হিন্দু'
পোষাক ও ভাষা বলে এ বাঙালি
        ভুল নেই এক বিন্দু
খাওয়া দাওয়া বলে, 'ভিখিরি'রে ওটা
        লেখা বলে 'ঠোঁট কাটা'
ধর্মবাদীরা গালাগাল দেয়
        বলে 'নাস্তিক' ব্যাটা।
নিয়ম কানুন হাল ছেড়ে ভবে,
        এ এক 'বেতালা' বটে,
সংস্কারের গেঁড়ো বলে হেসে
        শিক্ষা নেইকো ঘটে।
কালচার বলে, করেনা কো এটা
        সুযোগের ব্যবহার,
দাদা নেতা ভাবে ফুটো পয়সার
        এটা কোনো জমিদার!
মানী-ডাকাবুকো বলে 'কানকাটা'
        ভায়রা ঘেঁষে না কাছে
চাল-চলনেরা 'বেয়াকুব' ভাবে
        'আমি'তে 'মানুষ' হাসে।

নব্য মহাভারত

গৌতম সাহা

এসো, নতুন ভারত গড়ি,
একটা মহাভারত।
যেখানে কোনো দুঃশাসন থাকবে না,
থাকবে না কোনো দুর্যোধন,
ধৃতরাষ্ট্রের মতো কোনো অন্ধ রাজাও থাকবেন না।
গুরুজনেরা পাবেন যথাযোগ্য সম্মান,
নারী পাবে যথার্থ মর্যাদা।
কোনো রাজসভায়, প্রকাশ্যে বা অলক্ষ্যে
কখনও কোনো নারীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে না।
পঞ্চপাণ্ডবের মতো কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বামী
চোখের সামনে কুলবধূর অপমান
মুখ বুজে মেনে নেবে না, প্রতিবাদ করবে,
প্রয়োজনে অস্ত্র ধরবে।

ভালোমানুষির নামে কারও
সম্পত্তি হরণ বা কোনো নাগরিককে
তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
স্বামী অন্ধ বলে কোনো স্ত্রীও গান্ধারী হবেন না,
ভুল সিদ্ধান্ত, স্বার্থপর চিন্তা থেকে
গৃহস্বামীকে নিবৃত্ত করবেন।

শিক্ষক যেমন যথাযোগ্য সম্মান পাবেন
তেমনি শিক্ষকও শিক্ষার্থীর
প্রাপ্য স্নেহ, অধিকার কেড়ে নেবেন না।
আর কোনো একলব্য দেখতে চাই না।
নিম্নবর্গের মানুষ বলে তাকেও শিক্ষালয় থেকে
অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করতে পারবে না
কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
কোনো কর্ণকে যেন আর
পরিচয় গোপন করে অন্য গুরুর কাছে
শিক্ষালাভ করে পরে পরিচয় প্রকাশ হবার পর
অভিশপ্ত হতে না হয়।

ধর্মযুদ্ধ যুগে যুগে হয়,
এবারেও হবে।
তবে সে যুদ্ধে যেন কোনো অধর্ম না হয়;
সপ্তরথী মিলে যেন কোনো অভিমন্যুকে হত্যা না করে,
নিরস্ত্র শোকাতুর দ্রোণের মুণ্ডচ্ছেদ আর দেখতে চাই না,
শিখণ্ডী খাড়া করে কোনো পিতামহকে যেন শরবিদ্ধ করা না হয়।
চরম পাপী, অধর্মী, অন্যায়কারী জেনেও
অন্যায় যুদ্ধে কোনো দুর্যোধনের
উরুভঙ্গ চলবে না।

ধর্মযুদ্ধে ধর্মেরই জয় হতে হবে,
তা-তে আঠারো দিনের জায়গায় যদি
আঠারো মাস লাগে, লাগুক।

....

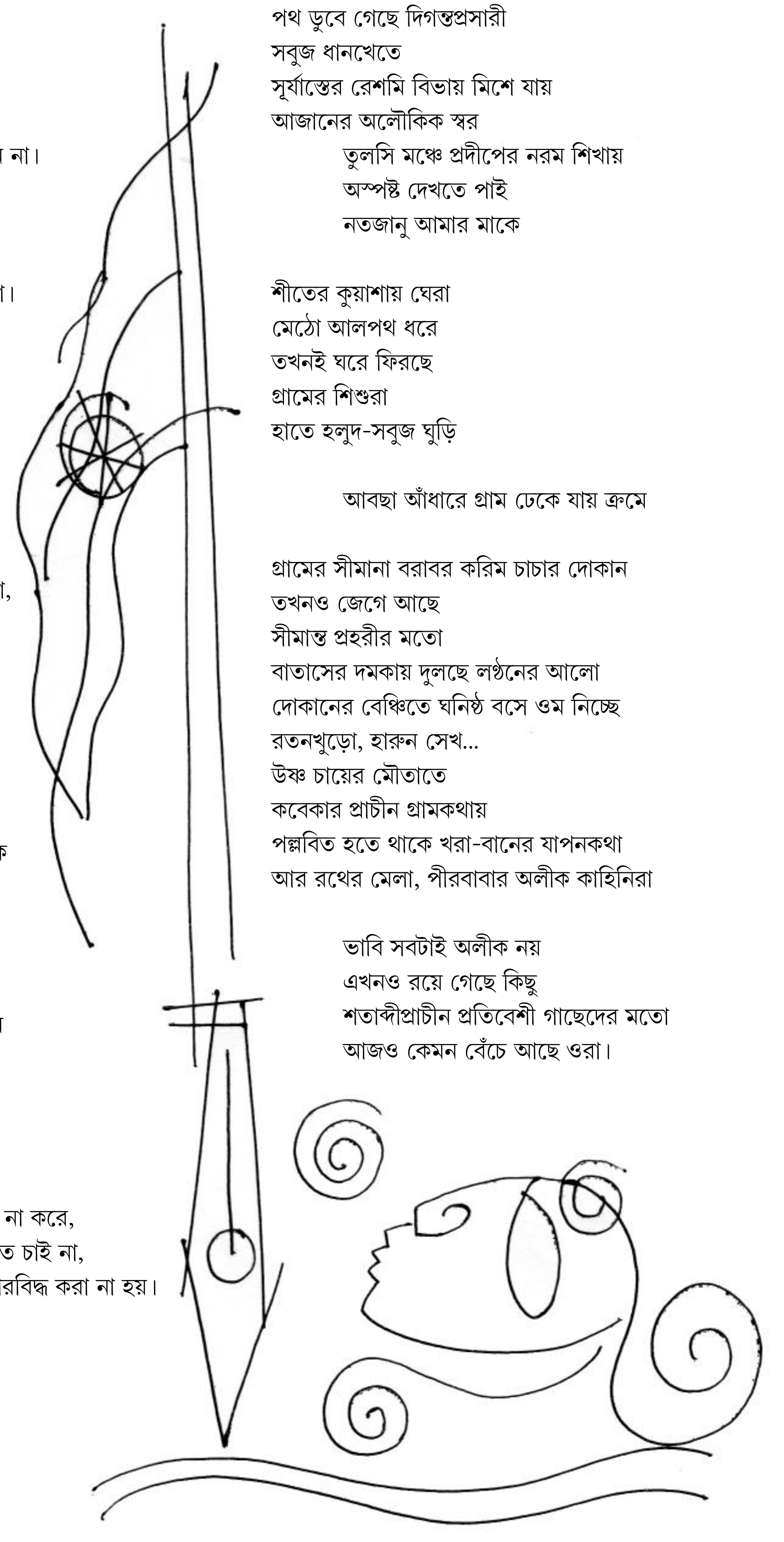

গ্রামকথা

অনন্য ভট্টাচার্য

পথ ডুবে গেছে দিগন্তপ্রসারী
সবুজ ধানখেতে
সূর্যাস্তের রেশমি বিভায় মিশে যায়
আজানের অলৌকিক স্বর
তুলসি মঞ্চে প্রদীপের নরম শিখায়
অস্পষ্ট দেখতে পাই
নতজানু আমার মাকে

শীতের কুয়াশায় ঘেরা
মেঠো আলপথ ধরে
তখনই ঘরে ফিরছে
গ্রামের শিশুরা
হাতে হলুদ-সবুজ ঘুড়ি

আবছা আঁধারে গ্রাম ঢেকে যায় ক্রমে

গ্রামের সীমানা বরাবর করিম চাচার দোকান
তখনও জেগে আছে
সীমান্ত প্রহরীর মতো
বাতাসের দমকায় দুলছে লণ্ঠনের আলো
দোকানের বেঞ্চিতে ঘনিষ্ঠ বসে ওম নিচ্ছে
রতনখুড়ো, হারুন সেখ...
উষ্ণ চায়ের মৌতাতে
কবেকার প্রাচীন গ্রামকথায়
পল্লবিত হতে থাকে খরা-বানের যাপনকথা
আর রথের মেলা, পীরবাবার অলীক কাহিনিরা

ভাবি সবটাই অলীক নয়
এখনও রয়ে গেছে কিছু
শতাব্দীপ্রাচীন প্রতিবেশী গাছেদের মতো
আজও কেমন বেঁচে আছে ওরা।

মিয়ামি

প্রভাত ঘোষ

সকাল থেকেই এক নাগাড়ে
ঝম্ ঝম্ আর ঝিম্ ঝিম্
কাচের ওধারে বৃষ্টির ধারাপাত
দূরে আকাশছোঁয়া প্রাসাদ
আর ম্যাংগ্রুভ গাছের সারি
বৃষ্টিতে ধূমল।

ফ্লোরিডার উপকূলে একি দমকা হাওয়া!
আকাশে আষাঢ় এলো নাকি!

মিয়ামির আকাশে হঠাৎ হঠাৎ রূপ বদল
ঘন মেঘে তার মুখ থম্ থম্
আবার তখনি
গাঢ় নীলে প্রাণখোলা তার হাসি
সূর্য-করে উজ্জ্বল এই ধরণী।

একশ চৌষট্টি দেশের এই
রঙিন সমাবেশ
সমাবেশে আর সমারোহে
বৈচিত্র্যে আর বৈভবে
সম্মেলনে সমবেত আমরা
গাই শুধু জীবনের জয়গান!

সম্মেলন শেষ হয়
সমাবেশে পড়ে থাকে
লিফলেট আর পোস্টারের পাহাড়।
বৈকালিক মিয়ামির
এই ধূসর বেলাভূমিতে
শুধু ঢেউয়ের আনাগোনা—
আর ভেঙে পড়া।

পৃথিবীর ঠিক উল্টো দিকে রয়েছো তুমি—
ফ্লোরিডার উপকূলে।
হা-হা করছে হাওয়া।

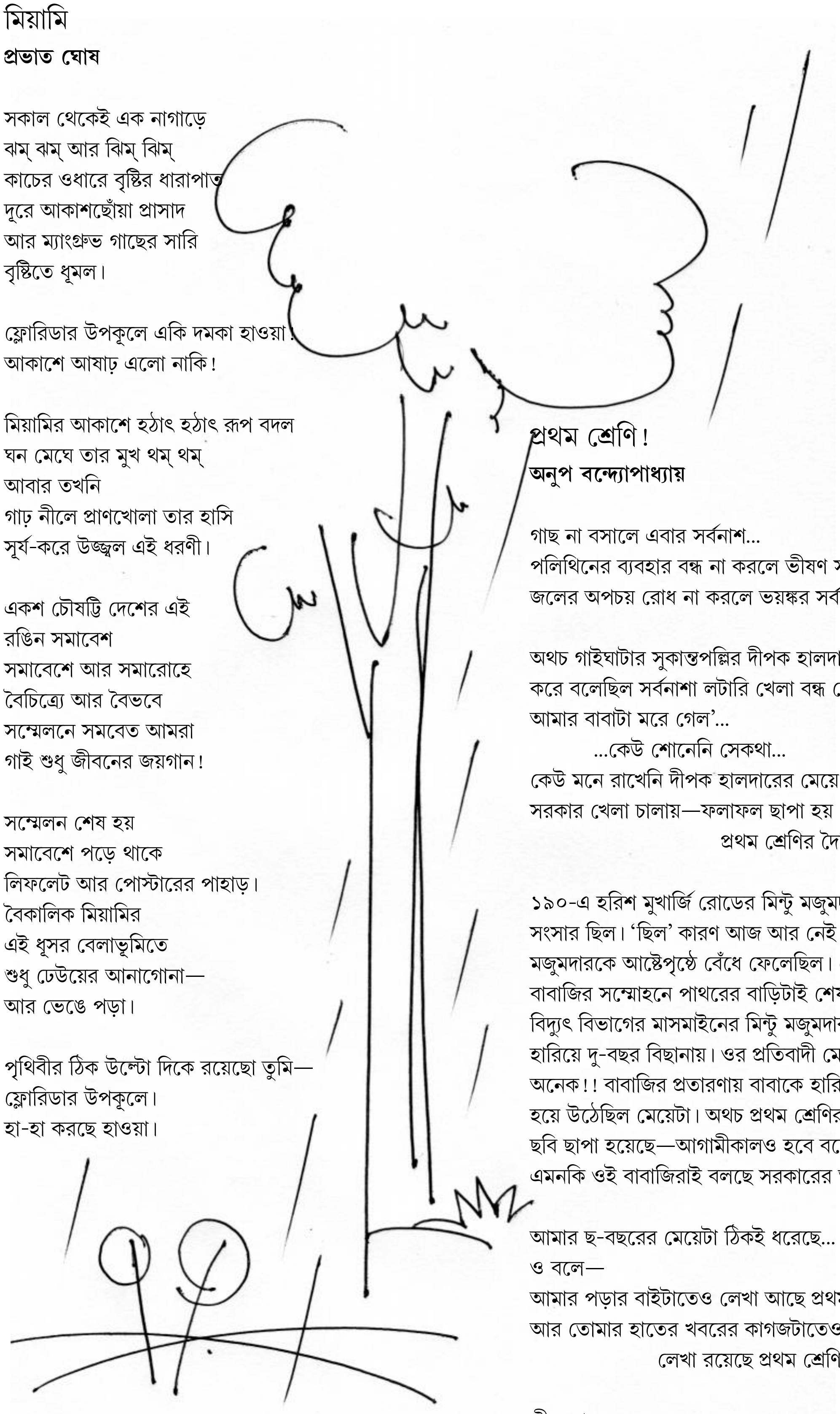

প্রথম শ্রেণি!

অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছ না বসালে এবার সর্বনাশ...
পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ না করলে ভীষণ সর্বনাশ...
জলের অপচয় রোধ না করলে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ...

অথচ গাইঘাটার সুকান্তপল্লির দীপক হালদারের মেয়েটা হাতজোড়
করে বলেছিল সর্বনাশা লটারি খেলা বন্ধ হোক—‘লটারির নেশায়
আমার বাবাটা মরে গেল’...
...কেউ শোনেনি সেকথা...
কেউ মনে রাখেনি দীপক হালদারের মেয়ে সুপ্রিয়াকে
সরকার খেলা চালায়—ফলাফল ছাপা হয়
প্রথম শ্রেণির দৈনিকে।

১৯০-এ হরিশ মুখার্জি রোডের মিন্টু মজুমদারের একটা সুখের সংসার ছিল। ‘ছিল’ কারণ আজ আর নেই। ভবিষ্যৎ ভাবনা মিন্টু মজুমদারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। বৌবাজারের এক বাবাজির সম্মোহনে পাথরের বাড়িটাই শেষ পর্যন্ত বেচে দিল। বিদ্যুৎ বিভাগের মাসমাইনের মিন্টু মজুমদার বাইক অ্যাক্সিডেন্টে পা হারিয়ে দু-বছর বিছানায়। ওর প্রতিবাদী মেয়েটাও চিঠি লিখেছিল অনেক!! বাবাজির প্রতারণায় বাবাকে হারিয়ে অত্যন্ত প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল মেয়েটা। অথচ প্রথম শ্রেণির দৈনিকে আজও তাদের ছবি ছাপা হয়েছে—আগামীকালও হবে বলে চুক্তি হয়ে আছে। এমনকি ওই বাবাজিরাই বলছে সরকারের ভবিষ্যৎ।

আমার ছ-বছরের মেয়েটা ঠিকই ধরেছে...
ও বলে—
আমার পড়ার বাইটাতেও লেখা আছে প্রথম শ্রেণির
আর তোমার হাতের খবরের কাগজটাতেও
লেখা রয়েছে প্রথম শ্রেণির...

কী মজা!
কী মজা!

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

নবস্থা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ ও কর্মীগণ

Sl. No. 134

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সুশান্ত কুমার রায়

কিশোরকোণা, খানা জংশন, গলসি, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 133

রুপিন পাস অভিযান

বিলাস চ্যাটার্জী

হিমাচল হিমালয়ের কিন্নর প্রদেশের বাসপা বা বিপাসা উপত্যকা এবং গাড়োয়াল হিমালয়ের তমসা উপত্যকার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ধৌলাধার পর্বতমালা। আর এই পর্বত-মালার দু-দিকে যাতায়াতের সহজ গাড়ি চলার পথ ছিল না, এখনও গাড়ি-পথে অনেক ঘুরে ঘুরে পৌঁছাতে হয়। অথচ এই দুই উপত্যকায় যাতায়াত ছিল অতীত কাল থেকেই। যাতায়াত হতো পায়ে হেঁটে। ব্যবসা-বাণিজ্যও হতো এই পায়ে চলা পথ ধরেই। যাতায়াতের জন্য এই দুই উপত্যকার মাঝে কয়েকটি গিরিবর্ত্ম আজও বিদ্যমান। এখন এই গিরিবর্ত্মগুলি আর সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নয়। তবে পাহাড়ি মেষ-পালকরা বছরের কয়েকমাস যাতায়াত করে থাকে এই পথগুলি দিয়ে। লামখাগা, বরাসু, ক্ষিমলোগা, সিন্‌কা, নলগান বা রুপিন পাস বা গিরিবর্ত্ম দিয়েই ব্যবসা- বাণিজ্য সহ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের যাতায়াত হয়ে থাকত। তবে এর অধিকাংশই আজ দুর্গম হিমালয় অভিযাত্রীদের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এই গিরিপথগুলি ছিল সিল্করুটের অন্তর্গত।

এখন আমি রুপিন গিরিবর্ত্ম-এর বর্তমান অবস্থার কথা জানাবো। অতীতকাল থেকেই এই গিরিপথটি বহুল প্রচলিত একটি পথ। আগের জানানো অন্যান্য গিরিপথগুলিতে সাধারণ মানুষের যাতায়াত না থাকলেও আজও উভয় দিকের কিছু গ্রামের মানুষ এই পথে যাতায়াত করে থাকে। মে-অক্টোবর পর্যন্ত বেশ কিছু হিমালয় অভিযাত্রী দল এই পথে গিয়ে থাকে। অর্থাৎ বেস কয়েকটি করে প্রতিবছর অভিযান এই পথে সংগঠিত হয়ে থাকে। এই বহুল প্রচলিত গিরিপথ দিয়ে বাসপা উপত্যকা থেকে তমসা উপত্যকায় যাওয়ার কথা এখন আপনাদের জানাবো।

এই পথে বেশি অভিযান সংগঠিত হয়ে থাকে গাড়োয়াল হিমালয়ের শাঁকারি থেকে। শেষ হয় হিমাচলের সংলায়। তবে আমরা গিয়েছিলাম সাংলা থেকে, শেষ করেছিলাম শাঁকরিতে।

প্রথম দিন

সাংলা থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে বিয়াস নদীর উপর সেতু পার হয়ে নদীর অপর পারে চলে এলাম। একটু এগিয়েই উপর থেকে নেমে আসা একটি নদী মিলিত হচ্ছে বিয়াসের সাথে। সেই সঙ্গম অঞ্চল থেকে আমরা ডান দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই পথে উঠে যেতে থাকলাম। নিচের দিকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে শুরু করলেও একসময় গাছ শেষ হল। পাহাড়ের গা বেয়ে আড়াআড়ি ভাবে চড়াই বেয়ে উঠে চলি। অনেকটা উপরে উঠে এসে পৌঁছাই ডানদিক থেকে নেমে আসা একটি নদীর সামনে। উপর থেকে নেমে আসা অপর একটি নদীর সাথে মিলিত হচ্ছে একটু নিচেই। এই দুই নদী একত্র হয়ে সাংলায় মিলিত হচ্ছে বিয়াসের সাথে। সামনে থেকে নেমে আসা নদীটির সৃষ্টি হয়েছে নলগান অঞ্চলে। সেই পথেই যাওয়া যায় নাপসাল গিরিবর্ত্মে। আমরা এবার যাব ডান দিকের নদীর তীর ধরে। এই নদীর সৃষ্টি হয়েছে রুপিন অঞ্চলে। এই জায়গার নাম সাংলা কান্দা। এখানে কিছু ভূজ ও রডোডেনড্রন গাছের ঝোপ দেখা যায়। এর পর আর গাছ নজরে আসে না।

সাংলা কান্দাতে বসে দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম। এখান থেকে দূরে কিন্নর কৈলাশ পাহাড়শ্রেণি দেখা যায়। চারিদিকের পাহাড় রুক্ষ্মতায় ঘেরা হলেও সুন্দর লাগে। বিশ্রাম শেষ হলে আবার পথ চলা শুরু করি। এবার চড়াই আরও কঠিন হয়।

দুর্গমতা না হলেও পথ চলতে দমের ঘাটতি হয়। আমাদের আজকের লক্ষ্য রুপিন বেস ক্যাম্প থাকলেও প্রথম দিনের পথ চলায় বেশ কষ্ট হচ্ছে। আমরা বেস ক্যাম্পের অনেকটা আগেই একটি সুন্দর জায়গায় নদীর ধারে আজকের ক্যাম্প করি। আগামী কাল এখান থেকেই আমরা রুপিন গিরিবর্ত্মে পৌঁছাব।

পাহাড়ের গায়ের নদীর তীরে একটি সুন্দর জায়গায় আমাদের আজকের তাঁবু ফেলা হয়েছে। পিছনের পাহাড়ের দিকে মেষ পালকরা তাদের ছাগল, ভেড়া নিয়ে বেস ক্যাম্পের দিকে চলেছে। আগামী কাল ওরাও পাস পেরিয়ে অপর দিকে পাহাড়ে যাবে। তারই প্রস্তুতিতে ওরা সামনে এগিয়ে চলেছে। পিছনে যে পথে আমরা এলাম সেখানের বহুদূর পর্যন্ত পাহাড়ের সারি নজরে আসে। দূরে কিন্নর কৈলাস পাহাড় দেখা যায় আকাশ পরিষ্কার থাকায়। ফাঁকা জায়গায় আমাদের টেন্টের পাশেই কিচেন বানিয়ে রান্না শুরু হল। আমরা অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বসে থাকলাম রাতের খাবার না হওয়ায়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কষ্ট হলেও মেঘমুক্ত খোলা আকাশের তলায় বসে রাতের পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে ভালোই লাগছিল।

দ্বিতীয় দিন

ভোরের আলো ফুটতেই আমরা উঠে পড়লাম। হিমালয়ে এমন পাস বা গিরিবর্ত্মগুলির নিয়ম হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার হয়ে যেতে হয়। একটু বেলা হলেই এই অঞ্চলে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে বেশি। আবার আমরা যেহেতু বেস ক্যাম্প থেকে অনেকটা নিচে ক্যাম্প করেছিলাম তাই আমাদের পাস পর্যন্ত পৌঁছাতেও সময় বেশি লাগবে।

চাইলেও যেতে পারলাম না। তৈরি হয়ে যাত্রা শুরু করতে ৭টা বেজে গেল। সামনেই চড়াই বেয়ে উঠে এলাম পাহাড়ের মাথায়। পরে কিছুটা এগিয়েই বেস ক্যাম্প অঞ্চলে পৌঁছাতে প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় লাগল। গতকাল এখানে আসা সত্যিই আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাত হয়ে যেত পৌঁছাতে। আজ সকালের মনোরম আবহাওয়ায় পথ চলার কষ্ট অপেক্ষাকৃত কম। যদিও এই উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় দমের ঘাটতি হয়। বারে বারে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় দম নেওয়ার জন্য। পাসটি দূর থেকে দেখা গেলেও পৌঁছাতে বেশ কষ্ট হয়। তবে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই অঞ্চলে এখনও তুষারপাত শুরু হয়নি। তাই পথ চলাবার কষ্ট অনেক কম হয়। পাসের নিচে একটি হিমবাহের উপর একটি ছোট জলাশয় রয়েছে। বরফ ঢাকা থাকলে এই জলাশয়ের উপর দিয়েই চলে যাওয়া যেতো। এখন বরফ নেই, তাই সতর্ক হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পাসের নিচে পৌঁছাই। এখান থেকে কয়েকশো ফুট মাটি পাথরের উপর দিয়ে খাড়াই চড়াই বেয়ে উঠে আসি রুপিন পাসের মাথায়। ঘড়িতে তখন ১১টা বাজে। এখনও আবহাওয়া বেশ ভালো। রোদ রয়েছে।

সারা পথে কোথাও এক ফোঁটা বরফ নেই। এমনকি ১৫২৫০ ফুটের উপর পাসেও কোনো বরফ না থাকায় একটু অবাক হলেও বেশ সুবিধা পেলাম। যে দিকে পাসের উপর উঠে এলাম সেই পথে বরফ থাকলে কষ্ট ও সময় বেশি লাগত। মেষপালকের দল আমাদের আগেই পাসে এসে উঠেছে। তবে তারা আমাদের আগে নেমে যেতে বলল। হাজারেরও বেশি ছাগল ভেড়া যে পথে যাবে সেই পথে পরে নামতে হলে তাদের বিষ্ঠায় আমাদের মাখামাখি হতে হবে। তাছাড়া যত সহজে উঠে এলাম তত সহজে এখান থেকে নেমে যাওয়া যে সম্ভব নয় তা একটু পরেই বুঝলাম।

পাসের মাথা থেকে দূরে কিন্নর কৈলাশকে আরো পরিষ্কার এবং সুন্দর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অপরদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সরস্বতী হিমবাহ। এখন মোরেন ও স্লেট পাথরে ঢাকা আছে। উপরে বরফ নেই। আমাদের নামতে হবে সেই হিমবাহের উপর। এই হিমবাহ থেকেই রুপিন নদীর সৃষ্টি হয়েছে। পাসের মাথায় উঠে এলে পুজো দেওয়ার নিয়ম। চন্দন সিং পুজো দিল দেবতার উদ্দেশ্যে। ধূপ জ্বালানো হলো। আমাদের চলল ফটোসেশন। তবে এত উচ্চতায় বেশি সময় থাকা ঠিক নয়। এবার আবহাওয়া খারাপ হওয়ার সময় হয়েছে। তাই নামার প্রস্তুতি শুরু হল। প্রথমেই মাটি পাথরের পিচ্ছিল উৎরাই বেয়ে প্রায় ১০০ ফুটের মতো নামতে হবে। যেখানে পা ফেলে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, গড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, সেই পথে নামব কী করে! গড়িয়ে পড়ার বিপদের হাত থেকে বাঁচতে দড়ির সাহায্য নিতে হল আমাদের। সাথে স্থানীয় পোর্টাররা বা মালবাহকদের সাহায্যে কোনো রকমে প্রথম ধাপ নেমে এলাম।

এরপর শুরু হল স্লেট পাথরের ভঙ্গুর পাহাড়ের গা বেয়ে নামা। সোজা নয়, একটু আড়াআড়ি ভাবে নেমে চলি এই অঞ্চলটিতে। এখানেও আমাদের সাহায্য নিতে হল স্থানীয় পোর্টারদের। দ্বিতীয় ধাপটি তো পার করে নেমে এলাম হিমবাহ অঞ্চলে। হঠাৎ কোথা থেকে মেঘ এসে পড়ল। সাথে হাওয়ার দাপট। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যেতে থাকলাম। সামনে পথ কুয়াশায় ঢেকে গেল। এখানে বসে কিছু খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই আবহাওয়ায় সেটা আর সম্ভব হল না। সকলে দলবদ্ধভাবে নিচে নেমে চলি। আর দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। যত শীঘ্র সম্ভব ক্যাম্প সাইডে পৌঁছাতে হবে। শুরু হল তুষারপাত। হালকা উৎরাই বেয়ে চলার পথ হওয়ায় সহজেই চলছিলাম। হঠাৎ এক খাড়াই দেওয়ালের উপর এসে পৌঁছলাম। এই দেওয়াল বেয়েই নামতে হবে আমাদের শেষ ধাপটি। চলার গতি কমিয়ে সন্তর্পণে নেমে চলি পাথরের উপর দিয়ে। অবশেষে পৌঁছাই একটি সুন্দর তৃণাচ্ছাদিত ছোট ক্যাম্পিং সাইডে। এখানেই আজকের তাঁবু ফেলা হল। উপরে তুষারপাত হলেও এখানে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টিতে ভিজেই তাঁবুর ভিতর নিরাপদ আশ্রয়ে সকলে প্রবেশ করলাম।

শেষ বিকালে বৃষ্টি থামলেও আকাশের মুখ ভার হয়েই রইল। চা সহ হালকা টিফিনের ব্যবস্থা হলে সকলে বাইরে এলাম। ভিজে থাকায় বসার জায়গা পেলাম না। দাঁড়িয়ে ঘুরে এক ঝলক দেখে নিলাম অঞ্চলটা। বেশি দূরে নজর যায় না মেঘে ঢাকা থাকায়। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত বাইরেই ঘুরে সময় কাটাই।

তৃতীয় দিন

সকাল বেলা তৈরি হয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু হল। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। সকালের দিকে বৃষ্টি থামলেও আকাশ কালো মেঘে মুখ ঢেকেই আছে। যখন তখন বৃষ্টি শুরু হতে পারে। তাই আর দেরি না করে যাত্রা শুরু করলাম। আপার ওয়াটারফল ক্যাম্প। এখান থেকে রুপিন নদী তিনটি ধাপে পাথরের উপর আছড়ে পড়ে চলেছে নিচের দিকে। ঝরনার আকার নিয়ে নিচে চলেছে। আমাদের নামতে হবে সেই ঝরনার রুপিন নদীর তীর ধরে। খাড়াই উৎরাই পথ। মাটি পাথরে পিচ্ছিল হয়ে আছে। অতি সাবধানে একে একে নেমে এলাম একটি সুন্দর উপত্যকার উপর। সবুজ গালিচার মতো ঘাসে ঢাকা, দুই দিকে পাহাড়ের মাঝে সুন্দর এই উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে রুপিন নদী। আমাদের পথ তার পাশে পাশেই চলছে। এখান থেকে রুপিনের সেই ঝরনার রূপ অপূর্ব শোভা তৈরি করেছে এই জায়গায়। শুধু এই জায়গাতেই তাঁবু খাটিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারা যাবে। প্রকৃতির মাঝে এই রুপিন উপত্যকা এক কথায় স্বর্গরাজ্য। এই উপত্যকার নাম Rajshrung.

রুপিনকে ডান দিকে রেখে এগিয়ে চলি। তৃণভূমি শেষ হলে

শুরু হল ভূজ গাছের জঙ্গল। ক্রমশ জঙ্গল বাড়তে থাকে। ভূজ গাছ শেষ হলে পাইনের জঙ্গলের শুরু। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলি। এক সময় একটি সেতুর কাছে পৌঁছাই। নদীর অপর পারে এসে, আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়েই পৌঁছাই এক সুন্দর পাহাড়ি গ্রামে। জাখা গ্রাম। ছোট্ট সুন্দর এই গ্রামের মাঝে একটি ছোট মাঠের ভিতর আমাদের আজকের তাঁবু পড়ল। দিনের শেষে সূর্যদেব মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। সেই আলোতে গ্রামের, পাহাড়ের রূপ এক লহমায় নতুন সাজে সেজে উঠল। সারাদিনের পথ চলার ক্লান্তি যেন নিমেষে মিলিয়ে যেতে থাকল আমাদের।

চতুর্থ দিন

জাখা গ্রামটি গত কাল ভালো করে দেখা হয়নি। বিকালের ক্লান্ত শরীরে আর ঘুরতে মন চায়নি। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে এক চক্কর গ্রাম ঘুরে আসি। ছোট্ট গ্রাম জাখা। পাহাড়ের এতটা উচ্চতায় হাওয়ায় জীবন জীবিকা আর পঁচটা হিমালয়ের গ্রামের মতোই কঠিন। তবে এদের হাসিখুশি মুখ দেখে তা বোঝা যায় না। একঝাঁক শিশুর দল আমাদের সঙ্গ নিল। এদের খেলার জায়গায় আমাদের তাঁবু পড়েছে। তাই খেলা হচ্ছে না। আমরা ফটো তুললাম ওদের। সাথে থাকা লজেন্স দেওয়ায় বেশ আনন্দিত।

৮টা নাগাদ প্রাতরাশ সেরে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সুন্দর পায়ে চলা পথ। ক্রমশ নিচের দিকে যাচ্ছি তাই পাহাড়ের গায়ে গায়ে গ্রাম ও রামদানা নামক এই অঞ্চলের একটি ফসলে সেজে আছে পাহাড়গুলো। পাকা রামদানা লাল ও হলুদ দুই রং-এর রয়েছে। সবুজ পাহাড়ের গায়ে এই রঙিন ফসলের রং-এ দারুণভাবে সেজে উঠেছে এই সময়। এদিকে শরতের আকাশ আবার মেঘমুক্ত হয়ে নিজ রং-এ মাতিয়ে আমাদের মনে উৎসাহ যোগাচ্ছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার। এক সময় পৌঁছলাম জিস্কুন গ্রামে। একটি বাড়ির বাইরে বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ বয়স্ক মালকিন তার বাসায় আমাদের নিয়ে গিয়ে চা-জল দিল। ভবিষ্যতে এই পথে এলে তার বাড়িতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। তার কাছেই জানলাম এই পথে সে একদিনেই সাংলা যায় তার বাপের বাড়িতে। ভোরে যাত্রা শুরু করলে সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যায় সাংলা। এই অঞ্চলের অনেকেই এখনও এই পথে যাতায়াত করে থাকে।

এখান থেকে বেরিয়ে আবার উৎরাই বেয়ে নেমে আসি রুপিন নদীর তীরে। সেখান থেকে হালকা চড়াই বেয়ে উঠে আসি 'সেবা' গ্রামে। গ্রামের এক পাশে একটি কাঠের তৈরি উঁচু মন্দির আছে। সেখানে একখণ্ড সমতল জায়গায় আমাদের তাঁবু খাটানো হল বেলা ৩টা নাগাদ। এখানে দোকান আছে। প্রয়োজনে টুকিটাকি দরকারি জিনিস কেনা যাবে। ঠাণ্ডার প্রকোপ এতটা নেমে আসায় অনেকটাই কমে গেছে। তাই রাত পর্যন্ত বাইরেই সকলে বসে আড্ডা দিলাম।

পঞ্চম দিন

আজ আমাদের এই অভিযানের শেষ দিন। শুনলাম পথ বেশি নয়। তাই সকাল বেলা তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করে যাত্রা শুরু করলাম। হেঁটে পৌঁছাতে হবে ধূলা গ্রাম। সেখান থেকে গাড়িতে নৈয়টর পৌঁছালেই অভিযান শেষ হবে।

সেবা গ্রাম শেষ হলে পাহাড়ের গা বেয়ে উৎরাই পথে হেঁটে চলা। রোদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। মনের আনন্দেই নেমে চলি। মাঝে মাঝে পাকদণ্ডী পথে হলেও বেশিটাই পাহাড়ের গায়ে আড়াআড়িভাবে পথ চলা। কয়েকটি গ্রামের ভিতর দিয়ে এই পথ চলেছে। ঘন্টা আড়াই পথ চললাম কোথাও না বিশ্রাম নিয়েই। পৌঁছলাম ধূলা গ্রামে। একটি সেতু পেরিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছলাম। এখানে কয়েকটি ছোট হোটেল আছে। তবে সকালে প্রাতরাশ উপরেই সেরে আসায় এখানে শুধু চা খেয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম সকলে। দলের মালবাহকদের এগিয়ে দিয়েছিলাম একটি গাড়ি ভাড়া করার জন্য। এখান থেকে শেয়ারে গাড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দলটি বড় হওয়ায় আমরা একটি গাড়ি ভাড়া নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। গাড়ি-পথটিও অভিযানেরই অঙ্গ। কারণ এই পথে গাড়ি যেভাবে চলছে তাতে বুকের ভিতর সবসময় কেঁপে উঠছে। যাক ১১টার আগেই আমরা পৌঁছলাম নৈটয়র। আর এই সাথেই শেষ হল আমাদের এই অভিযান।

লেখক : অ্যাডভেঞ্চার, স্পোর্টস-এর সঙ্গে যুক্ত

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দক্ষিণেশ্বর রাইস মিল

গলিগ্রাম, গলসী, পূর্ব বর্ধমান

এখানে উৎকৃষ্ট মানের অতি সুন্দর ভাতের চাল প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।। সততাই আমাদের মূলধন

Sl. No. 107

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

মাঝের গ্রাম পঞ্চায়েত

আমাদের আবেদন

১. স্বশাসিত ও শক্তিশালী পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে সকলে সহযোগিতা করুন।
২. নিয়মিত পঞ্চায়েতে কর দিন ও এলাকার উন্নয়নে হাত বাড়ান।
৩. বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।
৪. পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা ভাবুন।
৫. প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার গড়ে নির্মল বাংলা গড়ে তুলুন।
৬. রক্তদান জীবনদান—এই কথা স্মরণে রাখুন।

সুমন্ত রায়
উপপ্রধান

বিপুল রায়
প্রধান

Sl. No. 69

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

হামুনপুর এস.কে.ইউ.এস. লি.

গ্রাম : হামুনপুর, পোঃ বোহার, মেমারি-২, পূর্ব বর্ধমান ।। বিক্রয় কেন্দ্র : রায়বাটী বাজার, ফোন : ৮৬১৭০৮৫৩২০

এলাকার কৃষি উন্নয়নে অত্র সমিতি বহুমুখী পরিষেবা প্রদান করে

দীনবন্ধু হালদার
ম্যানেজার

Sl. No. 47

With best compliments of

ELCON ENGINEERING

ELECTRICAL CONSTRUCTION, ELECTRICAL CONSULTANCY & TESTING

5/9, Guru Nanak Road, Durgapur-713204
Mobile : 9434388560, 9832167426
E-mail : elcon.engg@gmail.com

Sl. No. 128

বার্লিনের ডাইরি

কৌশিক লাহিড়ী

বার্লিন IBIS Mess

৬ অক্টোবর পঞ্চম প্রবাস। শুধু এই বছরেই পাঁচবার হল। শুরুটা মার্চে। মার্কিনদেশ। তারপর মে। প্রাগ। সেপ্টেম্বরে জাপান, সেপ্টেম্বরেই ভুটান। তারপর এই বার্লিন।

এবার এয়ারপোর্ট পিকআপ আর করে ওঠা হয়নি আগে থেকে।

অরূপদা (দাস) যাবে লিওনার্দো হোটেলে। আমি IBIS Berlin Mess-এ। ট্যাক্সি ১৫ ইউরো নিল। দুজনে ভাগাভাগি করে দিলাম। এছাড়া বাস, U-Bahn বা Underground S-Bahn বা Scatace Ircin ছিল। কিন্তু নতুন জায়গায় ভরসা পেলাম না। ট্যাক্সিই নিলাম। হোটেলটা B-র উল্টোদিকে। বিকেলে রেজিস্ট্রেশন করে এলাম। তারপর একই এলোমেলো হাঁটাহাঁটি। ছবি তোলা।

সিগিরিড মেইস্নারের সাথে কথা হল। নম্রভাষী মহিলা। স্টিভে ইমেটের প্রথম প্রেম। সেই সত্তরে। আজ স্টিভ পঁয়ষট্টি পেরিয়েছে, সিগরিড ষাটের নীচে নয় বলেই মনে হয়।

কাল পরশু, হামবুর্গ যাচ্ছে ছোট মেয়ের কাছে। আমিও ব্যস্ত থাকব, দুদিন। ঠিক হল শুক্রবার দেখা হবে। এই হোটেলে আমার ফ্লোরেই ডাঃ হেমা জেরাজানি আছেন। কাল সিটি ট্যুর করে নেব ভাবছি।

7th Sep. 10.30 p.m.
Hotel Barlin 1 bis Messe
Room 60S

বার্লিন ছুঁয়ে দেখা। প্যারিসের মতো Hot on Hop off sous। হোটেলের পাশে কাউন্টার। ২০ ইউরো দিয়ে যেখানে খুশি নেমে, পরের বাস ধরো। বা চুপচাপ বসে থাকো একই বাসে। তবে এখানে জ্যান্ত গাইড। প্যারিসে হেডফোন ছিল।

U-Bahn ধরলাম। U2 লাইন। পাঁচ নম্বর স্টেশন জুগার্ডেন। Keiserdam তারপর Soplie Charlolte Platz, Bisimark, Enst-Reuter-Platz, এবং Zoologiscuer garden.

প্রথমে বুঝতে পারিনি কোথা থেকে বাস ছাড়বে। একটু দেরি হল। প্রথমে Cafe Kauzler, তারপর Kadeue ফিলহার্মনি পেরিয়ে বার্লিন দেওয়াল। মাত্র দশ ফুট আজ অবশিষ্ট, উচ্চতাও বেশি নয়। একটু হতাশই হলাম। এককালে সেই প্রবাদপ্রতিম বার্লিন প্রাচীরের এই অবস্থা দেখে। ছমছমে চেকপয়েন্ট চার্লি, তারপর Gemdemrey ... ঐতিহাসিক ব্র্যান্ডেনবার্গ গেট। রাইখস্ট্যাগ। ইউরোপের বৃহত্তম রেল স্টেশন বার্লিন স্টেশন Haupt bemhot. তবে এসব ট্যুরে ঝাঁকি দর্শন হয় শুধু। ভাবছি পরশু ওয়াকিং ট্যুরটা নেব। চার ঘন্টা ধরে হেঁটে চিনব বার্লিনের অতীত।

১০ অক্টোবর ২০০৯, ফ্র্যাঙ্কফুট এয়ারপোর্ট। দিল্লির বোর্ডিং হয়ে গেছে। ফেরা রাত সাড়ে বারোটায় দিল্লি। কলকাতার উড়ান সকাল সাড়ে ছ'টা। বার্লিন মন আর চোখ দু-ই ভরিয়ে দিল। সকাল দশটায়। জিওলজিক্যাল গার্ডেন-এর উল্টোদিকে ম্যাকডোনাল্ড থেকে হাঁটা শুরু। প্রথমে S-Bahn বা ট্রেনে করে ওয়াকেসকার মার্কেট। সেখান থেকে হাঁটা শুরু। পরের পাঁচ ঘন্টায় কান ভরে শুনেছি আর চোখ ভরে দেখেছি কল্পনায় বোঝার চেষ্টা করেছি। অটোমান সাম্রাজ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, প্রুশিয়া, হিটলারের অবিশ্বাস্য নৃশংসতা আর পাগলামি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ছেলেমানুষি বার্লিন ওয়াল। একষট্টিতে বসানো শুরু আর পাঁচাত্তরে শেষ। মাত্র চোদ্দ বছর যেতে না যেতেই ভেঙে চুরমার। Barneby Pole ব্রিটিশ। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র। আজ সাড়ে পাঁচ বছর The Famous English Walk-এ গাইডের কাজ করছে। ১২ ইউরো লাগে। সে সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম সব জানে। তবে বক্‌বক্‌ একটু বেশিই করে। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা শরীরটাকে কাজে লাগিয়ে দুরন্ত কাজ করছে।

আমাদের বাধ্য ছাত্রের মতো বসিয়ে মোরামের মধ্যে লাঠি দিয়ে আঁকা শুরু করে দিল। এই মনে কর জার্মানি আর এই মনে কর বার্লিন। আর এই মনে কর দেওয়াল। অনেকটা সেই হ য ব র ল-র কাক্কেশ্বর-এর কথা মনে পড়ল। তবে কিন্তু এ কুচকুচে নয়, ধবধবে।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, এ তল্লাটে দেখলাম কাকগুলো দিব্যি সাদা। অন্তত, গলা, বুক, পেট তো সাদাই, ডানা আর মাথাটা ধূসর। লালমোহনবাবু থাকলে হয়তো বলতেন, এ কোতায় এলুম মশাই?

বার্নাবির বকবক শুরু হল মিউজিয়াম থেকে। বার্লিনের ডোম-এর সামনে Lust garden। Lust মানে কিন্তু কামনা নয়, Pleasure, জার্মানরা সেভাবেই লেখেন। সেখান থেকে Humboldt University-র সামনে। সেই বেবেল প্লাজা। যেখানে হিটলারের নাৎসি বাহিনি ১২,০০০০ বই পুড়িয়েছিল। তারপর কুখ্যাত চেকপয়েন্ট চার্লি। আমেরিকান চেকপয়েন্ট। পাশেই CIA আর KGB-র লীলাক্ষেত্র। রাস্তার এদিক-ওদিক, তবে বার্নাবির মতে ওটা গুজব। বার্লিন ওয়ালের একটা ছোট্ট অংশ আজ অবশিষ্ট। তবে সেটা আসল দেওয়ালটা নয়। আউটার ওয়াল-এর ভগ্নাবশেষ। ২০০ মিটার।

নাৎসিদের হেড কোয়ার্টার দেখলাম। ১৯৫৩-র বিখ্যাত মহামিছিলের স্মরণিকা। তারপর হিটলারের বাঙ্কার। জনতার রোষে বাঙ্কার বহুদিন বন্ধ। ইট, বালি, পাথর, কংক্রিট দিয়ে পাকাপাকি মুছে ফেলা হয়েছে সেই উন্মাদ শয়তানের গোপন আস্তানা।

আজ তার ওপর নেহাৎই নিরীহ চেহারার একটা ফ্ল্যাটবাড়ি আর তার কারপার্কিং। কাঠ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে জায়গাটা। কয়েকটা ম্যাপল গাছ।

বার্নাবি বলল, আগে নাকি লোকে এই গাছের তলায় মূত্রত্যাগ করত। যদিও আজ সেটা আর এ্যাডভাইসেবল নয়। হলো কাস্ট মেমোরিয়াল শুধু ২৮ x ৭ (ভুল হতে পারে) জন ইহুদির স্মরণ ভূমি। ব্রান্ডনবার্গ গেট। আটচল্লিশ ঘন্টা, দ্বিতীয়বার। তারপর বাট্‌সব্যান হফ থেকে U2 ধরে হোটেল ফেরা। শ্যাম ভার্মা আর জয়শ্রী শারদ্র ছিল সাথে। আর গ্যাল্ডার্মার হরিরাম।

হোটেলে পৌঁছানোর আগেই সিগরিডের এস.এম.এস পৌঁছে গিয়েছিল সিগরিড মেইসনার (Sigrid Meissner) স্টিভ এমেটের বাল্যবান্ধবী। প্রথম প্রেম। সেটা পাঁচের দশকের শেষ। ছয়ের দশকের শুরু।

মার্কিনি ইহুদি স্টিভ জার্মানিতে পড়তে এসেছিল। সিগরিড আর ও একসাথে স্কুলে যেত। পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সিগরিডের এক ভারতীয়ের সাথে বিয়ে হয়। তবে সে বিয়েও টেকেনি। মানুষটা মন্দ ছিল। এখন রোটারডাম ইউনির্ভাসিটির এক অধ্যাপক ওঁর স্বামী। সিগরিডের তিন মেয়ে—মোনা, সাবিনা আর ছোটটার নাম জানি না।

ঠিক ছ'টায় রিসেপসান থেকে খবর পেলাম ওরা এসেছে। মধ্য ষাটের সুন্দরী। সিগরিডকে ভালো লেগে গেল প্রথম দর্শনেই। Elegant and Jaminie. মোনা আমার থেকে বছর পাঁচ ছয়ের ছোট। ইউ.এস.এ থেকে পড়াশোনা করে ফিরল। চাকরি খুঁজছে। ওর এখনো বিয়ে হয়নি। কি খেয়াল হল সানডিয়েগোতে স্টিভকে ফোন করলাম। ও চেম্বারে ছিল, তাও ফোন ধরল। 'নমস্তে'। বলল, আমি ওদের বলেছি সব ভারতীয়ই কিন্তু খারাপ লোক নয়। তাই তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দিলাম। মোনার জন্য একটা ভালো ছেলে দেখো তো!

আমি চমকিত আর বিস্মিত। নিজের প্রথম প্রেমিকা। তার মেয়ের বিয়ের জন্য প্রায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো চিন্তামাখা গলা। সিগরিড আমাদের নিয়ে গেল একটা থাই রেস্টুরেন্টে। এখানে অমৃত হোটেল ছাড়াও আর একটা ভারতীয় হোটেল চোখে পড়ল। কোথা দিয়ে কয়েকটা ঘন্টা কেটে গেল। সিগরিড মেইসনার আর মোনা জাভেদ কীভাবে যে অন্য মহাদেশে আমার কাছে এল। সেই জিগ্‌স হাট প্লাজা হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল আমাকে ওরা দুজন। বার্লিন ফাংট্রামে তখন আলোর উৎসব। জার্মানির মহামিলন বিংশতি বার্ষিকী শুরু হল।

With best compliments of

SRMB

Leadership through innovation

SRMB SRIJAN LIMITED

DURGAPUR WORKS
Sagarbhanga, Durgapur 713211, Dist. Paschim Bardhaman
Phone + 91(0343) 6450788 / 645 0877
Fascimile : +91 (0343) 255 9206 / 255 9205

Sl. No. 78

অবিশ্বাস্য

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

যামিনীকান্তের বড়ো মেয়ে জন্ম থেকেই সোনার বরণ। তাই আদর করে নাম রেখেছিলেন সুবর্ণবালা। ওই মেয়ে পড়াশোনাতে যেমন অত্যন্ত মনোযোগী ছিল, তেমনি ঘরের কাজেও অত্যন্ত পারদর্শী। সুতরাং তার বিবাহকালে যামিনীকান্তকে বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। ইঞ্জিনিয়ার পাত্র ধ্রুবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ঘর আলো করে সে দিব্যি সংসারধর্ম পালন করতে লাগল। যামিনীকান্তের তখন সুখের দিন। যাতে হাত দেন, সোনা ফলে যায়।

যামিনীকান্তের পাশের বাড়ির বাসিন্দা রামচন্দ্র রায়। তাঁর মেজোছেলে নির্মল রায়, ডাকনাম মানিক। সে যখন স্কুলকলেজে পড়ত, যামিনীকান্ত তাকে খুব যত্ন করে অঙ্ক শিখিয়েছিলেন। কালে কালে অসমসাহসী মানিক তারাতলা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে বিদেশি সওদাগরি জাহাজে মোটা মাইনের চাকরিতে দেশ ছাড়ে। বছরে তিনমাস সবেতন ছুটি নিয়ে সে দেশে আসে। আত্মীয়স্বজনদের জন্য বিভিন্ন উপহার আনে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ তার কাছে দেশ-বিদেশের গল্প। কিছু কিছু কাহিনি অলৌকিক অথবা গাঁজাখুরি মনে করেন যামিনীকান্ত। মাসের মাস জলে ভেসে থাকে যারা তাদের নানা ধরনের 'হ্যালিসিনেশন' সম্বন্ধে যামিনীকান্ত জানতেন। কাজেই তিনি মানিকের গপ্পো শুনতেন পরম স্নেহবশত, কিন্তু তর্ক-বিতর্কে যেতেন না।

এক রকমের মাছ উড়ে উড়ে জাহাজের পাশে পাশে নাকি কয়েক মাইল পথ চলে। আটলান্টিক সাগরের মাঝে কোথায় যেন লাইট-হাউসের এক প্রহরীর সাথে তিমি মাছের বন্ধুত্ব। সেই প্রহরীর পাঠানো জিনিসপত্র ওই তিমিমাছ নাকি সারেঙ-এর কাছে পৌঁছে দেয়। সারেঙ প্রহরীর খাবার রসদ ওই তিমিমাছের মাধ্যমেই নাকি পাঠায়। ডারবান বন্দরে নাকি এমন ঘড়ি পাওয়া যায় যা সচল অথচ সময়কে দ্রুত এগোতে দেয় না। দেয়ালঘড়ি অন্যান্য ঘড়ির সাথে একই সময়ে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে।

ওখানে ভালো করে খুঁজলে নাকি হাতঘড়িও পাওয়া যায়, যার ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে সময়কে আটকে রাখার।

আবার নাকি এমন ঝরনা কলম পাওয়া যায়, যার ব্যবহারে আপনা-আপনি লেখা বেরোতে থাকে, গদ্য-কবিতা, অঙ্ক, ইতিহাস—যাই তুমি চাও না কেন। শুধু ওটি ব্যবহারের আগে চান করে শরীর শুদ্ধ করে কলমকে নমস্কার করে তোমার কী চাই জানাতে হবে।

যামিনীকান্ত তাকে বলেছিলেন, ''মানিক, তোমার গল্পগুলো তো কয়েক বছরে বহুবার শুনেছি। পরের ছুটিতে তুমি আমাকে ওইরকম একটা হাতঘড়ি আর একটা ঝরনা কলম কিনে দিও'খন।''

এসব কাহিনি অনেক বছর পরে সুবর্ণবালার কাছেই শোনা।

সুবর্ণবালার ছেলে সিদ্ধার্থ এমনি পড়াশোনায় খুব ভালো। কিন্তু কোনোমতে পাশনম্বর পায়, শ্রেণিতে কোনো স্থান অধিকার করতে পারে না। পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র নিয়ে ভাবতে ভাবতে তার সময় শেষ হয়ে যায়, কলম সরে না। কেন যে এমন হয়! এর চিকিৎসাই বা কী সেই তা খুঁজে পায় না। এ ছেলে বিজ্ঞান পড়তে পায়নি। কলা বিভাগে একাদশ শ্রেণির উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় সুবর্ণবালা তাকে একটি কলম আর একটি হাতঘড়ি দেন।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল। কলা বিভাগের ছাত্র সিদ্ধার্থ তাক লাগিয়ে দিয়েছে, সে প্রথম হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল—সব বিষয়ে সে ঝুড়ি ঝুড়ি নম্বর পেয়েছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্ক নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা তার কাছে হালে পানি পায়নি।

পাড়ায় তো উৎসব লেগে গেল। সাংবাদিকদের ভিড়। জনে জনে একই জিজ্ঞাসা। কেমন করে এ অসম্ভবকে সম্ভব করলে?

প্রশ্নের মুখে পড়ে সিদ্ধার্থ আরো গুটিয়ে যায়, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

তার একই উত্তর। প্রত্যেকবার তার জবাব, এ আমার মায়ের জন্য। মা আমাকে সময় অনুযায়ী এগোনোর জন্য ঘড়ি দিয়েছেন, আমার নির্দিষ্ট সময়ে উত্তর শেষ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। মা আমাকে লেখার কলম দিয়েছেন, আপনা আপনি কলম উত্তর দিয়ে দিয়েছে। আমাকে ভাবতেও হয়নি।

এমন জবাব কি কখনো কারুর মনঃপূত হতে পারে! ছেলেটার উড়ে এসে জুড়ে বসে হঠাৎ প্রথম হয়ে নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই যত গাঁজাখুরি জবাব দিচ্ছে।

তবে দেখি তোমার ঘড়ি আর সেই কলম। ঘড়িটা ফাব্রেল্যুবা কোম্পানি 'সি-চিফ' মডেল আর পেনটা 'ডোরিক-স্পিড ম্যাজিক'।

পাতি পাতি খুঁজেও কোনও বিশেষত্ব নজরে পড়ে না। আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে যায়।

যামিনীকান্ত পেয়েছিলেন ওই ঘড়ি আর পেন, মানিকের কাছ থেকে। মানিক আর দেশে ফেরেনি। বিদেশিনী বিয়ে করে বিদেশেই থিতু হয়েছে। একটা পোঁটলাতে ঘড়ি, পেন, পাঠিয়েছিল এক বন্ধুকে দিয়ে। সাথে প্রণাম জানানো চিঠি।

যামিনীকান্ত খুব রেগে গিয়েছিলেন চিঠি পড়ে। কেন দেশের মানিক বিদেশে থাকবে?

সুবর্ণবালা যখন ছেলেকে নিয়ে উদ্বিগ্ন, কোনো সুরাহা মিলছে না, তখন যামিনীকান্ত লুকিয়ে লুকিয়ে ওই ঘড়ি আর পেন দিয়েছিলেন সুবর্ণকে। বলেছিলেন নিয়মকানুন।

সিদ্ধার্থের প্রথম হওয়া আর তার জন্য ঘড়ি আর পেনের অবদান এই স্বীকৃতিতে যামিনীকান্ত হতভম্ব।

অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য। মানিকের গল্পগুলি তাহলে গাঁজাখুরি নয়!

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বিবাহ, অন্নপ্রাশন সহ সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে পরিতৃপ্তির শেষ কথা

ফ্রেন্ডস্ ক্যাটারার

ধাত্রীগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান ।। যোগাযোগ : ৯০৯৩৬০৯০৪৮, ৯৪৩৪৫৭৬৪২৯

Sl. No. 73

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিরঞ্জন খাদি গ্রাম উদ্যোগ সেবা সমিতি

সোন্দলপুর, আটঘড়িয়া, পূর্ব-বর্ধমান

খাদি শাড়ি, পাঞ্জাবি, কুর্তা, কেটে, মটকা, তসর, মসলিনের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

(বি.দ্র. : কেন্দ্রীয় সরকারি রিবেট অনুমোদিত)

Sl. No. 175

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

তিরুপতি কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড

বিষ্ণুপুর, রসুলপুর, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 10

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মেসার্স কুমার ব্রাদার্স

আলু, ধানের কমিশন এজেন্ট

অনুপমা বস্ত্রালয়

উৎসবে উপহারে নিত্য প্রয়োজনে পোশাকের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

যোগাযোগ : ৯৭৩২৩৩১৮৩৩, ৯৭৩২২৪৯০১৭, সুলতানপুর বাজার (হাইস্কুলের নিকট), পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 75

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পেপসিকো ইন্ডিয়া হোলডিংস প্রা. লি.

সংযোগে আলু চাষ করে লাভবান হোন

ভেন্ডার : সৈয়দ মহঃতকি

বুলবুলিতলা, খালিশপুর, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৪৩৪৬৬৯৯২৪

Sl. No. 114

With Best Compliments from

M/s JNANRANJAN GHOSH

Vill. & P.O. Gram Chagram, M: 9434661688, 8518980600

ALL KINDS OF BUILDING MATERIALS AVAILABLE HERE

Sl. No. 18

With Best Compliments from

S. NATH

Kolkata

Sl. No. 17

With Best Compliments from

R. SAHA

Nadia

Sl. No. 16

With best compliments of

Jagannath Chakrabarty

Satgachia, Purba Bardhaman

Sl. No. 84

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

দেনুড় গ্রাম পঞ্চায়েত

দেনুড়, পূর্ববর্ধমান

জনগণের সার্বিক উন্নয়নই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ঐক্য বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হোন।

পার্বতী দলুই
উপপ্রধান

মকদুম হোসেন সেখ
প্রধান, মো. ৯৬০৯৪০২৪৩১

Sl. No. 56

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

খড়দত্তপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.

Sl. No. 54

With best compliments of

Sandip Narayan Jash

GOVT. CONTRACTOR AND GENERAL ORDER SUPPLIER

Vill & P.O. Asanpur, P.S. Manteswar, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal
Ph : 8167314484, 834893765

Sl. No. 55

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ

প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার ল্যাবরেটারি

মাধবপুর, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান-৭১২৪০২

আমরা আমাদের অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাসট্রি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিতে উন্নত গুণমানের টিস্যু কালচার কলাচারা প্রস্তুত করছি। নিয়মিতভাবে মাঠে বসানোর উপযুক্ত G-9 কলাচারা সরবরাহ করে থাকি। এই চারাগুলি অত্যন্ত সুফল দেয়। G-9 কলা ব্যবসায়ী ভিত্তিতে চাষ করা অত্যন্ত লাভদায়ক হওয়ায় এই প্রজাতি কলা মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই কলাগুলি প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষজনের শরীর-স্বাস্থ্য পুষ্টিগতভাবে খুব ভালো থাকে। আমাদের অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি এই ধরনের, বিশেষত G-9 কলাচারার প্রতি ভীষণভাবে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে আগ্রহী।

Sl. No. 67

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

লোহাচুড়-বড়গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

অফিস : বড়গাছি, পোঃ মোয়াইল, বর্ধমান ।। যোগাযোগ : ৮৯০০৫০২৪৩৪

এই সমিতি চাষিদের সেবায় নিয়োজিত। KCC সমিতি থেকে ঋণ, চাষির সেচের জল, আমানত গ্রহণ এবং রাসায়নিক সার বিক্রয় করা হয়। CSP-র মাধ্যমে উন্নত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়া হয়।

বাবলু মাহাতো	**প্রকাশচন্দ্র ঘোষ**	**মৃত্যুঞ্জয় বৈদ্য**
সম্পাদক	সভাপতি	ম্যানেজার

Sl. No. 53

With best compliments of

MICROCHIP

1 No. G. T. Road (Near LICI Office),
Bardhaman, Mob. 9434053055

Sl. No. 45

With best compliments from

Rafikul Islam

Sl. No. 8

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের বিচারে
পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রামীণ পাঠাগার ও সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠিকা

নাদনঘাট শাস্ত্রী স্মৃতিসংঘ গ্রামীণ পাঠাগার

নাদনঘাট, পূর্ব বর্ধমান

২০১৯ সালে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ জল পরীক্ষাগার

শাস্ত্রী স্মৃতিসংঘ জল পরীক্ষাগার

Sl. No. 124

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

জনগণের দ্বারা পরিচালিত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত জনগণের সার্বিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু ও নারী উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, পরিকাঠামো উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

ডলি মুর্মু
উপপ্রধান

পিন্টু খামারু
প্রধান

Sl. No. 62

With best compliments of

Expertian Skill Empowerment Pvt. Ltd.

[Education & Career Consultant]
ADMISSION CONSULTANT
Medical, Nursing, Pharmacy [MBBS, BDS, GNM, BSc Nursing, D. Pharm, B.Pharm)
TEACHING EDUCATION, MANAGEMENT
(D.El.Ed., B.Ed., M.Ed., M.P.Ed., BBA, MBA]
Facilities : (i) Special Class, (ii) Free Practicum, (iii) Free Notebook, (iv) Free Suggestion, (v) Low fees, (vi) Installment facilities, (vii) Bank Loan Facility

স্বনির্ভর হোক
আপনার কন্যা
বাড়িতে আসুক
খুশির বন্যা

Contact us : 8597576686, 9733557895
400, G. T. Road, Near ICICI Bank, Purba Bardhaman-713101 ● Juli Market, Rasulpur, Bankura-722208

Sl. No. 65

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কিতাবুল মল্লিক

কনট্রাক্টর এবং জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার

গ্রাম ও পোঃ মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : ৯৪৭৪৩৬৪৮৩৭, ৭৯০৮০৪৪০৬২
আসুন, আমরা সকলে মিলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

Sl. No. 115

অরুন্ধতী কোনার

জন্ম : ৩০-০৭-১৯৯৬

মৃত্যু : ১৮-০৮-২০১৮

দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে

আমরা হারিয়েছি।

ক্যান্সার সম্বন্ধে সচেতন হোন

Sl. No. 42

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

এস.এন. এন্টারপ্রাইজ

মালম্বা বাজার, পূর্ব বর্ধমান

যোগাযোগ : ৯৭৩৪২২২২২০, ৭৭৯৭৬৭১৯৭১

এখানে নামি-দামি কোম্পানির পিভিসি পাইপ,

ট্যাঙ্ক ও মোটর পাওয়া যায়।

আমাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সোনার বাংলা বস্ত্রালয়

Sl. No. 31

With best compliments of

RENUKA FURNITURE & SAW MILL

Prop. **ANIL KUMAR DALUI**

Amtala, Golapbag, More, Saraitikar Road, Burdwan-713104

Office : 0342-2657605, Anil Dalui : 9434133134, Abhijit : 9932494929, Subhajit : 9732297222

website : www.renukaa.in

Sl. No. 40

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

চণ্ডীমাতা হিমঘর

গ্রাম ও পোঃ আঝাপুর, থানা : জামালপুর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০১

এখানে খুবই যত্ন সহকারে আলু সংরক্ষণ করা হয়। চাষিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

Sl. No. 109

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

এম. এ. কনস্ট্রাকশন

বিল্ডিং মেটেরিয়াল সাপ্লায়ার ।। প্রোঃ সেখ মিরাজ হোসেন (রবু)

ক্ষেতিয়া রেল গেট, কাটোয়া রোড, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৬২৯৫৫৬৬০৩১, ৯৯৩২৭৯৩৫৫১, ৯৫৬৩৬৭৪৭৭৮

Sl. No. 37

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

অষ্টগ্রাম এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড

বেগুনিয়া, বর্ধমান

আমাদের পরিষেবা

• KCC Loan to Members • SHG Loan to Members • Pledge Loan • M.T. Agril. Loan
• Deposit : (a) Savings, (b) R.D., (c) T.D., (d) F.D. • 45 Mini Deep tubewell • Fertilisier Business

Sl. No. 30

With best compliments of

MANAB SEBA FLY ASH BRICKS PROKALPA

Kaligram, Purba Bardhaman

Prop. **Md. Sarif Minya**

Sl. No. 36

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

হিন্দুস্থান মার্বেল

এম. এস. চৌধুরী

রাজস্থানের উন্নত মানের মার্বেলস্, টাইলস্, গ্রানাইটস্ পাইকারি ও খুচরো সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কেশবগঞ্জ চটি, জি.টি. রোড, (মসজিদতলা), বর্ধমান। যোগাযোগ : ৯৩৩৩৪১০৮৬, ৯০০২৪৪৪৭৮৭

Sl. No. 39

With best compliments of

M/s. Mondal Construction

Prop. WASHIM MONDAL & AZIZUL ISLAM MONDAL

Govt. Regd. Civil Contractor

Office : Modhupur, P.O. Simlon, P.S. Kalna, Purba Bardhaman
Mob. 9064329502 & 8513865411

Sl. No. 113

With best compliments of

Gajanan Industries

Prof. Jagadish Patel, Mob. 9474688573
TIMBER MERCHANTS & SAW MILL OWNERS

Gajanan Trading Company

Prof. Hardik Patel, Mob. 9433506321
GLASS, ALUMINIUM, PLYWOOD, HARDWARE, MEMARN DOOR ETC.

Mirhat (Sirishtala), Baidyapur, Purba Bardhaman-713122

Sl. No. 28

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

রামনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ১৯ কে.টি., তারিখ : ৩০-০৩-৬৩ ।। গ্রাম : রামনগর, পোঃ বৈদ্যপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান

আমাদের পরিষেবা

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহ দান, সুলভ মূল্যে বিভিন্ন রকম চাল সরবরাহ, কাপড়ের দোকান, দিবারাত্র অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা (চালক : ৯৪৭৪১৫১৭৯৫), ট্রাক্টরের মাধ্যমে স্বল্প ভাড়ায় জমি চাষ, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন, স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণ দাদন, প্লেজ ঋণ (কেভিপি ও এন.এস.সি জমা রেখে), সেচের ব্যবস্থা (৫০টি মিনিডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে)

সমবায় ব্যাঙ্কের গ্রাহক হোন।। সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন ।। জেলার উন্নয়নে সামিল হোন।

Sl. No. 26

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সাতগেছিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ সাতগেছিয়া, জেলা : পূর্ব বর্ধমান

অত্র সমিতির ব্যবসায় আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে—

১. কে.সি.সি. লোন, ২. এম.টি. লোন, ৩. ক্যাস ক্রেডিট লোন, ৪. কনজামশান লোন, ৫. ডিপোজিট : সেভিংস, রেকারিং, ফিক্সড, ৬. এল.পি. গ্যাস (ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি.)

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমবায়ের এবং নিজের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করুন।

শরৎচন্দ্র মণ্ডল	**গৌতম মুখার্জি**	**সোমনাথ দে**
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

Sl. No. 14

With best compliments of

NARAYANI RICE MILL

Paraj More NH2 Side)

Contact No. 9332082128

Sl. No. 22

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

Sl. No. 20

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিত্যানন্দপুর-বলগোনা এফ.এস.সি.এস লিমিটেড

রেজি. নং : ৩০৮, তাং : ১৮-১২-৭৬

এখানে গ্রাহকদের ব্যাঙ্কিং-এর সমস্ত রকম পরিষেবা দেওয়া হয় এবং NEFT-এর মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়ার সুযোগ আছে। চাষিদের সুবিধার্থে ন্যায্য মূল্যে রাসায়নিক সার বিক্রয় করা হয়।

লালমোহন চৌধুরী	সেখ আনসার
চেয়ারম্যান	ম্যানেজার
মো. ৯৫৬৪৯৮৪০৬৪	মো. ৮১৫৮০৪০৭৩৯

Sl. No. 15

With best compliments from

RADISTA

Sl. No. 126

With best compliments from

Arup Arogya Niketan

Surekalna, Purba Bardhaman

Sl. No. 125

With best compliments from

SHYAMSUNDARPUR COLLIERY EMPLOYEES'
CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

P.O. Ukhra, Paschim Bardhaman-713365

A Symbol of Coperation, Trust and Growth

Sl. No. 131

With best compliments from

BABLU SINHA

UNDERGROUND AND CIVIL CONTRACTOR : **SHYAMSUNDARPUR COLLIERY**

P.O. Ukhra, Paschim Bardhaman-713363

Sl. No. 132

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কুবাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ কুবাজপুর, থানা : ভাতাড়, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৮৯৬৭০৭৯৬৫৬
রেজি. নং. ৩৪১২ তাং : ২০-০৮-৬৯

আমাদের পরিষেবা সমূহ : **১. ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, ২. কৃষকদের মধ্যে স্বল্প সুদে কে.সি.সি. খাতে ঋণ দাদন, ৩. বিভিন্ন কোম্পানির রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়।**

সমিতির পক্ষে

শাহাজামাল মণ্ডল

Sl. No. 60

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ইসলামপুর সমবায় সেবা সমিতি লিঃ

রেজি. নং ৪৬বি. তারিখে : ৩১-০৩-১৬ ।। ইসলামপুর, পোঃ নাদনঘাট, পূর্ব বর্ধমান

চাষিদের সেবায় নিয়োজিত

গোলাম সুফি — সভাপতি
সিরাজুল ইসলাম — সম্পাদক
আব্দুস সালাম সেখ — ম্যানেজার

Sl. No. 123

With best compliments from

CLW CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

রেজি. নং ৪৭ (২৪.০১.১৯৫২) ।। পোঃ চিত্তরঞ্জন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান-৭১৩৩৩১

'সমবায় প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।' *—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

আমাদের পরিষেবা

● কম সুদে ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান। ● ১,২০,০০০ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান। ● ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত উৎসব ঋণ প্রদান। ● শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। ● কম ভাড়ায় পুরীতে হলিডে হোম। ● এলাকার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান। ● বিদায়ী সদস্যদের সম্মানের সাথে বিদায় দেওয়া। ● আমরা আমাদের সদস্যদের আর্থিক মান উন্নয়নের সতর্কপ্রহরী।

Sl. No. 93

পরিচালন পর্ষদ

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

পঞ্চগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম : ডিহিপলাশন, পোঃ বড়োপলাশন, পূর্ব বর্ধমান

পরিষেবা

কেসিসি ঋণ প্রদান ● রেশন পরিষেবা ● এস.এইচ.জি. স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন
● এলাকার কৃষকদের ন্যায্য মূল্য রাসায়নিক সার সরবরাহ ● সি.এস.পি. দ্য বার্ডোয়ান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এলাকার সকল জনসাধারণকে পরিষেবা প্রদান।

Sl. No. 98

With best compliments of

Sl. No. 23

With best compliments of

brm

Bhadreswar Rice Mill

....WE CARE FOR YOUR HEALTH....

Sl. No. 19

With best compliments of

Sl. No. 21

With best compliments of

M/s HAZRA ENTERPRISE

Prop. ***Ram Sanjit Hazra***

(Mechanical Contractor & Transporter)

Vill. + P.O. Kajora Gram, (R.K. Cinema Hall)

Dist. Paschim Bardhaman, W.B.

PIN : 713338, Mob. 9564454709, 9832222330

We deal in Heavy Earth Equipment, JCB, L&T, Poclain, Loader, Dumper etc.

Sl. No. 143

সকলকে উৎসব শুভেচ্ছা জানাই

জনৈক শুভার্থী

Sl. No. 49

With best compliments of

Road Way & Roof Co-operative Labour Contract & Construction Society Ltd.

Regd. No. 3KT, 1986-87
Vill : Pearinagar, P.O. Dhatrigram, Dist. Purba Bardhaman, M : 9434669867
Banker : The BCCB Ltd.

Sl. No. 72

With best compliments of

SHREE DURGA HARDWARE

Guskara, New Town, Phone : 7679545483

Deals in : **RAKSHA PIPES**

Sl. No. 7

With best compliments of

R.S. AGRO INDUSTRY

P.O. Galigram, Galsi, Dist. Purba Bardhaman

এখানে উন্নত মানের ভাতের ও মুড়ির চাল তৈরি করা হয়।
সকলের সেবাই আমাদের একমাত্র কাম্য।

Sl. No. 106

With best compliments of

BARAPALASHON UNION CO-OP. AGRIL. CREDIT SOCIETY LTD.

Regd. No. 2343, Date : 26-02-57
Vill. + P.O. Barapalashon, Dist. Burdwan, PIN : 713426, Ph : (0342) 2716371
Branch Office : Malamba Bazar

Sl. No. 97

With best compliments of

Sl. No. 105

With best compliments of

Piplon S.K.U.S. Ltd.

Vill & P.O. Piplon, P.S. Monteswar
Regd. No. 14KT, Dt. 29.03.63
Dist. Purba Bardhaman

আমাদের পরিষেবা

KCC, MT. SHG Loan, Banking Facility, Customer Service Point, Paddy Procurement, Help to 100 SHG Groups, Business of Agril Inputs

Debabrata Dutta
Chairman

Malay Proshad Kundu
Secretary

Gopal Dutta
Manager

Sl. No. 59

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কুলুট বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

কুলুট, মন্তেশ্বর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই

Sl. No. 58

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

A. Dey Contractor & Suppliers

মন্তেশ্বর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, M : 9434576358

বজায় থাকুক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এটি আমাদের ঐতিহ্য।

Sl. No. 57

With best compliments of

KANAKA AUTOMOBILES

GALSI STATION ROAD, PIN : 713406
PHONE : 9064664479, 9064656441, 9732041419

Sl. No. 104

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

CARE-C-APOLLO

(APOLLO TELEMEDICINE)

(আনন্দলোকের নিকট)

চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসারতদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। বারংবার পরামর্শের জন্য চেন্নাই যাবার পরিবর্তে এখন ভিডিও কলিং-এর মাধ্যমে চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালের যে-কোনো চিকিৎসকের সাথে সরাসরি কথা বলার বা চিকিৎসা করানোর সু-ব্যবস্থা। ভাষাগত সমস্যার ক্ষেত্রে কো-অর্ডিনেটরের (সমন্বয়কারীর) সাহায্য পাওয়া যায়।

যোগাযোগ : **মুকুলবরণ সাধু**, মো. ৯৭৩২০৫৭৮৪৪, **সন্দীপ মাজি**, মো. ০৮১৫৯০৪২৫৮৭

চেন্নাই থেকে মেডিসিন আনিয়ে দেবার সুবন্দোবস্ত আছে। সেক্ষেত্রে কুরিয়র চার্জ প্রযোজ্য।

Sl. No. 94

With best compliments of

ARTI BAKERY PVT. LTD.

Kalipahari, Ningha, Jamuria, Paschim Bardhaman

Sl. No. 95

With best compliments of

SRI BISHNU HALL

SRI BISHNU HOTEL & RESTAURANT cum BAR

NINGHA NH2, PASCHIM BARDHAMAN 713370, M : 9735122633

Sl. No. 96

With best compliments of

DPS (S.P.S. UNIT) E.C.C.S. LTD.

Shibpur Power Station, P.O. Jamuria hat, Dist. Paschim Bardhaman-713336

Sl. No. 85

With best compliments of

DILIP KARMAKAR

Civil Contractor and General Order Supplier

Bogra Colony, P.O. Devchand Nagar, P.O. Jamuria, Dist. Paschim Bardhaman-713336

M : 9732153689

Sl. No. 86

With best compliments of

OM FLOUR MILLS

Ningha, Jamuria, Paschim Bardhaman

Sl. No. 88

With best compliments of

SOMESH ENTERPRISE

AMC, Asansol

Sl. No. 87

With best compliments of

BHAWANI BISCUITS

Ningha, Jamuria, Paschim Bardhaman

Sl. No. 89

With best compliments of

KOLKATA BHOJANALAYA

Kunustaria, Tapasi, Jamuria, Paschim Bardhaman

Sl. No. 91

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

LOOK

LADIES AND GENTS WEAR

Burdwan Road, Satgachia, Mob. 9832920749

Prop. Samrat Sil

Sl. No. 144

Happy Pooja Greetings From

Lachipur Colliery® Employees Co-operative Credit Society Ltd.

Reg. No. 314 of 28-06-1983
Lachipur Colliery, P.O. Kajora Gram, Dist. Paschim Bardhaman

Abhijit Ghosh	Bipadtaran Nandi	Niranjan Dhibar
Spl. Officer	*Manager*	*Staff Member*

Sl. No. 137

With best compliments of

BHARAT GAS

Distributor Code : 117349
for 24 Hrs. Refill Booking Call : 7715012345, 7718012345

ASHOKA TRADING CO.

Andal More, Andal, Paschim Bardhaman, Ph : 0341-2373212
Mob. 8967168689, 8967716868

Sl. No. 136

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

রাধারানী ক্লিনিক

মেমারি, পূর্ব বর্ধমান ।। ডা. দিলীপ ভট্টাচার্যের নার্সিং হোম ।। মেমারি থানার পাশে

ইউ.এস.জি. ইউনিট

প্রতি সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও রবিবার
ফোন : ৯৭৩৪৭৮৭২৭৭, ৮৩৮৯৯৬৫৭৭৬

With best compliments of

RAHATPUR TANTUBAY SAMABAY SAMITY LTD.

Regd. No. 30DHP & ADR 83-84, dated 23-02-84
Vill. Rahatpur, P.O. Samudragarh, Purba Bardhaman, E-mail : rahatpur@gmail.com, Mob. 9733094955

Manufacturer and supplier : **Govt. Supply Saree, Lungi etc**

Sl. No. 142

With best compliments of

S.K. HARDWARE

Prop. KAZI SAFIUL ISLAM
Mondalgram, Kala DighiPar, Purba Bardhaman

Sl. No. 83

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সহজ তথ্যমিত্র

আগড়াদহ, পোঃ অকালপৌষ, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান

আমাদের পরিষেবা
অনলাইনে সমস্ত রকম ফর্ম ফিল-আপ, ইন্টারনেটের যাবতীয় কাজ, ট্রেন ও বিমানের সমস্ত
টিকিট বুকিং (আই.আর.সি.টি.সি. অনুমোদিত) সমস্ত রকম ভিডিও প্রোগ্রাম এবং সাধারণ ছবি তোলার কাজ।

যোগাযোগ : অঙ্কন ব্যানার্জী, মো. ৯৭৭৫৭৭০৭৭১

Sl. No. 71

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সুন্দর ও মজবুত ইটের জন্য যোগাযোগ করুন

মেমারি ব্রিক ফিল্ড

(মেমারি মার্কা ইট)

পাঁচখেয়া, ঘোষ, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৪৭৪৮৫৮৭২০, ৯৭৭৫২৫০৩৯১

Happy Puja Greetings from

Magra Brick Field & Co.

Vill. Denha Magra, P.O. Ghosh, Dist. Purba Bardhaman

Phone : (0342) 2250639

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

জনৈক শুভার্থী

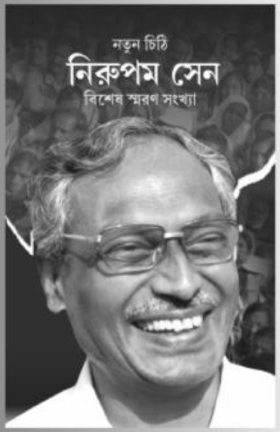

নতুন চিঠি
নিরুপম সেন
বিশেষ স্মরণ সংখ্যা

লিখেছেন

সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত, সূর্যকান্ত মিশ্র, মদন ঘোষ, ভি. কে রামচন্দ্রন, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, রথীন রায়, চন্দ্রাবলী সেন, অর্ধেন্দু সেন, সলিল ভট্টাচার্য, সুকান্ত কোঙার,জীবন চক্রবর্তী, সেখ সাইদুল হক, গৌতম চ্যাটার্জী, অলোক চ্যাটার্জী, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার মজুমদার, অরুণ মজুমদার, গীষ্পতি চক্রবর্তী, গৌরহরি দত্ত, বিলাস চ্যাটার্জী প্রমুখ। রয়েছে প্রয়াত নিরুপম সেন-এর দুটি লেখা ও দুটি সাক্ষাৎকারের পুনর্মুদ্রণ ও একটি অপ্রকাশিত লেখা 'ফিরে দেখা'।

নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর

৬২ বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-১

সত্যকে জানতে প্রকৃতকে চিনতে
এবং সৃজনশীল চেতনার বিকাশে আপনার হাতিয়ার

নতুন চিঠি

পড়ুন, পড়ান ও গ্রাহক হোন। আপনার মূল্যবান মতামত প্রকাশ করুন।
প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

৬২, বি সি রোড, বর্ধমান